

২

রচনা বালী

সৈয়দ মুজতবা আলী



স্বদেশী মুদ্রণ ও বচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৫৭

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
স্বমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচরনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিদ্ধ ফ্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

বিক্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ ভ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও দিউ লক্ষী প্রেস, ১৬ হেমেল সেন ষ্ট্রীট.
কলিকাতা ৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	গৌরকিশোর ঘোষ	/০
ধূপছায়া		
দেশভ্রমণ	...	১
রসগোল্লা	...	৬
চাপরাসী ও কেরানী	...	১৫
চিহ্না	...	২৪
বাঙালী	...	৩২
স্বকুমার রায়	...	৪৬
ভাবার জমা-খরচ	...	৪০
দর্শনচর্চা	...	৪৪
লেসে ফ্যার	...	৪৮
মার্কিনী তাত	...	৫২
বাঙালী মেছ	...	৫৪
রন্ধন-যজ্ঞ	...	৫৮
‘বালবনে—’	...	৬২
বাংলার গুণ না জর্মন গুণী	...	৬৮
শিক্ষাপ্রসঙ্গ	...	৭১
পৌলেমিক	...	৭৪
চরিত্র-বিচার	...	৭৮
দেয়ালি	...	৮১
গানের কথা : ভারত ও কাবুল	...	৮৭
উনো, হিন্দী, ক্রিকেট	...	৮৪
বুদ্ধঃ শরণঃ	...	৮৮
অ্যার ট্রাভেল	...	৯২
ভাষা ও জনসংযোগ	...	১০২
ইংরাজী বনাম মাতৃভাষা	...	১০৫
টুকিটাকি	...	১১৭

খেলাচ্ছিলে	...	...	১১৮
পিকনিকিয়া	...	...	১২১
সাহিত্যিকের মাতৃভাষা	...	...	১২২
আসা-যাওয়া	...	...	১২৩
দেহলি-প্রাস্ত	...	...	১২৫
পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব)			
ঐতিহাসিক উপস্থাপন	...	...	১৩১
কচ্ছের রাণ	...	...	১৩৫
দর্শনাতীত	...	...	১৪০
মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ	...	...	১৪৪
অমুবাদ সাহিত্য	...	...	১৪৮
বাবুর শাহ	...	...	১৫২
কেডিনান্ট্ জাওয়ারক্রম	...	...	১৫৫
হিডজিভাই পি মরিস্	...	...	১৬০
‘আধুনিক’ কবিতা	...	...	১৬৬
মুখের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিজ্রা শ্রেয়ঃ	...	...	১৭১
আলবের্ট বোয়াইৎসার	...	...	১৭৯
মরহুম ওস্তাদ কৈয়াজখান	...	...	১৮১
‘পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা ।’ ‘কটা ভাষা ?’ ‘হা কপাল !			
বাঙলাই হল না ।’	...	...	১৮৫
ইন্টারভ্যু	...	...	১৯০
অর্থঃ অর্থঃ	...	...	১৯৫
অস্ত্রাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায় ।			
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥	...	...	১৯৯
সাবিত্রী	...	...	২০৫
আধুনিকা	...	...	২১৯
ফরাইজ্	...	...	২১২
চোখের জলের লেখক	...	...	২১৬
ছাত্র বনাম পুলিশ	...	...	২২০
রাসপুতিন	...	...	২৩৯
বিষ্ণুশর্মা	...	...	২৫৭
বার্লম ও যোসাক্‌ট্	...	...	২৬১

রবি-মোহন-এনড্রুজ	...	...	২৬৫
‘ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে’—বাইবেল	...	...	২৭২
এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট	...	...	২৭৮
মিজোর হেপাজতী	...	...	২৮৩
গাড়োলশু গাড়োল	---	...	২৯১
ভাষা	...	...	২৯৬
কবিগুরু ও নন্দলাল	...	...	২৯৮
খেলেদ দই রমাকান্ত	...	...	৩০১
চতুরঙ্গ			
রবি-পুরাণ	...	...	৩০৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব	...	...	৩১৩
পুষ্পধনু	...	...	৩২৭
মরহুম মৌলানা	...	...	৩৩০
নসরুদ্দীন খোজা (হোক)	...	...	৩৩৬
নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম	...	...	৩৪৬
ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)	...	...	৩৬১
মামুদোর পুনর্জন্ম	...	...	৩৬৮
দিল্লী-স্থাপত্য	...	...	৩৭৭
বেজো না চরণে চরণে	...	...	৩৮৯
ইভান সের্গেভিচ ভুর্গেনেফ	...	...	৩৯৩
গাঁজা	...	...	৪০১
হরিনাথ দে’র স্মরণে	...	...	৪০৯
অম্বুকের না হম্বুকের ?	...	...	৪১৬
ফরাসী-বাঙালা	...	...	৪২২
চার্লি চ্যাপলিন	...	...	৪৩১
কিলোর ভাষা	...	...	৪৩৭
ক্রন্দসী	...	...	৪৪২
ছুচুন্দর কা সিব্বপর চামেলি কা তেল	...	...	৪৪৮
আর্ট না অ্যাকসিডেন্ট	...	...	৪৫২
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন	...	...	৪৫৬

ভূমিকা

কোনও কোনও জ্ঞানীশুণীর সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে অল্পযোগ, তাঁর পাণ্ডিত্য যত ছিল, তাঁর রচনায় তিনি তাঁর পরিচয় রেখে যেতে পারেননি। নিজে জ্ঞানী বা শুণী কোনটাই নই, তাই ও-কথার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারব না। তবে লোককে জ্ঞান দেবার জ্ঞান কোনও আগ্রহ এই মজলিশী মানুষটি কখনও দেখিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর চরিত্র বরং ছিল ঠিক উলটো। পণ্ডিত্য্যানা কি গুরুমশাইগিরি মুজতবার ধাতে সইত না।

পঞ্চতন্ত্রে মুজতবা এক জায়গায় লিখেছেন, “বেহেশতের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বৎস নামাজ পড়ে সেধায় যাবার বাসনা আমার নেই।” এই মন্তব্যটা থেকেই তাঁর চরিত্র বোঝা যায়। তবুজ্ঞানী হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন রসালাপী। একেবারে নৈকুন্ঠি আড্ডাবাজ। আর এই কথটা মুজতবা কি লেখায় আর কি জীবনচর্যায় কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। “আমো যে আড্ডাবাজ সে তবুটা ওদেরও মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একই ব্রাহ্ম মুহূর্তে।” কায়রোর আড্ডাধারীরাই যে প্রথম দর্শনে আড্ডাবাজ মুজতবাকে চিনে নিতে পেরেছিল তাই নয়, তাঁর অগণিত পাঠকবর্গও তাঁকে চিনে নিতে ভুল করেননি। আড্ডাপ্রিয় বাঙালীর জ্ঞান যে রস তিনি সাহিত্যের ভিয়েনে সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা আগন্তু আড্ডারই রস।

আর এই আড্ডার চক্রবর্তী বলুন, কুতব মিনার বলুন, অশোক স্তম্ভ বলুন, স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী। চাচা কাহিনীর অবিস্মরণীয় চাচার কথা স্মরণ হলেই আমার আলী সাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। পার্ক সার্কাসে এনং পার্ল রোডে এবং নাসিরউদ্দীন রোডের আন্তানায়, দিল্লীতে কনসিটিটিউশন ক্লাবে, বোলপুরের উকিলপাড়ার বাসাবাড়িতে, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় চায়ের দোকানে, কি কলকাতার বিভিন্ন পানশালায় যখনই সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি বারলিন শহরের কুরফুরসটেন-ডাম সড়কে অবস্থিত ‘হিন্দুস্থান হোস্টেল’র আড্ডার চক্রবর্তী চাচার মত, যার অনবদ্য বিবরণ তাঁর রচিত ‘চাচা কাহিনী’র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, আড্ডা জমিয়ে বসে আছেন। তিনিই সে আড্ডার মধ্যমণি এবং বখতিয়ার খিলজী। কথা বলতে এতও ভালবাসতেন। আর কত বিষয়ই না জানতেন!

ওঁর কথা আমরা এমন গোথাসে গিলতাম যে তিনি বিদগ্ধ না অর্ধদগ্ধ তা

বিচার করে দেখবার ফুরসতই পাইনি। তবে আড্ডাবাজ মুক্তবা আলীর যে পরিচয় আমীহুর রশীদ চৌধুরী সাহেব সজ্জনীকান্ত দাস মহাশয়ের জবানীতে (দেশ, ৪১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, পৃ ৪১৬) দিয়েছেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করছি। পাঠক মহাশয়েরা এর থেকেই কিছুটা আন্দাজ নিশ্চয়ই পাবেন।

“দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা শুনিতে শুনিতে পায়ে ঝাঁ ঝাঁ ধরিয়া গিয়াছিল। পাশে একটি কফির দোকান ছিল, প্রস্তাব করিলাম সেখানে একটু গিয়া বসি, এক কাপ কফি খাই। তারপর সেখানে বসিয়া কফির অর্ডার দিয়া পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কথা দুই পক্ষেরই জিজ্ঞাসাবাদ চলিল। একজনের কথা উঠিতে আমি বলিলাম যে সর্বনাশের পথ ধরিয়া সারাদিন মদ খাইয়া চুর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য—আমি মদ খাই না এবং সাহচর্যগুণে ঐ জিনিসটির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। মুক্তবা আলী কিন্তু সেই মদের উপর কথা পাড়িয়া বসিলেন। পৃথিবীতে কত রকম মদ আছে এবং ঐগুলো কিভাবে তৈরি হয়, কিভাবে খাওয়া হয়, কোন মদের স্বাদ কি রকম—এই সবার আলোচনা—বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। উনি যখন তাঁহার কথা শেষ করিলেন তখন আবিষ্কার করিলাম সন্ধ্যার বাতি জলিয়া গিয়াছে। আমাদের দুপূরেব খাওয়াও হয় নাই।

“আগে মুক্তবা আলীর কথাবার্তা শুনিয়া মনে করিতাম যে তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই। কিন্তু আমাদের মতো তিনটি প্রাণীকে প্রায় ঘণ্টা দশেক যাবৎ যে তন্ময় করিয়া রাখিতে পাবেন তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই একথা কি করিয়া বলি।”

লোককে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়ে কথা শোনাবার যে এলেম মুক্তবা আলীর ছিল তা তাঁর লেখাতেও বর্তেছে। তাঁর অননুकरणीয় বাগ্‌ভঙ্গীই যে তাঁর রচনারীতিকে গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে বিতর্কের স্থযোগ নেই। মুক্তবা আলীর যে-কোনও রচনা পড়লেই মনে হয়, তিনি কলমের মুখে কথা বলছেন। একটা উদাহরণ দিই। মদের প্রতি সজ্জনীবাবুর বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও মুক্তবা আলীর সামনে ঘণ্টা দশেক ঠাঁই বসে থেকে তাঁকে মদের নানা ব্যাখ্যান শুনতে হয়েছিল। তেমনি তামাকের নামে মুর্ছা যান এমন লোকও এই বিবরণটির শেষ না পড়ে পারবেন না, একথা আমি হালফ করে বলতে পারি।

“বলে কি? কাইরোতে তামাক? স্বপ্ন হু মায়া হু মতিভ্রম হু?”

“দ্বিবি ফর্শী হুঁকো এল। তবে হুমানের জাজের মত সাড়ে তিনগজী দরবারি নল নহু আর সমস্ত জিনিসটার গঠন কেমন ঘেন ভোতা ভোতা।

জরির কাজ করা আমাদের কশী কেমন যেন একটু 'নাছুক', মোলায়েম হয়—
এদের যেন একটু গাঁইয়া। তবে হ্যাঁ, চিলিমটা দেখে তজ্জি হল—ইয়া ডাবর
পরিমাণ। একপো তামাকে হেসেখেলে তার ভিতর থানা গাভুতে পারে—
তাওয়াও আছে। আঙনের বেলা অবিশ্তি আমি টিকের দিকিধিকি গোলাপী
গরম প্রত্যাশা করিনি, কারণ কাবুলেও দেখেছি টিকে বানাবার গুহুতথ্য সেখান-
কার রসিকরাও জানেন না।

“আর যা খুশবাই বেরল তার রেশ দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরও যেন আমার নাকে
লেগে আছে।

“পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই জানো সুগন্ধী ইজিপশিয়ন সিগারেট ভূবনবিখ্যাত।
কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ বিশেষ করে মিশরই সুগন্ধী সিগারেট তরিবং করে
বানাতে শিখল কি করে? আইস, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করা যাক। এই
সিগারেট বানাবার পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এস্তার রাজনীতি এবং দেশার রসায়ন
শাস্ত্র লুক্কায়িত আছে।

“সিগারেটের জন্ম ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার
ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে।
ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া থায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে
টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ন নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর
আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাধুলে নিয়ে এসে
কাগজ পেটিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কজাতে, তাই তুর্কীর
কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক
তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মিশিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ
করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ন সিগারেট।”—(আড্ডা, পঞ্চতন্ত্র)

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতিভার সম্যক পরিচয়টা তুলে ধরবার জন্মই এই
নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শুধুমাত্র বাগ-
বিভূতি নয়, মুজতবা আলী কথার পরতে পরতে হরেক বকম তথ্য ও সমাচার
এমন সুন্দর আন্দাজে পরিবেশন করতে পারতেন বলেই তাঁর শ্রোতা বা পাঠক
মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। আর তাঁর পরিবেশিত তথ্যসম্ভার ছিল যত ব্যাপক তত
বিচিত্র। দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং অক্লান্ত অধ্যয়নই তাঁকে এই সুবিপুল রত্ন-
ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী করে তুলেছিল। আর এর জন্ম তাঁকে কত না পরিশ্রম করতে
হয়েছিল। এই পরিভ্রমের ব্যাপারটা তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ লুকিয়ে
রাখতেন, যে তথ্য তিনি অনায়াসে সরসভাবে পরিবেশন করে গেলেন তা সংগ্রহ

করার পিছনে যে কত ঘাম বয়েছে (আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাতী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান সহ পনেরটি ভাষা তাঁর অধিগত ছিল) তা আদৌ বোঝা যেত না, সম্ভবত সেই কারণেই জ্ঞানীজনী মহল থেকে এই মন্তব্য শোনা যেত, জনপ্রিয়তার স্বযোগ নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে playing to the gallery তিনি তাই করে গিয়েছেন, আর তাই করতে গিয়ে শক্তির অপচয় করেছেন। আমি মনে করি, সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমরা তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকরূপে না পেয়ে যে রসালাপী আড্ডাধারীরূপে পেয়েছি, এটা আমাদের পক্ষে শাপে বর হয়েছে।

॥ দুই ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৪৮ সালে, একটা অন্তত ঘটনার মধ্য দিয়ে। তখন দেশ পত্রিকায় তাঁর “দেশে-বিদেশে” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আমাদের একেবারে চমকে দিচ্ছে। ঐ বছরই সত্যযুগ পত্রিকায় ফা হিয়েন ছদ্মনামে লিখিত আমার একটা রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম কিস্তি পড়েই উনি আমাকে তলব করেন। এনং পার্ল রোডের বাড়ির একতলায় একটা ঘরে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ এবং ঐ বাড়িরই তিন-তলার ঘরে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে শেষ সাক্ষাৎ।

প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে আমার নদে-শান্তিপুরের গোসাঁই বলেই মনে হয়েছিল। মাথাভর্তি টাক, সহাস্র, প্রাণোচ্ছল, দীপ্যমান সে চেহারা ভোলবার নয়। তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, “বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত স্মন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ধারালো।...বাস্তবিকই সে ঘোঁবনে ছিল কাকনকান্তি স্পুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র।”

তার দাদার এই বিবরণ থেকেই জানা যায়, ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে ‘আকাজ্জা’ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই মুজতবা রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেন, “আকাজ্জা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন?” রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “আকাজ্জা উচ্চ করিতে হইবে— এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্ত ও জনসেবার জন্ত স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে

নিষে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।”

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানাই তরুণ মুক্তবাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে এনে দেবার যোগসূত্রের কাজ করে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের বহা আসে। মুক্তবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র ও ক্লাসের ফাস্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলা থেকে কুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। ছেলেরা ধর্মঘট করল। তখন যে সব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। মুক্তবা আলীর পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী তখন সিলেটে জেলা সাববেজিস্ট্রারের পদে বহাল। ১৯০৪ সালে তিনি যখন করিমগঞ্জ শহবে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুক্তবা জন্মগ্রহণ করেন।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব মুক্তবা আলীর বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুক্তবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুক্তবা কিছুতেই স্কুলে ফিরে যেতে বাজী হলেন না। বাবা তাঁকে সবকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে তিনি শান্তিনিকেতনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুক্তবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলী ও কীটসের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তখন বেনোয়া, বগদানক, সিলভা লেভি, ভিনটারনিংস, ভুচ্চি প্রভৃতি দিকপাল অধ্যাপকগণ বিশ্বভারতী আলো করে ছিলেন। এঁদের সান্নিধ্যে আসার ফলেই মুক্তবার নানা ভাষা শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি হয়ে যায়। তাঁর জ্ঞানভূষণও বেড়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুক্তবা আলী কিছুকাল আলীগড়ে পড়াশুনা করেন। তারপর তাঁর কাবুলে অধ্যাপনা করতে যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে দু বছর থাকবার পর ১৯২৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। এই সময়ের অভিজ্ঞতাই তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা ‘দেশ-বিদেশে’র উৎস।

এরপর মুক্তবা জার্মান বৃত্তি নিয়ে প্রথমে বার্লিন এবং পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আমীনুর রহীদ চৌধুরী সাহেব লিখেছেন, ব্রাসেলসে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী ডঃ হাসান হৈমাম, আদি নিবাস বিহারে, তাঁকে

সিলেটের লোক জেনে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীকে চেনেন কি না? “আমি উত্তর দিলাম, চিনিব না কেন, উনি তো আমার আত্মীয়ও হন। এরপর ভক্তলোকের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। আমাকে বলিলেন, দেখুন, আমি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভরতি হই তখন অধ্যাপকমণ্ডলীর মুখে প্রাচ্যের একজন ছাত্রেরই নাম শুনিতাম। তিনি হইলেন ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী।” বন থেকে তিনি ডক্টর ডিগ্রি পান। বন বিশ্ববিদ্যালয় পায় তাঁর গবেষণা ‘খোজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের বর্তমান ধর্মজীবন’। আর আমরা, বাঙালী পাঠকেরা, পেয়েছি মুজতবার কাল-হাসির মালায় গাঁথা অভিজ্ঞতার অপূর্ব ফসল, আমার মতে তাঁর অগ্ন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘চাচা কাহিনী’।

১৯৩২ সালে তিনি জার্মানী থেকে দেশে ফিরে আসেন। তারপর আবার ইওরোপ যাত্রা এবং ইওরোপ থেকে কায়রো। সেখানে আল-আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাই-কোয়াদের সঙ্গে কায়রোতেই তাঁর আলাপ হয়। কায়রোর কথা ‘পঞ্চতন্ত্রের’ এখানে-ওখানে ছড়ানো। আর তাঁর ‘কোদু মুখহান’র কাহিনী তো বাঙালী পাঠকের কাছে কায়রোকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখে দেবে চিরকাল।

১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে মুজতবা বরোদা যান। বরোদা কলেজে তিনি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মহারাজার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে এনং পার্ল রোডে তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাহচর্যে বাস করতে থাকেন। অহুস আইয়ুব চিকিৎসার জগ্ন মদনাপল্লী গেলে মুজতবাও তাঁর অহুগমন করেন এবং এই সময় কিছুদিন বাঙ্গালোরে বাস করেন। তিনি রমন মহর্ষির প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং আশ্রমবাসীও হয়েছিলেন।

বাঙ্গালোরে বসেই তিনি ‘দেশে-বিদেশে’ রচনা শুরু করেন। তবে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় সতাপীর এবং টেকচাঁদ ছদ্মনামে তাঁর রচনা তার আগেই প্রকাশিত হয়েছে। ‘দেশে-বিদেশে’র প্রকাশ যেন তাঁর দ্বিধিজয়ের সমান।

১৯৪৯ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর পরিশীলিত এবং পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা তাঁর পাকিস্তান বাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে তিনি আবার কলকাতায় চলে আসেন এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এরপর আকাশবাণীতে যোগ দিয়ে তিনি কটকের স্টেশন ডিরেক্টর হন। তার আগে তিনি কিছুদিন ভারত সরকারের কালচারাল রিলেশনস সংস্থার সেক্রেটারীর পদেও কাজ করেন। আকাশবাণীর চাকরি ছেড়ে তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। সেখানে প্রথমে

জার্মান ভাষা পড়াতেন পরে তিনি ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা ছাড়বার পর সাহিত্যচর্চা ছাড়া আর কিছু করেননি।

১৯৩১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশররফ আলী এবং সৈয়দ জগনুল আলী বাংলাদেশেই বাস করেন।

॥ তিন ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে একটা ভাবুক, সদা ছটফটে রসিক শিশু পুরুষ লুকানো ছিল। পরিহাসের তলায় অনেক গ্লানি লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। ‘দেশে-বিদেশে’ কি ‘চাচা-কাহিনী’র পাতায় পাতায় যার অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গভীর মর্যাদাসিক সব দুঃখের কাহিনী কত অনায়াসেই না বলে যেতে পারতেন! হাসতে গিয়ে মনে হত কি বোকাই না বনে গিয়েছি।

এনং পার্ল রোডের বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বেশ কিছুদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। কোথায় সেই উজ্জলকান্তি! অবসন্ন পাণ্ডুর চেহারাটি নিয়ে তিনি “আস্তাজ্ঞান-হোক” বলে চোকির উপর উঠে বসলেন। চারদিকে বই ছড়ানো। এলোমেলো ঘর। গায়ে একটা নকশী-কাঁথা জড়ানো।

এই এলোমেলো বেশবাসের মধ্যেও যেটা হারায়নি তা হল তাঁর অনর্গল কথার স্রোত। তাঁর রচনায় যা বয়েই চলেছে।

গৌরকিশোর ঘোষ

ধূপছায়া

ভংগ

অগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের কলকমলে



দেশভ্রমণ

ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই গোরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে হুকুম দিতেন। এখনও মনে পড়ছে, তালুর ব্রহ্মরজ দিয়ে ঘোঁয়া বেরিয়ে যেত কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেতুম না, গোরু সম্বন্ধে লিখব কী? শেষটায় মনে হত, আমি একটা আস্ত গোরু, না হলে গোরু সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারছি নে কেন—যে গোরু ইষ্টুল আসতে-যেতে নিত্যা নিত্যা দেখতে পাই। সে-কথা একদিন এক বন্ধুকে বলতে সে বীকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।

শেষটায় অনেক ভেবে-চিন্তে লিখতুম, গোরুর চারখানা পা, দুটো শিঙা আর একটা হাজ আছে। গুরুমশাই তারই উপর চোখ বুলিয়ে যেতেন, পেটের অস্থখ থাকলে দিতেন ছ নম্বর, মজি ভাল থাকলে দিতেন আট। আমিও খুশী হয়ে ভাবতুম, এই গোরুর হাজ ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবতুম, দুটো শিঙা বলার অর্থ হয়, কারণ গণ্ডারের নাকি একটা শিঙা। চার পা বলাও অবাস্তব নয়, কারণ চার না হয়ে গোরুর দু পাও হতে পারত কিন্তু একটা হাজ বলার ত কোন মানে হয় না—আজ পর্যন্ত ত কোন জানোয়ারের দুটো হাজের কথা শুনি নি। একদিন মাস্টারমশাইকে প্রশ্নটা শুধালে তিনি বললেন, ইংরেজী ভাষার আইন অনুসারে বলতে হয়, দি কাউ হাজ এ টেল। ‘এ’টা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়। তখন বুঝলুম ‘এ টেল’টা গোরুর হাজ নয়, ইংরেজী ব্যাকরণের হাজ। কিন্তু তবু প্রশ্ন রয়ে গেল, বাংলাতে যখন ‘একটা’ ব্যবহার না করে দিয়া বলতে পারি ‘গোরুর হাজ আছে’ তখন ইংরেজের মত হুসভ্য জাত সৃষ্টির প্রথম পূর্বদ্বৈ বৃদ্ধাবতরণকালে তার মর্কট রূপটি ত্যাগ করার সময় এই বৈয়াকরণিক কিংবা আলঙ্কারিক পুচ্ছটিও বর্জন করল না কেন?

আমি ইংরেজী লিখতে পারি নে। যারা ওই ভাষাতে নাম করেছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি, ওই ‘এ’র হাজ নাকি এখনও তাঁদের মুখের উপর মাঝে মাঝে ঝাপটা মারে। তাই শুনে বিশ্বসন্তোষী মন বিমলানন্দ লাভ করে।

সে-কথা থাক।

কিন্তু যখন মাস্টারমশাই হুকুম দিতেন, ‘দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় কিঞ্চৎ বর্ণনা কর’, তখন সে-বৈতরণীর ও-পার আর চোখে দেখতে পেতুম না। গোরু জানোয়ারটা উৎকৃষ্ট হোক নিকৃষ্ট হোক সেটাকে তবু চিনি, না-হক এ-কথা কখনই বলে ফেলব না, ‘গোরু বড় প্রভুভক্ত জীব, সে রাত জেগে

চোর-ডাকু খেদায় কিংবা পাড়ার মোন্দারমশাই গোক চড়ে আদালতে পেশকারি করতে যান।’ কিন্তু দেশভ্রমণ বলতে ত বুঝি দাদীর বাড়ি যাবার সময় নৌকোর ছৈয়ের ভিতরের দিকটা—ছৈয়ের বাইরে যেতে চাইলেই বাবা রাশভারী গলায় বলতেন, ‘থাক থাক, আর বিলে ডুবে মরতে হবে না।’ বাংলা ভাষাটা নিজস্ব পশ্চিম-বাঙলার ভাষা। না হলে ‘ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়’ না বলে বলত, ‘ডানপিটের মরণ বিলের তলায়’। সেই ছৈয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ত আর দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই তখন বাধ্য হয়ে সন্ধান নিতে হত, কোন ‘এসে বুক’ মুখস্থ করে বীরভূমের হেতুমপুর ইন্সুলের বিশ্বস্তর ডড় গেল-বার ম্যাট্রিকে কাস্ট হয়েছে। ‘চিত্তের প্রসার’, ‘অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য’, ‘কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপূর্ণতা’ ইত্যাদি যাবতীয় উত্তম উত্তম গুণরাজিতে প্রবন্ধটি ভরে দিতে তাই আমাদের তখন আর কণামাত্র অহবিধে হত না—ইন্সুল-ঘরের চারিটি বেড়ার ভিতর বসে বসে। মাস্টারমশাইও কোন আপত্তি জানাতেন না, কারণ আমরা বিলক্ষণ জানতুম, তাঁর দৌড়, ‘মোজার দৌড় মসজিদ তক’—অর্থাৎ, তাঁর এক ভাগে ম্যাট্রিক ফেল মেরে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়াতে তিনি ভয়ে ভয়ে ‘দুর্গা দুর্গা, দুর্গাভিনাশিনী’ জপ করতে করতে অতি অনিচ্ছায় আগরতলা অবধি একবার ‘দেশভ্রমণ’ করেছিলেন। জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই যাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরঙ্কুশ, অপর্ণরূপে। ফিরে এসে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কারণ ভিড়ে মেলা জাত-বেজাতের লোক হয়ত তাঁর গাত্রান্ধ করে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষা তাঁকে তখন পেরতে হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন পরীক্ষার তুলনা হয় না, সেই একমেবাবিধীয়ম দেশভ্রমণের ঝাড়া বারোটি ঘণ্টা তিনি তাঁর নর্মসখী কুশালদীপ্ত তান্ত্রকূটমীর্ষ ডাবান্নন্দরীর সূচিকণ কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চূষন দিতে পারেন নি। তিনি ‘পথি নারী বিবর্জিতা’ এই আপ্তবাক্যটির স্মরণে গুচান্মিতাকে সজল নয়নে তাঁর সপত্নীর হাতে সমর্পণ করে দৃঢ়পদে পশ্চিমাভিযান করেছিলেন।

এ-জাতীয় গুরু পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছেন। টোলো-পণ্ডিত, আপন চেষ্টায় ইংরেজী শিখেছিলেন, কিন্তু কোনও ডিগ্রী ছিল না বলে ক্লাস সিক্সের উপরে যাবার তাঁর হুক ছিল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা এই, তিনি যখন দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে ‘পয়েন্ট’ দেবার সময় উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা ঝাড়তেন তখন, কেন জানি নে, একমাত্র আমারই মনে সন্দেহ হত যে, তাঁর ভ্রমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহবীর ভিন্ন হেঁশেলে মুর্গা রাগা করার মত। ছেলে-ছোকরারা থাকে, তিনি রাগার পর

গল্পাঙ্গন করে বুনেন্দী হেঁশেলে পুঁই-চচ্চড়ি চড়াবেন।

আমি তাই একদিন সাহস করে বলেছিলুম, ঘোরাঘুরি করলেই যদি এত বিস্তে হয় তবে ত গার্ডসাহেব আজমল আলী আমাদের শহরের সবচেয়ে জানী পুরুষ। আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই রাগ করলেন না। সন্দ্বিদ্ধ নয়নে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন শুধু; আমি তাঁর চোখের ভাষাতে পড়লুম, ‘তবে কি রাস্কেলটা আমার মনের গোপন খবর পেয়ে গিয়েছে?’

তা সে যাই হোক, পণ্ডিতমশাই কিন্তু তখন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার অর্থ, আর পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণও খুদাতালা আপন হাতে কজা করে রেখেছেন। পাঁচটা জিনিসের মত দেশভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার পরই মাহুদ দেশভ্রমণে বেরয় না; যার কপালে ওটা লেখা আছে, কিংবা বলুন কপালে নয়, যার পায়ে চক্র আছে, সে-ই বেরয় দেশভ্রমণে। কেউ বেরয় পণ্ডিতমশায়ের মত গজরাতে গজরাতে, কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে, তিন লম্ফে গেট-পেরিয়ে।

দেশভ্রমণ করেছি, এ-রকম একটা খ্যাতি আমার আছে। এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের উচ্চবাচ্য আমি করি নে। অর্থাৎ আমি যে-সব ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকি। দেশভ্রমণ ভাল কি মন্দ, কোন কোন দেশে গিয়েছিলাম এ-সম্বন্ধে কোন প্রকারের ইঙ্গিত দেবার প্রয়োজন মনে করি নে। অথচ, আমার বহু সহদয় পাঠক ধরে নিয়েছেন যে, আমি দেশভ্রমণের নাম শুনেই মুক্তকণ্ঠ হয়ে তদন্তেই বন্দর পানে ধাওয়া করি।

এ-ধারণাটা সত্য নয়। কিন্তু তবু এটার প্রতিবাদ আমি করতুম না, যদি না এ-ধারণা আমার প্রতি কিকিং অবিচার করত। কিংবা এটা যদি নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তা হলেও চূপ করে থাকলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমিই সবেধন উজ্জল নীলমণি নই, আমার চেয়েও হতভাগা গুটি কয়েক আছেন। তাই ব্যক্তিগত কাহিনী বলার স্কোচ অনিচ্ছায় কাটাতে হল।

কেউ যখন বলে ‘ফলনা দেশভ্রমণ করতে ভালবাসে’ তখন সে-বাক্যে আমি প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী। এ যেন অনেকটা ‘ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, গামছা পর গিয়ে’। তার অর্থ মেয়েটা এমনি মারাত্মক রকমের হস্তে হয়ে উঠেছে বিয়ে করবার জন্ত যে, বাপ-মার স্নেহ-ভালবাসার তোয়াকা সে আর করে না, আপন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে তার আর কোন ক্ষোভ নেই, বিশ্বের অপরিহার্য আবহবৃত্তিক শাড়ি-গয়না, বাজনাবাতিরও তার প্রয়োজন নেই, আপন গামছা পরেই পড়ি-মরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।

পাঁড় দেশভ্রমণকারীর-অর্থও তা-ই। যে মাটিতে তার নাড়ি পোতা আছে, যে-নদীর জল খেয়ে সে আজ চলতে শিখেছে, যে আমজামকাঠাল তাকে ছান্না দিয়ে শ্রামল শীতল করে রেখেছে, যার প্রতিটি দুর্বাদল তার পদ-তাড়না কামনা করে—তারা যেন কিছুই নয়, তারা যেন বানের জলে ভেসে-আসা, ফেল্‌না। গুরুদেবের আশীর্বাদ, বাপ-মায়ের স্নেহ, ভাইবোনের ভালবাসা, বন্ধুজনের সদাস্তরিকতা, এসব কথা আর তুলনুম না, সেগুলো এতই শুচিশুদ্ধ পবিত্র যে, ওদের স্মরণকে কলঙ্কিত করে মহাপাতকী হতে চাই নে।

অসহিষ্ণু হয়ে শান্ত পাঠক বললেন, ‘কী জালা, লোকটা ত আর চিরকালের তরে দেশত্যাগী হয়ে চলে যাচ্ছে না। দুদিন কিংবা দুবছর পরে আবার তো ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার গাছগুলো ত আর রবি ঠাকুরের “হংস-বলাকা”র মত ডানা মেলে আকাশের কিনারা খুঁজতে বেরিয়ে যাবে না, কিংবা নদীটি জনকতনয়ার অভিসম্পাতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাবেন না, কিংবা—”

বেশ কথা। তা হলে কিছু বলার নেই। এবং সত্যি বলতে কী, সেইটেই কাম্য। আমাদের মুনিঋষিরা সেই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছেন; আমাদের বাপ-পিতামো তাই করেছেন। মুসলমান মোলানা-দরবেশরা তাই বলেছেন। তাদের ব্যাটা-বাচ্চারা তাই করেছে।

তাই শাস্ত্রকার আদেশ দিয়েছেন, গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা সমাপ্ত হলে পর তীর্থ-ভ্রমণান্তে (‘দেশভ্রমণ’ কিংবা হালফিলের কথা ‘টুরিজম’) স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত গৃহস্থাস্রম-প্রবেশ কর্তব্য। তারপর আর দেশভ্রমণ-টেশভ্রমণের রা-টি কেড়ে নি। নিতান্তই যদি বাউণ্ডলেপনা করতে হয় তবে কর, প্রাণভরে কর, সন্মাস নেবার পর। এমন কী, বাণপ্রস্থ যাবে জনপদভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে। সে-অবস্থায়ও যত্রতত্র পথটন গহিত।

কিন্তু সন্মাসের বাউণ্ডলেগিরির প্রতি কর্তার এত সদয় কেন? তার এক কারণ :

ভোগে রোগভয়ং, কূলে চ্যুতিভয়ং, বিস্তে নৃপাদ্ ভয়ং,
মানে দৈন্ত্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যা ভয়ং,
শাস্ত্রে বাদীভয়ং, গুণে খলভয়ং, কায়ে কৃতাস্তাদ্ ভয়ং,
সর্ববস্তু ভয়াধিতং, ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥

গুধু বৈরাগ্যেই অভয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন, যে মুহূর্তে মনে বৈরাগ্যের ঈদয় হবে সেই মুহূর্তেই সন্মাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করবে। ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত না করে গার্হস্থ্যাস্রমে প্রবেশ করা যায় না, গার্হস্থ্য সমাপন না করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ

গর্হিত ; কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া যায় যে-কোনও সময়ে—ডবল, ট্রিপ্ল প্রমোশন নিয়ে ।

কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর গৃহে ফিরতে পারবে না । সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই দিকেই বিশেষ করে আমি আমার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোন জায়গাতেই তিন দিনের বেশী থাকবার নিয়ম নেই, এক বর্ষাকাল ছাড়া । বৌদ্ধ শ্রমণদেরও এই ‘বিনয়’ ।

এর সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কী ? সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আত্মার কি প্রসার হয় না-হয় সে-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করবার অধিকার আমার নেই ; কিন্তু তাতে করে সমাজ ও সংস্কারের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে বলার অধিকার আমাদের মত সংসারীদের নিশ্চয় আছে ।

আমার মনে হয়, সন্ন্যাস নিয়ে পর্যটন করুন, আর সন্ন্যাস না নিয়ে টুরিস্টের মত বাউণ্ডলেপনা করুন, ফল একই । নানা দেশ নানা লোক, বহু সমাজবন্ধন, বহু উচ্ছ্বালতা, বিস্তার ধর্মাচার এবং ততোধিক চার্বীকাচরণ দেখে দেখে মানুষের চিত্তের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই ‘প্রসাধ’ই তাকে দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে একদিক দিয়ে করে দেয় নির্বিকল্প উদাসীন, অগ্ৰাদিক দিয়ে আপন মাটি আপন গ্রামের কলাণকামনায় নিম্পুহ । ইংরেজীতে একেই বলে ‘জেডেড’, ফরাসীতে ‘ব্লাজে’ । এই অবস্থার কল্পনা করেই জার নিকোলাস বলেছিলেন, ‘পরেব বেদনা বুঝিতে না পারে, না ভাবে আপন স্বপ্ন’ । গাম্য ভাষায় একেই বলে ‘দড়কচ্চা হয়ে “ল্যাঙ্গা” মেরে যাওয়া’ ।

এইসব ‘ভবঘুরে’রা তখন আর সমাজের ভিতর আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না । প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি অগ্নায় বন্ধন থাকে, এককালে হয়ত সেগুলোর কোন অর্থ ছিল, এখন লোকে ভুলে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার মুক্তির রক্তও থাকে । এ-ভয়ের টানাটানির মাঝখানের উত্তম পন্থাটি বের করার নামই সমাজ । আমাদের বাউণ্ডলেটির কাছে দুটোই অর্থহীন । সে ঘোরাঘুরির কলে দেখেছে বহু সমাজ, যেখানে অগ্ন বন্ধন, অগ্ন মুক্তি । দেশের সমাজের মূঢ়তা যেমন তাকে বিচলিত করতে পারে না, তার আদর্শবাদও তাকে উদ্ধুদ্ধ করতে পারে না । তাই পূর্বেই নিবেদন করেছি, সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ ।

আর যদি ধান-ধারণা সাধনা-তপস্শ্রাব্য কথা তোলেন, তবে তার পরম শত্রু দেশভ্রমণ । গো্যাটে বলেছেন, ‘চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে ।’

আর আমাদের অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে-স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে, তার হিসেব নিলেই স্থখে চলে যাবে দিনগুলো—’

‘আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ কর এক জায়গায়, দিতে থাক তুলির টানে রঙের পৌঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, অষ্টান আনন্দ।’

চতুর্দিকে নিজেকে বিক্ষিপ্ত বিকীর্ণ করে দিলে এ-আনন্দ পাওয়া যায় না ॥

রসগোল্লা

‘চুজিঘর’ কথাটা বাংলা ভাষাতে কখনও খুব বেশী চালু ছিল না বলে আজকের দিনে অধিকাংশ বাঙালী যদি সেটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে মর্মান্তিক হবার কোন কারণ নেই। ইংরেজীতে একে বলে ‘কাস্টম্ হাউস’, ফরাসীতে ‘দুয়ান্’, জার্মানে ‘ৎসল্-আম্ট্’, কাসীতে ‘গুম্‌রুক্’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতগুলো ভাষাতে যে এই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিষ্ঠানটার প্রতিশব্দ দিলুম তার কারণ আজকের দিনে আমার ইয়ার, পাড়ার পাঁচু, ভূতো সবাই সরকারী, নিম-সরকারী, মিন-সরকারী পয়সায় নিতি নিত্য কাইরো-কান্দাহার প্যারিস-ভেনিস সর্বত্র নানাবিধ কনকারেন্স করতে যায় বলে, আর পাকিস্তান হিন্দুস্থান গমনাগমন ত আছেই। ওই শব্দটি জানা থাকলে তড়িঘড়ি তার সন্ধান নিয়ে আর পাঁচজনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারলে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওটাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কখনকালেও করবেন না। বরঞ্চ রহমত কাবুলীকে তার হকের কড়ি থেকে বঞ্চিত করলে করতেও পারেন কিন্তু তার দেশের ‘গুম্‌রুক্’টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না। ‘কাবুলি-ওয়ালা’ কিল্ল আমি দেখি নি। রহমতও বোধ করি সেটাতে তার ‘গুম্‌রুক্’কে এড়াবার চেষ্টা করে নি।

কেন ? ক্রমশ প্রকাশ্য।

ডাক্তার, উকিল, কসাই, ডাকাত, সম্পাদক (এবং সম্পাদকরা বলবেন, লেখক) এদের মধ্যে সকলের প্রথম কার জন্মগ্রহণ হয় সে কথা বলা শক্ত। যারই হোক, তিনি যে চুজিঘরের চেয়ে প্রাচীন নন সে-বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। মাহুবে মাহুবে লেনদেন নিশ্চয়ই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠল, ‘আমার ট্যাক্সোটা ভুলো না কিন্তু’—তা সে তৃতীয় ব্যক্তি গায়ের মোড়লই হন, পঞ্চাশখানা গায়ের দলপতিই হন, কিংবা রাজা অথবা

তার কর্মচারীই হন। তা তিনি নিন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, কারণ এযাবৎ আমি পুরনো ধবরের কাগজ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু বিক্রি করি নি। কিন্তু যেখানে ছু পয়সা লাভের কোন প্রস্রই ওঠে না, সেখানে যখন চুজিঘর তার না-হকের কড়ি না-হক চাইতে যায়, তখনই আমাদের মনে স্বেচ্ছা জাগে, ওদের কাকি দেওয়া যায় কী প্রকারে ?

এই মনে করুন, আপনি যাচ্ছিলেন ঢাকা। প্যাক করতে গিয়ে দেখেন, মাঝ দুটি শার্ট খোপার মারপিট থেকে গা বাঁচিয়ে কোন গতিতে আশ্রয়লা করতে সমর্থ হয়েছে। ইন্টিশানে যাবার সময় কিনলেন একটি নয়া শার্ট। বাস, আপনার হয়ে গেল। দর্শনা পৌছতেই পাকিস্তানী চুজিঘর হলুধনি দিয়ে দর্শনী চেয়ে উঠবে। তারপর আপনার শার্টটির গায়ে হাত বুলবে, মন্তক আঘাত করবে এবং শেষটায় ধুতরাষ্ট্র যে-রকম ভীমসেনকে আলিঙ্গন করেছিলেন ঠিক সেই রকম বুক জড়িয়ে ধরবে।

আপনার পাজির কথানা পটপট করতে আরম্ভ করেছে, তবু শুকনো মুখে চিঁচিঁ করে বলবেন, ‘ওটা ত আমি নিজের ব্যবহারের জগ্ন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওতে ত টাক্স লাগবার কথা নয়।’

আইন তাই বলে।

হায় রে আইন! চুজিওলা বলবে, ‘নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু ওটা যদি আপনি ঢাকাতে বিক্রি করেন?’

তর্কস্থলে ধরে নিলুম, আপনার পিতামহ তর্কবাগীশ ছিলেন তাই আপনি নুর্খের তায় তর্ক তুললেন, ‘পুরনো শার্টও ত ঢাকাতে বিক্রি করা যায়।’

এই করলেন ভুল। তর্কে জিতলেই যদি সংসারে জিত হত তবে সক্রান্তেসকে বিষ খেতে হত না, যীশুকে ক্রুশের উপর শিব হতে হত না।

চুজিওলা জানে, জীবনের প্রধান আইন, চূপ করে থাকা, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল নয়। একেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।

কী যেন এক অজানার খেয়ানে, দীর্ঘ অ্যারস্টিপের পশ্চাতের সুদূর দিকচক্র-বালের দিকে তাকিয়ে বলবে, ‘তা পারেন।’

তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে কী সব টরে-টঙ্কা করবে। তারপর বলবে, ‘পনের টাকা।’

আপনার মনের অবস্থা আপনিই তখন জানেন—আমি আর তার কী বয়ান হবে। ব্যাপারটা যখন আপনার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল, তখন আপনি ক্ষীণতম কণ্ঠে বললেন, ‘কিন্তু ওই শার্টটার দামই ত মাঝ চার টাকা।’

চুঙ্গিওলা একথানা হলদে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেবে। আপনি এটাতে দরখাস্ত করেছিলেন এবং নতুন শাটটার উল্লেখ করেন নি। চুঙ্গিওলার কাছে তার সরল অর্থ, আপনি এটা স্বাগল করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পাচার করতে চেয়েছিলেন, হাতে-নাতে বেআইনী কর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার জরিমানা দশ টাকা, জেলও হতে পারত, আফিং কিংবা ককেইন হলে—এ যাত্রা বেঁচে গেছেন।

সেই হলদে কাগজখানা অধ্যয়ন করে কোন লাভ নেই। কারণ তার প্রথম প্রশ্ন ছিল,

১। আপনার জন্মের সময় যে কাঁচি দিয়ে নাড়ি কাটা হয়েছিল, তার সাইজ কত ?

এবং শেষ প্রশ্ন,

২। আপনার মৃত্যুর সন ও তারিখ কী ?

আপনি তখন শাটটির মায়া ত্যাগ করে ঈষৎ অভিমানভরে বললেন, ‘তা হলে ওটা আপনারা রেখে দিন।’

কিন্তু ওইট হবার জো নেই। আপনি ঘড়ি চুরি করে পেয়েছিলেন তিন মাসের জেল। ঘড়ি ফেরত দিলেই ত আর হাকিম আপনাকে ছেড়ে দেবে না। শাট ফেরত দিতে চাইলেও রেহাই নেই।

তখন শাটটা চড়বে নিলামে। এক টাকা পেলে আপনি মতা ভাগ্যবান। জবিমানটার অবস্থা নড়নচড়ন হল না।

ঢাকা থেকে ফিরে আসবার সময় ভারতীয় চুঙ্গিওলা দেখে ফেললে আপনার নতুন পেলিকান ফাউন্টেন পেনটি। কাহিনীব পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। আপনি ভাবলেন, ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই একে নতুন, তাই প্যাসেঞ্জারকে খামকা হয়রান করে। বিলেত-ফিলেতে বোদ তয় চুঙ্গিঘর টুরিস্টদের নিছক মনোরঞ্জনার্থে। তবে শুহুন।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকা যান। এতই বেলা যাওয়া-আসা করেন যে, তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে বলবার উপায় নেই, তিনি বিদেশ যাচ্ছেন না ফিরে আসছেন। ওই যে রকম ঢাকার কুট্রি গাড়ওয়ান এক ভদ্র-লোককে ভি-শেপের গেল্লি উল্টো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞাস করেছিল, ‘কর্তা আইতেছেন, না যাইতেছেন?’

তিনি নেমেছেন ইটালির ভেনিস বন্দরে জাহাজ থেকে। বাণু ব্যবসায়ী লোক। তাই চুঙ্গিঘরের সেই হলদে কাগজখানায় যাবতীয় প্রশ্নের সহজর দিয়ে

শেষটায় লিখেছেন, ‘এক টিন ভ্যাকুয়াম প্যাকড্ ভারতীয় মিষ্টান্ন। মূল্য দশ টাকা।’ অন্ধার ওয়াইল্ড যখন মার্কিন মুল্লুকে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন চুঙ্গিঘর পাঁচজনের মত তাঁকেও শুধিয়েছিল, ‘এনিথিং টু ডিক্লেয়ার?’ তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মগজের বাস্কটি বার কয়েক ট্যাপ করে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘মাই জিনিয়াস।’ আমার পরিচিতদের ভিতর ওই ঝাণ্ডাই একমাত্র লোক, যিনি মাথা ত ট্যাপ করতে পারতেনই, সঙ্গে সঙ্গে হাটটা ট্যাপ করলেও কেউ কোন আপত্তি করতে পারত না।

জাহাজখানা ছিল বিরাট সাইজের—ঝাণ্ডার বপুটি স্বচক্ষে দেখেছেন যারা, তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন যে, তাঁকে ভাসিয়ে রাখা যে-সে জাহাজের কর্ম নয়—তাই সেদিন চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছিল মোহনবাগান ভর্সস ফিল্ম-স্টাট-টীম ম্যাচের ভিড়। ঝাণ্ডা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মনে পড়ল ইতালির ‘কিয়ান্টি’ জিনিসটি বড়ই সরস এবং সরস। চুঙ্গিঘরের কাঠের খোঁয়াড়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল এক পাহারাওলা। তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কয়েক বোতল ‘কিয়ান্টি’ রাস্তার ওদ্বারের দোকান থেকে নিয়ে আসতে। পাহারাওলা খাঁটি খানদানী লোকের সংস্পর্শে এসেছে ঠাহর করতে পেরে খাঁটি নিয়ে এল তিন মিনিটেই। পূর্বেই বলেছি ঝাণ্ডা জন্মেছিলেন তাগড়াই হাট নিয়ে—জাহাজের পরিচিত অপরিচিত তথা চুঙ্গিঘরের পাহারাওলা, সেপাই, চাপরাসী, কুলী সবাইকে ‘কিয়ান্টি’ বিলোতে লাগলেন দরাজ দিলে। ‘স্বাস্থ্যপান’ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঝাণ্ডার ডাক পড়ে গেল চুঙ্গির কাউটারে। মাল খালাসিতে তাঁর পালা এসে গেছে। নিমন্ত্রিত রবাহূত সবাইকে দরাজ হাত দুখানা পাখির মত মেলে দিয়ে বললেন, ‘আপনারা ততক্ষণে ইচ্ছে করুন; আমি এই এলুম বলে।’ ‘কিয়ান্টি’ রানীকে বসিয়ে রাখা মহাপাপ।

ঝাণ্ডার বাস্ক-পেটরায় এত সব জাত-বেজাত হোটেলের লেবেল লাগানো থাকত যে, অগা চুঙ্গিওলাও বুঝতে পারত এগুলোর মালিক বাস্কভিটার, তোয়াক্কা করে না—তাই জীবন কাটে হোটেলে হোটেলে। আজকের চুঙ্গিওলা কিন্তু সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথম ভাগের ছেলে যে-রকম বানান ভুল করে করে বই পড়ে। লোকটার চেহারা-বদনত। টিঙটিঙে রোগা, গাল দুটো ভাঙা, সে-গালের হাড় দুটো জোয়ালের মত বেরিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো গভীর গভীর ভিতর থেকে নাকটাকে প্যাসনের মত চেপে ধরেছে, নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোপ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, ঝাণ্ডা ঝাণ্ডা লোক, তাই তিনি মানুষকে তার চেহারা থেকে যাচাই করেন না। এবারে কিন্তু তাঁকেও

সেই নিয়মের ব্যতিচার করতে হল। লোকটাকে আড়চোখে দেখলেন, সম্মোহের নয়নে আমার কানে কানে বললেন, ‘শেক্স্পিয়ার নাকি বলেছেন, রোগা লোককে সমঝে চলবে।’ আমার বিশ্বাস, আজ যে শেক্স্পিয়ারের এত নাম-ডাক সেটা ওই দিন থেকেই শুরু হয়—কারণ ঝাণ্ডা আত্মনির্ভরশীল মহাজন, কারও কাছ থেকে কখনও কানাকড়ি ধার নেন নি। তিনি ঋণ স্বীকার করাতে ওই দিন থেকে শেক্স্পিয়ারের যশ-পত্তন হয়।

চুক্তিওলা শুধালে, ‘ওই টিনটার ভিতর আছে কী?’

‘ইণ্ডিয়ান হুইটস।’

‘ওটা খলুন।’

‘সে কী করে হয়? ওটা আমি নিয়ে যাব লগুনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে?’

চুক্তিওলা যে-ভাবে ঝাণ্ডার দিকে তাকালে তাতে যা টিন খোলার হুকুম হল, পাঁচশো ট্যাঁচার পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুম-জারি করতে পারতেন না।

ঝাণ্ডা মরীয়া হয়ে কাতর নয়নে বললেন, ‘বাদার, এ-টিনটা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার এক বন্ধু মেয়ের জন্ম লগুনে—নেহাতই চিংড়ি মেয়ে। এটা খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

এবারে চুক্তিওলা যে-ভাবে তাকালে, তাতে আমি হাজার ট্যাঁচার শব্দ শুনতে পেলুম।

বিরিট-লাশ ঝাণ্ডা পিঁপড়ের মত নয়ন করে সকাতির বললেন, ‘তাহলে ওটা ডাকে করে লগুন পাঠিয়ে দাও, আমি ওটাকে সেখানেই খালাস করব।’

আমরা একবাক্যে বললুম, ‘কিন্তু তাতে ত বড় খরচা পড়বে। পাউণ্ড পাঁচেক—নিদেন।’

হুস্থাস ফেলেই বললেন, ‘তা আর কী করা যায়।’

কিন্তু আশ্চর্য, চুক্তিওলা তাতেও রাজী হয় না। আমরাও অবাক। কারণ এ-আইন ত সঙ্কলেরই জানা।

ঝাণ্ডা একটুখানি দাঁত কিড়মিড় খেয়ে লোকটাকে আইনটার মর্ম প্রাজ্ঞ ভাষায় বোঝালেন। তার অর্থ টিনের ভিতরে বাঘ-ভাল্লুক ককেইন-হেরয়িন যা-ই থাক্, ও-মাল যখন সোজা লগুন চলে যাচ্ছে তখন তার পুণ্যভূমি ইতালি ত আর কলঙ্কিত হবে না।

আমরা সবাই কসাইটাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঝাণ্ডার প্রস্তাবটি অভিশব্দ সমীচীন এবং আইনসম্মতও বটে। আমাদের দল তখন বেশ বিরাট আকার ধারণ

করেছে। ‘কিন্মাস্তি’-রানীর সেবকের অভাব ইতালিতে কখনও হয় নি—প্রাচুর্য থাকলে পৃথিবীতেও হত না। এক ফরাসী উকিল কাইরো থেকে পোট সজ্জে জাহাজ ধরে—সে পর্যন্ত বিন্ ফীজে লেকচার ঝাড়লে। চুক্তিওলার ভাবখানা সে পৃথিবীর কোন ভাষাই বোঝে না।

ঝাণ্ডা তখন চটেছেন। বিড়বিড় করে বললেন, ‘শালা, তবে খুলছি। কিন্তু ব্যাটা তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ছি নে।’ তারপর ইংরেজীতে বললেন, ‘কিন্তু তোমাকে ওটা নিজে খেয়ে পরখ করে দেখতে হবে ওটা সত্যি ইণ্ডিয়ান ফুইটস কিনা।’

শয়তানটা চট করে কাউন্টারের নীচে থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনের অভাব হয় নি।

ঝাণ্ডা টিন-কাটার হাতে নিয়ে ফের চুক্তিওলাকে বললেন, ‘তোমাকে কিন্তু এই মিষ্টি পরখ করতে হবে নিজে, আবার বলছি।’

চুক্তিওলা একটু শুকনো হাসি হাসলে। শীতে বেজায় ঠোঁট ফাটলে আমরা যে-রকম হেসে থাকি।

ঝাণ্ডা টিন কাটলেন।

কী আর বেরবে? বেরল রসগোল্লা। বিয়ে-শাদিতে ঝাণ্ডা ভুরি ভুরি রসগোল্লা স্বহস্তে বিতরণ করেছেন—ব্রাহ্মণ-সন্তানও বটেন। কাঁটা-চামচের তোয়াক্কা না করে রসগোল্লা হাত দিয়ে তুলে প্রথমে বিতরণ করলেন বাঙালীদের, তারপর যাবতীয় ভারতীয়দের, তার পর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।

মাতৃভাষা বাংলাটাই বহুত তকলিফ বরদাস্ত করেও কাবুতে আনতে পারি নি, কাজেই গণ্ডা তিনেক ভাষায় তখন বাঙালীর বহু যুগের সাধনার ধন রসগোল্লার যে বৈতালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?

ফরাসীরা বলেছিল, ‘এপাতী!’

জার্মানরা, ‘রুর্কে!’

ইতালিয়ানরা, ‘ব্রাভো!’

স্প্যানিশরা, ‘দেলিচজো, দেলিচজো।’

আরবরা, ‘ইয়া সালাম, ইয়া সালাম।’

তামাম চুক্তিঘর তখন রসগোল্লা গিলছে। আকাশে বাতাসে রসগোল্লা। কিউবিজম বা দাদাইজমের টেকনিক দিয়েই শুধু এর ছবি আঁকা যায়। চুক্তি-ঘরের পুলিশ-বরকন্দাজ, চাপরাসী-স্পাই সকলেরই হাতে রসগোল্লা। প্রথমে ছিল

ওদের হাতে ‘কিয়ান্তি’, আমাদের হাতে রসগোল্লা। এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল।

আফ্রিকার এক ক্রিস্টান মিথ্রো আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘ক্রিস্টান মিশনারিরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলেন তখন তাঁদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমিজমা। কিছুদিন বাদেই দেখি, ওঁদের হাতে জমিজমা, আমাদের হাতে বাইবেল।’

আমাদের হাতে ‘কিয়ান্তি’।

ওদিকে দেখি, ঝাণ্ডা আপন ভুঁড়িটি কাউন্টারের উপর চেপে ধরে চুঙ্গিওলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন বাংলাতে—‘একটা খেয়ে দেখ।’ হাতে তাঁর একটি সরেস রসগোল্লা।

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হটিয়ে গম্ভীররূপ ধারণ করেছে।

ঝাণ্ডা নাছোড়বান্দা। সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে বললেন, ‘দেখছ তো, সবাই খাচ্ছে। ককেইন নয়, আফিও নয়। তবু নিজেই চেখে দেখ, এ বস্তু কী!’

চুঙ্গিওলা ঘাড়টা আরও পিছিয়ে নিলে। লোকটা অতি পাগল। একবারের তরে ‘সরি-টরি’ও বললে না।

হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই, ঝাণ্ডা তামাম ভুঁড়িখানা কাউন্টারের উপর চেপে ধরে কাঁক করে পাকড়ালেন চুঙ্গিওলার কলার বাঁ হাতে আর ডান হাতে খেবড়ে দিলেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর। ঝাণ্ডার তাগ সব সময়েই অতিশয় খারাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায়, ‘শালা, তুমি খাবে না। তোমার গুটি খাবে। ব্যাটা, তুমি মসুরা পেয়েছ। পই পই করে বললুম, রসগোল্লাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, চিংড়িটা বড্ড নিরাশ হবে, তা তুমি শুনবে না’—আরও কত কী!

ততক্ষণে কিন্তু তাবৎ চুঙ্গিঘরে লেগে গিয়েছে ধুন্দুমার! চুঙ্গিওলার গলা থেকে যেটুকু মিহি আওয়াজ বেরুচ্ছে তার থেকে বোকা যাচ্ছে সে পরিত্রাণের জন্ত চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে ইলুচে মুসসোলিনী—মাঝখানে যত সব কনসাল, লিগেশন মিনিস্টার, অ্যাম্বাসেডর প্লেনিপটিনশিয়ারি—কারুরই দোহাই কাড়তে কসুর করছে না। মেরি মাতা, হোলি যিসস, পোপঠাকুর ত বটেনই।

আর চিংকার-টেচামেচি হবেই না কেন? এ যে রীতিমত বে-আইনী কর্ম। সরকারী চাকুরেকে তার কর্তব্যকর্ম সমাধানে বিঘ্ন উৎপাদন করে তাকে সাড়ে তিনমণী লাশ দিয়ে চেপে ধরে রসগোল্লা খাওয়ানোর চেষ্টা করুন আর সেকো

খাওয়াবারই চেষ্টা করুন, কর্মটির জন্ত আকছারই জেলে যেতে হয়। ইতালিতে এর চেয়ে বহুত অল্পেই ফাঁসি হয়।

ঝাণ্ডার কোমর জাবড়ে ধরে আমরা জনাপাঁচেক তাঁকে কাউন্টার থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছি। তিনি পর্দার পর পর্দা চড়াচ্ছেন, ‘খাবি নি, ও পরান আমার, খাবি নি, ব্যাটা—’ চুঙ্গিওলা ক্ষীণকণ্ঠে পুলিশকে ডাকছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আমার মাতৃভূমি সোনার দেশ ভারতবর্ষের দ্রাক্ষকলে যেন কথা শুনছি। কিন্তু কোথায় পুলিশ? চুঙ্গিঘরের পাইক বরকন্দাজ ডাঙা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বেমানাম গায়েব! এ কি ভানুমতী, এ কি ইলুজাল!

দেখি, ফরাসী উকিল আকাশের দিকে দু’হাত তুলে অধনিমীলিত চক্ষে, গদ-গদ কণ্ঠে বলছে, ‘ধন্য পুণ্যভূমি ইতালি, ধন্য পুণ্যনগর ভেনিস! এ-ভূমির এমনই পুণ্য যে হিদ্দেন রসগোল্লা পর্যন্ত এখানে মিরাক্লে দেখাতে পারে। কোথায় লাগে ‘মিরাক্লে অব মিলান,’ এর কাছে—এ যে সাফাৎ জাগ্রত দেবতা, পুলিশ-মুন্সি সবাইকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিলেন এখান থেকে! ওহোহো, এর নাম হবে “মিরাক্লে রসগোল্লা।” ’

উকিল মানুষ, সোজা কথা প্যাচ না মেরে বলতে পারে না। তার উচ্ছ্বাসের মূল বক্তব্য, রসগোল্লার নেমকহারামি করতে চায় না ইতালীয় পুলিশ-বরকন্দাজরা। তাই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

আমরা সবাই একবাক্যে সায় দিলুম। কিন্তু কে এক কাস্টরসিক বলে উঠল, ‘রসগোল্লা নয়, কিস্যান্তি।’ আরও ছ’চার পাশও তায় সায় দিলে।

হা তমধ্যে ঝাণ্ডাকে বহু কণ্ঠে কাউন্টারের এদিকে নামানো হয়েছে। চুঙ্গিওলা রুমাল দিয়ে রসগোল্লার খাবড়া মুছতে যাচ্ছে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, ‘ওটা পুছিস নি; আদালতে সাক্ষী দেবে—ইগজিবিটু নাম্বার ওয়ান।’

ওদিকে তবন বেটিং লেগে গিয়েছে, ইতালিয়ানরা ‘কিস্যান্তি’ স্থান করে, না রসগোল্লা খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? কিন্তু ফৈসালা করবে কে? তাই এ-বেটিঙে রিস্ক নেই। সবাই লেগে গিয়েছে।

কে একজন ঝাণ্ডাকে সহপদে দিলে, ‘পুলিস টুলিস ফের এসে যাবে। ততক্ষণে আপনি কেটে পড়ুন।’

তিনি বললেন, ‘না, ওই যে লোকটা ফোন করছে। আহুক না ওদের বড় কর্তা।’

তিন মিনিটের ভিতর বড় কর্তা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। ফরাসী

উকিলের বোধ হয় সবচেয়ে বড় মুক্তি ঘুষ। এক বোতল ‘কিয়ামতি’ নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঝাণ্ডা বাধা দিয়ে বললেন, ‘নো।’

তারপর বড় সাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, ‘সিগার, বিস্কো ইউ প্রসীড, অর্থাৎ কিনা ময়না তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপনি একটি ইণ্ডিয়ান হুজট্‌স চেখে দেখুন।’ বলে নিজের মুখে তুললেন একটি। আমাদের সবাইকে আরেক প্রস্থ বিতরণ করলেন।

বড় কর্তা হয়ত অনেক রকমের ঘুষ খেয়ে ওকিবহাল এবং তালেবর। কিংবা হয়ত কখনও ঘুষ খাননি। ‘না বিইয়ে কানাইয়ের মা’ যখন হওয়া যায় এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র যখন এ-প্রবাদটি ব্যবহার করে গেছেন তখন ‘ঘুষ না-খেয়েও দারোগা’ ত হওয়া যেতে পারে।

বড় কর্তা একটি মুখে তুলেই চোখ বন্ধ করে রইলেন আড়াই মিনিট। চোখ বন্ধ অবস্থায়ই আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফের। আবার।

এবারে ঝাণ্ডা বললেন, ‘এক ফোটা কিয়ামতি?’

কাদম্বিনীর তায় গম্ভীর নিনাদে উত্তর এল, ‘না। রসগোল্লা।’

টিন তখন ভোঁ-ভোঁ।

চুঙ্গিওলা তার ফরিয়াদ জানালে।

কর্তা বললেন, ‘টিন খুলেছ ত বেশ করেছ, না হলে খাওয়া যেত কী করে?’ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে? আরও রসগোল্লা নিয়ে আসুন।’ আমরা হুড় হুড় করে বেরিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলুম, বড় কর্তা চুঙ্গিওলাকে বলছেন, ‘তুমিও ত একটা আস্ত গাড়ল। টিন খুললে আর ওই সরেস মাল চেখে দেখলে না?’

‘কিয়ামতি না রসগোল্লা’ সে-বেটের সমাধান হল।

ইতালির প্রখ্যাতা মহিলা-কবি ফিলিকাজা গেয়েছেন,

‘ইতালি, ইতালি, এত রূপ তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।’

অনন্ত ক্লেশ লেখা ও-ললাটে নিরাশার কালিমায়।’

আমিও তাঁর স্মরণে গাইলুম,

রসের গোলক, এত রস তুমি কেন ধরেছিলে, হায়।

ইতালির দেশ ধর্ম তুলিয়া লুটাইল তব পায় !!

চাপরাসী ও কেরানী

কিছুদিন পূর্বে বহুতা দেবার সময় পণ্ডিতজী বলেন, চাপরাসীদের মাইনে মাস্টারদের চেয়ে বেশী কিংবা ওই ধরনের কিছু একটা। আমার ঠিক মনে নেই। তার জন্ত পণ্ডিত সম্প্রদায় আমার অপরাধ নেবেন না। বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি তাঁদের উপকারই করেছি। কারণ পণ্ডিতজীর সব কথা বিশেষ করে তাঁর সব শপথ এবং প্রতিজ্ঞা সর্বসাধারণ স্মরণ রাখলে বড় বিপদ হত। আমার মত কোন কোন আহাম্মুক এখনও ভুলতে পারে নি, পণ্ডিতজী স্বরাজ্যভেদে উদ্যোগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি কালাবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কেউ যদি কাউকে ওই ভাবে ঝুলে থাকতে দেখে থাকেন, তবে দয়া করে জানাবেন। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম না হলেও প্রাণাভিরাম। একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। কারণ আমার জীবন-সায়াহ আসন্ন।

অতএব, পণ্ডিতজী প্রাতঃস্মরণীয় বটেন, কিন্তু তাঁর বচনামৃত প্রাতঃস্মরণীয় নয়। খয়ের। বাংলা ‘খয়ের’ নয়, উর্দু ‘খয়ের’। তার অর্থ ‘তা সে যাকগে’। এই উর্দু ‘খয়ের’টি এই বেলাই একটু ভাল করে শিখে নিন। বিস্তার ‘ফায়দা ওঠাতে’ পারবেন। বুঝিয়ে বলি।

উর্দুওয়ালারা দেশ সঞ্চাৎ বহুতার আরম্ভেই শুরু করেন তার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে। আমরা খেতে পাই নে, পরবার কিছু নেই, আশ্রয় জোটে না, শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, মেয়েরা গর্ভযন্ত্রণায় মারা যায়, ডাক্তারবড়ির ব্যবস্থা হল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা তখন উদ্গ্রাব হয়ে প্রতীক্ষা করি, এইবারে বুঝি দেশের কর্ণধাররা বাতলে দেবেন, তাঁরা এ সব বালাই-আপদ দূর করবার জন্ত কী সব পরিপাটী ব্যবস্থা করেছেন, দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় এ সব অভাব-অনটন তাঁদের সম্মার্জনী-সঞ্চালনে দূরীভূত হয়েছে, এইবারে আমাদের সবুরের মেওয়া ফলবে কবে, এই ধরনের কোন কিছু।

বারমাস্তা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেবেন। চতুর্দিকে স্তব্ধতা নৈঃশব্দ্য। আমরা কান পেতে আছি, এইবার শুনতে পাব, ‘চাপানের’ ‘ওতর’, এইবারে শুরু হবে উটো ‘বারমাস্তা’, এইবারে আরম্ভ হবে আমাদের আশার বাণী, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন।

ও হরি। কোথায় কী ?

শুনতে পাবেন, বক্তা গুরুগম্ভীর নিনাদে একটি কথা বললেন, সেটি ‘খয়ের’।

যানে ? এর অর্থটা ত তাহলে বুঝতে হয়। কারণ ইতিমধ্যে নাকাল ‘চাপানের

ড্রাই ফার্মিং' কিংবা 'জান্জিবারের কো-অপারেটিভ সিস্টেমে' চলে গিয়েছেন। তা হলে নিশ্চয়ই ও 'খয়ের' শব্দে তাবৎ সমস্তার সমাধান ঘাপটি মেরে বসে আছে। ঠ-তে যে রকম হিন্দুর ব্রহ্ম লাভ, ক্রুশে যে রকম খ্রীষ্টানের গড লাভ। 'সকলং হস্ততলং শব্দমাত্রেণ যদি অর্থধনং কোহপি লভেৎ।'

এইবারে 'খয়ের'-কলমার গুহ্য অর্থ শোনার পূর্বে ভাল ভক্তারকে দিয়ে হাটটি দেখিয়ে নিন। শব্দ-টি মারাত্মক রকমের হবে; ছাপাখানায় সদ্ব্রাক্ষণও আছেন। আর কেউ না পড়লেও তাঁরা বাধ্য হয়ে আমার লেখা কম্পোজ করেন, প্রফ দেখেন। অকালে ব্রহ্মহত্যা করলে লোক-সভায়ও আমার ঠাই হবে না।

'খয়ের' কথার সাদামাটা প্লেন 'নির্ভেজাল' অর্থ, 'তা সে যাক্গে—অন্য কথা পাড়ি'। অর্থাৎ এতক্ষণ আপনি যে সব ছুঃখ-কাহিনীর ফরিয়াদ-প্রতিবাদ আগড়ম্-বাগড়ম্ যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার রইল না। আপনি এখন কালীঘাট, মোলা আলী সর্বত্রই লম্ফ রাম্প দিতে পারেন। কারণ 'খয়ের' শব্দের প্রসাদাৎ আপনি আপনার পুচ্ছটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন।

'খয়ের' বাক্যের শব্দার্থ আরবী ডিক্শনারি খেঁটে বের করেও পুলিশ-পিঠের ত্রাজ গজাবে না। ওতে পাবেন 'খয়ের' অর্থ 'উত্তম', 'শিব', 'মঙ্গল'। তবে কি বক্তা যে গোড়ার দিকে ফুল্লরার বারমাস্তা গেয়েছিলেন সেটা 'ভাল' ?

না। আমরা অর্থাৎ বাঙালীরাও এ-রকম জায়গায় 'উত্তম' বলে থাকি, কিন্তু বিপরীত অর্থে। আমাদের পণ্ডিতগণ কোনও কিছুর হৃদ্যর্ঘ অবতারণা করার পর সর্বশেষে বলেন, 'উত্তম প্রস্তাব'। তার অর্থ এই নয়, 'এতক্ষণ যা বললুম সে সব খুব ভাল জিনিস'—তার সরল অর্থ, 'এ-দিককার কথা বলা হল, এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য নিবেদন করছি এবং সেইটেই আমার বক্তব্য এবং তাতেই পাবেন প্রশ্নের সমাধান, রহস্তের মীমাংসা।'

'খয়ের'-এর এরূপ ব্যবহারকে ফার্সীতে বলা হয়, 'তাকিয়া-ই-কালাম'—'কথার' (কালামের) 'বালিশ' (তাকিয়া)। অর্থাৎ যে কথার উপর ভর করে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। বিপক্ষ রা'টি কাড়তে পারবে না, আপনি কেবল কতেহ করে দিয়েছেন, ভাগ্যিস, আপনি, মোকামাফিক 'খয়ের' শব্দটি প্রয়োগ করতে জানতেন, 'রাখে খয়ের মারে কে ?'

মুসলমানরা নাকি এদেশের মন্দির ভেঙেছে, পার্ক সার্কাসে শিককাবাব চালিয়েছে, ইদানীং নুতন শুনছি, খামখেয়ালিতে খেয়াল আমদানি করে ঝুপদ-খামার বরবাদ করেছে। করেছে ত করেছে, তাই বলে কি উদ্ভাভের গোসা-

ঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন ? গড়ের মাঠে গিয়ে রাষ্ট্রভাষায় (কটকে আমার বৃদ্ধ বাঙালী কেরানী সরকারী ইশ্তিহার পড়ে ভীত কণ্ঠে আমাকে শুখিয়েছিল ‘আমাকেও লোষ্ট্রভাষা শিখতে হবে নাকি, শ্রার ?’) কী ভাবে ‘খয়ের’ শব্দের স্রষ্ট প্রয়োগ করতে হয়, সেটি শিখবেন না ? ওইটে ঠিকমত, তাগম্যক্ষিক, বাংলায় ‘এসুতেমাল’ করতে পারলে পাড়ার তর্কবাগীশ, তাকিয়া (ই-কালামের)-র কল্যাণে তর্কবাগীশ হতে কতক্ষণ ?

চিন্তা করে দেখুন, ‘খয়ের’ শব্দের কত গুণ ! রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তাঁর শব্দভাণ্ডার থেকে লাখি ঝাঁটা মেয়ে তাবৎ আরবী-ফার্সী শব্দ বের করে দিচ্ছেন—কারণ হিন্দী বাংলার তুলনায় অনেক ধনী (!) কিনা—কিন্তু কই, ‘খয়ের’ শব্দটি তাড়াবার প্রস্তাব ত কেউ করে না। কটুর কান-ফাটা হিন্দীতে ‘ভারতওয়ার্ধকী উন্নতি ঐর সোওয়াধীস্তা, গড়তস্তর ঐর সামওয়াদ’ ইত্যাদি ‘কঠন্ কঠন্’ (কঠিন কঠিন) সমস্তায়ে নির্মাণ করার পর সে-ইন্দ্রজাল তাঁরা ছিন্নভিন্ন করেন কোন মোহমুদগরে ? সেই সনাতন—রাম ! রাম !—সেই যাবনিক, স্নেচ্ছ খ-য়ের দ্বারা। এবং সেই ‘খয়ের’-এর ‘খ’ও উচ্চারণ করেন অ্যাসন্ ঘর্ষণ দ্বারা যে শুনে মনে হয় বড়ী মসজিদের সামনে জাকারিয়া স্ট্রীটে কাবলীওলা ‘খ’ উচ্চারণ করার ছলে গলা সাফ করছে। কোথায় লাগে তার কাছে স্কচ ‘লখ্’ শব্দের ‘খ’, জার্মান ‘বাখ’ শব্দের ওই একই ব্যঞ্জন ?

মুসলমানরা মন্দির ভেঙে অতিশয় অপকর্ম করেছে, কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রাগে ‘খয়ের’ শব্দের যে বিরাট বালাখানা তৈরি করে দিলে তার উপরে বসে হাওয়া খাবেন না ?

শুধু মন্দ দিকটাই দেখবেন, ভাল দিকটা দেখবেন না ?

তবে একটা গল্প শুনুন।

হয়ত অনেকেই শুনেছেন, তাঁরা অপরাধ নেবেন না। কারণ, বিবেচনা করে দেখুন, পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি না করলে সেটি বেঁচে থাকবে কী করে ? মহাভারতের গল্প সবাই জানে, তাই বলে কি আমরা মহাভারতের চর্চা বন্ধ করে দিয়েছি ?

খয়ের।

গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।

কালীঘাটের মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে এক ভদ্রসন্তানের হৃদয়ে ধর্ম-ভাবে উদয় হল। মন্দিরে ঢুকে পাণ্ডাকে ডেকে যথারীতি যাবতীয় পূজা-পাটা করালে এবং শেষটায় উত্তম দক্ষিণা পেয়ে পাণ্ডা ভদ্রসন্তানের কপালে ইয়া

একখানা খাসা তিলক কেটে দিল। বহর আর চেহারা দেখে মনে হয় ওই দিয়ে লাইটনিং কণ্টক্টরের কাজ অনায়াসে চালানো যায়। দেখলেই ভক্তির হয়। গড় হয়ে পেগাম করতে ইচ্ছে যায়। ভক্তিতে গদগদ হয়ে ‘তারা ব্রহ্মময়ী মা, ব্রহ্ম-যোগিনী মা’ ইত্যাদি জপ করতে করতে ভদ্রসন্তান বাড়িমুখো হল।

কিন্তু হায়, সংসারে কত না সর্বজনীন অনাচার, রঙিন প্রলোভন। হবিত হ, কিছুদূর যেতে না যেতে পথে পড়ল বাহারে একখানা ‘বার’। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, ড্রাই ডে, শরাব বারণ, তাই ভদ্রসন্তান প্রলোভনের ভয় নেই জেনে সে-পথ নিয়েছিল, কিন্তু বিধি বাম, বড়দিন না কিসের যেন জবর পরব ছিল বলে ‘ইম্পিশেল’ কেস হিসাবে ‘বার’ খোলা।

এখন এগোই কী প্রকারে? ভদ্রসন্তানের রাস্তায় এগোবার কথা হচ্ছে না। আমি গল্পটা নিয়ে এগোই কী প্রকারে? পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাপঠন। তাঁদের আমি অধর্মের কাহিনী শোনাই কী করে? কিন্তু তাঁরা যখন এতাবং এতখানি দয়া করেছেন তখন গোপাল-ভাঁড়ের মা-কালীর মত জোড়া মোষ থেকে নেমে নেমে শেষ পর্যন্ত ছুটো বুনো কড়িং নিজেই ধরে থেতে রাজী হবেন—এই আমার ভরসা।

পাট। ইংরেজীবাগীশ ছোঁড়ারা বলে ‘পাইন্ট’। তিন কোয়াটারে থেতে না থেতেই হয়ে গেল। রঙিন পাখনায় ভর করে সে পুনরায় নামল রাস্তায়। কোয়াটারটুকু ফেলা যাবে বলে বোতলটা পকেটে—বোতলবা সিনীর সেবকেরা বরঞ্চ জীবনের বেটার-হাককে বিসর্জন দিতে রাজী আছে, ওই ‘ব্যাড’ কোয়াটারকে নয়।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উদয় হয়েছিলেন কি না বলতে পারব না, কারণ আমি জ্যোতির্বিদ নই। তবে উদয় হলেন পাড়ার মৈত্রমশাই, নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ, কালেভদ্রে বাড়ি থেকে বেরন। এক মৈত্র মিনার্ভা থিয়েটার কোথায় জেনেও বলেন নি। ইনি কিন্তু বোতল দেখে বললেন, ‘পাষণ্ড মাতাল!’

পকেটে বোতল থাকলেই, এমন কী সঙ্গে সঙ্গে টলটলায়মান হলেই মাহুধ মাতাল হয় না। কিন্তু মৈত্রমশাই গায়শাজের চর্চা করতেন। তাতে আছে,—

১। দেবদত্ত বিরাট লাশ।

২। দেবদত্তকে দিনের বেলায় কেউ কখনও ভোজন করতে দেখে নি।

অতএব, দেবদত্ত রাজে ধায়।

এটাকে বলে নলেজ বাই ইনকারেন্স।

আমাদের ভদ্রসন্তান সচরাচর কথা কাটাকাটি করে না। কিন্তু অব্যাপ্ত

অনধীকার। বেচনাভরা কণ্ঠে, গদগদ ভাষে করুণ নয়নে শুধু বললে, 'মৈত্র মশাই, বোতলটাই শুধু দেখলেন, তিলকটা দেখলেন না।'

মন্দির ভাঙাটাই শুধু দেখলেন, 'খয়ের'টা শুনলেন না।

আমার অনেক পাঠক আমাকে বাচনিক এবং পত্র দ্বারা মাঝে মাঝে জানান যে, আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে থাকেন। আমি শুনে বড় উল্লাস বোধ করি। কারণ পাণ্ডিত্য বিতরণ করার শক্তি মুশিদ আমাকে দেন নি। আমি বিদূর, যা পারি তাই দি। তাঁরা হয়ত বলবেন, এ-গল্পটা সর্বত্র বলা যাবে না। তাই তাদের জগ্ন একটা গার্হস্থ্য সংস্করণ নিবেদন করছি। ইটি অনায়াসে পুত্র-কন্যার হাতে দিতে পারবেন।

ঢাকার কুড়ি গাড়েয়ানের গল্প। কুড়ি বসে আছে ছাকরা গাড়ির কোচবাক্সে। বাবু জামাজোড়া পরে উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। পা গেল হড়কে। বহুতর ধাক্কা আর গোত্তা খেয়ে খেয়ে বাবু গাড়িয়ে পৌঁছলেন নীচে। তিন লক্ষের কুড়ি কোচবাক্স থেকে নেমে কর্তাকে কোলে তুলে নিলে। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে কয়, 'অহো-হো, কত্নার বড় লাগছে। আহা-হা-হা, এইহানে লাগছে, এ হে-হে-হে, ওইহানে লাগছে।' গা বুলায় আর আদর করে, আদর করে আর গা বুলায়। শেষটায় কিন্তু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কত্না আইছেন জল্দি।'।

জখম-চোটের কথাই শুধু ভাবছ, তাড়াতাড়ি যে এসেছে সেটা দেখছ না।

কিন্তু কেরানী আর চাপরাসীদের কী হল ?

খয়ের।

চাপরাসীদের মাইনে কোতওয়ালের মত হোক সেই আমার প্রার্থনা। কিন্তু সন্ধে সন্ধে চাপরাসীদের কাছে নিবেদন, কোতওয়ালের মাইনে যেন কমে গিয়ে চাপরাসীদের আজকের মাইনেতে না দাঁড়ায়। আমার বাসনা, সকলেরই যেন কোটালের মাইনে হয়—অর্থাৎ আই-জি-র মাইনে হয়। আমি ধনী হব, তুমি ধনী হবে, সবাই ধনী হবে—এই হল সত্যকার প্রার্থনা। ঋষি যখন বিশ্বজনকে আহ্বান করে জানিয়েছেন সকলেই অমৃতের পুত্র তখন ওই সত্যই ঘোষণা করেছেন। পাঁড় কমিউনিষ্টও ওই আদর্শের জগ্ন লাড়ে। পেতিরা বলে, 'মজহুর ভাইরা শুধু সোনার খাটে বসে রূপোর শানকি থেকে দু হাত ভরে গুড় খাবে এবং

আর সবাই রাস্তায় পাথর ভাঙবে।’ এটা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের পণ, আমরা সবাই রাজা হব।

কিন্তু বেদান্তের এই অতি প্রাচীন সত্যটি পুনরায় জানাবার জন্ত আমি এ-প্রবন্ধের অবতারণা করি নি। মূল কথায় ফিরে যাই।

মনে করুন, আপনি দিল্লির কোনও সরকারী দফতরে কাজ করেন। সেখানে গেলে না করেও উপায় নেই। কেন নেই; সে কথা পরে হবে। বিশ্বাস না হয়, ১৯৫৭ সনের একখানি টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে ১৯৫৭ সনের খানার তুলনা করে দেখুন, চাকুরের সংখ্যা কত গুণ বেড়েছে। ওখানে একদিন রুটিওলা আণ্ডাওলা আর থাকবে না—এই আমার বিশ্বাস।

আপনার চাপরাসী চৈতরাম কিংবা ব্রিজমোহন ১৫ মাইনে পায়। কেরানী বোধ হয় ১১৫ পায়। আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না—তবে অল্পপাতটা মোটামুটি এই। অকশাপ্ত এম্বলে বলবে, ‘অতএব চাপরাসী কেরানীর চেয়ে বিশ টাকা কম পায়।’ ওই করলেন ভুল। শুনুন।

আপনি চৈতরামকে ঘণ্টি বাজিয়ে বললেন, ‘যাও ত চৈতরাম, এক পাকিট গোল্ডফ্লেক নিয়ে এস।’

সরকারী আইন অনুসারে চৈতরাম অনায়াসে বলতে পারে, ‘আমি যাব না। আমি মাইনে পাই সরকারী কাজের জন্ত। আপনার জন্ত সিগারেট আনা সরকারী কাজ নয়।’ আপনি কিছু বলতে পারবেন না। বলা উচিতও নয়।

কিন্তু চৈতরাম তা বলবে না। সে ভদ্রলোক। তদুত্তরে বলবে, ‘বৃহৎ (উচ্চারণ ‘বোহৎ’) আচ্ছা, হজুর।’ এবং লক্ষ দিয়ে এমন তীরবেগে ঝেরিয়ে যাবে যে, আপনি মনে মনে শাবাশি দিয়ে বলবেন, ‘সোনার চাঁদ ছেলে, কী স্মার্ট!’

এক মিনিটের ভিতর চৈতরাম আপনার টেবিলের উপর প্যাকেটটা রাখবে। সিগারেটের দোকানে আসতে-যেতে পনের মিনিট লাগার কথা। কী করে হল?

চৈতরাম ডাইনের বুক পকেটে রাখে গোল্ডফ্লেক, বাঁয়ের পকেটে ক্যাপস্টান, পাতলুনের পকেটে রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট, মেপোল ইত্যাদি। নিতান্ত কর্কশ ব্যবসায়ী হিসাবে সে পরিচয় দিতে চায় না বলে, বারান্দায় গিয়ে পকেট থেকে প্যাকেটটি বের করে এনেছে। আসলে সিগারেট বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা। ঠিকমত নোটস দিলে সে আপনাকে বলকান্ সবারনী সিগারেটও এনে দিতে পারে। ও-মাল সূক্ষ্মাত্র এম্বেসিগুলোর ক্যান্টিনে পাওয়া যায়।

আইন বলে, সরকারী চাকরির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করতে পারবে না।

কিন্তু আপনি যখন পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করলে সরকার আপনাকে ছড়ো দেয় না, তখন চৈতরামের সিগারেট বিক্রিতে দোষ কী? কিছু না। আমি তাকে আলীবাদ জানাচ্ছি, তার ব্যবসা বাতুল।

কিন্তু কেরানী এ-ব্যবসা করতে পারে না। কে কত মাইনে পায়, এ-কথা এখন আর তুলবেন না। সিগারেট বিক্রি করে এখন চৈতরাম কেরানীর মাইনে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই হল আরম্ভ।

প্রায়ই আপনি লক্ষ্য করেন, দশটা থেকেই চৈতরাম টুলের উপর ঢোলে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, ডাকলে তার সাড়া পাবেন না। বরঞ্চ ঘণ্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে দর্শন দেওয়াতে কখনও গাফিলতি করে নি। একদিন আমি তাকে শুধালুম তার ইন্সমনিয়া আছে কি না। সে মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, ‘না।’ হেড ক্লার্ক ওই সময় আমার ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি মৃত হাস্তার বেখা দেখতে পেলুম। পরে তাঁকে শুধালুম, ‘ব্যাপারটা কী?’

নাঃ! চৈতরাম প্রতি রাতে অভিসারে বেরয় না—যদিও তার যমুনা-পারে বাস এবং পিতৃপিতামহের সাবেক মোকাম বন্দাবন এবং মথুরার মাঝখানে। নাঃ! ‘বন্দাবনকে কুন্জ-গলিয়ে শ্রামরিয়া কা দরসন’ ইত্যাদি যাবতীয় সমুদায় ব্যাপার সে মায়ের গব থেকেই শুনে আসছে, ও-সব রোমান্সে তার কোনও চিন্তদৌর্ভল্য নেই।

সে করে অতিশয় গগুময়ী ব্যবসা। খবরের কাগজ বেচে। সাতটার ভিতর ওই কর্ম শেষ হয়ে যায় বলে সরকারী চাকরির সঙ্গে এতে ওতে কোনও ধন্দ বাধে না। দুধের ব্যবসাও আটটার ভিতর শেষ হয়ে যায় বলে এককালে তাও করেছে। এখন নাকি ভাবছে, দুটোই কন্সাইন করা যায় কি না। চোর পালিয়ে যাওয়াতে বাবু তখি করে দরওয়ানকে পুছেছিলেন, ‘চোর ভাগা কিওঁ?’ দরওয়ান বললে, ‘মেরা এক হাথ মে তলওয়ার, দুস্রমে ঢাল; পক্ড়ে কৈসে?’ চৈতরাম তাকে ছাড়িয়ে যাবে। তার এক হাথমে দুধ, দুস্রমে পাইপর (পেপার) এবং সঙ্গে সঙ্গে সে নৌকরিকেও পাকড়ে ধরে থাকবে।

এইবারে চিন্তা করুন, চৈতরামের আয় কতখানি বেড়ে গেল। কেরানী বেচারি ত আর সকালবেলা দুধ কিংবা খবরের কাগজ বিক্রি করতে পারে না। সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? পারে টুইশানি করতে। কিন্তু সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে-কথা আপনারা না জানতে পারেন, আমি বিলম্ব জানি—বেকার হওয়ার পরের থেকে এই আট মাস ঘুরে ঘুরে একটাও

যোগাড় করতে পারি নি। অধ্যক্ষ কুলীন সন্তান—এর চেয়ে অনেক অল্পায়াসে পাঁচটি বিয়ে করতে পারতুম। চারটি আইনত—‘হিন্দু কোড-বিল’ আমার উপর অর্সায় না।

হেড ক্লার্ক আপনাকে বলবেন, ‘শ্রুত, আপনি যে চাপরাসীদের যুনিফর্মের জঙ্ঘ দরদ দিয়ে পার্সনাল ইন্সট্রেন্ট নেন, সে বড় ভাল কথা। কিন্তু শ্রুত, এদের যুনিফর্ম ছেঁড়ে সরকারী কাইল এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিয়ে যাবার সময় নয়, ছেঁড়ে বাইসিকলের সেডলে বসে দুধ বিক্রি করার ফলে। চাপরাসীদের পাতলুন দেখে বলে দেওয়া যায়, সকাল বেলা কে কোন্ ব্যবসা করে।’

ভুলে গিয়েছিলুম, যুনিফর্মের সাক্ষরতারায়ের জঙ্ঘ চৈতরাম সরকারের কাছে থেকে ‘ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স’ পায়। অবশ্য একদিন ক্যাসওয়েল লীভ নিলে সেদিনের জঙ্ঘ অ্যালাওয়েন্সটি কাটা যায়। অ্যাকাউন্টেন্টের অর্ধেক সময় বায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ভাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার খেজালতী কর্মে—আপনাদের মোটা মাইনের হিসেব রাখতে নয়। এই ‘ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স শীট’খানা ঠিকমত টানতে পারেন ক’টি বাহু অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই নিয়ে বিরাট বিরাট আলোচনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক আনা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তির গোলমালে আপিসমুহু সবাই অডিটার-জেনারেলের কাছে কী ছড়োটাই না খেয়েছিলুম। শনিবার হাফ ডে—অ্যাকাউন্টেন্ট হাফ ওয়াশিং চার্জ কেটেছিলেন বলে। কাগজের সম্পাদক যখন তাঁর স্তম্ভে বলেন, সরকারী পয়সার প্রতি আমাদের দরদ নেই তখন আমাদের প্রতি বড় অবিচার করেন। অবশ্য ‘দামোদরে’ কত লক্ষ টাকা কোন্ দিকে ভেসে যায়, সে-কথা আমি বলতে পারব না, তবে এক-কথা আল্লার কসম খেয়ে বলব, বেহেস্তের দোহাই দিয়ে বলব, ‘তঁাবা-তুলসী-গঙ্গাজল’ স্পর্শ করে বলব, সরকারী নোকরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরও এই ‘ওয়াশিং শীটের’ দুঃস্বপ্ন দেখে এখনও মাঝে মাঝে ঘুম থেকে এক গাঁবে জেগে উঠি। গিন্নি জানেন। বুকে হাত বোলান আর গুরুদত্ত ‘ওয়াশিং-ওচাটন’ আওড়ান।

কেরানী ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স পায় না। যুনিফর্ম যখন নেই তখন ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স হয় কী প্রকারে? শিশুবোধ ব্যাকরণ। অথচ তাকে ঠাঁট বজায় রেখে দক্ষতরে আসতে হয়। বুল শাট ইঞ্জিন না করা থাকলে বছরের শেষে তার কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট লিখি, ‘শ্রাবি।’ আপনি হয়ত বলবেন, ‘ওই ওয়াশিং অ্যালাওয়েন্স আর ক’পয়সা?’ বটে! ছ পয়সা হোক আর ছ গুণ্ডাই হোক—দেখুন না একবার রাস্তায় নেমে, ছ পয়সা কামাতে কতকণ লাগে।

ওই ব-বা। ভুলে গিয়েছিলুম, বর্ষাকাল এসেছে—চৈতরাম বর্ষায় ছাতা আর বর্ষাতি পায়। মহামূল্যবান সরকারী সব কাইল এ-দফতর থেকে ও-দফতরে নিয়ে যাবার সময় যদি ভিজ়ে যায় তবেই ত চিত্তির—একদম অক্ষরার্থে।

কিন্তু কেরানী পায় না। যদিও সরকারী কাজেই তাকে এ-দফতর ও-দফতর করতে হয়—বগলে কাইলও থাকে। কেরানীরা সচরাচর চাপরাসীর ছাতা ধার চায়।

একবার এক কেরানী ছাতাখানা হারিয়ে কেলে। চাপরাসী বলে, ‘ছাতা কিনে দাও।’ সরকারী কাইল বাঁচাবার প্রেমে নয়, দুখ বাঁচাবার জ্ঞ। কেরানী বলে, ‘সরকারী কাজে ধোওয়া গিয়েছে, ওটা “রাইট অফ্” হবে।’ দুখের স্বরণে নাকি উপদেশ দিয়েছিল, ‘তা বেরবার সময় দুখে জল দিস্ নি, বুট্টির জলে ওটা পুষিয়ে নিস।’ শেষটায় কী হয়েছিল, জানি নে। সি. সি. বিশ্বাস বলতে পারবেন। তখন আইন-মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

চৈতরাম শীতকালে কঞ্চল পায়। কেরানী পায় না। তার চামড়া বোধ করি গণ্ডার ব্যাণ্ড। সদাশয় সরকার বলতে পারবেন।

চৈতরাম কোয়ার্টারও পায়। একখানা ঘর। এক ফালি বারান্দা। এক ডুমো উঠোন। ঘরখানা সে একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে চৈতরামের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতরাম বারান্দায় শোয়, মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে নাশ্তা বথরায় খায়-টায়। চৈতরাম দুখানা ঘর পেলে বড় ভাল হত। একখানাতে সে মাথা গুঁজতে পারত বলে? উহঁ। দুখানাই ভাড়া দিতে পারত বলে। তাই চণ্ডীগড়ের নূতন ক্যাপিট্যালাে তারা দুখানা ঘরের জ্ঞ আবেদন-আন্দোলন চালিয়েছে। আমি সেই আবেদনে সানন্দে স্বাক্ষর নিয়েছি।

কোয়ার্টার কেরানীও পায়—যাদের সত্যকার মুকুবীর জোর আছে। কিন্তু সেটা ভাড়া দিয়ে থাকবে কোথায়? বারান্দায়? মুশকিল।

এই তো গেল মোটামুটি জরিপ। তার ওপর পুজো-আর্চায় বথশিশটা-আসটা। কোন জিনিস বড় সাহেবের জ্ঞ কিনে আনলে তিনি কি আর চেঞ্জটা সব সময় ফেরত চান? কেরানী এসব রসে বঞ্চিত।

এই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চৈতরাম করে কী?

ওই জানলেই ত পাগল সারে।

কেরানীদের সঙ্গে লগ্নির ব্যবসা করে। এটা সবিত্তার বর্ণনা করতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কেরানীরা অসন্তুষ্ট নয়। এবং

আপনি খুশী, মাসের পয়লা তারিখে কাবুলীওয়ালাদের দফতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে। চাপরাসী ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

জর্নৈক বন্ধু গল্পটি বলেছেন—

আহাম্মক জামাই খশুরকে শোবাচ্ছে, ‘সহুরমশাই, সহুরমশাই, আপনার বিয়ে হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’ (মনে মনে, ‘ব্যাটা না হলে তুই বউ পেলি কোথেকে?’)

‘কার সঙ্গে, সহুরমশাই?’

রাগত কঠে, ‘তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে।’

জামাই, গদগদ কঠে, ‘আহাহা, ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়েছে।’

দফতরের ভিতর আপোসে এই ব্যবস্থা আপনারও পছন্দসই হওয়ার কথা। চিন্তা করে দেখুন।

*

*

*

শুনেছি, একদম টপে উঠলে, অর্থাৎ মস্ত্রী-টম্রী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম স্বপ্ন-স্ববিধা আছে। অবশ্য চাপরাসীদের মত টায় টায় এ রকম নয়! তবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কোনও বিশেষজ্ঞ যদি সেটা বাতলে দেন তবে ঠিক আন্দাজ করতে পারব, দশ পার্সেন্ট উজ্জুগ গো করাতে তাঁরা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।

চিন্তা

সন্ধ্যাবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুঁড়ি তৈরী করার পর আজ এ-কুঁড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে-কুঁড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভিতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। রেণু যেন রাজকুমারী, আর চতুর্দিকে সার বেঁধে তাঁর সখীরা এক নিমন্ত্রণ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চূপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধ্যাবেলায় কুঁড়িতে দেখেছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলাকার ফোটা-ফুলে দেখছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভিতর

আরও সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে ত হবার নয়; ফুল কোটে এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন ত চোখে পড়ে না। মমন্ত রাত কুঁড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখে এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে-ক্লান্ত চিহ্নার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিহ্নার সার্কিট হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাকাচ্চাদের কিচির কিচির শব্দে। আঙ্গুল-আঙ্গুরের ছেলেমেগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর-রাত্রে এসে পৌছেছে।

দরজা খুলে পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের সেই গোলাপ-কুঁড়ি। শুধু এ-কুঁড়ির রঙ একটু বেশী লালচে। আমার আর পূব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁথুর। কিংবা যেন কোন রক্তাশ্রয়ধারিণী গরবিনী চিহ্নার উপর দিয়ে পুর সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাশ্রয়ী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে কুঁড়ি ফুটে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাণ্ডুর আকার অল্প রকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মত এক একটি সূর্যরশ্মি দিঘলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পূর্ব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র—ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিহ্নার রাঙা জলের ফালি গোলাপী হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাশ্রয়ী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সব কিছু পাত্ত, যেন হিমালয়ের গানি-মাথা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমালয়ের সর্ব-গানি ঘুচে যাচ্ছে। পূব আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাঁজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাহ্নবী তার ভাষ্কর্যমণ্ডলী ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ-ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণে গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্ব-চরাচর ছড়িয়ে এবং হস্ত ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোন ক্লান্ত রইল না।

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিক্কার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি রঙ মেখে নিয়েছে। এ-রঙ সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে, বিদেশের নু ডানয়বেও নীলের এ-আভাস আমি কখনও দেখি নি। তবে কি চিক্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অল্পদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে সাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নীলুফরি রঙ ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপরাধ জল হ্রদে নেমে এসে তার লোন জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলুফরির মাঝখানে ওই বিরাট কালো পৌচ কিসের? মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বলে সে-পৌচ আবার অল্প অল্প ঢুলছে। স্তিমলক ক্রমেই কালো পৌচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল—লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই ত; এদেরই ত আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে, ডাউকির হাওরে হাওরে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিক্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটা উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন চোক গিলতে পারছি নে।

মাথার উপরকার সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়ালে কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কঁপে কঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলের দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ ত সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রঙ কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাজন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভায়ী কৃষ্ণ বসে ছিল। বললে, ‘মামা, ওই দেখ, চিক্কার দেবী কালী-মার দ্বীপ। ওখানে জল নেই, বাস নেই, তোমার টাকের মত সব কিছু খা-খা করছে।

টাকের কথা ওঠাতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে না তাকিয়ে তাকালুম রোহ-কষায়িত লোচনে, কৃষ্ণার চোখের দিকে। সেখানে দেখি চিক্কার মাধুরী। কৃষ্ণার

চোখের সাদা যেন সাদা হতে হতে নীলুফরি হয়ে গিয়েছে আর তার গায়ের কালো রঙ দিয়ে চোখের চতুর্দিকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান। শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি নিখরিসীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা স্বধারসে, নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আবাচের ভিজে মাটির গন্ধ।

রসময় পার্ঠক, এইবারে আমি তোমার একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি কাব্যরস ভিন্ন অগ্র আরও দু-একটি রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাত্তরস। চিন্তার এ-পাখির রস আমি চেখেছি দেশে। আবার লোভ হল। সন্ধে ছিল স-বন্দুক পারিকুদের রাজ্য। তার এবং তার বন্দুকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সন্ধে সন্ধে মনে মনে চিন্তার কালীকে স্মরণ করে বললুম, ‘গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা!’ তারপর ভাবলুম, না, অত বেশী চাওয়া-চাওয়ি ভাল নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অন্তরেই সমুদ্র হই। মনে মনে বললুম, ‘আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা না-ই বা দিলে। গোটা দুতিন দিলেই হবে। আমার খাই মাইজী বডডই কম।’

বলেই একটা ইরানী গল্প মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল। এক ইরানী দরবেশ ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বললে, ‘হে আল্লাতালা, আমাকে হাজার পঁচিশেক তুমান দাও। আমি তোমার কিরে কেটে বলছি, তার থেকে পাঁচ হাজার তুমান গরিব-দুঃখীদের ভিতর দান-খয়রাত করে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।’

চিন্তা হ্রদ বিস্তার ছোট ছোট দ্বীপে ভতি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোন যোগসূত্র নেই। এদের পোস্ট-অফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয় নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা ওরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে শহরে যায়। এটা সেটা দেখে,র ফুটপাথে

দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িয়ারই আদি-বাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিঙ্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যে-সব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে, দু-হাজার বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোনও কাজে লাগে নি।

হয়ত ভালই আছে। ফার্সীতে বলে, ‘দূর বাশ্, খুশ বাশ্।’ দূরে আছে ; ভালই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, ‘যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মলুষ্য হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।’ হয়ত ‘সভ্যতা’র আওতায় না এসে এরা সভ্যই সভ্যতর।

চিঙ্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ভাঙা থেকে মাইল আটেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিঙ্কা, কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধুরেখা আর কোথায়ই বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ ত দেখছি, পূব-বাংলার পাড়া-গা। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু দিকে রাস্তার জন্তু মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট খেতপদ্ম রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধানময় বক। মোষগুলো গলা অবধি ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পূব-বাংলার জমির মত এ-জমি উর্বরা নয় ; তাই ক্ষেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্রামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়য়। ওইখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক ; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পারিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে পৌঁছে দু দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কোঁচ সোফা, দশ-হাতী খাড়া আয়না, জগদল কাবাড় আলমারি, সোনার সিংহাসন, মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, রাড-কাহুস, আরও কত কী ! এসব ওই গরিব জেলেদের পয়সায় ? অবিশ্বাস্ত।

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিঙ্কার পার অবধি। তারপর কত চেলাচেলি হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নাবাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে

এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রাণী। আর আজ সকালের মত আমরা।

স্বর্ঘ মধ্যগগনে। লঞ্চ পূর্বদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে-জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দক্ষতান্ত্র দিগন্তে যে আশ্চর্য ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্তরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চূষনে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু-একটি ঝাঁক হেথা হোঁথায়। বোধ হয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দীপের গাছতলার ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল হুপুর-রোদে অতি হালকা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রঙ আরও একটু বেশী ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানি নে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় হয় সবুজ রঙের কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি, আমার চোখ দুটিকে নীলাঞ্জন— কিংবা নীল চশমা পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সব কিছুই নীল দেখছি?'

মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোন এক জাহুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল এই হরতন, চিরতন, রুহিতন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ওস্তাদ লাল-কালোর দু রঙ না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেলুকি-বাজি দেখাচ্ছেন।

হৃদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটে নি—একেবারে সম্পূর্ণ নিখরকিচ। শুধু আমাদের লক্ষ যেন চিরুনির মত ইজ্রপুরীর কোন এক রমণীর দীর্ঘ বিস্তৃত নীলকুন্তলে সিঁধি কেটে কেটে সমুদ্র-সীমন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁধির দু দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেনা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে কিন্তু এ গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিরুনি বেশীদূর এগতে-না-এগতেই দেখতে পাই, দু দিকের ঘন কুন্তল সিঁধিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লকের মোটরটার একটানা শব্দ কর্তে পীড়া দেয়। সাহসনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্য-মাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিন্তাবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তাঁর নীল কপালের সিঁধিতে এক ফালি সিঁধুর মেখেছিলেন, তারপর তাঁর খোকা কচি হাতের এলোপাতাড়ি খাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা সিঁধুর লাগিয়ে দিয়েছে! মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁধুর মেখে নিয়েছেন।

নালে লালে মিশে গিয়ে বেগুনী হয়? তাই বোধ হয়। হৃদের জল বেগুনী হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড় অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরার রেশের মত খানিকক্ষণ আকাশ-বাতাস জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই ‘শেষ রেশটুকু’র উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দূরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা বুরবুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, ‘অগর পানী বরসতা এক ঘন্টা, তো ছৎ বরসতী দো ঘন্টা’—‘জল যদি বর্ষে এক ঘন্টা ত ছাত বর্ষে দু ঘন্টা!’

হু-এক ঝাঁক পাখি এখানে ওখানে। পারিকৃদের রাজাকে বললুম, ‘হু-একটা মার না।’

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরে স্তম্বে বলেন, ‘বন্দুকো।’ চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারি। আরও ধীরে স্তম্বে কেস

খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করী চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কাতুজো'। ক-রে, ক-রে সব যখন তৈরী তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ ধারাপ ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা গুলি ছুঁড়লেন। ফলং শূন্য।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়লাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারী রহমৎ মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারীরা উদ্গ্রীব হয়ে শুধালে, বড়লাট সায়েবের তাগ কী রকম ? ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়েন না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়লাটের মত শিকারী হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকট্রিটে খবর পাঠাল, না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পূব লাল হয়। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌঁছচ্ছে ? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ ত ফিকে, কোনও রঙ নেই, ফেরকার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায় ?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দীপে নামলুম। আম-বাগানের ভিতর ছোট একটি ডাক-বাংলো। লাদুল-আশ্রমের কাচাবাচ্চারা কিচিরমিচির করছে। স্থানিক পরে চিন্তা হ্রদের তাজা মাছ-ভাজার গন্ধ নাকে এল। সর্বদে ক্লান্তি, কখন খেলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছু মনে নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজ্ঞানভে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রে মুষায়েরা বসবে। আম গাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নুপুর বাজাবে, পুঁবের বাতাস মজলিসের সর্বদে গোলাপ-জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে যাবে।

তারপর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে ঠান্ড উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যে সব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোট বাচ্চা যেমন মুষায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লঞ্চে উঠে পাড়ের পানে রওয়ানা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল কিন্তু আপিসের জুজু আমার পক্ষেদ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুব-সাতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

বাঙালী

এই যে কলকাতা। জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমায় কুলত্যাগ করে ভিন-দেশে যেতে না হয়।

আহা, মাইকেল কি কবিতাই না রচছিলেন—

‘আশার ছলনে ভুলি কি কল লভিষু হয়।

তাই ভাবি মনে—’

কিন্তু আশাকে আমি দোষ দিই নে। আশাকে তখনই দোষ দেওয়া যায়, যখন মানুষ হেথাকার শাস্তি-সুখ বর্জন করে হোথাকার খ্যাতি-প্রতিপ্রস্তির জগু ছোট্টে। কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুটছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায়—হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায়? ‘তার জীবন’ কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সাওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ক্যা ক্যা করছে কেন, কলকাতার বাচ্চাই বা দিল্লির এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন? তার জীবন ত এখন দৈন্তের জীবন, দু মুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, এক টুকরো কাপড়ের কাছে বেচে দেওয়া।

কিন্তু থাক্ এসব অগ্রিয় আলোচনা। আপনাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, আপনারা শীক বাজান আর না-ই বাজান ‘মম চিত্ত মাঝে’ ঘন ঘন শীক বাজছে। ‘

বড় ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে—না? তবে কিনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যার জন্মদিন, তা সে পাঁচ বছরের ছেলেই হোক সেদিন সে রাজা। তার চতুর্দিকে সেদিন পরব জমে ওঠে, তাকেই সবাই কথা কইতে দেয়। আজ কলকাতায় আমার পুনরায় নবজন্মদিনে আমার সহৃদয় পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিঞ্চিৎ বরদাস্ত করে নেবেন বইকি। শাস্ত্রেও তার ব্যবস্থা আছে। আমি স্বার্থ নই, তাই আবছা-আবছা মনে পড়ছে, কেউ যদি চৌদ্দ বৎসর (কিংবা সাতও হতে পারে) নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিন্তু তারপর

যদি হঠাৎ সে ফিরে আসে, তবে তার জন্ত নতুন করে জায়গা সব ইত্যাদি ব্যবসায়িক-কর্ম করতে হয়। তাকেও মাতৃগর্ভস্থ ছোট বাচ্চাটির মত দু'মুঠো বন্ধ করে আন্তে আন্তে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ভান করতে হয়। তার নামকরণ, চূড়াকরণ, এমন কী নতুন করে উপনয়নও হয়। মনে পড়ছে না, তবে বিবেচনা করি, ব্রহ্মচর্যের পর তাকে পুনরায় তার জীকে বিয়েও করতে হয়—বিলিতি ধরনের সিলভার, গোল্ডেন ওয়েডিংয়ের মত। তাতেই বা কী কম আনন্দোন্মাদ, অবশ্য সব কিছুই হয় ঘণ্টাখানেকের ভিতর। এ সব ক'টা ব্যবস্থাই আমার বড়ই মনঃপূত, ভাবতে গেলেই হৃদয় প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বাচ্চাটির অর্ধাংশ লোকটাব মায়ের ছবি মনের ওপব ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু পরিবর্তন করে বলি, তিনিও কি সেদিন বধূবেশ পরে সীমন্তের উপর অর্ধাংশগঠন টেনে নিয়ে অত্যাশ্চর্য অস্ত্রঃপুরিকা কুললক্ষ্মীদের দ্বায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত হন না?

কিন্তু হায় যার মা নেই?

দিল্লি ভাল জায়গা; ভালবাসি কিন্তু কলকাতাকে।

আসানসোল কিংবা বর্ধমানের কাছে রেলগাড়িতে ঘুম ভাঙল। আগের রাতে যুক্তপ্রদেশের কোন নাম-না-জানা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে যে, পরদিন সকালবেলাই চোখ মেলব বাঙলা দেশে; তাই না, জাগলে আমি হাওড়া পেরিয়ে, শেয়ালদা ছাড়িয়ে যে কহাঁ কহাঁ মল্লকে চলে যেতুম, তার ধবর কি আই বি পর্যন্ত রাখতে পারত? ডাক্তাররা বলেন, মনের শান্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদায়িনী—ওনারা শুষ্ক লাতিনে বলেন বলে আমি অহুবাধি ঐৎ সংস্কৃত-বৈদ্য করে দিলুম। ঘুম কেন বর্ধমানের কাছাকাছি ভাঙল সে-কথাও নিবেদন করছি। চায়ের গন্ধ পেয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আসাম-বাঙলার বাইরে কেউ চা তৈরি করতে জানে না—বাঙলা প্র্যাটিকর্মের রন্ধি চা-ও দিল্লী-লাহোরের উত্তম উত্তম খানদানী পরিবারের চা-কে খুশবাইতে হার মানাতে পারে। বাঙলার চায়ের খুশবাই ঘুম ভাঙল।

চোখ খুলে দেখি সমুখে বাঙলা।

অবশ্য মানতে হবে যুক্তপ্রদেশ-বিহাব দুম করে বাঙলা দেশে পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি 'আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহান্নন থেকে' 'কালের সাগর' পাড়ি দিয়ে এক মুহূর্তেই 'শ্রামল মাটির ধরাতলে' চলে আসতে পারেন তবে আপনিই বা কেন এক ঘুমের ডুব-সাতার কেটে এলাহাবাদ থেকে বর্ধমান পৌঁছতে পারবেন না? এমন কী, গেল রাজিতে যে-লোকটা আপনার কামরায় ঢুকে

উপরের বার্ষিক শুয়েছিল, যাকে আপনি 'ছাতু' জেবে অবহেলা করেছিলেন, সে-ব্যক্তি বর্ধমান পৌঁছে দেখবেন দ্বিবি বাংলা বলতে আরম্ভ করেছে। আপনার জানটা অকারণে খুশ হয়ে যাবে, গায়ের পড়ে বলবেন, 'এক কাপ চা হবে ভারি।'

পাঞ্জাবীদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড়িসার, এদের হুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে দুবার করে প্রেস করিয়ে ব-তরিবত পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনও সেই মাদ্রাসার আমলের শাড়ি ব্লাউজ পরে, পেট-কাটা একবিঘতী কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা কেলে এরা গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ও কে' 'নো কে' বলতে শিখলে না—এরাই বাঙালী।

দিল্লির লোক একদা মাংস রুটি খেত; এখনও তারা রুটি মাংসই খায়। শুনেছি বাঙালীরা নাকি এককালে মাছ-ভাত খেত। ঠিক বলতে পারব না, এখনও খায় কি না। রেশনে যে-বস্তু পাওয়া যায়, তাকে চাল বলে তারা তাদের বাপ-পিতেমোর খাওয়া চালকে অসম্মান করতে চায় না। এই কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ কিছু মাছ ধরা পড়াতে বাঙালী উদ্বাহ হয়ে যে-নৃত্যটা দেখালে, তাতে মনে হল—আমি দিল্লিতে বসে 'আনন্দবাজারে' পড়েছিলুম—যেন স্বয়ং উর্বশী স্বর্গ থেকে সুধাভাও নিয়ে বাংলা দেশে অবতীর্ণ হয়েছেন! ছেলেবেলায় দেখেছি, উদ্ভৃত্ত মাছ পচিয়ে পোড়বার জন্ত তেল আর ক্ষেতে দেবার জন্ত সার তৈরি করা হয়েছে। যারা এসব করেছেন, তাঁরাও বাঙালী, এরাও বাঙালী।

এককালে এ-দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই সংস্কৃত জানতেন কিংবা আরবী-ফার্সী জানতেন। উনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠল, যার তুলনা ভারতের অগ্র কোনও প্রদেশে নেই—সে এমারত গড়াতে চুনহুকি যোগালে সংস্কৃত এবং কিছুটা আরবী-ফার্সী, আজ সে-সোঁধের স্তম্ভ তোরণ দেখে বাঙালী মুগ্ধ, কিন্তু শুনতে পাই ছ'মুঠো অম্লের জন্ত সে আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে একথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অমৃতভব করে, খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (রাষ্ট্রভাষার গীর্থাভূমিতে সংস্কৃতচর্চার জন্ত চেলাচেলি হয়, কিন্তু কেউ গা করে না।)

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালী।

তবুও এই বাঙলা দেশ।

এখনও খুলো কমে নি, সে-খুলো এখনও লাল, পুরোপুরি বাঙলা দেশ এখনও আরম্ভ হয় নি।

হঠাৎ দেখি লাইনের পাশে পুকুর ডরে রক্তপদ্ম ফুটেছে। সবুজ বাঁশবনের মাঝখানে ছোট্ট পুকুরটি—কৃষ্ণনীরে রক্ত-সরোজিনী! দিল্লির নিজাম-প্রাসাদের শাল গোলাপের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কণেকের তরে বৃকটা হ্যাঁত করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ল, তরুণ বয়সে যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলুম, তখন প্রথম দর্শনেই এরা আমার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে নিয়ে বসেছিল। শরৎ হেমন্ত, এমন কী, বেশ শীত পড়ার পরও কত দূর পুকুরে পদ্মের সন্ধানে গিয়েছি, কখনও ফিরেছি একটি মাত্র পদ্ম নিয়ে, হাতে ধরে ঘুরিয়ে কিরিয়ে দেখতে দেখতে, কখনও বা এক আঁটি বগলে করে। প্রিয়জনকে বলিয়েছি হাসিমুখে, লোভীজন জোর করে কিছুটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছে, কণেকের তরে ফুল হয়েছি, কিন্তু বিরক্ত হই নি। ঘরে এসে কলসীতে তাদের জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি যতদিন পারা যায়। তারপর তারা একে একে শুকনো মুখে বিদায় নিয়েছে—আজ সকালে একজন, কাল সকালে দুজন। বৃকে লেগেছে, মনে ভেবেছি, আর পদ্ম আনতে যাব না, আনলেও সব-কিছু বিলিয়ে দেব, ঘরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা কি মনে রাখা সোজা? একেই তো জ্ঞানীর নাম দিয়েছেন শ্মশান-বৈরাগ্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে মানুষ আবার কিছুদিন পরে বিয়ে করে সংসার পাতে, আবার বিরহ-বেদনা, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আমিও শ্মশান-বৈরাগ্য ভুলে গিয়ে নতুন করে সংসার পেতেছি, আবার তাদের বিদায়-বেদনার স্নান মৃদু গন্ধে বিধূর হয়েছি।

কিন্তু ওই যে লোকে বলে, মার খেতে খেতে মানুষ শক্ত হয়, কই, আমি তো হতে পারলুম না।

তারপর কত দেশ-বিদেশে ঘুরেছি। নরগিস দেখেছি, দায়ুদী কিনেছি, গিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বৃকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি, কিন্তু কখনও বেলীকর্ণের জন্ত ভুলে থাকতে পারি নি আমার রক্তপদ্মকে।

বিদেশী বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেছেন মতামত! আমি তাদের ফুলের অকুণ্ঠ প্রশংসা গেয়ে শেবটায় বলেছি, কিন্তু আমাদের পদ্ম ভারি চমৎকার ফুল। এক বন্ধু তখন মৃদু হেসে বলেছিলেন, ‘এ-লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে রেখে।’

এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।

জয় মা, গন্ধে,
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে ।

সুকুমার রায়

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি ।

আঙিনা পেরুতে-না-পেরুতেই একখানা খাসা নেমস্তম্ভ পেয়ে গেলুম ।

এলগিন রোড অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে ‘হরবোলা’ নাম দিয়ে একটি দল গড়েছে । এদের উদ্দেশ্য হাস্তরসের উত্তম উত্তম পালার অভিনয় করে বাঙালীর হৃদয়ে তার লুপ্তপ্রায় হাস্তরসকে আবার বইয়ে দেওয়া । হরবোলার প্রযোজকদেরা ভাষায় বলি, ‘হাসতে ভুলে গেছি বলে দুর্নাম আছে আমাদের (বাঙালীর) ।’ সুকুমার রায়কে কেন্দ্র করে সেই দুর্নাম কিছুটা যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলেই এই উদ্যোগ সার্থক হবে ।’ হরবোলা নেমস্তম্ভ করেছেন, তাঁদের প্রথমা পালা দেখতে ।

সুকুমার রায় যে বাঙলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্তরসিক সে-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না । তাঁরই রচিত ‘লক্ষণের শক্তিশেল’ বেছে নিয়ে হরবোলা আপন রুচি ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ।

‘সকের থিয়েটার’, তার উপর হরবোলার অধিকাংশ সদস্য অভিনয় করতে নেমেছেন, গান ধরতে শুরু করেছেন জীবনে এই প্রথম, কাজেই পালা এবং তার বন্দোবস্তে যে দোষত্রুটি থাকবে সেটা আগের থেকেই বলা যেতে পারে, কিন্তু দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরা যে রসস্থিতি করতে পেরেছেন, সেইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা ।

আমি কিন্তু একটা ধোঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম ।

সিরিয়স নাট্য কী-ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে, কিন্তু যে নাট্য নূলে হাস্তরসে টাইটসুর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে ? বিশেষ করে সুকুমার রায়ের পালা, যেখানে প্রতি ছত্রে, না, প্রতি শব্দে রস আর রস । নট যদি সেখানে তার অভিনয় নিয়ে সে-রস শুধু প্রকাশই করেন, তবে ত আর কোন হাকামা থাকে না, কিন্তু যদি সে রস প্রকাশ করতে গিয়ে নট সেখানে ‘থিয়েটারি’ (অর্থাৎ করুণকে করুণতর, বীরকে বীরতর, হাস্তরসধনকে ঘনতর) করে ফেলেন, তা হলে সেটা চপলতায় পরিণত হয় । সুকুমার রায়ের রচনা হাস্তরসে এতই কান্নার কান্নার ভরা যে, তাতে কোনও

কিছুই যোগ দিতে গেলোই, তা সে আজিকের মাজাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক, রস নষ্ট হয়ে যায় এবং রসিকতা তখন প্রগল্ভতা হয়ে যায়।

এই বিপদে না পড়ার জন্যই বাস্তব কীটন হামেশাই প্যাটার মত মুখ করে হাতরসের অভিনয় করতেন, কিন্তু চার্লি চেপলেন তাঁর অভিনয়ে ষংক্খিৎ ‘বিয়োরি’ এনে হাতরসকে আরও জম-জমাট ভর-ভরাট করে তোলেন, কিন্তু এ দুজনেরই সমস্ত হরবোলা সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক সহজ। এঁদের রসিকতা ঘটনা কিংবা অ্যাকশান নিয়ে—কেউ কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়লেন, কেউ ‘পিয়া মিলন কো’ গিয়ে ষাণ্ডার জীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়লেন, কাজেই তাঁর অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু হুকুমার রায়ের রসিকতা হৃদয়তর, হাতরসের জগতে হৃদয়তম বললেই ঠিক বলা হয়, সে-রসিকতা প্রধানত ভাষার এবং ভাষা ছাড়িয়ে ব্যঙ্গনায়। অভিনয়ের ভিতর দিকে তাকে বাহু রূপ দেওয়া, চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা (একসটেরিয়োরাইজ করা) ত সহজ কর্ম নয়। করিই বা কি প্রকারে? বাস্তব কীটনের মত প্যাটা-চণ্ডে, না চার্লির মত একটুখানি রসিয়ে?

এই হল আমার ধোঁকা।

‘হরবোলা’ সম্প্রদায়ের মস্ত একটা সুবিধে, তাঁরা ‘সকের দল’ গড়েছেন। কাজেই তাঁরা একসপেরিমেন্ট করতে ভয় পাবেন না জানি, সেই আমার ভরসা। আজিক নিয়ে ধোঁকা থাকলেও এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সে-আজিক ব্যবহাবে অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রচুর সফলতা অর্জন করেছেন। সুতবাং তাঁরা যদি হুকুমার রায়ের আসছে পালা কীটন-আজিকে করে দেখেন তবে মন্দ হয় না। এই ধবনের এক্সপেরিমেন্ট করে করেই শেষটায় পরিষ্কার হয়ে যাবে ঠিক কোন্ আজিক হুকুমার রায়ের হাতরসকে রক্তমঞ্চে কণায়িত করার উপযুক্ত।

‘শক্তিশেল’-এর সঙ্গীতের পরিচালনার ভাব নিয়েছিলেন আমার জনৈক বন্ধু, ওস্তাদ কৈয়জ খানের শিষ্য। আমি তাঁর অঙ্ক ভক্ত, কাজেই এখানে তাঁর সঙ্গীত-পরিচালনার গুণাগুণ যদি আমি বিচার না করি, তবে আশা করি তিনি অপবাদ নেবেন না।

শেষ কথা, কর্মকর্তাগণ অভ্যাগত-অতিথিদের প্রচুর খাতির-বস্তু করেন। শুধু লৌকিকতা বা মুখের কথা নয়, আমি সর্বান্তঃকরণে ‘হরবোলা’র হরবকৎ হরেক-রকমের উন্নতি কামনা করি।

সুকুমার রায়ের মত হান্তরসিক বাঙলা সাহিত্যে আর নেই সে-কথা রসিকজন
মাজেই স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-কথা অল্প লোকেই জানেন যে, তাঁর জুড়ি
করাসী, ইংরেজী, জার্মান সাহিত্যেও নেই, রাশানে আছে বলে শুনি নি। এ-কথাটা
আমাকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে হল, কারণ আমি বহু অহুসন্ধান করার পর
এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

একমাত্র জার্মান সাহিত্যের ভিলহেল্ম বুশ সুকুমারের সমগোত্রীয়—স্ব-শ্রেণী না
হলেও। ঠিক সুকুমারের মত তিনিও অল্প কয়েকটি আঁচড় কেটে খাসা ছবি
ওতরাতে পারতেন। তাই তিনিও সুকুমারের মত আপন লেখার ইলাস্ট্রেশন
নিজেই করেছেন। বুশের লেখা ও ছবি যে ইয়োরোপে অভূতপূর্ব সে-কথা
‘চন্দ্রা’ ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।

বুশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তকাত এই যে, বুশ বেশীর ভাগই ঘটনা-বহুল
গল্প ছড়ায় বলে গিয়েছেন এবং সে-কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু সুকুমার রায়ের
বহু ছড়া নিছক ‘আবোল-তাবোল’, তাতে গল্প নেই, ঘটনা নেই, কিছুই নেই—
আছে শুধু মজা আর হাসি। বিস্তৃত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে-বকম শুধুমাত্র ধ্বনির
উপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিয়ে গীত বানাতে হয় না, ঠিক তেমনি
সুকুমার রায়ের বহু বহু ছড়া শ্রেণক হান্তরস, তাতে আ্যকশান নেই, গল্প নেই
অর্থ্যাৎ আর-কোন দ্বিতীয় বস্তুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই। এ বড়
কঠিন কর্ম। এ-কর্ম তিনিই করতে পারেন, যার বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এ-
জিনিস অভ্যাসের জিনিস নয়, ঘষে মেজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ-বস্তু
হয় না।

বুশ আর সুকুমারের শেষ মিল, এদের অহুকরণ করা বার্থ চেষ্টা জার্মান
কিংবা বাংলায় কেউ কখনও করেন নি, এঁদের ছাড়িয়ে যাবার ত কথাই
ওঠে না।

একদা প্যারিস শহরে আমি, কয়েকজন হান্তরসিকের কাছে ‘বোম্বার্ডের
রাজা’র অহুবাদ করে শোনাই—অবশ্য আমসম্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে
বলতে হয়েছিল (তাতে করে কিঞ্চিং রসভঙ্গ হয়েছিল অস্বীকার করি নে)
এবং ‘আলতা’র বদলে আমি লিপটিক ব্যবহার করেছিলুম (আমার ঠোটে কিংবা
চোখে নয়—অহুবাদে)।

করাসী কাকেতে লোকে হো-হো করে হাসে না, এটিকেটে বারণ, কিন্তু
আমার সঙ্গীতের হাসির হদ্রাতে আমি পক্ষান্ত বিচলিত হয়ে তাঁদের হাসি বন্ধ
করতে বার বার অহুরোধ করেছিলুম। কিছুতেই ধামেন না। শেষটা বলায়,

তোমরা যেভাবে হাসছ, তাতে লোকে ভাববে, আমি বিদেশী পাড়ল, বেকাঁস কিছু একটা বলে ফেলেছি আর তোমরা আমাকে নিয়ে হাসছ—আমার বড় লজ্জা করছে।' তখন তাঁরা দয়া করে থামলেন, ওদিকে আর পাঁচজন আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল বলে আমি ত ঘেমে কাঁই।

তারপর একজন বললেন, 'এরকম weird, ছন্নছাড়া, ছিটছিট করা কর্মের কিরিস্তি আমি জীবনে কখনও শুনি নি।'

আরেকজন বললেন, 'ঠিক। এবার একটা চেষ্টা দেওয়া যাক, এ লিস্টে আর কিছু জুতসই বাড়ানো যায় কি না।'

সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধবে আকাশপাতাল হাতড়ালুম, দু-একজন একটা দুটো অদ্ভুত কর্মের নামও করলেন, কিন্তু আব সবাই সেগুলো পত্রপাঠ ভিসমিস করে দিলেন। আমরা জন পাঁচ প্রাণী প্রায় আধ ঘণ্টা ধন্যবাদ কয়েও একটা মাত্র জুতসই এপেন্ডিক্স পেলুম না। গোটা কবিতার ত প্রায়ই ওঠে না।

আগেব থেকেই জানতুম, কিন্তু সেদিন আবাব নূতন করে উপলব্ধি করলুম, যদিও স্কুমার রায় স্বয়ং বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়', যে-জগতে স্কুমার বিচরণ করতেন, সেখানে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সিগনেট প্রেস স্কুমার রায়কে পুনরায় বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন বলে বাংলার ভিতরে বাইরে বহু লোক ওই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। আমাব বাসনা, সিগনেট যত শীঘ্র পারেন স্কুমার রায়ের অগ্রাগ্র গল্প পঞ্চ লেখা যেন পুনরায় প্রকাশ করেন। বহু অতুলনীয় অনবদ্য অভূতপূর্ব লেখা 'সন্দেশ'-এর ফাইলে চাপা পড়ে আছে। 'পাগলা দাঁত'কে পেয়ে যেন লণ্ড লস্ট ব্রাদারকে পাওয়াব আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরেছি, কিন্তু তার আর সব ভাই-বেরাদররা কোথায়? তারা যেন আর বেশীদিন আত্মগোপন না করে।

দু-একটি অসাবধানতা লক্ষ্য করেছি, তারই একটা এ-স্থলে নিবেদন করি।-

'খাই-খাই' কাব্যের 'পরিবেশন' কবিতায় আশুবাণ্য দেখছি—

'কোনো চাচা অল্পপ্রায় ('মাইনাস' কুড়ি)

ছড়ায় ছোলায় ভাল পঞ্চষাট জুড়ি।

মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি

"কারো কিছু চাই" বলি তড়বড় দুটি

বীরোচিত বীর পদে এসে দেখি ত্রস্তে

ওই দিকে খালি পাড়, চল হাঁড়ি হস্তে '

অথচ আমার অধবিশ্রান্ত শ্রমশক্তি বলেছে :—

‘কোনো চাচা অল্পপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)

ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।

মাতব্বর যায় দেখ মুদি চক্ষু দুটি

“কারো কিছু চাই” বলে’ তড়বড় ছুটি।

হঠাৎ ডালের পাকৈ পদার্পণ মাঝে

হুড়মুড়ি পড়ে কারো নিরামিষ পায়ে।

বীরোচিত ধীরপদে’

—ইত্যাদি ইত্যাদি

‘হঠাৎ ডালের পাকৈ’ ইত্যাদি লাইন দুটো বাদ পড়াতে অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

কিন্তু থাক, আর না। স্বকুমার রায় বলেছেন :

‘বেশ বলেছ, ঢের বলেছ

ঐথেনে দাও দাঁড়ি,

হাটেব মাঝে ভাঙবে কেন

বিত্তে বোঝাই হাঁড়ি ॥’

ভাষার জমা-খরচ

পূব-বাংলার বিস্তার নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের সংখ্যা এক লপ্তে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেও পূব-বাংলার উপভাষা দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনাত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোন কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো কায়দা এখনও কোন লেখক ওঠান নি। পূব-বাংলার লেখকেরা ভাবেন, ‘ক’রে’ শব্দকে ‘কইরা’ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি হুঁচকার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা ইন্ডিয়মে—অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে-ইন্ডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পূব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারেন। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টকর দিতে গিয়ে যদি গরিব-দার প্রাণ ভরে গিয়ে

অবশ্যে বলে, ‘হাতির সঙ্গে পাতি খেলতার গেছলার কেন?’ অর্থাৎ ‘হাতির সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?’ কিন্তু পাতিখেলা যে Polo খেলা সে-কথা বাংলা দেশের কম লোকই জানেন, (চলন্তিকা এবং জানেক্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ-ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওতরাবে না। আবার,

‘দুট্টলোকের মিষ্ট কথা,

দিঘল-ঘোমটা নারী

পানার তলার শীতল জল।

তিনই মন্দকারী।’

‘কামুদ্রাজ’ বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পূব, পশ্চিম কোন বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙালি সভ্যতায় আরেকটি মহদগুণ আছে এবং এ-গুণটি ঢাকা শহরের ‘কুট্টি’ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পূব-বাংলা এবং পশ্চিম-বাংলাবও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রস-পটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা ‘নাগরিক’—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম, অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়ত বা কিঞ্চিং ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আগ্রা, বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখনউ, দিল্লিতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুবসিক। কিন্তু এদেব সবাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির আছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাকশূন্য করা, কার্সী এবং উদ্বৃতি যাকে বলে ‘হাজিব-জবাব’) এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরশূ ধারার স্ত্রায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলব, কুট্টির সঙ্গে ফস করে মস্করা না করতে যাওয়াটাই বিবেচকের কর্ম।

প্রথম তা হলে একটি সর্বজন-পরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুণ্ধতী-স্ত্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রায় অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজীতে এই পদ্যভেদেই ‘ক্রম স্কলকম টু দি ওয়াইড ওয়ার্ল্ড’ বলে)

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিমবাংলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

রাষ্ট্রী, ‘সকলকে যেতে বৃত্ত নেবে।’

কুটি গাড়োয়ান, 'এমনিতে ত দেড় টাকা, কিন্তু কর্তার জন্ত এক টাকাতাই হবে।'

যাকী, 'বল কী হে? ছ আনায় হবে না?'

কুটি, 'আন্তে কন, কর্তা, ঘোড়ায় গুনলে হাসবে।'

এর জুতসই উত্তর আমি এখনও খুঁজে পাই নি।

মোটাই ভাববেন না যে, এ-জাতীয় রসিকতা মাদ্রাসার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুটির সেগুলো ভাঙিয়ে থাকছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজবামর, কিন্তু কুটি হামেশাই চেষ্টা করে নতুন নতুন পবিবেশে নতুন নতুন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতো ঘোড়দোড় চালু হল তখন এক কুটি গিয়ে যে-ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কী ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সন্ধ্যার শেষে এল?'

কুটি হেসে বললে, 'কন কী কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া ত নয়, বাঘের বাচ্চা, বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড় করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথী, অপটিমিজম।'

কিংবা, আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ-যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাঞ্জায় পড়ে ঢাকার লোকও মনিং স্টুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্ত এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স-কোট বানাতো। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌কালো, তছপরি তিনি হাড়কিপটে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আলপাকা দেখলেন, কোনও কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না, অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। দোকানী শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সত্বপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্ত খামকা পয়সা খরচা করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকুর উপর ছটা বোতাম, আর দু হাতে কজির কাছে তিনটে তিনটে করে ছোট বোতাম লাগিয়ে নিন। খালা প্রিন্স-কোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অহুসঙ্কান না করে বাথরখানী (বাকির-খানি) কটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমীর আলী অ্যাভিনিউতেই অসংখ্য আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাথর-খানী লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা, কুটির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাথরখানীর মতই পশ্চিম-বাংলায় ছড়িয়ে

পড়বে এবং তার সূতনকে মুদ্রা হয়ে কোন কৃতি লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিশিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্দায় তুলে দেবেন—পরশুরাম যে-রকম পশ্চিমবাংলার নানা হাঙ্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হতোম যে-রকম একলা কলকাতার নিতান্ত ককনিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে, কিন্তু খরচের দিকে, একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে-ভাষা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পূব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাতাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা ‘ম্যাণ্ড’ বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এস্তার, ইলাহি, বেলেলা, বেহেড, দো গেডের চ্যাং এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পূব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য যদি বক্তা সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁক-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে কেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রামবাজারের রক্-আড্ডাতে পূব-বাঙালীর সংখ্যা থাকত অতিশয় নগণ্য। তাই শ্রামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়। নয়। বাক্য-ভঙ্গী বানাতেন যে, রসিকজনই বাহবা শাশাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পূব-বাংলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাতাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দ-বিশ্রাস-ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়ত এঁরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনও ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জম-জমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পূব-বাংলার সদস্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাতাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলো ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো তুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্র ভাষার স্থান পেয়ে শেষটার অভিধানে উঠবে, উঠে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাতাই চমৎকার বাংলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সারোবী ইউল পড়েছিলেন বলে বাংলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল তাঁদের তাকবধুর। তাই এঁরা বলতেন

ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাংলা এবং সে-বাংলা যে কত মধুর এবং বলয়লে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন ধারা সে-বাংলা শুনেছেন। ক্রীক রোর ময়খ দস্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। ময়খদা যে-বাংলা বলতেন তার উপর বাংলা সাহিত্যের বা পূর্ব-বাংলার কথা ভাবার কোনও ছাপ কখনও পড়ে নি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতুম আর ময়খদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্ত-মনস্ক হলে বলতেন, ‘ও পরান, ঘুমুলে?’ ময়খদার কাছ থেকে এ-অধম এস্তার বাংলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালীই চেনেন। এঁর নাম গাজুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সূরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু, এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের এক দিক দিয়ে গোক টোক'নো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে জলতরঙ্গের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্, টাবালাপ্ করে, গাজুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতো-গুতো কটাকট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ-গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিপাটি হয় নি?

হায়, এ-শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবুও এখনও আমার শেষ ভরসা শ্রামবাজারের উপর।

দর্শনচর্চা

মাদ্রাজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রগণের এক সভায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলেন, ‘প্রাচীনকালে চরম ও পরম সত্যের অন্বেষণের জন্তু ঐহারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, তাঁহারা ইহাকে কেবল বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবপর বলিয়াই মনে করতেন না, তাঁহারা ইহাকে অতিশয় প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে পরবর্তী কালে দার্শনিকগণ যে-সমস্ত কথা লিখিলেন তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত সে-সমস্ত কথা একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ম্যতীত আর কিছুই হইল না।’

ঠিক এই উক্তিটিই আজকাল নানা গুণী জ্ঞানীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় বলে এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিকাল মূল্য ছিল, এখন আর নেই ; এখন দার্শনিকদের কেতাবে শুধু শব্দ আর শব্দ, এই হল রাজাজীর মূল বস্তুবা।

এককালে ‘ক’ ছিল এখন ‘খ’ হয়ে গিয়েছে, সে-কথা কেউ বললেই দার্শনিকরা তার জবাবে বলেন, কারণ বিনা কার্য হয় না, অতএব দেখিতে হবে দর্শনের বাস্তব মূল্য হঠাৎ উবে গেল কেন।

এ-কথা যদি প্রমাণ করা যায় যে, দার্শনিকেরা আস্তে আস্তে চরম ও পরম সত্যের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে একদিন অসত্যের সন্ধান লেগে গেলেন তা হলে অবশ্য এটা অসম্ভব নয় যে, সেই কারণেই তাদের পুস্তকারাজি আজ অবোধ্য হয়ে উঠেছে ; কিন্তু এযাবৎ, কি এদেশে, কি বিদেশে, কেউ ত দার্শনিকদের এ-রকম সন্দেহের চোখে কখনও দেখে নি। বরঞ্চ বেশ জোর দিয়ে বলতে হবে, সত্য দার্শনিক চরম সত্য ছাড়া অল্প কোনও জিনিসের সন্ধান কখনও করে নি— ধান্নাবাজি জাল-জোচ্চুরি করার ক্ষমতা যার আছে, সে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে মন দেবে কেন, এসব ত কবে অল্প লোকেরা। এই দার্শনিকই তাই হুঃখ করে বলেছেন,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যা কিম্
প্রয়োজনম।

অর্থাৎ যে প্রতারণা করতে জানে তার বিদ্যার কি প্রয়োজন। তারপরই তিনি আবার বলেছেন ঠিক ওই একই বাক্য,

প্রতারণাসমর্থজনে বিদ্যা কিম্
প্রয়োজনম।

কিন্তু এবারে প্রতারণাসমর্থ শব্দের সন্ধি ভাঙতে হবে প্রতারণা+অসমর্থ দিয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্রতারণা না করতে জান তবে বিদ্যা নিয়ে তোমার কী কাজ হবে ?

তাই বিদ্যা বিদ্যারই জগৎ, দর্শন দর্শনেরই জগৎ, অর্থাৎ সত্যাসুসন্ধান সত্যাসু-সন্ধানেরই জগৎ। সত্য নিরূপিত হলে সেটা যদি তোমার আমার কাজে না লাগে তবে সত্যের সেটা দোষ নয়। শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি মশারির পেরেক ঠোকা না যায় তবে সেটা শিবলিঙ্গের দোষ নয়।

মাহুষ কোনও যুগেই সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পায় নি—পেয়ে থাকলে তার আর অবনতি উন্নতি কিছুই হত না। সম্পূর্ণ সত্য ভগবানের হাতে, মাহুষের কাজ,

হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা সেই সত্যের যতদূর সম্ভব কাছে পৌঁছানোর। তাই করতে গিয়ে তার প্রচেষ্টার ফল যদি অবাস্তব (ইমপ্র্যাকটিকাল) হয় তবু তাকে সত্যেরই সন্ধান করতে হবে।

এ-স্থলে আর একটি কথা ওঠে। সত্য নিরূপিত হলে তাকে কাজে লাগাবার ভার কার হাতে? এখানে বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এটম বম্ব বানাবার শূন্যটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন তারপর এটম বম্ব বানানো হবে কি না এবং হলে পর সেটা হিরোসিমার মাথায় ফাটানো হবে কিনা সেটা স্থির করেন রাজনৈতিকরা, সমাজপতিরা, জাদুঘরলরা। তাঁরা যদি না চান, তবে বৈজ্ঞানিকদের সাধ্য নেই যে, তাঁরা এটম বম্ব হাতে নিয়ে ভুবনময় দাবড়ে বেড়াবেন। এবং শেষ পর্যন্ত এটা বানানো হোক আর নাই হোক, এটম বম্ব ভাল কাজে লাগুক আর মন্দ কাজেই লাগুক, এটম বম্ব তৈরি করার পিছনে যে বৈজ্ঞানিক সত্য শূন্য আবিষ্কৃত হল সেটা সত্যই থেকে যাবে।

কিন্তু এগুলো হল আংশিক সত্য—বৈজ্ঞানিকের সন্ধানের আদর্শ। দার্শনিক সন্ধান করেন চরম সত্যের। সে-সত্য কখনও কারও অমঙ্গল করতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যাহা সত্য তাহাই শিব এবং তাহাই হৃন্দর। এই তিনের চরম রূপ কখনই একে অগ্ৰকে আঘাত করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বেলা যে-রকম, দার্শনিক-সত্যের বেলাও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক, সমাজবিদ্ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন দার্শনিক-সত্যের কতখানি মানব-সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজাজী দার্শনিকদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘আধুনিক যুগের দার্শনিকগণের আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী। এই সংশয় ধর্মবিশ্বাসের স্থান অধিকার করিয়াছে।’ যদি বা এ-মন্তব্য স্বীকার করে নিই, তবু আবার বলতে হবে, সংশয়বাদ ধর্মের আসন কেড়ে নেবে কিনা সে-কথা স্থির করবেন সমাজপতিরা। দার্শনিকেরা সত্য নিরূপণ করাটাই তাঁদের চরম স্বধর্ম বলে বিশ্বাস করেন, সে-নিরূপণ সমাজে কী স্থান নেবে, সে সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন।

এককালে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সর্ব কলা-শিল্প ধর্মের সেবা করত। ছবি আঁকা হত দেবদেবীর, গান গাওয়া হত দেবদেবীর, নৃত্য করা হত দেবতার সামনে। আজ নন্দলাল দেবদেবীর ছবি আঁকেন, আবার খোয়াইডাঙারও ছবি আঁকেন (এবং নন্দলালও খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের ছায়া সম্পূর্ণ উদাসীন যে, লোকে তাঁর দেবদেবীর ছবিকে পূজো করছে কি না, তিনি হৃন্দরের রূপ দ্বিগ্নেই আনন্দিত), রবীন্দ্রনাথ রচেন শত শত বর্ষার গান, উদয়শঙ্করের আপন

রচা সার্থক নৃত্যের বেশীর ভাগ সামাজিক সমস্যাতে কেন্দ্র করে। তাই বলে আজ কি কেউ এ-অপবাদ দেয় যে, এদের কলা-সৃষ্টি প্রাচ্যকালিক নয়, রবীন্দ্রনাথের গান ‘একত্র গ্রথিত কতকগুলি কথার মালা ব্যতীত আর কিছুই নয়’, উদয়শঙ্করের নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিস্তার!

মোক্ষা কথা এই, যারা ‘ধর্মপ্রাণ’ তাঁরা এঁদের সৃষ্টিকর্ম, বৈজ্ঞানিকের তথ্য, দার্শনিকের সত্য, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।

কেন পারছেন না, এ-প্রশ্ন যদি কেউ শুধায় তবে অপ্রিয় সত্য বলতে হবে, এবং আজ যখন অপ্রিয় সত্য দিয়েই তথ্যলোচনা আরম্ভ করেছি তবে সেই আলাপই এখন তালে চলে আহুক। আসল কথা হচ্ছে এই, আজ যারা ‘হা ধর্ম হা ধর্ম’ করেন, তাঁদের অধিকাংশই (রাজাজীর কথা বলছি নে, তিনি সত্যিই ধর্মপ্রাণ কি না সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই) ধর্মে একনিষ্ঠ নন। স্বধর্মে, সত্য ধর্মে, সনাতন ধর্মে যদি তাঁদের শ্রদ্ধা ঐকান্তিক এবং অবিচল হত তবে তাঁরা আজ দার্শনিককে, কাল বৈজ্ঞানিককে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ নামে অভিহিত করতেন না।

কিন্তু আমি কে? আমার ছোট মুখে বড় কথা কেন?

অতএব সে আপ্ত-বাক্য সন্ধান করে, এক ঋষির বচন উদ্ধৃত করে তাঁরই পশ্চাতে আশ্রয় নিই

সে ঋষি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর মত ধর্মনিষ্ঠ ঋষি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছেন অতি কম। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এরকম ভগবৎপ্রেমিক আমি আমার জীবনে অল্পই দেখেছি।

তিনি লিখেছেন,

‘একটা জন্মন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিকর্মী লোকের একটা বাস্তবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধূয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অস্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেকে না। এইরূপ জন্মন শুনিলে আমাদের হাসি পায়, কান্না ও হাসি পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি তোমার এতই প্রিয়বস্তু, তবে তার পথ অবলম্বন কর—জন্মন কেন? একেলে সভ্যতা ত আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর

(জিটোরিয়া) এমন কোনও শক্ত রাজা নেই যে ‘কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছে কি আর অমনি তাহার শির লইবে’। বৈরাগ্য ত আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা হুলুড় ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্লভ হইয়াছে। বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র; আর অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিশ ঘণ্টা সংসারকাণ্ডে ঘোল আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কাঞ্চি হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য; দেখিতেছ না—একটা কেরানীগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি এ, এম এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ছায়া আপিস অকলে গতায়িত করিতে থাকে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোন কর্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্তব্য সাধনের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না—মনের স্বর বাঁধা; সেতারের স্বর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের স্বর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্বাহ করা যাইতে পারে।’ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নানা চিন্তা, সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রবন্ধ, পৃ ১—২, বিশ্বভারতী)।

এই উদ্ধৃতিতে যেখানে যেখানে ‘বৈরাগ্য’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে ‘ধর্ম’ শব্দ ব্যবহার করলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে ॥

লেসে ফ্যের

নৃতত্ত্ববিদের কৈলাস, কৈলাস পর্বতে নয়, তাঁদের স্বর্গ আসামের পর্বতে। এ-কথা ভূ-ভারতের তাবৎ নৃতত্ত্ববিদ উত্তমরূপে জানেন বলেই আসামে আসবার জগ্গ তাঁদের ছোকছোকের অন্ত ছিল না। কিন্তু ইংরেজ তখন আসামের ম্যানেজার, কাজেই ব্যাপারটা ঠাড়াল ইংরেজী প্রবাদে যাকে বলে ‘ডগ্ ইন্ দি মেঞ্জার’ নয় ‘ডগ্ অ্যাণ্ড দি ম্যানেজার’। ইংরেজ নিজে অমূল্য পার্বত্যজাতির ভিতর বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর করত না, অল্প উৎসাহী পণ্ডিতকেও তাদের সঙ্গে মিশতে দিত না।

ইংরেজ কখনিকালেও কোনও প্রকারের জ্ঞানচর্চা করে নি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ওই কর্ম সে করেছে রাজ্যবিস্তার এবং আত্মশক্তিক ধন্যজনের

বহু পূর্বে। নৃত্য এবং সমাজতত্ত্বের যখন প্রচার এবং প্রসার হল, টাকার গরমিতে ইংরেজ তখন 'কোনও প্রভু হস্তীদেহ ভূঁড়িখানা ভারী'গোছ হয়ে গিয়েছেন, মা-সরস্বতীর পিছনে আসামের বনে-বাদাড়ে ঘোরার মত গতি আর তাঁর গায়ে নেই। যে দু-চারখানা বই ইংরেজ আসামের অল্পমত সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে লিখেছে সেগুলো প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা—নৃত্যের নব নব তত্ত্বাবিকাশের দৃষ্টিবিন্দুর সম্মান এ-কেতাবগুলোতে পাবেন না।

কিন্তু জানা-অজানায় ইংরেজ এদের অনেকের সর্বনাশ করে দিয়ে গিয়েছে, এদের ভিতর মিশনারিদের ঘোরাঘুরি এবং বসবাস করতে দিয়ে।

খ্রীষ্টধর্ম অতি উত্তম ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কোনও ধর্ম থেকেই সে নিকৃষ্ট নয়। কোটি কোটি লোক শত শত বৎসর ধরে খ্রীষ্টের বাণী থেকে নব নব আদর্শের অমূল্য প্রেরণা পেয়েছে, খ্রীষ্টের অমূল্য করণ করে বহু সাধুসন্ত ভগবানের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের দেখে সংশয়বাদীরা বলেছেন, ভগবান আছেন কি না জানি নে কিন্তু যদি থাকেন তবে তাঁর স্বরূপ এঁদেরই মত।

কিন্তু সেই মহান ধর্ম প্রচারের ভার যদি অজ্ঞের হাতে পড়ে তবে তার ফল বিষময় হয়। কারণ সে তখন খ্রীষ্টের নামে যে-বাণী প্রচার করে সে উচাটন শয়তানের।

আসামের সব মিশনারি যে শয়তান ছিলেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অজ্ঞের স্বার্থে শয়তান ভর করে যে কী কুকর্ম করতে পারে সে-তত্ত্ব হজরৎ মুহম্মদ (দঃ) জানতেন বলেই বলেছেন,

মুখের উপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানীর নিজা শ্রেয়ঃ।

যে-মিশনারি এসে আসামের বনেব ভিতর বাসা বাঁধল তার বাংলা দেখে আমরা দূরের থেকে মুগ্ধ হই। অনেকটা যেন—

‘ওই যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,

সিন্ধু গাছের তলাটিতে,

পাচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি

ওই যে রেলের কাছে,

ইন্টেলনের বাবু থাকে,

আহা এরা কেমন সুখে আছে॥’

টিলার উপর ফুটফুটে বাংলা, চতুর্দিকে ফুলের কেয়ারি, বকবক তকতকে বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল সাজানো—মনে হয়, আহা, পাদরী কেমন সুখে আছে।

যাদের ভিতর পাদরী সাহেব ক্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছেন, তাদের তুলনায় তিনি আছেন অনেক সুখে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু বিলেতের যে-কোনও মজুরের বাড়ি পাদরীর বাসার চেয়ে অনেক বেশী আরামদায়ক, মজুর পাদরী সাহেবের চেয়ে খায় ভাল এবং পাদরীর সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তাকে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় স্বদেশ থেকে বহু দূরে অনাঙ্গীয়ার মাঝখানে। তাই রবীন্দ্রনাথ এদেরই একজনকে দিয়ে বলিয়েছেন,

‘আপনার জন আপনার দেশ

হয়েছি সর্বত্যাগী।

হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়

তোমার প্রেমের লাগি।

সুখসভ্যতা রমণীর প্রেম

বন্ধুর কোলাকুলি,

ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত

মাথায় লয়েছি তুলি।

এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে

মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,

চিরজীবনের সুখবন্ধন

সেই গৃহমাঝে টানে।’

কিন্তু এটা হল পাদরীর হৃদয়ের দিক। এবং বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে পাদরী আপন দেশের তুলনায় যত দৈত্তেই থাকুক না কেন, এদেশের মধ্যবিত্ত সন্তানের চেয়েও তাদের আর্থিক অবস্থা ঢের ঢের ভাল এবং চাষাভূষীদের সঙ্গে এদের কোন তুলনাই হয় না।

কিন্তু পার্থক্যটা সবচেয়ে মারাত্মক হয় যখন পাদরী পার্বত্য অহুন্নত জাতির ভিতর গিয়ে বাংলা বাঁবে।

অহুন্নত জাতি বৃষ্ণতে পারে না যে, ক্রীশ্চান হয়ে গেলেই সে পাদরী সায়েবের বাংলা ভেট পেয়ে যাবে না। পাদরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে পাদরীর বাড়ি ঘর-দোর, জামা কাপড়, বাসন-কোসন, টেবিল-চেয়ার দেখে মুগ্ধ হয় এবং এই সব জিনিস যোগাড় করার জন্য তার সরল মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু নাগা কিংবা লুসাইয়ের যা আমদানি, তা দিয়ে এসব বস্তুর কল্লাও সে করতে পারে না। কল তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

পাদরী সায়েবরা এই সর্বনাশটি করেছেন অহুন্নত জাতিদের। চোখের সামনে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে ছিমছাম স্টাণ্ডার্ড অব্ লিভিংটি তুলে ধরেছেন, সে-স্টাণ্ডার্ডে পৌঁছানোর ক্ষমতা নাগা কিংবা লুসাইয়ের কন্মিনকালেও হবে না—কিন্তু তার লেগেই থাকবে।

অন্য বাবদে এই সব অল্পমত সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ইংরেজের নীতি ছিল ‘লেসে ফ্যোর’ অর্থাৎ তাদের জীবনধারণ-পদ্ধতিতে কোনপ্রকার পরিবর্তন না আনা, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, একমাত্র নাগাদের বাদ দিয়ে আর সব অল্পমত সম্প্রদায়কে যত কম খাঁটানো যায় ততই মঙ্গল। তার কারণ এদের অনেকেই এমন শান্ত, সরল ও নির্দ্বন্দ্ব জীবন যাপন করে যে, আমাদের ‘সভ্যতা’ তাদের জীবনে নতুন কিছু ত আনবেই না, বরঞ্চ নানা প্রকারের দৈনন্দিন দুর্দশা সৃষ্টি করবে। অস্তুত একজন অতিশয় জ্ঞানবুদ্ধ ঋষিতুল্য ভারতীয়কেও আমি এই মত পোষণ করতে দেখেছি। প্রাতিশ্রুতীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয় সাঁওতালদের সঙ্গে গত শতকের শেষের দিকে। তখনও বোলপুর অঞ্চলে ধান-কল হয় নি, সেখানকার কৃত্রিম জীবন তখনও সাঁওতালদের চরিত্র নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সকল অনাড়ম্বর সাঁওতালদের জীবনধারণ-পদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন এবং আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এদের জীবনে আমরা যেন হস্তক্ষেপ না করি। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাঁওতালরা যে অহেতুক ভূতপ্রেতকে ডরায়, সেটা সারাবার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা এদের ভিতর প্রচার করলে ভাল হয়। সে-ধারণা প্রচার করার কতটুকু প্রয়োজন, গুণীরা তার বিচার করবেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম উপদেশ আমি সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছি।

আমি জানি, এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে। যারা শিক্ষালীক্ষায় বিশ্বাস করেন, মড়ক এবং অগ্ন্যাগ্নি ব্যাধি যারা নিমূল করতে চান, তাঁরা হয়ত সহজে আমাদের ‘লেসে ফ্যোর’ পন্থা মেনে নেবেন না। উত্তরে আমার নিবেদন, এই সব অল্পমত জাতির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও এত কম যে, বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এদের সম্বন্ধে আরও অনেক অহুসন্ধান করার পর বিস্তৃত ভেবে-চিন্তে কাস্ত আরম্ভ করতে হবে—অবশ্য ততদিন বৈচে থাকলে আমি তখনও আপত্তি জানাব। কারণ ধর্মের মিশনারি আর ‘সভ্যতা’র মিশনারিদের ভিতর আমি পার্থক্য দেখতে পাই অতি কম ॥

মার্কিনী তাত

মার্কিনরা হস্তে হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যদিকে তাকায় সেদিকেই কমুনিষ্ট-জুজু দেখে। দেশে যে-রকম ছেলে-ধরার জুজু দেখা দিলে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাকে-তাকে ধরে বেধড়ক মার লাগায়, অনেকটা সেই রকমই। তফাত এই যে, এদেশের কর্তাব্যক্তির এ-রকম মারধোর থেকে দূরে থাকেন, আর যতখানি পারেন জুজুর ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করেন। মার্কিন মূলকে কিন্তু কমুনিষ্ট-ডাইনী পোড়ানোর ভারটা আপন হাতে তুলে নিয়েছেন ওই দেশের কর্তাব্যক্তির।

তা তারা আপন দেশে যা খুশি করুন, আমরা রা-টি কাড়ব না। আমরা বলি—

‘হরি হে রাজা কর রাজা কর
যার ধারি তারে মার
যার ধারি চুচরখানা
তারে কর দিন-কানা
যার ধারি দু শ চার শ
তারে কর নির্বংশ
যে আমার আধলা ধারে
ব্যাটা যেন দিয়ে মরে।’

কমুনিষ্টরা আমাকে কিছুই ধারে না, তারা এখন মরুক তখন মরুক আমার কিছুটি যায় আসে না।

কিন্তু মার্কিনরা যখন এদেশে এসে দাবড়াতে থাকে, তখন আমি বিদ্রোহ করি। ভারতবর্ষের যত্রতত্র আজকাল দেখতে পাবেন মার্কিন অধ্যাপক অমুক তার তমুক ‘গণতন্ত্র’ ‘নবীন জীবনপদ্ধতি’ ‘দর্শনের নব সূত্রপাত’ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওগুলো হচ্ছে মুখোশ—যে কোন বক্তৃতায় যান, দেখতে পাবেন তিন মিনিট যেতে-না-যেতেই, দর্শন, বিজ্ঞান, কলাশিল্পের বাহানা ধরে তাঁরা ঠিক পৌঁছে গেছেন আসল মোকামে, ‘এস ভাই ভারতীয়, তোমরা আমরা সবাই মিলে রুশকে ধায়েল করি।’

ইংরেজীতে একেই বলে ‘ওয়ার-মন্ডারিং’, বাঙলায় বলে, ‘তাতানো’, ‘ওসকানো’, ‘খ্যাপানো’।

ধর্মসাক্ষী, স্বেচ্ছায় যাই নি। অকালে বুট্ট নেমেছিল, আশ্রয়ের সন্ধানে

‘বারান্দায় উঠেছিলুম। যজ্ঞির যজ্ঞমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভাস্থলে বসিয়ে দিলেন। ভোজনের নিমন্ত্রণে নয়, পঞ্চাঙ্গী-আইনে পড়ে না। বক্তৃতার সারাংশ পূর্বেই নিবেদন করেছি। অবাক মানলুম দেশের লোক এই ‘তাতানো’টা ধরতে পারল না। যে-রকমভাবে তাবৎ বক্তৃতাটা গলাধঃকরণ করে মিষ্টি মিষ্টি প্রশ্ন শুধাল, তার থেকে মনে হল তারা যেন আরও মণ্ডাটা মিঠাইটা চাইছে।

থাকতে না পেরে শুধালুম, ‘সায়েব তোমার আসল মতলব, আমরা যেন তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে বলশিদের সঙ্গে লড়ি—নয় কি? ঠিক বুঝেছি ত?’

সায়েব একগাল হেসে আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। আমি শুধালুম, ‘বলশিদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হয় না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অসম্ভব নয়’। তাই তিনি কোন দলেই ভিড়ছেন না।’

সায়েব বললেন, ‘রুশরা চলে যাক চেকোস্লোভেকিয়া হাঙ্গেরি রুমানিয়া পোলাণ্ড ছেড়ে। তারা কী রকম সেখানে রাজ্য চালাচ্ছে জান? সেখানে তারা সর্ব-প্রকার স্বাধীনতার টুঁটি চেপে তার দম বন্ধ করে মারছে, জান সে কথা?’ এবার আমি পাণ্টা একগাল হেসে বললুম, ‘বিলক্ষণ জানি সায়েব। কিন্তু বল ত, তোমারই রুজভেন্ট আর চার্চিল যখন ইয়ালটা, তেহরান পংসদামে এসব দেশ রুশের হাত তুলে দিয়েছিলেন, তখন কি তাঁরা এত গবেট ছিলেন যে জানতেন না, রুশ সেখানে কোন্ ধরণের বাজত্ব কায়েম করবে? তোমারই মার্কিন জাত, ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদর পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে, না নিজের প্যাটার্ন? তা নয় সাহেব, রুজভেন্ট চার্চিল বিলক্ষণ জানতেন রুশ-নাগর বলকানহুন্দরীকে নিয়ে কোন রুজরস করবেন। কিংবা বলতে পারি, শেয়ালকে যদি দাওয়াত করে’ মূর্গার খাঁচায় ঢোকাও, তবে সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করাই ভাল।’

সায়েবের মুখ সেন্দ্র ছামবর্ন, সেটা লিপষ্টিক হল কিনা বুঝতে পারলুম না—চোখে চশমা ছিল না—তবে কণ্ঠে উদ্ভা প্রকাশ পেল। বললেন, ‘তোমরা গণতন্ত্র মান। বিশ্বজোড়া গণতন্ত্রের বিপদে তোমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে?’

বললুম, ‘তাতে করে ত আমরা মার্কিনেরই অহুসরণ করব। ভুলে গেছ, ১৯১৪ সালে লয়েড জর্জ যখন তোমাদের দরজায় ধরা দিয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন, পাস্চাত্য গণতন্ত্র বাঁচাও, তখন তোমরা সাড়া দিয়েছিলে? না বলেছিলে, “ও ইয়োরোপের ঘরোয়া ব্যাপার।” শেষটায় ঢুকেও বেরিয়ে পড়লে। লীগ অব নেশন্সে যোগ ত দিলেই না উন্টে তার খয়েরখা উইলসনকে তাড়ালে। তারপর

১৯৩৯ সালে যখন চেম্বারলেন চার্চিল একই কান্না কাঁদলেন, ক্যাসিজমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও, তখনও কি পত্রপাঠ লক্ষিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে? না পার্জহারবারের আঁতে যখন যা পড়ল, তখন “গণতন্ত্র বাঁচাবার” টনক নড়ল? এখন দেখছ ক্লশ বড্ড বেশী তাগড়া হয়ে উঠেছে, তাইতে এত শিরঃপীড়া। সে-কথা থাক্। কিন্তু এ-কথাও মানবে যে, আজ যদি আমরা কোনও পক্ষে যোগ না দিই, তবে সে শুধু তোমাদের ইতিহাস থেকে হাদিস নেওয়ার মত হবে। ইংরেজ, ক্রাসী, জার্মান, জাপান লড়াই করে মরল, তাই আজ তোমরা পরল। এবার তোমরা আর ক্লশা মারামারি করে ছুলা হও, তখন আমরা পৃথিবীতে রাজত্ব করব।’

কথাটা সায়েবের বড্ড টক লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, ‘কিন্তু এই যে লড়াইয়ের বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাব থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে কি?’

আমি বললুম, ‘সে হচ্ছে অন্য কাহিনী। দুর্ভিক্ষের সময় বাঙালী ডাফ্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেয়েছে, তাই বলে ওটা তার কর্তব্য এ-কথা ত কেউ বলতে যাবে না। লড়াই এড়াতে পারব না, তাই তৈরী হয়ে জেতার পক্ষ নিই, সে হচ্ছে এক কথা; আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এস্তেয়ারে, বহালতবিত্তে “কর্তব্যবোধে” “গণতন্ত্র বাঁচাতে” যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমাদের সে বোধটা হচ্ছে না।’

ততক্ষণে রুটি খেমে গেছে! দেশ ত আমি চালাই নে। কেটে পড়লুম।

কিন্তু প্রশ্ন, এই যে হরেক রকম চিড়িয়া নানারকম মুখোস পরে এদেশে এসে ‘ওয়ার-মজারিং’ করে, তার কি কোন লাওয়াই নেই?

বাজালী মেনু

বয়স হয়েছে, যখন খুশি রেস্টরঁয় ঢুকে মমলেট-কটলেট হুকুম দিতে লজ্জা করে। আর যখন বয়স হয় নি তখন জেবে সিজিল চায়েরও রেস্ট থাকত না বলে রেস্টরঁয় ঢোকবার উপায় ছিল না।

ভগবান দয়াময়। তিনি সব কিছুই দেন; কিন্তু তাঁর ‘টাইমিং’টা বড্ডই ধারাপ। বুদ্ধকে দেন তরুণী ভাষা এবং হোটেলে যাবার পরস। উনিশ শতকের নাটক-নভেলে একেই বলা হত ‘অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস’।

অসময়ে বৃষ্টি। ট্রাম থেকে নেমেই রেষ্টুরাঁতে ঢুকতে হল। বহুকাল পরে কলকাতা ফিরেছিও বটে—পুরনো ষাণ্ডারীয় প্রতিষ্ঠান আগেরই মত চালু আছে কি না দেখার বাসনাটাও রয়েছে।

একখানা আলুর চপ আর এক কপ্‌চা।

শুনছি, সায়েবরা মাস্টার্ড খান শুধু শূকর এবং আরেকটা নিষিদ্ধ মাংসের সঙ্গে। মুর্গী, মটন, মাছের সঙ্গে তাঁরা রাই খান না। মুর্গী, মটনের সঙ্গে না ই বা খেলেন, কিন্তু মাছের সঙ্গে সরষে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের মিল—এ-তব্বটা সায়েবরা এদেশে দু'শ বছর থেকেও শিখল না দেখে তাজ্জব মানতে হয়।

তা সে যা-ই হোক, আমি সরষে খাই সব জিনিসের সঙ্গে—এই নিতান্ত সন্দেহ-রসগোল্লা ছাড়া। তাই আলুর চপের মটনকিমা সরষে সংযোগে খেতে খেতে ছোকরাকে বললুম, 'সরষেটা ভাল না।'

মানেকার শুনতে পেয়ে বললে, 'হক্-কথা বলেছেন, স্যার, কিন্তু বিলিভী মাস্টার্ডের উপর সরকার ট্যাক্সো যা লাগিয়েছেন তার ঝাঁঝটা মাস্টার্ডের ক্ষেয়েও বেশী।'

আমি বললুম, 'তবে নাকচ করে দিন বিলিভী মাস্টার্ড'; চালান দেশের তৈরী খাঁটি, প্লেন কাহন্দি। খরচাও কম পড়বে।'

মানেকার আমার দিকে হাবার মত তাকালে। বোধ হয় ভাবলে, আমি নিতান্তই গাইয়া। তা আমি বটিও।

দিশী বিলিভী কোন মাস্টার্ডই কাহন্দির সামনে দাঁড়াতে পারে না। কাহন্দিতে থাকে মিঠে-কড়া, মোলায়েম-মোলায়েম ঝাঁজ—আর বিলিভী মাস্টার্ডের ঝাঁজ চাষাড়ে, ফরাসী মাস্টার্ডে বদখদ্ মিষ্টি-মিষ্টি ভাব।

যবে থেকে আমার পাশের বাড়িতে এক দার্শনিক এসে উঠেছেন, পাড়ার আমাদের সকলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে। আমরা এখন আর তথ্য নিয়ে তর্ক করি নে, তব্ব কারে কয় তার-ই চিন্তা করি। আমি তাই কাহন্দির খেই ধরে তব্বচিন্তায় মনোনিবেশ করলুম। আমরা আপন জিনিসের সম্মান দিতে জানি নে। হিন্দীতে যাকে বলে 'ঘরকো মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ 'গেয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না'।

তখন মনে পড়ে গেল, গেল লড়াইয়ের সময় আমাকে এক মার্কিন অফিসার আক্সোস করে বলেছিল, কলকাতায় বাঙালী-রাঙ্গা খাবার রেষ্টুরাঁ নেই। তাকে এক বাঙালী নিমন্ত্রণ করে ডাল-চচ্‌ড়ি খাইয়েছিল, সেই থেকে বেচারী তামাম

কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বাঙালী-রান্নার সন্ধানে, আর পেয়েছে শুধু মমলেট-ফটলেট-ডেভিল কিংবা কোমী-পোলাও-কালিয়া। সে চেয়েছে এক ঘটি জল, পেয়েছে তিনখানা বেল।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শোপেনহাওয়ার বলেছেন, ‘অমা যামিনীর অঙ্ককার অন্ধনে অন্ধের অল্পপস্থিত অসিত অশ্বভিষের অল্পসন্ধান।’ কলকাতায় বাঙালী-রান্নার রেস্টুরাঁ অল্পসন্ধান এই একই গোত্রীয়—কলকাতায় প্রথম আশ্চর্য।

অথচ দেখুন ইংরেজী (কিংবা ট্যাশ বলতে পারেন), মোগলাই, চীনা, মাদ্রাজী, গুজরাতি (‘অন্নপূর্ণা’ দ্রষ্টব্য—থাওয়া না-থাওয়ার জিম্মেদার আপনি) বহু রকমের রান্নাই এই কলকাতায় পাবেন। রোস্ট কবাব চপ্ স্নয়েজ ইডলি-ডোসে করহী, করাসী এস্কেলোপ দ্য ভো ও শাতোব্রিয়া, এমন কি ভিয়েনার ভীনার স্নিৎসেল পর্যন্ত পাবেন। পাবেন না শুধু খাট, অঞ্চল।

তাই ভাবছি, আপনাতে আমাতে একটা বাঙালী-রেস্তুরাঁ খুললে হয় না ?

বাঙালী সর্বভুক। তাই বাঙালী প্রবাদ ‘লোহা খাই নে শক্ত বলে, “—” খাই নে গন্ধ বলে।’ তাই বলে কি আমাদের রেস্তুরাঁয় সব কিছু থাকবে ? উহ্ ! আমাদের মাপকাঠি হবে—বাড়িতে আমাদের মা-মাসীরা আটপৌরে এবং পোশাকী যে-সব রান্না করেন।

তা হলে এইবারে ‘মেহু’টা তৈরি করা যাক।

কিন্তু তার পূর্বেই স্থির করতে হয়, খেতে দেবেন কিসে ?

আমি মনস্থির করেছি—কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরের থালারও ব্যবস্থা থাকবে, নিত্যন্ত সার্বিক জনের জগ্ন শালপাতা, কলা-পাতার ব্যবস্থাও থাকবে। সব কটা থাক্ আর নাই থাক্—চীনে বাসন ছুরি-কাঁটা বারণ।

এখন আহাতি।

১। ভাত—আতপ এবং সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকর-খানী (বাদ দিলে চলবে না, পুর্ব-বাঙলার বিস্তার লোক কলকাতায় আন্তানা গেড়েছেন), খি-ভাত, পোলাও। কিছু বাদ পড়ল না ত ? ভেবে দেখুন। এ ‘মেহু’ তৈরী করা ত একজনের কর্ম নয়। আমি শুধু একটা পয়লা খসড়া করে দিচ্ছি।

এ-স্থলে আরেকটি তত্ত্ব খুলে কই। রেস্তুরাঁ প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয় ; ডাই কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে—অর্থাৎ প্যারিসকে, কারণ রেস্তুরাঁ-লোকের বৈকুণ্ঠ প্যারিসে। তাই ‘মেহু’ বানাবার পরিচ্ছেদ, অল্পচ্ছেদ, পদ করাসী কায়দাতেই যুক্তিসম্মত এবং অভিজ্ঞতা-সম্পূর্ণ

করাসী ‘মেহু’ আরম্ভ হয় হরেক রকম রুটির বর্ণনা দিয়ে (আমিও তাই ভাত-
লুচি-পোলাও দিয়ে বিসমিল্লা পড়েছি), তারপর অল্প অল্প, সূপ, ডিম, কিশ
ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব—

২। তেতো ;—

উচ্ছেভাজা, করেলাসন্ধ, নালতে শাক (ইন সীজন—মৌসুমী কালে)।
এইবারে ভাবুন, কিংবা মা-মাসীকে জিজ্ঞেস করুন, আর কী কী তেতো আছে—
আমার দুর্ভাগ্য, যে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই।
পশ্চিমাঞ্চলে স্টাক্ট—অর্থাৎ মাংসের পুর দেওয়া—করেলা খায়, কিন্তু বিবেচনা
করি তার রেওয়াজ বাংলা দেশে নেই।

৩। ডাল ;—

মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। তারপর ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা,
কেউ বা দু-চারটে বড়ি দেয়। অতএব ডালের দুভাগ—প্লেস এবং মেশানো,
যেমন পূর্বেই বলেছি ডাল আ লা ডাঁটা ; কিংবা আ লা নারকোল, অর্থাৎ ডালে
নারকোলের টুকরো থাকবে।

৪। ভাজা ;—

নিম্নে কিস্তি বিপদ। কারণ এতক্ষণ দিব্য নিরামিষ চলছিল, এখন ভাজা
নিরামিষ, আমিষ, ডিম তিন প্রকারই হতে পারে।

অতএব

(ক) আলু, পটল, বেগুন, কুমড়া...

(খ) ডিমভাজা, মমলেট...

(গ) মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুটি, পোনা...)

কাজেই খ এবং গ-কে হয়তো ‘ডিম’ এবং ‘মাছের’ অন্তর্ভুক্তি পুনরাবৃত্তি
করতে হবে। ‘ক্রস রেফারেন্স’ দিতে পারেন, কিস্তি ভয়, তাহলে ‘মেহু’ হয়ত
জর্মন ডক্টরেট থিসিসের প্রকাব এবং আকার নিয়ে নেবে। উপস্থিত অবস্থায়
আমি সেই নিষ্ঠা নিয়েই এই মহানুভাবান নির্ঘণ্ট নির্মাণের প্রয়াসী হচ্ছি, কিন্তু
ভৈরী মাতে ও জিনিস এতরাং চলবে না।

(৪) ছেঁচকি—ছোঁকা—ছক্কা—চচ্চড়ি—লাবড়া (লাফড়া)।

এইবারে আমার পেটের এলিম বেরিয়ে গেল। এগুলোর মধ্যে একটা
আরেকটার সূক্ষ্ম পার্থক্য আমি জানি নে। যদিও খাবার সময় রাঁধুনীকে অপটু
দাঁওরাতে এ-বিষয়ে উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দিতে কহুর করি নে। আর-পাঁচজন কান

পেতে শোনে, কারণ তারা জানে আমার চেয়েও কম। দু-একবার যে কান-মলা খাই নি তাও নয়। সে কথা যাক। এখন প্রশ্ন, এ-অহুচ্ছেদের মূল হেজি নেবেন কী এবং তার পদ বাতলাবেন কী কী ?

করে করে আসবেন, মাছ মাংসে— তার কত অহুচ্ছেদ, তন্তু ছেদ, পদ, পদ-ভেদ—ডালনা, বোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে, ডাবের ভিতর, কলাপাতার পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে—খোদায় মালুম, কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

তাই আমার প্রস্তাব ; একখানা ফুলক্যাপ কাগজ নিন এবং রেক্তরার মেছুর কায়দায় একখানা বাঙালী মেছু তৈরী করুন দু পাতা জুড়ে, অর্থাৎ ফুলক্যাপ কাগজের ভাঁজ খুলে যতটা জায়গা পান। এর বেশী কাগজ নিতে পারবেন না কারণ পূর্বেই বলেছি মেছু খিসিস নয়। আবার শীটখানা যেন টায়-টায় ভর্তি হয়। ফাঁক থাকলে চলবে না। আমি যে পরিচ্ছেদ-অহুচ্ছেদ দিয়ে প্যাটার্ন বাতলালুম সেটা একদম অবজ্ঞা করে আপনি আপন মেছু বানাবেন। কোন্ জিনিসের কত দাম সেটা আপনি বলতে পারেন, না-ও পারেন। না-বলাই ভাল। কারণ ‘কসটিং’ ব্যাপারটা বড়ই কঠিন। রেক্তরার-ম্যানেজার অভিজ্ঞতা থেকে সেটা স্থির করবেন।

‘এক্সট্রা’ অহুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে, কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে-পুদিনা...), আচার (আম, জারক নেবু...) ইত্যাদি এবং কাহুন্দি।

যে-কাহুন্দি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছিলুম।

এইবারে বিবেচনা করুন ॥

রন্ধন-যজ্ঞ

ধবর এসেছে লওনে এক বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে। সে-যজ্ঞে পৃথিবীর আঠারোটি দেশ আপন আপন স্বস্বাচ্ছন্দ্যে পেশ করবেন। অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু হায়, আমাদের বিচারকর্তা করে ডেকে পাঠাচ্ছে না কেন? রন্ধন-মার্গে সত্যের সন্ধানে আমি বিস্তর ইচ্ছন পুড়িয়েছি, আকাশের আরোপ্নেন, মাটির ট্রেন আর জলের জাহাজ এই তিন সচল বস্তু ভিন্ন আর সবই ত আমি খেয়ে দেখেছি। তাও আবার দেশী বিদেশী নানা কায়দায়। জার্মান কায়দায় রান্না ভারতীয় ‘রাইস-কারী’ (অতিশয় অশাস্ত) খেয়েছি, শিখের বানানো বাঙালী লোডিকেনি খেয়েছি (সেক পেজাদ-মারা গুলি—গ্রহলাদকে খাইয়ে দিলে হিরণ্যকশিপুকে আর ভাবতে হত না), আরব বেহুইনের হাতে ‘পাকানো’ দিল্লীর বিরিয়ানি খেয়েছি, জাপানী

বহুতৈ ডেরী চেজিসখানী কাবাব ভী খেয়েছি (এর নির্মাণ-কৌশল একদিন 'সবিস্তর নিবেদন করব—আহা, অতি খাসা জিনিস), আর কত বলব।

তা সে-কথা যাক গে, সে নিয়ে ছুঃখ করে কোন লাভ নেই, শুগীর আদর কি আর এ মুঢ় সংসার করেছে কিংবা করবে?

লণ্ডন থেকে আরও খবর এসেছে, ভারতীয় 'টীম' চলবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বহু এবং শ্রীমতী রায়ের কর্তৃত্বে। তিনজনই বাঙালী, কাজেই বাঙালী হিসেবে, হে পাঠক, তোমার আমার দুজনেরই মনে বিমল আনন্দ অহুভূত হল, এ-কথা অস্বীকার করে খামোখা মিথ্যাবাদী হতে যাব কেন? কে না জানে, আজ বাঙালী সর্বত্র অনাদৃত, কেন্দ্রীয় সরকার তাকে উপেক্ষা করে, বিদেশে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি শনৈঃ শনৈঃ কমে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞের পালা-পরবে শ্রীক্ষ-নিমজ্ঞণে সে প্রায় ব্রাত্য—অপাণ্ডুস্তেয় হতে চলল। এরই মধ্যখানে যদি বিশ্ব-রন্ধনযজ্ঞে তিন বন্ধরমণী ভারতের প্রতিভূ হিসেবে আমন্ত্রণ পান, তবে কোন্ বাঙালীর ছাতি তিন ফুট ফুলে উঠবে না?

কিন্তু আমার নিবেদন, গর্ব অহুভব করেছি বটে কিন্তু আনন্দিত হই নি।

আমি বাঙালী, আমি এই 'দেহলিপ্ৰাস্তে' বসেও বাঙালী-রান্না খাই। আমি আতপ চালের ভাত, কিঞ্চিৎ ঘৃত, সোনা মুগের ডাল (দিল্লিতে অতিশয় নিরুজ্জ), সর্ষে বাটায়া মাছের ঝোল ইত্যাদি খেয়ে থাকি। বাঙালীর অন্ত্যান্ত রান্না নিয়েও আবার দন্তের অস্ত নেই, কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় রান্নার কেবলদানি দেখাতে হয় তবে শুধু বাঙালী হেঁশেল দেখালেই চলবে না।

হাঁ, আলবত, অতি অবশ্য আমি স্বীকার করি, বাঙালীর সর্ষে-ইলিশ, মালাই-চিংড়ি, ডাব-চিংড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ (বিশেষ করে 'বোটমের পাঠা' এঁচোড়), জলখাবারের লুচি, আলুর দম, সিঙাড়া, মাছের ডিমের বড়া, মোচার পুর লেওয়া সমোসা ইত্যাদি, তারপর ছানার মিষ্টি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই, মিহিদানা সীতাভোগ আরও কত কী! (মুতাকর মহাশয়, আপনার জিন্তে জল আসছে, অথচ এ-লৈখা কম্পোজ না করে আপনার বাইরে যাবার উপায় নেই, তত্পরি আজকের দিনে আপনি আমি কেউই এ-সব সুস্বাদু বস্তু চাখবার সামর্থ্য রাখি নে, অতএব অপরাধ নেবেন না।)

এমন কী, আমাদের উচ্ছেভাজা, আমের অফল, কিসমিস-টমারটোর টক (প্রধানত বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের) নগণ্য জিনিস নয়, ভোজনরসিক মাঝেই আনেন।

আর পিঠে—তার কিরিস্তি আর দেব না।

কিংবা যাকে বলে ‘ফেনসি-খানা’ বিশেষ জেলা বা মহকুমার আপন বৈশিষ্ট্য। বাইরের—এমন কী, বাংলা দেশের ভেতরের লোকই যেগুলো জানে না, যেমন মনে করুন ব্যাণ্ডের ছাতা, ইংরেজীতে যাকে বলে মার্শরুম, মেদিনীপুর এ-বস্তুর পাক্ষা কদরদার, ভোজনরাজ করাসীও এর নামে অজ্ঞান, কিংবা পূব-সিলেটের ‘চোঙা-পিঠে’ (এক রকম হাঙ্কা বাঁশের চোঙায় ভেজা চাল ভরে দিয়ে সে-চোঙা খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলসানো হয়, তারপর চোঙা ভেঙে ফেললে একখানা আন্ত লম্বা টুকরো বেরিয়ে আসে—এক ফুট লম্বা ; খেতে হয় শুকনো মালই কিংবা করকরে কই মাছ ভাজার সঙ্গে), কত বলব !

শুটকি ? নাক সিঁটকাচ্ছেন ত ? কিন্তু আমার বিশ্বাস শুটকির আপন মূল্য আছে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান সব ভোজন-রসিকজনই ‘স্নোকড্-কিস’ অর্থাৎ শুটকির কদর জানেন।

আরও কত কী !

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মাছ, নিরামিষ, পিঠে, সন্দেশ হুচাক্করূপে তৈরি করতে জানলেও সে পারে না—এবং একদম পারে না মাংস রাখতে।

বাঙালী-বাড়িতে মাংস খেতে গেলে আমার চোখে জল আসে। মাংস আর ঝোল নন্-কো-অপারেশন করে বসে আছেন—এদিকে শক্ত মাংস ওদিকে টলটলে ঝোল। মাংসের নিতান্ত আপন ‘সোওয়াদ’ আছে বলেই ধাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অথাৎ।

কিংবা মাংস-চালে মিশিয়ে বিরিয়ানি পোলাও বাঙালী রাখতে জানে না (বাঙালীর উপাদেয় ঘি-ভাত, মটরশুঁটি-ঘি-ভাত অল্প জিনিস) অথবা মাংসে তরকারিতে মিলিয়ে আলু-গোশং, মটর-গোশং, গোবি- (কপি) গোশং বাঙালী বিলকুল চেনে না।

একেবারে কেউই পারে না—একথা আমি বলব না। ঢাকার নবাব-বাড়ি, সিলেটের কাজীবাড়ি এবং মজুমদার-বাড়ি (শ্বেচ্ছা—খাই নি), মুর্শিদাবাদের ও মাটিয়াবুরুজের নবাব-বাড়ি এসব বস্তু সত্যিই ভাল রাখেন। আর পারে উত্তম দুর্গী-ঝোল রাখতে গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর জাহাজের খালসীরা ; যে একবার খেয়েছে, সে কখনও ভুলতে পারে না।

কিন্তু এসব মাংস রান্না বড়ই সীমাবদ্ধ, বাংলা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, বিক্রমপুরের মেয়ে প্রতি বৎসর গোয়ালন্দী জাহাজে করে কলকাতা-হস্টেলে যায়, যাবার সময় জাহাজে ‘রাইস-কারি’ ধায়, সে

রাধতে-বাড়িতেও জানে, কিন্তু জাহাজের ওই মূর্গী-ঝোল সে কখনও রাধতে পারল না !

মাত্র একটি বাঙালী কাপালিককে আমি চিনি, যিনি সত্যি মাংস রাধতে জানতেন। পাঠার মাংস কমে তিনি পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কা দিয়ে যে অপূর্ব, না অভূতপূর্ব ‘মহাপ্রসাদ’ রাধতেন তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত স্থাণ্ড আমি এ জীবনে কখনও খাই নি। কিন্তু তিনি ব্যত্যয়। তিনি এখন সেই লোকে, বিবেচনা করি, যেখানে আহারাদির কোন ঝামেলা নেই, তাই আমাদের শহরে এখন আর কেউ ‘মহাপ্রসাদে’র সন্ধান পায় না। আমার মত ছ-একজন এখনও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তাঁর স্মরণে চোখের জল ফেলে।

অথচ দেখুন, পশ্চিম-ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়। নানা রকমের স্করুয়া (সূপ), শিক-শামী-টিকিয়া-বুড়ী-আফগানী-মিশ্রী-নরগিস কত রকমের কাবাব, ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, গুদা, কলিজা, তন্দুরীমূর্গী, মূর্গীমুসল্লম, মূর্গীশাহী, রওগন যুঘ, তারপর মাংসে তরকারিতে মেশানো আলু-গোশ্‌ং, গোবী-গোশ্‌ং, দইয়ে মাংস মাখানো রায়তা-গোশ্‌ং, মাংস কুচি কুচি করে কোফতা, কীমা এবং তার থেকে কোফতা-ঝোল, কীমা-ঝোল, বাহান্ন রকমের সমোসা, এবং আরও কত কী।

এক কথায় আমরা বাঙালী যে-রকম মাছ দিয়ে পয়ষটি রকমের ভেজিভাজি দেখাই, এরাও তেমনি মাংস দিয়ে নিপুণ বোল চিকন কাজ দেখাতে জানে।

আমার মনে সন্দেহ জাগছে বাঙালী রমণীরা লগুনে এসব রান্না রাধবেন কী করে ?

কিংবা পার্সীদের ধনে-শাক ? উপাদেয় বস্তু।

মাছের রাজা আমরা, কিন্তু ভৃগুকচ্ছ নগরের পার্সীদের রান্না ইলিশ-মশালাও ত ফেলনা নয়। মাছটিকে ঠিক মধ্যাধানে লম্বালম্বি কেটে কাঁকা জায়গাটা সবুজ পেশা মশলা দিয়ে ভরে গোটা মাছটাকে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে সেকা হয়। তিনখানা আড়াই-সেরী আস্ত ইলিশ থেয়েও আপনার পেটের অস্থখ করবে না, এর বাড়ী কী প্রশংসা আছে বলুন ?

গুজরাতীদের পর্তোড়ি। ঘোলের ভিতর বেসন ভিজিয়ে রাখবেন রাত্রিবেলা। সকালে তাই দিয়ে চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন, তেলে ভেজে নিয়ে ফালি ফালি করে কেটে ‘রোল অপ’ করে নেবেন। মুখে দিলে মাখনের মত মিলিয়ে যাবে। নিরামিষের ভিতর এ-রকম মুখরোচক বস্তু এ-ভারতে কুমই আছে।

মিষ্টির ভিতর শ্রীখণ্ড এবং দুধ-পাক ।

মারাঠীদের দহি-ভাত । বেহারীদের আচার । তামিলদের মালে-গাটানি সূপ, রসম, ইডলি-ডোসে । কাস্মীরীদের বসন্ত ঋতুর বাচ্চা ভেড়ার কাবাব । পাঞ্জাবীদের হালুয়া, লসুসী ; আরও কত প্রদেশের কত অনবদ্য ‘অবদান’ !

ক্রিকেট-টীমে আর রন্ধন-টীমে কোনও তফাত নেই । ক্রিকেটে এগার জন নাইডু পাঠানো হয় না—তা তিনি যত ভাল ব্যাটসম্যানই হোন না কেন । ফাস্ট মিডিয়ম ব্লো গুলি বোলার, উত্তম উইকেট কীপার, এমন কী, না-ব্যাটসম্যান না-বোলার শুদ্ধমাত্র কীল্ডার (যথা ভাইয়া) দু-একজন রাখতে হয় ।

অতএব এই রন্ধন-যজ্ঞে ভারতের সর্ব প্রদেশ থেকে বহুতর ভীমসেনকে পাঠাতে হবে ॥

‘বাঁশবনে—’

প্যারিসের এক সুবিখ্যাত ‘গুর্মে’ অর্থাৎ ‘খুশখানেওলা’ বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান । ইয়োরোপে উত্তম ভোজনের মক্কা-মদীনা যে রকম প্যারিস, এশিয়া-আফ্রিকায় সেই রকম তুর্কী । অন্তত ইয়োরোপীয়দের বিশ্বাস তাই—যদিও আমার ব্যক্তিগত ধারণা প্রাচ্যদেশীয় ভোজন-মক্কা তুর্কী নয় দিল্লি, লখনউ, আগ্রা । কিন্তু সে-কথা থাক্ ।

প্যারিস গুর্মের কন্সতুনতুনিয়া (কন্সটানটিনোপোল) আগমন-বার্তা সেখানকার ভোজন রসিক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে বেশীদিন লাগল না । তাঁদের চক্রবর্তী যে পাশা ওই মার্গে বহুদিন ধরে সাধনার ফলে স্বর্গত মহামান্ন আগা খানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের গুর্মেকে আশুষ্ঠানিকভাবে নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন—গুর্মেও তারই প্রতীক্ষায় গ্রহর গুনছিলেন ।

সে-ভোজনের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব । বরঞ্চ যে এখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত শোনে নি, তাকে বেটোফেন সমঝাতে আমি রাজী আছি ।

গুর্মে পরের দিনই প্যারিস রওয়ানা দিলেন । তাঁর তীর্থদর্শন সমাপন হয়েছে—তিনি ত আর সিন্সোফিয়া মসজিদ দেখতে কন্সতুনতুনিয়া আসেন নি ।

প্যারিসে ফিরে যাওয়া মাত্রই সেখানকার গুর্মে-সমাজ তাঁকে শুধালে, ‘কী রকম খেলে ?’

তিনি বললেন, ‘অপূর্ব, অপূর্ব ! এ-রকম খানা এ-জন্মে কখনও খাই নি । তুর্কী গিয়ে আমার উদর ধন্য হয়েছে, আমার রসনা তার চরম মোক্ষলাভ করেছে ।’

এবং প্রকার বহুবিধ উচ্ছ্বাসিত প্রশংসার পর তিনি কিঞ্চিৎ তুক্ষীভাব ধারণ করলেন। তার পর বললেন, ‘কিন্তু...’

সবাই বললে, ‘কিন্তু...?’

‘পদ ছিল বড় বেশী।’

ভোজন-মার্গে যারা মন্ত্রসিদ্ধ তাঁরাই শুধু এ-বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবেন।

কেউ যখন বলে, ‘ওঃ, যা থাইয়েছে! ডাল ছিল চার রকমের, পোলাও ছিল পাঁচ রকমের, অমুক ছিল তমুক রকমের—’

তখন আমার ভুরু ইঞ্চিখানেক উপরের দিকে ওঠে।

চার রকমের ডাল? লোকটা কি তবে জানে না তার বাড়িতে কোন্ ডাল সবচেয়ে ভাল রান্না হয়? আর চার রকমের ডাল এবং পাঁচ রকমের পোলাও-ই যদি আপনি খান তবে রসগোল্লা সন্দেহে পৌঁছবেন কী করে? যদি বলেন, ‘রুচির পার্থক্য রয়েছে, তাই চার রকমের ডাল’, তবে শুধাই সার্থক কবি সুন্দরীর বর্ণনাকালে কি পঁচিশটা বিশেষণ দিয়ে বলেন, ‘রুচি-মাক্ষিক তোমরা বিশেষণটা বেছে নাও’ কিংবা চিত্রকর হুমুমানের ছবি আঁকার সময় তাঁর পশ্চাদ্দেশে পাঁচটা পাঁচ রকমের গাজ এঁকে দিয়ে বলেন, ‘পছন্দ-সই তোমার গাজটা বেছে নাও।’

কাগজে পড়েছি ডাচেস অব উইনজার কখনও স্থপ খেতে দেন না। ডিনারের অবতরণিকায় গাদা-গুচ্ছের তরল বস্তু পেটে ঢুকিয়ে দিলে বাদ-বাকী পদ মাহুষ ভাল করে খাবে কী করে? অতিশয় হৃৎ কথা। আমার ভাল পাচক নেই বলে আমি পারতপক্ষে কাউকে নিমন্ত্রণ করি নে। যদিষ্ঠাৎ করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই। শেবির গেলাস-ভর্তি টমাটো রস এবং দশ ফোটা ‘মাগ্গী’—তদভাবে উন্টাস সস্+চার ফোটা তাবাক্সো সস্—তদভাবে চীনা চিলি সস্—তদভাবে একটি চিমটি লাল লঙ্কাগুঁড়ো+প্রয়োজনীয় হুন। এসব ভাল করে মিশিয়ে খুশবায়ের জগ্গ উপরে অতি সামান্য গোল-মরিচের গুঁড়ো ভাসিয়ে দেবেন। এটা খাওয়া নয়—ক্ষুধা-উত্তেজক মাত্র।

তবে রেক্তরার কথা আলাদা। কারণ রেক্তরায় তাবৎ চৌষটি পদ খাবার জগ্গ কেউ পীড়াপীড়ি করে না। ভোজে আপনি পদের পর পদ স্থিগ্ করতে থাকলে গৃহস্থামী তথা অগ্গ নিমন্ত্রিতেরা সন্দ করবেন, আপনি একটা স্নব। রেক্তরায় সে-আশঙ্কা নেই।

এবং ভাল রেক্তরাতে আলা কার্তের বাহান্ন পদ খাবার পরও গোটা তিনেক তাবল দোং (t b e d' l' te) বা ফিক্সড্ দামে ফিক্সড্ পদের ভোজন থাকে। যেমন মনে করেন দু টাকাতো আছে (১) সেলেরি স্থপ, (২) রোস্ট মাটন,

(৩) পুডিং ; আড়াই টাকাত (১) সেলেরি স্প, (২) বয়েলড্ ফিশ, (৩) রোস্ট মাটন, (৪) পুডিং ; এবং তিন টাকাত আছে (১) সেলেরি স্প, (২) বয়েলড্ ফিশ, (৩) রোস্ট চিকেন, (৪) পুডিং কিংবা আইসক্রীম ।

এই তাব্ল্ দোং বাতলে দেবার প্রধান উদ্দেশ্য ভোমকে বাঁশ-বাছতে সাহায্য করা । বিশেষ করে এই সাহায্যের প্রয়োজন মহিলাদেরই বেশী । ভুক্তভোগী মাট্রেই জানেন, মহিলারা মেহু কার্ড অর্থাৎ আ লা কার্ত হাতে নিলে পুরুষদের কী হয় । এই ফাঁকে মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন, ম্যাডাম তখনও মনস্থির করতে পারেন নি কোন্ স্প তার বিবাহের ছুঁয়ে কসু কণ্ঠ পেরিয়ে লম্বোদরে বিলম্বিত হবেন । ইতিমধ্যে ওয়েটারের দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে—দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে—অবশ্য আসলে তা নয়, ইতিমধ্যে পাকা চকিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে ।

দা-ঠাকুরের পাইস-হোটেলে মেহু বাছতে আমাদের কোনও অহুবিধে হয় না । কখন তেতো খেতে হয় আর কখনই বা টক, সে-তহু আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি । আমাদের সময়ে পাইস হোটেলে তাব্ল্ দোংও থাকত । ওই জিনিস সে-দিন রান্না হয়েছে লাটে ; কাজেই সেইটে সেদিন অর্ডার দিলে ভোজনপর্ব সমাধান হত সস্তায় ।

সায়েবী হোটেলে গিয়ে আমরা পড়ি বিপদে । সে-রেস্তরাঁ যদি আবার উগ্রাসিক হয়, তবে প্রায় সমস্ত মেহুখানাই লেখা থাকে ফরাসী ভাষায় । ‘বাছুরের কাটলেট’ নাম দেখে আপনি হিন্দুসন্তান আঁতকে উঠলেন, কিন্তু ওইটেই হয়ত খেতে দেখলেন আপনার মুসলমান বন্ধুকে । শুধালেন, ‘কী বস্ত ?’ বললে, ‘এক্সালপ ছ ভো ভিয়েনোওয়াজ’—তাতে বাছুরের নাম-গন্ধ নেই, ‘ভো’ যে বাছুর আপনি জানবেন কী করে ? আপনি তাই দিব্যি অর্ডার দিয়ে বসলেন । রেস্তরাঁ যদি আরেক কাঠি সরেস হয়, তবে ওই বস্তরই নাম পাবেন জার্মানে—‘ভিনার স্নিংসেল্’ । ‘স্নিংসেল্’ অর্থ ‘এক্সালপ’, তার মানে ইংরেজীতে ‘স্ক্যালপ’, সোজা বাংলায়, ‘মাংসের টুকরো’ । ওটা কিসের মাংস তার কোনও হিন্দু ওতে নেই । শুয়োরেরও ‘স্নিংসেল্’ হয়, চীনদেশে হয়ত কুকুরেরও হয় । শুনেছি, আমাদের মুনিষ্মিরা গণ্ডার খেতেন । অহুমান করি, তাঁরা তা হলে গণ্ডারের ‘স্নিংসেল্’ খেতেন ।

আমি ইংরেজী জানি নে । মুসলমান মুকুবীদের কাছে শুনেছি, শুয়োরের মাংসের নাম ইংরেজীতে ‘পর্ক’ এবং ওটা খাওয়া মহাপাপ । তাই ‘পর্কচপ্’ না খেয়ে আশ্বস্ত হতুম, ধর্মরক্ষা করেছি । তার পর একদিন আবিষ্কার

করলুম, ‘হাম’, ‘বেকন’ শুয়ারের মাংস, এমন কী ওই মাংসের কটলেট, সসেজও হয়—এবং মেহুতে তার উল্লেখও থাকে না। আবিষ্কারের পর অহোরাত্র জলস্পর্শ করি নি এবং মোল্লাবাড়িতে গিয়ে ‘তওবা’ অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলুম। মোল্লা সান্দ্রনা দিয়ে বলেছিলেন ‘অজান্তে খেলে পাপ হয় না’। কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মন চিন্তা করে দেখলে, অজান্তে খেলেও স্বাদে ভাল লাগতে পারে।

কিন্তু ইংরেজী রেস্তরা বাবদে আমার আপনার বিশেষ কোন হুচ্চিন্তা নেই। বন্ধুবান্ধবদের ভিতর আকছারই দু-একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন। মেহু সম্বন্ধে তাঁদের স্বগভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোজ্জাস অমূভব করেন, আমরাও উপকৃত হই। তহুপরি ‘বয়’ যখন বিল হাজির করে, তখন আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি—এটিকেট-হুরন্ত বিলেত-ফেরতাকেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়। উদাস, ভাবানু হওয়ার ভান করতে পারলে বিস্তর লাভ।

বাঙালীর দুর্বলতা আ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইংলিশ্ রান্নার প্রতি নয়—তার গ্রাণ হোক হোক করে মোগলাই রান্নার জন্ত। কিন্তু মেহু পড়তে জানে না বলে যা-তা অর্ডার দিয়ে বসে এবং নিতান্ত পয়সা ঢেলে দিয়েছে বলে সেটা যখন অতি অনিচ্ছায় খায়, তখন দেখতে পায়, পাশের টেবিলে এক ভাগ্যবান ঠিক সেই সেই জিনিসই পরম পরিতোষ সহকারে খাচ্ছে, যে-সব খাবার সং-কামনা নিয়ে সে রেস্তরায় এসেছিল।

একেই বলে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস।

জীবনের মেজর ট্র্যাজেডি বা ‘অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে’র নিষ্পত্তি যদি দিতে হয়, তবে আমার প্রথম যৌবনের প্রথম প্রিয়া যে আমাকে জিল্ট করেছিলেন সেটার উল্লেখ আমি করব না, কিন্তু এটার উল্লেখ অতি অবশ্য করব। স্বখাত্তের জিল্টিং ভোলার জন্ত একটা জাবন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়।

বাঙালী-রান্না বললে কী বোঝায় সেটা আমরা মোটাগুটি জানি, কিন্তু সব বাঙালী-রান্না এক রকম নয়। পূব আর পশ্চিম বাংলার রান্নাতে এস্তার তফাত। পূবের রান্নাতে ঝালের প্রাচুর্য, পশ্চিমের রান্নাতে চিনি। কে যেন বলেছিল, ‘মাই মোটর কাব ইজ সাউণ্ড ইন্ এভ্রি পার্ট, এক্সেপ্ট ইন দি হর্ন—ঠিক সেই রকম পশ্চিম-বাংলার রান্নাতে ‘স্বগার ইন্ এভ্রিথিং এক্সেপ্ট ইন্ রসগোল্লা।’

সব মোগলাই রান্না এক রকমের নয়। কলকাতায় এই কয়েক বছর পূর্বেও প্রচলিত ছিল একমাত্র ‘কলকাতাই মোগলাই’ রান্না। হালে ‘লাহোরী মোগলাই’ও

প্রচলিত হয়েছে। দেশ-বিভাগের পর লাহোর-শিঙির 'শেক'রা দিল্লির কনট সার্কাসে এসে 'পাঞ্জাবী মোগলা'ই রান্না প্রবর্তন করেন (দিল্লীর মোগলাই এখন চান্দনী চৌকে আজয় নিয়েছে) এবং তারই ব্রাঞ্চ এখন কলকাতা এসে পৌঁছেছে।

এ রান্নার বৈশিষ্ট্য তিনটি জিনিসে :—

(১) আফগানী নান্। কলকাতার আদিম ও অকৃত্রিম নান্-কটির (কার্সীতে 'নান' শব্দেরই অর্থ রুটি—'নান্-কটি' তাই হুবহু পাউ-কটির মত, কারণ পতুগীজ 'পাউ' শব্দের অর্থ রুটি) সঙ্গে এর অতি অল্প মিল। আফগানী নান্ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং আকারে অনেকটা সিংহল দ্বীপের গ্রায়। রুটির পাশগুলো মোলায়েম, মধ্যখানটা বিস্কুটের মত ক্রিস্প্ (ওই দিয়ে ভোজনের শেষ অঙ্কে দিয়া 'চীজ্ অ্যাণ্ড বিস্কিট্'ও খাওয়া যায়)। এই নান্ আপনি কতখানি মোলায়েম বা ক্রিস্প্ খেতে পছন্দ করেন সেটা দু-চার দিন খাওয়ার পরেই খান-সামাকে বলে দিতে পারবেন।

(২) তন্দুরী মাছ। মাঝারি সাইজের একটা আন্ত মাছ সাক্ষুতরো করে, মসলাদি মাখিয়ে তন্দুব-(আত্ন) এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যখন বেরিয়ে আসে তখন মনে হয়, বোধ হয় ভালমত রান্না হয় নি। কিন্তু খেয়ে দেখবেন, অপূর্ব স্বাদ। আমাদের বাড়িতে তন্দুর নেই বলে আমরা পাঞ্জাবীদের এই 'তন্দুরী ফিশ্' অবদানটি মুক্তকণ্ঠে এবং সরস জিহ্বায় মেনে নিয়েছি।

(৩) তন্দুরী চিকেন্। এতে প্রায় কোনও মসলাই ব্যবহার করা হয় না বলে এ-জিনিস যত খুশি খান অস্ব্থ করবে না। অতি মোলায়েম এবং উপাদেয়। আন্ত মুগীটি হাত দিয়ে ভাঙবেন, এবং হাত দিয়েই নান্ সহযোগে খাবেন—ছুরি-কাটার পাশ মাড়াবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শিক কাবাব, শামী কাবাব, বড়ী কাবাব, মিশরী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পারেন। একটুখানি গ্রেভি-ওলা ভিজ়ে বস্তুর প্রয়োজন হলে কোফ্তা-নরগিস্ (অনেকটা ডেভিলের মত) অর্ডার দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ-পর্বে শুকনোই পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত এক, দুই, তিন নম্বরের জিনিস খাস কলকাতাই মোগলাই রেস্টুরাঁয় পাবেন না। তবে শুনেছি, ইদানীং কোনও কোনও রেস্টুরাঁ চাপে পড়ে রাখতে আরম্ভ করেছেন।

এবার ভেজার পালা।

মটন পোলাও, চিকেন পোলাও, আঙা পোলাও এবং মটর পোলাও। ফিশ

পোলাও অন্ন রেস্তরাঁয় পাওয়া যায়।

এর সঙ্গে ছুনিয়ার জিনিস খেতে পারেন। কোর্শী, কালিয়া, দোলমা, রেজালা যা খুশি। ধীরে ঝাল খেতে ভালবাসেন অথচ অল্পখের ভয়ে খান না, তাঁরা 'দহী-ওলা-গোশ্‌—অর্থাৎ দহী-মাংস (সাধারণত মটনের হয়) খাবেন। দিল্লি-ওলারা যে এত ঝাল খেয়েও কাল কাটাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, হয় দহী-ওলা গোশ্‌ খায়, নয় খাওয়ার পর এক ভাঁড় টক দই খায়।

পেটটাকে যদি আরও ধাতস্থ রাখতে চান তবে খাবেন 'শাক ওলা-গোশ্‌—অর্থাৎ শাকের সঙ্গে মাংস। এটা শিখদের প্রিয় খাদ্য—যে রকম ওরা করেলার ভিতর কিমা মাংস পুরে দোলমা খায়।

আর ঝাল-কর্জী, রওগন যুগ, শাহী কুর্মা এবং লাটের মাল চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই। ভেজিটেরিয়ানদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি। তবে মাংসহীন সাদা পোলাওয়ের সঙ্গেই চীজ-মটর ঝোল মানায় বেশী।

আমি মটর-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন কিংবা চিকেন কারি খাই; কারণ মটন-পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে মটনের বাড়াবাড়ি হয়, আবার চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে ছোটো মাংসের ককটেলকে আমার গুণ্ডলেটে বলে মনে হয়। তবে এটা নিছকই রুচির কথা। আর ভুলবেন না যেতির অগ্রাচুর্ষ হলে, সব সময়ই ওটা আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায়।

সর্বশেষ উপদেশ, বয়স্ক ওয়েটারকে মেহু বাছাই করার সময় ভেঁক নিয়ে তার সহপদে নেবেন। না নিলে কী হয়?

এক ইংরেজ স্নব গেছেন প্যারিসের রেস্তরাঁয়। তিনি কারও উপদেশ নেবেন না। মেহুর প্রথম পদে আঙুল দিয়ে বোঝালেন কী চাই। নিশ্চয়ই স্থপ। এল তাই। উত্তম প্রস্তাব।

তারপব আঙুল নামালেন অনেকখানি নীচে। তাবলেন মাছ, মাংস আঙা কিছু একটা আসবে। এল আবার স্থপ। ইংরেজ জানতেন না, করাসীরা বাইশ রকমের স্থপ রাখে।

খেয়েছে! এখন কী করা যায়? আঙুল দিলেন সর্বশেষ পদে। পুড়িত, কিংবা আইসক্রীম হবে।

এল খড়কে—টুথপেক্ !!

বাংলার শুণ না জর্মন শুণী

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-করিডরে দু-পিরিয়ডের মাঝখানে লেগে যায় গোক-হাটের ভিড়, কিংবা বলতে পারেন আমাদের সিনেমা-হলের সামনের জনারণ্য। তফাত শুধু এইটুকু যে, জর্মনরা আইনকানুন মেনে চলতে ভালবাসে বলে ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি বড়-একটা হয় না, করিডরে ত রীতিমত উজ্জ্বল-ভাটা ছুটো শ্রোতর মত ছেলেমেয়েরা চলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসের দিকে, কিংবা ইউনিভার্সিটি-রেক্তরার দিকে অথবা কমন-রুম পানে।

তার মাঝখানে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখতে পেতুম বুড়ো আইনস্টাইন হস্তদস্ত হয়ে ছুটে চলেছেন ক্লাস নিতে। আলুখালু কেশ, লজ্জা বোধ। কোন্ খেয়ালে মগ্ন ছিলেন খোদায় মালুম। শেষ মুহূর্তে টনক নড়েছে সেদিন তাঁর ক্লাস আছে—রুম নম্বর গিয়েছেন ভুলে, কী পড়াতে হবে তারও খেয়াল নাই। ছেলেরা সমীহভরে পথ করে দিত আর বুড়ো আইনস্টাইন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে তাবৎ ইউনিভার্সিটি-বিল্ডিং চষে বেড়াতেন আপন রুমের সন্ধানে। মুখে শুধু ‘পারদৌ, পারদৌ’ (মাফ করুন, মাফ করুন), কারণ জানেন, কলিশন লাগলে দোষ তাঁরই।

অথবা দেখতে পেতুম, অর্থশাস্ত্রের বাবা কোটিল্য সমবার্ট চলেছেন হেলেহুলে। বগলে একগাদা কেতাব, তাবই ধাক্কায় টাইটা একটু বেঁকে গিয়েছে, সঙ্গে গোটা দশেক শিষ্য-শিষ্যা। চলতে চলতেই পড়ানো চলছে। সমবার্ট আর কতদিন বাঁচবেন কে জানে, তাই—

ছেলেরা সব সমবার্টের ঘিরে

মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিক ঘিরে—

তাঁর শেষ জ্ঞানবিন্দুটুকু শুষে নিতে চায়।

কিংবা দেখতুম কাঁচাপাকা চুল, একচোখ কানা সংস্কৃতির অধ্যাপক ল্যুডার্স। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বেদে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতা আর্থ, অনার্থ, না প্রাক-আর্থ, তাই নিয়ে যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা খুন-খারাপি করার মত অবস্থায় এসে পড়েছেন, তখন সবাই বললেন, ‘মোন-জো-দড়ো বৈদিক, না প্রাক-বৈদিক, সেকথা ঠাহর করার মত এলেম মার্শালের পেটে নেই। সেখানে পাঠাও ল্যুডার্সকে। চতুর্বেদ আর সে-সময়কার আহার-বিহার, ক্ষেত-খামার, হাতিয়ার-তলোয়ার সর্ববিষয় তাঁর নখদর্পণে। মোন-জো-দড়ো সভ্যতার গোপনতম কোণেও যদি বৈদিক সভ্যতার কণামাত্র প্রভাব গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে, তবু সে

ল্যুডার্সকে কীকি দিতে পারবে না—

‘করাচী বন্দরে নেমেই ল্যুডার্স তার গন্ধ পাবেন, ওই একটি চোখ দিয়েই তাকে খুঁজে নেবেন আর কীকি করে ধরে নিয়ে বিশ্বজনকে দেখিয়ে দেবেন, বেদের ইন্দ্রদেব কোন ময়ূরের প্যাঁথম পরে সেখানে ঘাপটি মেঁরে বসে আছেন।

‘আর ল্যুডার্স যদি বলেন, “না, বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে মোন-জো-দড়োর কোনও প্রকারের যোগসূত্র নেই,” তাহলে নাককান বুজে সেই রায় মেঁনে নিয়ে তাদং বগড়া-কাজিয়ার উপর ধামাচাপা দিয়ে দাও।’

আইনস্টাইন, সমবার্ট, ল্যুডার্স এঁরা সব ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ, তোরণ-শিখর-বিশেষ। তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো শুধে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরে কত যে নাম-না-জানা ঘুলঘুলি গবাক্ষ ছিলেন তার হিসেব রাখবে কে ?

এঁরা যে বিশ্ববিদ্যালয়-যজ্ঞশালার প্রত্যন্ত প্রদেশে অনাবৃত উপেক্ষিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হতে সময় লাগত একটু বেশী। এঁদেরই একজন ছিলেন, অধ্যাপক ভাগনার, ইনি পড়াতেন বাংলা ভাষা।

জর্মন ভাষা বিশ্ববরেণ্য ভাষা। সে-ভাষা পড়বার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু বাংলার মত অর্বাচীন ভাষা পড়বার ব্যবস্থা যে স্কুদর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এ-সংবাদ শুনে পুলকিত হয়েছিলুম।

ভাগনারের সঙ্গে আলাপ হতেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথেষ্ট বঙ্গভাষাভাষীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় নি বলে তিনি কথা কইলেন জর্মন ভাষায়, মাঝে মাঝে বাংলা মসলার ফোড়ন দিয়ে। অদ্ভুত শোনাল, কিন্তু সেই নির্বাক্ষব পাণ্ডববর্জিত দেশে বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে জানটা যে তর হয়ে গেল, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ভাগনারের বাড়ি গিয়ে দেখি, ভদ্রলোক একথানা বাংলা বই নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। ভাইনে বাঁয়ে বিস্তর বাংলা অভিধান, ব্যাকরণ—এক পাশে ব্যোটিলিক্স-রোটের পর্বতপ্রমাণ সংস্কৃত-জর্মন অভিধান।

বাংলা অভিধানে হদিস না মিললে সংস্কৃত দিক-সুন্দরীর (ডিক্সনারি) নিকট দিগদর্শন যাচঞা করবেন বলে।

ভূমিকা না করেই বললেন, ‘আমায় একটু সাহায্য করুন।’

এতদিন পর আজ আর টিক মনে নেই কিন্তু খুব সম্ভব গল্পটা ছিল শরৎ চাটুয্যের ‘আঁধারে আলো’! ‘হাবুবাবু ছোঁরা চালাতে শিখেছে’ এইরকম ধারা কী জানি কী একটা ছিল। যোগক্লান্তার্থে ‘নীলকণ্ঠ’ শিব এ-কথা ভাগনার জানতেন কিন্তু ‘হাবুবাবু’ যোগক্লান্তার্থে যে শাস্ত-শিষ্ট গোবেচারী—নিরুৎসাহ—সে কথাটার

সন্ধান ভাগনার কোথাও পান নি, অবশ্য আভাসে-আন্দাজে শব্দটার খানিকটে মানে আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু ভাগনার দেখলুম তাঁর ওয়াটালুতে এসে ঠেকেছেন, সেই গল্পের মধ্যে বিদ্যাপতির এক উদ্ধৃতিতে :—

“আজু রজনী হম ভাগে পোহাইমু

পেখমু শিয়া-মুখ চন্দা

জীবনযৌবন সকল করি মানমু

দশদিশ ভেল নিরানন্দা—”

আজু-কাজু, পেখমু-টেখমু খাটি বাংলা কথা নয়, কিন্তু ছ’শিয়ার ভাগনার কেঁদে-ককিয়ে এসব কথার মানে বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু ‘নিরানন্দা’ কথায় এসে যে মানে তিনি করেছেন, সেটা মন মেনে নিলেও হৃদয় ‘নিরানন্দা’ই থেকে যায়।

ভাগনাব বললেন, ‘তবে কি এই বুঝতে হবে, প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করাতে আমার এতই আনন্দ হল যে, মনে হচ্ছে দশদিশ নিরানন্দ হয়ে গিয়েছে, কারণ বিশ্বপ্রকৃতির সকল আনন্দ আমাতে এসে ঠাঁই নেওয়ায় “দশদিশ নিরানন্দ” হয়ে গিয়েছে?’

অভিনবগুপ্তের না হোক, অভিনব টীকা তো বটেই।

সবিনয়ে বললুম বিদ্যাপতি বিনা টীকায় পড়ার মত বিদ্যা আমার নেই তবে যতদূর মনে পড়ছে, কথাটা এখানে ‘নিরানন্দ’ নয়, আসলে আছে বোধ হয় ‘নিরবন্দা’। আমাতে প্রিয়াতে মিলন হয়েছে ঐক্য হয়েছে, দশদিশে আমি আর কোনও দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছি নে। যেখানে যত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বিরহ ছিল সেখানেই মিলন এসে গিয়েছে—দশদিশে এখন শান্তি।

আর বেদেও ত ঋষি প্রার্থনা করেছেন, “সর্বপ্রকারের দ্বন্দ্বের সমাধান হোক।”

ভাগনার বললেন, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ছাপার ভুল হতে যাবে কেন?

এর কোনও সহুত্তর আমি দিতে পারি নি। আপনারা যদি বাতলে দেন। ঘটনাটি যে এত সবিস্তর বয়ান করলুম তার ‘মরাল’ কী?

সুকুমারী ভাষায় বলি :—

‘হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা

রাম্গুরুড়ের লাগছে ব্যথা

বুঝে না কি তারা?’

প্রকাশক আর ছাপাখানা যে ‘নিরঙ্কুশ’ হয়ে ছাপার তুল করেই যাচ্ছেন, ‘ভাগনারেই লাগছে ব্যাথা, বুঝছে না কি তারা ??’

শিক্ষা প্রসঙ্গ

কিছুকাল আগে বোম্বায়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বলেন, এদেশের সবচেয়ে বড় কর্তব্য আপামরজনসাধারণের ভিতর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা এবং বেকার-সমস্যার নিরঙ্কুশ সমাধান করা।

এ অতি সত্য কথা—এমন কি পৃথিবীর বর্ষরতম দেশও এ-তদ্ব মেনে নেবে। কিন্তু প্রাণ, শিক্ষার বিস্তার এবং প্রসার করা যায় কী প্রকারে? পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ আছে :—

‘যত টাকা জমাইছিলাম

সুঁটকি মাছ খাইয়া

সকল টাকা লইয়া গেল

‘গুলবদনীর মাইয়া।’

যত রকমের খাজনা হতে পারে, যত প্রকারের ঋণীয় অন্নায্য ট্যাক্স হতে পারে সবই ত চাঁদপানা মুখ করে দিচ্ছি। সরকারের হাতে সে-টাকা জমা হচ্ছে এবং তার বেবাক খরচ হয়ে যাচ্ছে এ-খাতে ও-খাতে সে-খাতে, অর্থাৎ গুলবদনীর মাইয়াই সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত যে-অর্থের প্রয়োজন তার শতাংশের এক অংশও উদ্ধৃত থাকছে না।

কাজেই গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলি কী করে, পুরনোগুলিই বা চালু রাখি কোন্ কোশলে?

কিন্তু আমার মনে হয় পুরনো স্কুল চালু রাখা আর নতুন স্কুল খোলাই শিক্ষা বিস্তারের জন্ত প্রধান কর্ম নয়।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, কোন বিশেষ গ্রামে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একটি ভাল পাঠশালা উত্তমরূপে চালু আছে, প্রতি বৎসর দশ বারোটি ছেলে শেষ পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বৃত্তিও পাচ্ছে, কিন্তু তবু যে-কোনও সময় আপনি সে-গ্রামে গিয়ে যদি হিসেব নেন, কটি ছেলে লিখতে পড়তে পারে, তবে দেখবেন দশ-বারোটির বেশী না; বাদবাকী আর সবই লেখা-পড়া ভুলে গিয়েছে এবং যে দশ-বারোটি কেঁদে-ককিয়ে পড়তে পারে তারাও শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে। অবশ্য আমি এস্থলে সাধারণ চাচা-মজুরের

কথাই ভাবছি—মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তশালী পরিবারের কথা উঠছে না।

এর কারণ অহুসঙ্কান করলে দেখতে পাবেন—আমরা চাষার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে ভাবি, আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু একথা ভাবি নে, তারা পরীক্ষায় পাস করার পর পড়বে কী! তারা যে পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায় তার একমাত্র কারণ তাদের কাছে পড়বার মত কিছু থাকে না।

ইয়োরোপের চাষা মজুর আমাদের মত গরিব নয়। তারা যে নিরক্ষর হয়ে যায় না, তার একমাত্র কারণ তারা খবরের কাগজ পড়ে এবং মেয়েরা ক্যাথলিক হলে প্রেয়ার বুক আর প্রটেষ্ট্যান্ট হলে বাইবেল পড়ে। অবসর-সময়ে হয়ত একখানা নভেল কিংবা ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে, কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে, কিন্তু এগুলো আসল কারণ নয়—আসল কারণ খবরের কাগজ, প্রেয়ার বুক এবং বাইবেল।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চাষা খেতে পায় না, সে খবরের কাগজ কিনবার পয়সা পাবে কোথায়?

তাই দেখতে পাবেন, যে-চাষা কোন গতিকে তার ছেলেকে পাঠশালা পাসের সময় একখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত কিনে দিতে পেরেছিল তাব বাড়িতে তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে। এই আংশিক বাঁচাও তাটা কিন্তু প্রধানত বাংলা দেশে। হিন্দীভাষীদের তুলসী রামায়ণ পড়ে সে-লাভ হয় না, কারণ তুলসীদাসের ভাষা আর আধুনিক হিন্দীতে প্রচুর তফাত। তুলসীদাসের ভাষা দিয়ে আজকের দিনে চিঠি লেখা যায় না—কাশীরাম কিংবা কুন্তিবাসের ভাষার সঙ্গে কিন্তু আধুনিক বাংলার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

তাই দেখতে পাবেন মুসলমান চাষা পাঠশালা পাসের পর খুব শিগগিরই নিরক্ষর হয়ে যায়, কারণ সে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে না এবং বাংলা ভাষায় এ-রকম ধরণের সহজ সরল মুসলমানী ধর্মপুস্তক নেই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতিটা কী রকম তার খবর আমার জানা নেই, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অহুসঙ্কান করলে আমরা শিক্ষাবিস্তারের জগৎ বিস্তর হৃদিস পাব।

তা হলে এমুখ কী?

যে-উত্তর সকলের প্রথম মনে আসবে সে হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি বসানো। কিন্তু অত টাকা যোগাবে কোন্ গোঁরী সেন? সরকার ত দেউলে। তা হলে?

এইখানে এসে আমিও আটকা পড়ে যাই। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নতুন ইমুল

খোলার চেয়েও বড় কাজ, পড়ার জিনিস সাক্ষর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া—বিনি পরসায় কিংবা অতি অল্প দামে।

আমি বহু বৎসর ধরে এ-সমস্তা নিয়ে মনে তোলপাড় করেছি, বহু গুণীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, দেশ-বিদেশে উন্নত অন্নত সমাজে অনুসন্ধান করেছি—তারা এ-সমস্তার সমাধান কী প্রকারে করে, কিন্তু কোন ভাল ওষুধ এখনও খুঁজে পাই নি। আমার পাঠকেরা যদি এ-সম্পর্কে তাঁদের সূচিস্থিত অভিমত আমাকে জানান, তবে তার আলোচনা করলে আমরা লাভবান হব সন্দেহ নেই।

অল্প এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ছাত্রদের ‘স্পিরিচুয়াল’ ডিরেকশান দেওয়া।

আমার মনে হয়, এইমাত্র আমরা যে-সমস্তা নিয়ে বিভ্রত হয়েছিলুম সেই সমস্তারই এ আরেকটা দিক।

‘স্পিরিচুয়াল’ বলতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ‘রিলিজিয়ান’ বলতে চান নি—তাহলে হাক্কাম অনেকখানি কমে যেত—তাই মোটামুটি ধরা যেতে পারে, তিনি আমার প্রয়োজনের দিকটাতেই ইঙ্গিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্ম ছাত্রকে তার দেশের বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্য আত্মার কুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনের অধিক স্বহা হু আহাৰ্য রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, অধ্যাপকেরা যদি ছাত্রকে ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করতে পারেন, সে-বৈদগ্ধ্যের উত্তম উত্তম বস্তুর রসাস্বাদ করাতে শেখান, তবে ছাত্র নিজের থেকেই তার প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ধন চিনে নিতে পারবে। সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুষ্টিযোগ যখন মুষ্টিগত নয়, তখন ছাত্রের সামনে গন্ধমাদন রাধা ছাড়া উপায় নেই—যে যার বিশল্যকরণী বেছে নেবে।

কিন্তু সমস্তা তৎসঙ্গেও গুরুতর। ছেলেদের পড়তে দেব কী? ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সংস্কৃত-পালিতে, তিন ভাগ ইংরেজীতে, আর মেরে কেটে ছুতাং বাংলায়। অথচ আজকের দিনে সব ছেলেকে ত আর জোর কবে বি. এ অনার্স অবধি সংস্কৃত পড়াতে পারি নে। এবং তাতেই বা কী লাভ? কজন সংস্কৃতে অনার্স গ্র্যাজুয়েটকে অবসরসময়ে সংস্কৃত বইয়ের পাতা ওঁটাতে আপনি আমি দেখছি? সংস্কৃত গড় গড় করে পড়া শিখতে হলে টোল ছাড়া গতাস্তর নেই।

অতএব মাতৃভাষাতেই আমাদের বৈদগ্ধ্যার্চা করতে হবে।

এবং সেখানেই চিন্তির। আজ যদি আপনি বেদ, উপনিষদ, বড়দর্শন, কাব্য,

অলঙ্কার, নৃত্যনাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অমুবাদে পড়তে চান তবে একবার ঘুরে আসুন কলেজ স্কোয়ারে বইয়ের দোকানগুলোতে। যে-সব বইয়ের বাংলা অমুবাদ হয়ে গিয়েছে সেগুলোই যোগাড় করতে গিয়ে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে হতে হবে।

আর কত শত সহস্র পুস্তক যে আপনার পড়তে ইচ্ছা হবে, অথচ অমুবাদ নেই তার হিসেব করবে কে ?

হিন্দীওয়ালাদের ত আরও বিপদ। আমাদের চেয়ে ওদের অমুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশী কম-জোর। এই দিল্লির কনট সার্কাসে আমি হিন্দী বইয়ের দোকানে সার্কাসের ঘোড়ার মতই চকর লাগাই—আজ পর্যন্ত কোন সংস্কৃত বইয়ের উত্তম হিন্দী অমুবাদ চোখে পড়ল না, যেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।

মারাঠী ভাষায় তবু কিছু আছে, গুজরাতীতে তারও কম। আসামীতে প্রায় কিছুই নেই, ওড়িয়ার খবর জানি নে—তবে যেহেতু শিক্ষিত আসাম এবং উড়িষ্যা-সম্ভান মাত্রই বাংলা পড়তে পারেন তাই তাঁদের জ্ঞান বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

মোন্দা কথায় কিরে যাই। রাধাকৃষ্ণ ত দায় চাপিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ অধ্যাপকদের উপর। কিন্তু হায়, তাদের ত দরদ নেই এসব জিনিসের প্রতি। আর স্বয়ং রাধাকৃষ্ণের যদি দরদ থাকত তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাষ্ট্রপতি হতে গেলেন কেন ??

পোলেমিক

কলকাতাতে বর্ষা বসন্ত আছে বটে, কিন্তু তাতে করে কলকাতাবাসীর জীবন-যাত্রায় কোনও প্রকারের কেরফার হয় না। হৈ-ছোড়াড়, পার্টিপরব, কেনাকাটা, মারামারি একই ভঙ্গিতে চলে। দিল্লিতে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে দুই ঋতু—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে এস্তার দাওয়াত-নেমস্তন্ন, দিনে দশটা করে মীটিং, হুপায় দুটা বরে আর্ট প্রদর্শনী, আজ ভরতনাট্যম, কাল কথাকলি, পরশু রেহুদী মেহুহিন, আর এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসঙ্কম, মুশাইরা। গ্রীষ্মকালে এ-সব-কিছুতে মন্দা পড়ে যায়, শুধু যে সব দেশের বাৎসরিক পরব গরমে পড়েছে, সে সব দেশের রাজদূতেরা বাধ্য হয়ে “রিসেপশন” দেন, আর সবাই শার্ক স্কিন আর কালো বনাতের মধ্যখানে প্রচুর পরিমাণে ঘামেন। পার্টিগুলোর জলুসেরও খোলতাই হয় না, কারণ ডাকসাইটে হুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন—

পাটিতে যদি রক্তবেরঙের শাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পাটি অতি নিরামিষ (নিরঘৃ ত বটেই; এসব পাটিতে জল মানা)। তাই পাঁচজন পাটি থেকে ভদ্রতা রক্ষা করেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়েন।

এসব হল নিউ দিল্লির কাহিনী। পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না। প্রায় প্রতিদিনই কোন-না-কোন নাগরিককে অভিনন্দন করার জন্তু কোন-না-কোন পার্কে তাঁবু আর শামিয়ানা খাটিয়ে, দিগ্বিড়িঙ্গে লাউডস্পীকার বুলিয়ে যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ হয় তাতে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে—দরজা জানলা বন্ধ কবে একে অন্তের সঙ্গে কথা পর্যন্ত কওয়া যায় না।

এ-রকম একটা অভিনন্দন-পাটিতে আমি দিনকয়েক পূর্বে গিয়েছিলুম। যে দুজনকে অভিনন্দন করা হল, আমি তাঁদের নাম শুনি নি, দিল্লির কজন লোক তাঁদের নাম শুনেছে তাও বলতে পারব না।

দুজনাই যে প্রশস্তি গাওয়া হল, তা শুনে আমার বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের একটি ছোট লেখার কথা মনে পড়ল। এ লেখাটি সচরাচর কেউ পড়েন না বলে উদ্ধৃতির প্রলোভন সঞ্চার করতে পারলুম না।

‘কবিকুলতিলকশ্রু কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোশ্রু’ এই ছদ্মনামে বিজ্ঞাসাগর মহাশয় লিখেছেন :—

‘আমি এ স্থলে—নাথ বিজ্ঞারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষণীসভাদেবী—মোহন বিজ্ঞারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিজ্ঞারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিজ্ঞাবুদ্ধির দোড়ও উভয়ের একই ধরনের। সুতরাং উভয়েই নবদ্বীপ-চন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই কিন্তু এ পর্যন্ত এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং একজন বই, দুইজনে নদিয়ার চাঁদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একজন একবারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে দুজনে ছড়ছড়ি গুঁতাগুঁতি করিয়া মরিবেন সেটাও ভাল দেখায় না। এজন্ত আমার বিবেচনায় সমাংশ করিয়া দুজনকেই এক এক অর্ধচন্দ্র দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা উচিত। শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষণীসভাদেবী আমার এই পক্ষপাতবিহীন কয়তা ঘাড় পাতিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগ বা বিবাদ বিসংবাদ থাকে না। এক্ষণে তাঁর যেরূপ মরজি হয়।’

নিত্য নিত্য কারণে-অকারণে হৈ ছল্লোড় করার অভ্যাস দিল্লিবাসী বাঙালীর

উপরও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ এখানে সাহিত্যসভা, কাল এখানে বর্ষামঙ্গল প্রায়ই এসব ‘পরব’ হয়।

এবং অনেক সময় মনে হয়েছে, এ-সব পরবে সত্যকার কাজ যেন ঠিকমত হচ্ছে না।

তাই আমি চেষ্টা করেছি, ছোট গণ্ডির ভিতর অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি পক্ষে “স্টাডি সার্কেল” বসাবার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-যাবৎ কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার বয়স হয়েছে তদুপরি আমি খ্যাতনামা সাহিত্যিক নই, কাজেই আমার দ্বারা এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পত্তন সম্ভবপর নয়, অথচ এর প্রয়োজন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কেন্দ্র হিসাবে দিল্লির মাহাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। কেন্দ্রের হাতে অর্থ আছে এবং সে-অর্থের কিছুটা প্রাদেশিক সরকারও পান—সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সেবার্থে। বাংলার প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যের জন্ত কত টাকা বাগাতে পারবেন, সে তাঁরা জানেন, কিন্তু আমরা যারা দিল্লিতে আছি, এ বাবদে আমাদেরও যথেষ্ট কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোট ছোট কর্মঠ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের কর্মতৎপরতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। আজ যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের দরদেব অভাব, তার প্রধান কারণ আমরা সাহিত্যের সত্যকার চর্চা করি নে।

তার অগ্রতম জাজ্জল্যমান উদাহরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আমরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের জন্ত কিছুই করে উঠতে পারি নি, অথচ সেখানে রুশ ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আবার দিল্লিতে ব্যাঙের ছাতার মত একটা জিনিস বড় বেশী গজাচ্ছে। এঁরা হচ্ছেন আট ক্রিটিক সম্প্রদায়। এঁরা ছবি বোঝেন, মেমুহিন শোনেন, আবার আলাউদ্দীন সায়েবকেও হাততালি দেন; এঁরা ভরতনাট্যম আব মণিপুরী নিয়ে কাগজে কপচান, চীনা সেরামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রোঞ্জ সম্বন্ধে এঁদের ‘জ্ঞান’ের অন্ত নেই।

এঁদের একজন ত সবজাস্তা হিসেবে এক বিশেষ গণ্ডিতে রাজপুত্রের আদর পান, বিলক্ষণ দু পয়সা তাঁর আয়ও হয়। তা হোক, আমার তাতে কণামাত্র আপত্তি নেই—পারলে আমিও ঠর ব্যবসা ধরতুম।

কিন্তু আমার দুঃখ ভরলোকটি বড়ই বাংলা এবং বাঙালী-বিশেষী। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা যে ‘বেঙ্গল স্কুল’ গড়ে তুলেছেন, সেটাকে মোকা পেলেই এবং মাঝে মাঝে না পেলেও বেশ কড়া

কড়া কথা শুনিয়ে দেন।

তঁার মতে যামিনী রায়, যামিনী রায়, এবং আবার যামিনী রায়। বাংলা দেশের আর সব মাল বরবাদ, রুদ্ধ।

ইনি যে সব ‘আর্ট সমালোচনা’ প্রকাশ করেন, তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ হওয়া উচিত। যারা এসব জিনিসের সত্য সম্বন্ধার, তাঁদের উচিত বেরিয়ে এসে আপন দেশের স্বসন্তানদের কীর্তি বার বার স্বীকার করা। ‘ডেকাডেন্স’ বা ‘গোল্ডায় যাওয়ার’ অন্ততম লক্ষণ আপন দেশের মহাজনকে স্বীকার করা বা খেলো করে দেখানো।

এ-জাতীয় লেখাকে ‘পোলেমিক’ বলে—বাংলায় ‘মসীযুদ্ধ’ বলতে পারি। এবং মসীযুদ্ধে বাঙালীব পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে। ভারতচন্দ্রের পঞ্চময় পোলেমিক, আর বাঙলা গল্প ত আরম্ভ হল খাঁটি মসীযুদ্ধ দিয়ে। রামমোহন ত কলমের লড়াই লড়লেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের সঙ্গে। তার পরের বাঘ বিছাসাগর। তিনি যে পোলেমিক লিখেছেন, সে-লেখা লিখতে পারলে পৃথিবীব বড় আইনজীবী নিজেকে ধ্বংস মনে করবেন—অধর্মের মতে পোলেমিকে বিছাসাগর মশাই মিলটনের বাড়ি। আর মসীযুদ্ধে ব্যঙ্গ কী করে প্রয়োগ করতে হয় তাব উদাহরণ ত আপনারা একটু আগে ‘অর্ধচন্দ্র’ দানে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তারপর তিন নম্বরের মল্লবীর বন্ধি। তিনি হেষ্টি সাহেবের (নাম ঠিক মনে নেই) বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের হয়ে যে লড়াই লড়লেন সে ত অতুলনীয়। বরঞ্চ বলব, ‘কৃষ্ণচরিত্র’-এর চেয়েও বড় ক্যানভাসে কাজ করেছেন বন্ধি এ-মসীযুদ্ধে এবং এ-সত্যও আজ স্বীকার করব যে, আজ যদি কোন হেষ্টি পুনরায় দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে ও-রকম পাণ্ডিত্য আর ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে (এখানে সাহিত্যিক বন্ধিমের কথা হচ্ছে না—সে-সাহিত্যিক যে নেই সে-কথা ইন্সুলের ছোঁড়ারা পর্যন্ত জানে) লড়নেওলা আজ বাংলা দেশে নেই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ, তিনিও কম লড়েন নি। তবে তাঁর র্কাচবোধ বিংশ শতাব্দীর ছিল বলে তাঁর লেখাতে ঝাঁজ কম, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখা চিঠিতে কী তিক্ততা, কী বেদনা।

গল্প শুনেছি উহঁর কবি-সম্রাট গালিব সাহেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জওক সাহেবের একটি দোহা মুশাইরায় (কবি-সঙ্গমে) শুনে বার বার জওককে তসলীম করে বলেছিলেন, ‘আপনি দয়া করে ওই দুটি ছত্র আমায় দিয়ে দিন, আর তার বদলে আমি আমার সম্পূর্ণ কাব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।’

রবীন্দ্রনাথের ওই শেষ চিঠির পরিবর্তে পৃথিবীর যে-কোন পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোচ্চারিত প্রস্তুত হবেন।

শরৎচন্দ্র যদি তাঁর মসীযুক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে না করে সে-যুগের আর যে-কোন লোকের সঙ্গে করতেন, তবে তিনিও মসীযোক্তা হিসেবে নাম কিনে যেতে পারতেন।

তাঁর ‘নারীর মূল্য’ পোলেমিকের প্রথম চাল। বাংলা দেশ এ-পুস্তকের বিরুদ্ধে কলম ধরলে তিনি যে কী মাল ছাড়তেন, তার কল্পনা করতেও আমি ভয় পাই। ধর্ম বিবেকানন্দ পোলেমিস্ট, ব্যঙ্গকবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল।

এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কোনও বাঙালী এই সব ভুঁইফোড় ‘আর্ট ক্রিটিক’দের জোরসে ছু-কথা শুনিয়ে দেয় না কেন??

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রগ্ন ওঠে না, এ-বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কী। রস-নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন, আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অন্নবিস্তর যাচাই করে নেন। কিন্তু যখন কোনও জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ-প্রগ্নও ওঠে যে-সব লোক এ-আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এ-বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অহুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। ‘বাঙালীচরিত্র’ সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথি-প্রবন্ধ থাকত, তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারত। তা নেই। বস্তুত আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অল্প প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অরূপণ, অকরণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা ‘বাঙালী বড় দস্তী’, ‘বাঙালী অল্প প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না’। সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, ‘বাঙালী মেয়ে ভাল চুল বাঁধতে জানে,’ কিংবা ‘ব্যবসায়ে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল’।

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লিতেই প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনও দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলি জিনিস বুঝে যাবেন।

(১) সিদ্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয় নি। সিদ্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেনী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লির কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেন্টরা খুলেছে। ফলে খাম দিল্লির মোগ্লাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্ত্র পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। (দিল্লির রান্নার কাছে সে রান্না অজ্ঞ পাড়াগেয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট-গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবদৈব সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনও হাত পাতে নি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বাশঙ্করণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবুদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পূব-বাংলাব লোক পশ্চিম-বাংলায় এসে অনেক করেছে, কিন্তু পাঞ্জাবী-সিদ্ধীরা যতখানি পেবেছে ততখানি কি তাদের জ্বাবে হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমাব উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কথা শুনিতে দেবেন। আমি নতশিরে সব উত্তর মেনে নিচ্ছি এবং এ-স্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবাব জন্ত। একটু বৈধ ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসাবিশেষের চাকরি, সেখানে সে-চাকরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবুদ্ধি ও কল্যাণের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এই সব চাকরি পাচ্ছে কজন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিতি বেশি। কী? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের ভাষা হকগত বেশি পাচ্ছে কি?

দিল্লিবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবেন, ‘না, না, না।’ পরশ্রী-কাতর অবাঙালীও সে-ঐক্যতানে যোগ দেন। মনে মনে হয়ত বলেন, ‘ভালই হয়েছে।’ তা সে-কথা থাক।

কেন পায় নি তার জ্ঞান আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কে কেন পারলে না, সে সাক্ষ্যই গাইবার জ্ঞানই এ-আলোচনা। একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লির সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনও তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শত্ৰু মিত্র দিল্লিতে যা ভেঙ্কিবাজি দেখালেন সে-কেরামতি সম্পূর্ণ অবিখ্যাত। অল্পের ভিতর লিটল থিয়েটার চালান চাটুর্ঘ্যে। দিল্লিতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকীলবাবুর তাঁবুতে। গাওনা-বাজনাতে বাঙালি আলাউদ্দীন সায়েব—বিশিষ্টতার কথা নাই বা তুললুম। শিক্ষাদীক্ষায় মোলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবীর।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা ‘পথের পাঁচালী’ দিল্লি ছাড়িয়েও কঁহা কঁহা মুহূর্তে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বৃদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, কে করে তবে ‘নটীর পূজা’, কাকে ডাকা যায় ‘চণ্ডালিকা’র জ্ঞান?

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ স্পর্শকাতর। তাই সে সেনসিটিভ এবং অভিমাত্রী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমসুল হক (কিংবা ইসলাম) নামক একজন ইন্সপেক্টর আসামীদের সঙ্গে পিরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুগণ তাই তার উল্লেখ করে বলত, ‘হে শমসুল, তুমিই আমাদের শ্রাম, আর তুমিই আমাদের শূল।’

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর ‘শ্রাম’ এবং স্পর্শকাতরতাই তার ‘শূল’। হুঙ্কার কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে-রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অল্প প্রদেশের লোক সে-রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জ্ঞান বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চাশ দিন ধরা দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিখাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল-ডিসপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ

ভোঁতা, অহুতব-অহুত্বির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়া-ধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্রিন এ-টুটোর সম্বন্ধ হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর, তাদের ভিতর ডিসিপ্রিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্রিনও ভাল।

এ-আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্রিন মেনে নিলে কী মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, ‘অতখানি ডিসিপ্রিন ভাল নয়।’ কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনি নি, ‘অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।’

কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে ত আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানব কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্রিন কতখানি? কিংবা শুধাই উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন্ বস্তু—স্পর্শকাতরতা, না ডিসিপ্রিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন ॥

দেয়ালি

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেয়ালি-উৎসব হয় এবং সর্বত্রই ওই দিন আলো জ্বালানো হয়। দিল্লিতেও বিস্তার আলো জ্বালানো হয়েছিল—বহু রঙের বহু ধরনের আলো জ্বালিয়ে দিল্লিবাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কলকাতাতেও এই রকম রঙ-বেরঙা আলো জ্বালানো হয়।

আমার কিন্তু এখনও ভাল লাগে ছোট শহরের দেয়ালি দেখতে—যেখানে বিজলী বাতি নেই। বিজলীর প্রধান দোষ মাহুষ নানা রঙের প্রদীপ জ্বালাবার জগ্ৰ সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং তাতে যেন রুচির অভাব লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয়ত, পিঙ্গিমের শিখার কাঁপনে কেমন যেন একটা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিজলীর নিরুপস্থিতি আলো বড় ঠাণ্ডা বড় নির্জীব বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, বিজলী বাতি একবার জ্বালিয়েই খালস, তার জগ্ৰ কোন তদারকি করতে হয় না। তাতে করে কেমন যেন জীবনস্পন্দনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না—মনে হয় সিনেমা-সাজানোর আলোই জ্বালানো হয়েছে, তবে সিনেমা-কোম্পানির অটেল পয়সা নেই বলে রোশনাইটার খোলতাই হয় নি।

তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি, একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে
সৈ (২য়)—৬

নিম্নে এ-পিঙ্গিমে তেল ঢালছে, ও-পিঙ্গিমের পলতে উত্তে দিচ্ছে, পিঙ্গিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইকে হাতে ধরে এক পিঙ্গিম থেকে আর এক পিঙ্গিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের উপর যে-ছবিটি আঁকা হয় সে-ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর বেদনাও এনে দেয়।

দিল্লি শহরও পিঙ্গিম জ্বালে। কিন্তু পাশের বাড়িতে বিজলী বাতির রোশনাই থাকলে পিঙ্গিমের আলো কেমন বেশ স্নান আর বে-জলুস মনে হয়। তত্বপূর্ণ দিল্লির যে-সব জায়গায় পিঙ্গিম জ্বালানো হয় সে-সব জায়গার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্দিক সম্পর্ক নেই, তাই, ‘অতীত প্রাণ যেন মজ্জবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।’

এই দেয়ালি দেখে আরেক দেয়ালির কথা মনে পড়ে গেল। আর যে-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় বর্ণনা তিনি তাঁর দীর্ঘ কবি-জীবনে অল্পই দিতে পেরেছেন :—

‘কবি বলে, যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃদুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের স্নগন্ধ শিউলি
মালা হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমালা সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকুতারা আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনবারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুকা যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।’

দেয়ালির উৎসব-আলো দেখে বার বার মনে পড়ল, জীবনের বড় বড় আশ্রয়-দীপগুলি অনন্ত ওপারে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন। হায়, কজনের জীবনে কবার তায় এপারের দেয়ালি সর্বাঙ্গসুন্দর করে জ্বালাতে পারে !!

গানের কৰ্ণা : ভারত ও কাবুল

শব্দশাস্ত্র বলেছিলেন, কে জানিত কাবুলীও গান গায়।

কিন্তু সতাই কাবুলী গান গাইতে আর শুনে ভালবাসে।

কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশী। কাবুলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা কম, এবং সে-সঙ্গীতে তার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই বলে সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপর। কাবুল শহরে যে দু-চারজন কালোয়াত আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতে বাস করে সঙ্গুর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গিয়েছেন। তবে উচ্চারণের বেলায় খাটি হিন্দী গানে তাঁরা একটুখানি বিব্রত হয়ে পড়েন যদিও উর্দু গজল গাইতে তাঁদের তেমন কোনও অসুবিধা হয় না।

যাঁদের রেডিও আছে, তাঁরা প্রায়ই ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমাদের ওস্তাদী, গজল-গীত শুনে থাকেন।

কাবুলীরা খাস আরবী, ইরানী বা তুর্কীস্থানী সঙ্গীত শুনে হৃষ পান না।

তাই যখন খবর এল, পণ্ডিত ওস্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে গান গাইতে গিয়েছেন তখন আনন্দিত হলুম। এঁর পূর্বে কজন সত্যাকার ওস্তাদ কাবুলে গিয়েছেন সে-কথা আমার জানা নেই, তবে দু-চারজন গিয়ে থাকলেও ওস্কারনাথ যে সেখানে রাজসম্মান পাবেন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

কাঁধত তাই হয়েছে।

একদা কাবুলের রাজা যে-রকম শ্রমণ হিউয়েন সাঙকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলেন ঠিক তেমনি কাবুলের আজকের রাজা পণ্ডিত ওস্কারনাথকে সহৃদয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজা জহীর শাহ পণ্ডিতজীকে বলেন, রেকর্ডে পণ্ডিতজীর সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য তাঁর পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু মুখোমুখি তাঁর আপন কণ্ঠের গান শোনার সুযোগ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

কাবুলীরা তাগড়া জাত, তারা সঙ্গীতে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ পছন্দ করে। ঠিক ওই বস্তুটাই পণ্ডিতজীর আছে—তিনি গাইতে আরম্ভ করলে সভাস্থল গমগম করতে থাকে। তিনি যে শুধু এদেশে সুখ্যাতি তাই নয়, ইয়োরোপও তাঁর গলা শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আমার এক জর্মন বন্ধু পণ্ডিতজীর ‘নীলাধরী’তে গাওয়া ‘মিতুয়া’ রেকর্ডখানা বাজিয়ে বার বার আনন্দোন্মত্ত প্রকাশ করেন।

তাই ওস্কারনাথ যে কাবুলে অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কী।

কিন্তু এই কি শেষ?

হাউই জলে ছাই হয়ে যাওয়ার পূর্বে তার শিখা দিয়ে যে-লোক তার মাটির প্রদীপটি জালিয়ে নেয় সে-ই বুদ্ধিমান। ওকারনাথ কাবুলে যে আতশবাজি দেখিয়ে দিলেন তার জের এখানেই শেষ হওয়া উচিত নয়। ওরই খেই ধরে অনেক কিছু করবার আছে।

বিদেশী কত ছাত্র ভারতীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে এদেশে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি শিখে যায়। এসব বিজ্ঞা আমাদের নিজস্ব নয়, ইয়োরোপের কাছ থেকে শেখা। এগুলোতে আমাদের আপন কোনও গর্ব নেই। কিন্তু কাবুলী ‘শাগরেদ’ যদি ভারতে এসে আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত শিখে যায় তবে তাতে ভারতের গর্ব যোল আনা; এই করেই পুনরায় ভারত-আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত এবং দৃঢ়ীভূত হবে। ভারত সরকারের উচিত তার সুব্যবস্থা করা—আফগানিস্তান আমাদের তুলানায় গরিব দেশ। (আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, কাবুলে পাশ্চাত্য ‘জাজ’ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে; আমরা যদি এই বেলা জোর হাতে হাল না ধরি তবে একদিন দেখতে পাব, কাবুল আর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গুনতে চায় না।)

দ্বিতীয়ত এদেশ থেকে ছাত্র কিংবা অধ্যাপক পাঠাতে হবে কাবুল গিয়ে অহুসন্ধান করতে, আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নৃত্য একদা কাবুলে কতখানি প্রচারিত এবং প্রসারিত ছিল এবং অত্ধকার পরিস্থিতিই বা কী! তাঁকে প্রস্তাব করতে হবে, কী করলে আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অধলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

এ সব কর্ম যত শীঘ্র করা যায় ততই মঙ্গল।

আমি চেষ্টা করছি, কাবুলী খবরের কাগজ থেকে পণ্ডিত ওকারনাথ ঠাকুরের বিজয় অভিযান উদ্ধার করতে।—শব্দ কাজ। দিল্লিতে ত আর কাবুলী সংবাদপত্র বিক্রয় হয় না! পেলেই কিন্তু পেশ করব ॥

উনো, হিন্দী, ক্রিকেট

প্রান্তঃস্মরণীয় কবিরাজ শ্রীকুমার রায় বলেছেন,

‘গৌকে বলে তোমার আমার—গৌক কি কারো কেনা ?

গৌকের আমি গৌকের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।’

অর্থাৎ ‘মাহুষ দিয়ে গৌকের বিচার হয় না—গৌক দিয়ে মাহুষের বিচার করতে হয়।

কথাটা আমাদের কাছে আজগুবি মনে হলেও আসলে তা নয়। চোখ খোলা রাখলে নিত্য নিত্য তার উদাহরণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এই মনে করুন কলকাতা শহর। কী লোকসংখ্যা, কী আয়তন, কী ব্যবসা-বাণিজ্য, কী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা—সব দিক দিয়েই কলকাতা শহর দিল্লিকে একশবার হার মানাতে পারে, কিন্তু হলে কী হয়, দিল্লি যে রাজধানী! অতএব দিল্লির মাহাত্ম্য কলকাতার চেয়ে বেশী।

অর্থাৎ রাজধানীর গৌরব দিয়ে শহর যাচাই করতে হয়। শহরের প্রাধান্য থেকে রাজধানী হয় না।

তবেই দেখুন, সুকুমার রায়ের বাণীটি আপ্তবাক্য কিনা।

তাই দিল্লির ধারণাইউ এন ও'র পালা-পরব করার অধিকার তারই সবচেয়ে বেশী এবং এ সম্বন্ধে দিল্লি বিস্তর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দে-পরব সমাধান করেছে ও বটে।

মেলা গুলী বিস্তর ভাষণ দিয়েছেন। কী গলা, কী বলার ধরন, কী হাত-পা নাড়া, কী উচ্চাস—সব দেখে শুনে মনে কণামাত্র সন্দেহ আর থাকে না, এঁরা যদি দিল্লিতে বক্তৃতা না দিয়ে উনোতে দিতেন তবে অন্যায়সে আমাদের জ্ঞান কাবুল-কান্দাহার জয় করে আনতে পারতেন।

এঁরা কী বক্তৃতা দিলেন? আমার নীরস ভাষা দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করলে গুলীদের প্রতি অবিচার করা হবে, তাই প্রত্যেকের সাহায্যে, অর্থাৎ অ্যালজেরা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

এঁদের প্রায় সকলেই একই কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই; যদিও উনো ক, খ, গ করতে সক্ষম হন নি, তবু চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে চ, ছ, জ হয়ত বা করতেও পারেন এবং ট, ঠ, ড-ও যে তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?

যেন ইঙ্কলের মাস্টার মশায় জমিদারবাবুর ফেল করা ছেলের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখছেন। জমিদারবাবুকে না চাটিয়ে তাঁর গর্দভ ছেলের হাল-হকিকৎ বাতলানো সোজা কর্ম নয়। উনোর প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি দিল্লিতে স্থচরুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

হায় কান্দাহার, হায় কোরিয়া, হায় ইন্দোচীন, হায় তুনিং, আরও কত হায়, হায়!

আমি কিন্তু উনোর কাম্-কেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।

প্রথমত, মীটিঙে গালিগালাজ মারামারি না করা। কিছুদিনের কথা, ফ্রান্সের পার্লিমেণ্টে সদস্তেরা অত্র কোনও অস্থ শব্দ পান নি বলে গলার চেন খুলে একে

অন্যকে জোরসে ঠুকেছেন—কলে রক্তারক্তিও নাকি হয়েছিল। বাংলা দেশের পার্লামেন্টেও নাকি অনেক কিছু হয়েছে, যদিও রক্তারক্তি হয়েছে বলে স্বরূপ হচ্ছে না। তবে মারামারিই ত শেষ কথা নয়। ভাষা অনেক সময় ডাঙর চেয়েও কঠিন কঠোরতর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মাস্টাররা এখন ছেলেদের চাবুক মারেন না বটে, তবে সে-চাবুক এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের জিভে; তাঁদের জিভ এখন চাবুকের চেয়ে নিষ্ঠুরতর।

কিন্তু সে-তত্ত্বালোচনা উপস্থিত থাক।

আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয়, এখন উনোতে হাতাহাতি কিংবা পুরোদস্তুর একে অন্যকে অপমান না করেও তাঁরা কাজকর্ম (তা সে যতই নগণ্য কিংবা অর্থহীন হোক না কেন) সমাধান করছেন কী করে ?

কাঠরসিকেবা এর উত্তরে কী বলবেন তাও আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁরা বলবেন, ‘আরে বাপু, যেখানে শুধু তর্কাতর্কি—বাকযুদ্ধ, যেখানে কোনও প্রকারের জীবন-মরণ-সমস্যার সমাধান হবে না, যেখানকার কোনও বাগাড়ম্বরই আমার আপন দেশে কোনও প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না, সেখানে মারামারি হাতাহাতি করতে যাব কোন দুঃখে ?

হুক কথা। দুনিয়ার বহু জাতই এ-তত্ত্ববাক্যে সায় দেবে। কিন্তু আমি বাঙালী। আমার মন বলে কথাটা হুক হলেও টক করে মেনে নিতে আমার বাধেছে। ‘মোহনবাগান-ইন্সটিটিউট’র খেলাতে কে জেতে কে হারে, তাতে আমার কণামাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু ত তাই নিয়ে তর্ক করে আমি সেদিন দুটো চড় খেয়েছি, তিনটে কিল মেরেছি। সে-রাজে না-খেয়ে শুতে গিয়েছি, পাশের বাড়ির শা—রা সাত টাকা সেরে ইলিশ কিনে কিস্তি করেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব ততোধিক গুরুত্বযুক্ত (সোজা বাংলায় ইমপটেন্ট) হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রভাষা। তাঁর জয় হোক। তিনি দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুন; আমার নুক কাটবে না! কিন্তু যখন বলা হয়, হিন্দী নাশিথলে (এবং ইংরেজী বর্জন করার পর) আমরা দিল্লির পার্লামেন্টে একে অন্যকে বুঝব কী করে, তাই সবাই হিন্দী শেখ, তখন আমার মনে আসে উনোর কথা। সেখানে কে গুপ্ত ভাষা নিয়ে কারবার চলে ঠিক বলতে পারব না, তবে বিবেচনা করি ভারতে যে-কটি ভাষা চালু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাষা-ভাষী সেখানে জমায়েত হন। তাঁদের বেশির-ভাগই বক্তৃতা দেন আপন আপন মাতৃভাষাতে। বর্মার সদস্য যখন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন, সঙ্গে সঙ্গে সে-বক্তৃতা ইংরেজী, কন্নড়, স্পেনিশ

ইত্যাদি বহু ভাষায় অনুদিত হয়। প্রত্যেক সদস্তের কানে ‘ইয়ার-কোন’ লাগানো। সমুখে ছোট একটি কল। তিনি যে-ভাষায় অনুবাদ চান, সে-ভাষার উপর কলের কাঁটাটি লাগিয়ে অনুবাদটি শুনে নেন। যেমন যেমন বক্তৃতা হয়, অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে চলে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ শেষ হয়—সব সদস্যই জেনে যান, বক্তা কী বললেন। যে-সব সদস্য বক্তার মাতৃভাষা জানেন, একমাত্র তাঁরাই তখন ‘ইয়ার কোন’ ব্যবহার করেন না।

তবে দিল্লির পার্লামেন্টেই বা এ-ব্যবস্থা হতে পারে না কেন? ভারতব্রহ্ম লোককেই বা হিন্দী-উর্-হিন্দুস্থানী শিখতে হবে কেন?

হিন্দী-উর্-হিন্দুস্থানীর কথায় মনে পড়ল ক্রিকেট-কমেন্টারির কথা।

এবারকার ক্রিকেট টেস্টম্যাচের খেলাতে হিন্দীতেও ‘সমসাময়িক টীকা’ দাবমান-মল্লীনাথ (রানিং কমেন্টারি) দেওয়া হচ্ছে। যেদিন আপিসের অভ্যাচারে খেলা দেখতে যেতে পারি নি, সেদিন লাঞ্চার সময় টীকা শুনে দুধের আল বোল নয়, জল দিয়ে মিটিয়েছি। মাঝে মাঝে হিন্দী টীকাও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় শুনতে হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

এই টীকাকার যুক্তপ্রদেশের অতি খানদানী ঘরের ছেলে। তিনি জানেন, আমির ইলাহী বহুদিনের মুরুব্বী খেলোয়াড়। তাই তিনি বার বার বললেন, এর পর আমির ইলাহী সাহেব বড়ী খুবসুরতকে সাথ (বড় সৌন্দর্যের সঙ্গে) গেন্দ (বল) পাকড়লী (কিন্তু করলেন)। আমির ইলাহীকে ‘সাহেব’ বলার পূর্বে তিনি অশ্রু-একজনকে ‘সাহেব’ উপাধি দেন নি, এর পর তাঁর মনে হল সবাইকে ‘সাহেব’ বলা উচিত, তাই তিনি আঠার বছরের ছোকরা হাকীজকেও ‘সাহেব’ সম্বোধন করতে লাগলেন।

ক্রিকেট গণতান্ত্রিক খেলা। ক্রিকেটের দেবেজ ব্র্যাডমানকেও কোনও ইংরেজ টীকাকার মিষ্টার ব্র্যাডমান কিংবা ‘রেসপেকটেড’ ব্র্যাডমান বলে উল্লেখ করেন না, কিন্তু ভারতবর্ষ সৌভাগ্য—ভদ্রতার দেশ, ক্রিকেট খেলি আর ঘাই খেলি, পিতৃবয়স্ক আমির ইলাহী, কিংবা মুরুব্বী অমরনাথকে ‘সাহেব’ না বলে বাক্য-সুন্দর করি কি প্রকারে?

টীকাকার আবার হিন্দী-উর্-দুই-ই জানেন। আবার তিনি এ-তথ্যও জানেন, করাচি-লাহোরে বিস্তর মুসলমান তাঁর টীকা রেডিওর পাশে বসে কান পেতে শুনছেন। তাঁরা কষ্টের হিন্দী বুঝতে পারেন না—টীকাকার তাঁদেরই বা নিরাশ করেন কী প্রকারে? তাই সমস্তক্ষণ তিনি ছিলেন আপসের তালে।

দৃষ্টান্ত দি।

পাকিস্তানের ‘অবস্থা তখন বড়ই বিপদসঙ্কুল’, হিন্দীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়, ‘বিপজ্জনক পরিস্থিতি’, উর্দুতে বলতে হয়, ‘খতরনাক হালৎ’। চীকারকার হু কুল রক্ষা করলেন, ‘খতরনাক পরিস্থিতি’। আশা করলেন, পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয়েই বুঝে যাবে ‘অবস্থা সজ্বিন’।

আমি কিন্তু সত্যই স্বীকার করি, ভাষার উপর ভদ্রলোকের দখল আছে। যাকড ‘আরামকে সাথ’ (অক্রেপে, আরামের সঙ্গে) গেন্দ (বল) বোলারকে ফিরিয়ে দিলেন, পরজবাবু ‘আহসানীসে’ (অনায়াসে, অবহেলায়) বলটাকে পাকড়ে নিলেন, গুলমহম্মদ বড় ‘শানদার’ (মহিমাময়) খেলা দেখালেন, নাজির মহম্মদ ‘কাইম’ (‘কায়েমী’—অর্থাৎ সেটেলড্ ডাউন) হয়ে গিয়েছেন—আরও কত কী!

আর অদ্ভুত তাঁর নিরপেক্ষতা। বরের মাসী, কনের পিসী। একে বলেন, সাধু সাধু, ওকে বলেন, শাবাশ শাবাশ। কেউ ক্যাচ ধরলে তিনি ‘অচৈতনি’, কেউ সিদ্ধল করলে তিনি ‘বেছ’শ।

খেলা না দেখেও খেলা দেখার আনন্দ পেয়েছি।

বুদ্ধঃ শরণঃ

সারিপুত্র ও মহামৌদগল্যায়নের পূর্তাস্থি প্রায় এক শতাব্দীর পর পুনরায় তাঁদের সমাধিস্থলে রক্ষিত হচ্ছে।

প্রায় এক শ বছর পূর্বে সাঁচীর জুপের উপর থেকে নীচের দিকে হুড়ক কেটে তলার দিকে দুটি পেটিকা পাওয়া যায় এবং তাদের উপরের লেখা থেকে সপ্রমাণ হয় যে, পেটিকা দুটিতে এই দুই মহানুবিদের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। আপাত-দৃষ্টিতে হুড়ক খুঁড়ে এই দুই মহাপুরুষের দেহাস্থি বের করা বর্বরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে-যুগের তার সত্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে-যুগে বিদেশী শাসন-কর্তারা এই জিভুবনে আমাদের যে কোনও গৌরবস্থল খাকতে পারে সে-কথা আদর্শই স্বীকার করতে চাইতেন না—শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাহুরির শাবাশ দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন, সে নাকি আমাদের কল্পনাশক্তি—উদ্ভাস উজ্জ্বল কল্পনা-প্রবণতা। এই ‘প্রশস্তি’ দিয়ে তার পর-মুহূর্তেই তাঁরা তার সম্পূর্ণ স্বযোগ নিয়ে বলতেন, ‘এদের বুদ্ধ, এদের আনন্দ, সারিপুত্র মৌদগল্যায়ন, জনপদ-কল্যাণী সবই এদের কল্পনাগ্রন্থিত—অভদ্র ভাষায় গাঁজা-গুল।’

দৈত্যকূলের প্রহ্লাদ ইংরেজ পণ্ডিতগণ এ মতে ঠিক সায়্য দিতেন না বলেই

সাঁচীর খুপ খুঁড়ে এই দুই ভ্রমণের দেহাঙ্গি বের করা হয়েছিল। পেটিকা ছুটি না বেরলে আমাদের আরও কতখানি এবং কতদিন ধরে গালাগাল খেতে হত তার ঠিক হিসেব করা কঠিন।

তারপর এই দুই পেটিকা বিলেতে প্রায় এক ণ বছর বাস করার পর বহু দেশে বহু লক্ষ নরনারীর সম্ভ্রম অভিযান পেয়ে আবার সাঁচীতে ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, খোঁড়া না হয় হয়েছিল, কিন্তু পেটিকা ছুটি বিলেতে নিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল ?

সেখানেও এঁদের জীবনের মাহাত্ম্য এক অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখায়। এঁদের দেহাঙ্গি যদি একদা বিদেশে না যেতেন তবে তাঁদের দেশে ফিরে আসার উপলক্ষ্য নিয়ে এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারত না এবং আজ সাঁচীতে তার চরম উৎসব উপলক্ষ্যে এতগুলি দেশের গুণী, জ্ঞানী, সাধু, তাপস একত্র হয়ে তাঁদের জীবন মাহাত্ম্য কীর্তন করে, একমন হয়ে, তাঁদের জীবনাদর্শের স্মরণে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তির বাণী প্রচার এবং প্রসার করতে নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত হতেন না।

এখানে ঐশ্বর্য একটি অপ্রিয় মন্তব্য করে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করি।

এ-দেশের সরস্বতীপূজা, দুর্গাপূজা যে আজ জাঁকজমক আর বাহাড়ম্বরেই শেষ হয় সে-কথা বাংলা দেশের বিচক্ষণ লোক মাঝেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই সাঁচীর উৎসব যে বাগাড়ম্বরেই শেষ হতে পারে, সে-ভয় আমাদের সম্পূর্ণ অনুলক নাও হতে পারে। তাই প্রশ্ন, সাঁচীতে সমবেত মনোবীণ যে একবাক্যে শপথ গ্রহণ করলেন, পৃথিবীতে পুনরায় শাক্যমুনির শান্তিবাণী প্রচারিত হোক, তার সম্ভাবনা কতটুকু ?

এ-আশা দুরাশা যে পৃথিবীতে বহু লোক এখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ-পর্বের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিতজী, শ্রামাপ্রসাদ এবং রাধাকৃষ্ণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা কিংবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি। তাই আজ যদি আমরা সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা জীবনে সকল করবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কপটাচারী, এ-কথা বলা অন্তায় হবে।

আমার মনে হয়, ধর্ম পরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ-পৃথিবীতে অন্ত ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে-সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে-ধর্মের ফলশ্রুতি করার কোন পন্থা উন্মুক্ত থাকত না—কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন সঙ্গীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্ব ধর্মহুগ্র অনায়াসলভ্য, আজ

আমরা অল্প ধর্মের সাধুসঙ্ঘদের সহবাস করতে পারি, ক্ষিপ্র ক্ষিপ্র সমাজের দোষ-গুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অত্যন্তম কর্তব্য, এ-কর্ম সহজ, সরল করে দেওয়াও বটে। সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; আজ হিন্দু খ্রীষ্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।

শান্তির বাণী ত সব ধর্মই প্রচার করেছে; তাই এখন প্রঙ্গ, শান্তির বাণীর জন্য বৌদ্ধধর্মের কাছেই হাত পাড়বার প্রয়োজন।

প্রয়োজন এই, প্রত্যেক ধর্মই কোন না কোন এক কিংবা একাধিক নীতির উপর জোর দিয়েছে বেশী। বৌদ্ধধর্ম সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য (কেন দিয়েছিল সে প্রশ্নের উত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে বিজড়িত) এবং তারই ফলে মৌর্যযুগে তাৎৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে একদিন অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে দেখা দিয়াছিল। সারিপুত্ত, মহামৌদ্গল্যায়ন প্রমুখ ভ্রমণেরা যদি আপন প্রশ্ন হাতে নিয়ে প্রদেশ হতে প্রদেশান্তরে শান্তির বাণী প্রচার না করতেন (জাতকে বার বার দেখতে পাই, যে-কোনও দেশ বা প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যাওয়ার অর্থ সে-যুগে ছিল আপন প্রাণ নিয়ে খেলা করা) তাহলে প্রদেশ-প্রদেশের সীমান্তরেখা বিলীন হত না এবং ফলে ঐক্যবদ্ধ অবিচ্ছিন্ন ভারত কবে সে রূপ নিত—এবং আদৌ নিত কি না—আজ তার কল্পনা করা যায় না।

এবং এইখানেই তথাগতের প্রেম এবং মৈত্রী অভিযানের শেষ নয়—আরম্ভ মাত্র। পুনরায় বলি, আরম্ভ মাত্র।

তারপর এই বৌদ্ধবাণীর কল্যাণেই সিংহল গমন সহজ হল, দুর্ঘর্ষ আফগানিস্তানের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বন্ধ হল, (কাবুলের গ্রীক, বৌদ্ধ হয়ে গিয়ে গান্ধার শিল্প নির্মাণে সাহায্য করল এবং আজ যে আমরা প্রভু বুদ্ধের মূর্তি দেখে শান্তিরসে পূর্ণ হই, তার গোড়াপত্তন করে এই গ্রীকরাই), দুর্লভ্য হিন্দুকুশ অতিক্রম করে বৌদ্ধ ভ্রমণেরা বামিয়ান পৌঁছলেন (সেখানকার বুদ্ধমূর্তি পৃথিবীর আর যে-কোনও বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ মূর্তির চেয়ে উচ্চ), তারপর বর্বর তাতার তুর্কমান পর্যন্ত বৌদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করল, সর্বশেষে তখনকার দিনের সবচেয়ে সভ্যদেশ চীন পর্যন্ত তথাগতের শরণ নিল।

এ-দিকে বর্মার, শ্রাম, মালয়, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ ভূখণ্ড।

ভারতের মত বিরাট দেশকে চীনের মত বিশালভর দেশের সঙ্গে মিলিয়ে

দয়ে এই বৌদ্ধ অভিযান যে মানব সভ্যতাকে কতখানি এগিয়ে দিল তার হুস্পষ্ট ধারণা দূরে থাক, তার কল্পনামাত্রও আজ আমরা করতে পারি নে। জানি পরবর্তী যুগে খৃষ্টধর্ম আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডকে এক করে দিয়েছিল, কিন্তু সে ত অসংখ্য দ্বন্দ্ব অগণিত সংগ্রামের ভিতর এবং আজও তার শেষ হয় নি।

ভারত-চীন, ভারত-তিব্বত এবং ভারতের সঙ্গে অত্যাশ্চর্য দেশের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে। এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, যেদিন ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করল (কেন করল, এবং না করলে তার গত্যন্তর ছিল কি না, সে প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং এখানে অবাস্তব), সেইদিন থেকেই ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে হতে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পেল।

কিন্তু ভারত বৌদ্ধ ধর্ম বর্জন করেছে এ-কথা ভুল। তথাগতের বাক্য, নীতি, অবদান (প্রাচীনার্থে) ধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্মের শিরা-উপশিরায় আজ এমনই মিশে গিয়েছে যে, তার বিশ্লেষণ অসম্ভব এবং অপ্রয়োজন।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও আজ সেগুলো হিন্দু ধর্ম থেকে বর্জন করতে সম্মত হবেন না। তাই আজ ব্রাহ্মণ শ্রামাশ্রম, রাধাকৃষ্ণ ও জগদীশ্বরলালের শ্রমগান্ধি সঙ্কে গ্রহণ ক্রিষ্ণাং গুরুভার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

এবং শুধু কি তাই? অমিতাভের বাণীতে কী অমিত অমৃত লুকানো রয়েছে 'যে, বর্তমান যুগে যেদিন তার বাণী ইয়োরোপে পৌঁছল সেদিন ক্রান্তের বূর্নক ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আগ্রহের সঙ্গে সে বাণী গ্রহণ করলেন। ইয়োরোপের জনসাধারণও কী অদ্ভুত সাড়া দিলে সে বাণী শুনে! ইয়োরোপ তখন আজকের চেয়ে বেশী ধর্মবিমুখ—বিগত হুই যুদ্ধ ইয়োরোপকে আবার আত্মার সন্ধানে তাড়া দিয়েছে—তবু তারা কী আগ্রহেই না বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ সংস্করণের পর সংস্করণ শেষ করল!

খুদ পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে, পাদরী-পুরুতের তোয়াক্কা না করেও ধর্মচর্চা করা যায়, একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করে, ক্রিয়াকাণ্ড বর্জন করে, তথাগতের উপদেশের সঙ্গে সাধনাগত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিয়ে, তথাগত যেখানে আগত হয়েছেন সেখানে পৌঁছনো যায়, এ-স্বপ্ন ইয়োরোপের কোন জ্ঞানী কোন গুণী দার্শনিকই দেখবার সাহস করেন নি। বুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব বাণী এক মুহূর্তেই ইয়োরোপের সামনে এক নবীন ভুবন আলোক দিয়ে জাজল্যমান করে দিল।

তাই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে আজ ওই এক মহাপুরুষ—বুদ্ধদেব—খায়

পায়ের কাছে আজ সর্ব নাস্তিক সর্ব আস্তিক স্বধর্ম-ভ্রষ্ট না হয়েও দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ত্রিশরণ ভ্রপ করতে পারে—

বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি

ধর্ম শরণং গচ্ছামি

সজ্জ শরণং গচ্ছামি ॥

অ্যার ট্রাভেল

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম আরোপ্লেন চড়েছিলুম। দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য থুশ-সোওয়ারি বা ‘জয় রাইড’ নয়, রীতিমত দু শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাছি। একদিন হয়ত পুষ্পকরথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-জ্যাশে অকালান্ত করব—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ ত জানা কথা, ‘ডানপিটের মরণ গাছের ডগায়’। সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে স্বখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, ‘স্বখ-সুবিধে’ না বলে ‘অস্বখ-অসুবিধেই’ বলা উচিত ছিল, কারণ প্লেনে সফর করার চেয়ে গীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত অবিকার করতে পারে নি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যারা প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত, তাই তাঁদেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাদের এ-যাবৎ হয় নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বহ্নন—বাস, হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অল্প কথা, কিন্তু তবু একথা বলব, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোন গাতকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার জো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে ‘অ্যার আপিসে’। আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না—কেউ দেবে ঢাকা, কেউ দেবে আসাম, মাল্জা অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লির।

এবং এ-সব অ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গম্বরে। এবং বেশীর ভাগই ট্রাম-লাইন, বাস-লাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা-গঙ্গার হাওয়া খেয়ে; অ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

অ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে, ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিও-অফিসার ত উর্দি পরে আছেনই, এমন কী টিকিট-বাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল সোনালীর ব্যাজ-ঝিল্লি-রিবন-পট্টা যা-খুশি বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু গার্ড সাহেবরাও উর্দি পরেন কিন্তু সে-উর্দি জঙ্গী কিংবা লক্করী উর্দি থেকে স্বতন্ত্র, অ্যার আপিসে কিন্তু এমনি উর্দি পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির যুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে ঢুক করে একটা গুলুট করে।

তারপর সেই উর্দি-পরা ভক্তলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরেজীতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধুতি কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী, তবু ইংরেজী বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন, বি-এ এম-এ পাস করেছেন—কিন্তু আমি ‘মশাই পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরেজী বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরেজী বুঝতে পারি নে—কী জালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাংলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্তত তিনি বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখুনি যদি রোকা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে ত ল্যাঠা চুকে গেল, কিন্তু যদি শুধু ‘বুক’ করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অহুবিধা এই যে, পরে যদি মন বদলান তবে রিক্যাণ্ড পেতে অনেক ছাপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন, আপনি ঠিক সময় দমদম উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস্ করলেন। রেলের বেলায় তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকার খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সেটি হচ্ছে না। অথচ আপনি

পাকি খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায় নি, আর-এক বিপদগ্রস্ত ভক্তলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে ট্যাভেল করেছেন, আর কোম্পানিও স্বীকার করল, কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। আর কোম্পানির ডবল লাভ। এ নিয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা লাগালে কী হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই আর কোম্পানির চেয়েও বেশী।

টিকিট কেটে ত বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহা মূল্যবান ‘মূল্য-পত্রিকা’খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেনে দমদম থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু আর আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কী? নিতান্ত খাডেজা কেলাসে যেতে হলেও ত আমরা এক ঘণ্টার পূর্বে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে ত আধ ঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট, আর যদি ফাস্ট কিংবা সেকেন্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফাস্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফাস্টের দেড়া) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে ত আধ মিনিট পূর্বে পৌঁছেলেই হয়।

আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু ঘণ্টা, অথচ আপনাকে আর আপিসে যেতে হচ্ছে পাকা দু ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরও কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবারে মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াম্লিশ (কিংবা বিয়াম্লিশ) পাউণ্ড লগেজ ব্রী পাবেন। অতএব

“সোনা মুগ সুরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি কিছু বুনা নারিকেল
দই ভাণ্ড ভাল রাই সরিষার তেল
আমসব্ব আমচুর—”

ইত্যাদি মাথায় খাটুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। অথচ আপনি গোঁহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাকবাংলোয়। বিছানা বিশেষ করে মশারি বিনা কী করে পোয়াবেন দিনরাত্তিয়া?

বিছানাটা নিলেন কি? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তাহলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোন লাভ হত না, কারণ জিনিসটিকে ওজর ত করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

আর ট্রাভেল করবেন—মাত্র চুম্বলি পাউণ্ড ক্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বৃক্ষমানের মত একটি পিচবোর্ডের কিংবা কাইবারের স্টকেসে মালমাজ পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌঁছলে পরে বলব—রওমানা দিলেন আর আপিসের দিকে, ছাড়া বরখাতি অ্যাটাচি হাতে, তার কস্তে কালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাক ইউ!)।

ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু-একজন বন্ধুবান্ধব। যদিও দৈবাৎ পেন মিস করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওনা দিলেন এবং আর আপিসে পৌঁছলেন পাঁচ সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাভাই বাঙালীরা যে রকম ইন্ডিয়ানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

আর আপিসের লোক হস্তদস্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে-লোকটা কুলি-চাপরাসী সমন্বয়—তা হোক গে—কিন্তু তার বাই সে ‘হিন্দী’তে—রাষ্ট্রভাষাতে—অর্থাৎ তার অউন, অরিক্সিভাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে-রকম তার বসের ইংরেজী বলার বাই অঞ্চ উভয়পক্ষই বাঙালী।

আমাদের বন্ধিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাংলা দেশের মহানগরী, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস আদালতে, রাস্তাঘাটে ‘আ মরি বাংলাভাষার’ কী কদর, কী সোহাগ!

কলকাতা বাঙালী শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি, তাই আমাদের আর আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়সা তিন দিন ইলিশ মূর্গা তারপর আলুভাতে আর মস্তর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের আর আপিসগুলো খোলা হয় তখন সায়েবী কায়দায় বড় বড় কোঁচ, বিরাট বিরাট সোফা, এস্তার ক্যান, হাট-স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল—তার উপরে থাকত মাসিক, দৈনিক, আশ্রয় আরও কত কী! সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষার সোকার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দিই ত আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী ধোপদুর্গন্ধ ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ক্যানগুলো কঁচা কঁচা করে ছুটির জন্তু আবেদন জানাচ্ছে, দেয়ালে চুনকাম করা হয় নি সেই অল্পপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা এলোপাড়াড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরাজীতে যাকে বলে ড্রেয়ারী ডিসমেল।

একটা আর আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে

ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় আমাদের রান্নাঘরের তেলচিটে-কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না। আসুন একদিন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাসই লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাশা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মৃত্তাক আলীর মত ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু ‘—মুখ্যো’ যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যে এসে ভিরাম গিয়েছিল। মুখ্যো আমাকে হেসে বলেছিল, ‘কিন্তু তাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।’

কী অত্যাশ!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবি ঠাকুর কী একটা গান রচেন না ?

“আমার বেলা যে যায় সাববেলাতে
তোমার সুরে সুর মেলাতে—”

অ্যার কোম্পানির বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বাসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন -কচু-বন থেকে কুড়িয়ে আনা যে-সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম, আমাদের অ্যার কোম্পানির বাস প্রায় সেই রকম। ওদেবই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবীস্তানের উটের পিঠের মত। ‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেতুইন’ হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসেব যে-কোন একটা দু দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর খেদ থাকবে না।

মধ্য-কলকাতা থেকে দমদম ক মাইল রাস্তা সে-খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে

‘যেন পেরিয়ে এলুম অস্ত্রবিহীন পথ !

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বে-সরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল রিক্শাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্ত তৈরি এই চাউশ বাস—প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়,

ছাইভার করবে কী, আপনিই বা বলবেন কী ?

দিল্লি থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে-যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয় নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদম পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। -সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাক-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক অ্যার পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে করাসী মেম থেকে কালো-বোরকায়ে-সর্বাঙ্গ-ঢাকা পর্দানিশিনী হজ-যাত্রী সবার কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে একথাও ঠিক, হাওড়ার প্লাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম।

প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর ছড়োছড়ি করার কী প্রয়োজন ?

তবু তারতবর্ষ ভাষ্যব দেশ। দিন কয়েক পূর্বে দমদম অ্যার পোর্ট রেলস্টেশন দুকে এক মাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ কিকে হলদে। শুধালুম, শরবত কি ক্রি বিলানো হচ্ছে ?

বয় বললে, জলের টাঁকি সাক করা হয়েছে, তাই জল ঘোলা, এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে, ও জল না খাওয়াই ভাল।

শুনেছি ইয়োরোপের কোন কোন দেশে নরনারী এমন কী কান্ধা-বাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্য নিত্য টাঁকি সাক করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাব।

শুধু কি তাই, জলের জন্ত উদ্বাস্তরা উদ্বাস্ত-করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই এখন কুটির বদলে কেক খাব। সে-কথা থাক্।

কিন্তু দমদম অ্যার পোর্টের সত্যিকার-জলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই নীতেই হুবার দেখেছি। ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারে নি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে অ্যার পোর্টে।

আরও যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না, করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। এক দিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্য দিক থেকে আসছে; এই শ্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বস্তা আগে, তাদের উৎকর্ষা, আহাতিদির সন্ধান, ধবরের জন্ত অ্যার কোম্পানির

কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, ‘ডায় ক্যালকাটা ওয়েদার’ ইত্যাদি কটুবাণ্য, নানা রকমের গুজব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—যে-সব বন্ধুরা ‘সী-অফ্’ করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অঞ্চ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন ‘টেক অফ’ করতে পাবে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ক্রী থাওয়ানো হচ্ছে, কঙ্গুস কোম্পানির গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত—আরও কত কী !

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়ে নি। খবর দেবেই বা কী ?

দমদম নর্থ-পোল হলে কী হত জানি নে। শেষটায় কুয়াশা কাটল। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলার কাশি বার কয়েক সাক করে জানালে, ‘অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কী নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।’

আমি না হয় ইংরেজী বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেন নি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা অ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানির লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে রওয়ানা করে দিলে—পাণ্ডারা যে-রকম গাইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক-গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, ‘আজকাল ত অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়াল। যাত্রী-ভী প্লেনে চড়ে তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে কাহে ?’

ওই বুঝলেই ত পাগল সারে।

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুঃস্থ যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় পর্বত, গৃহ অট্টালিকা অতিশয় দ্রুত গতিতে তার চক্ষুর সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুঃস্থ তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিশ্বয় প্রকাশ করেছিলেন।

পূনার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুঃস্থের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই ধ-পোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কী প্রকারে ?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমণ মহর্ষি একটা ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নীচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন ‘এখন ত তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উদ্ভীষ্যমান হতে পারেন।’ আমায় এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনাব আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্য উল্লেখ করে বলেছিলুম :—

“পীরহা নমীপরন্দু,

শাগিরদান উছারা মীপবানন্দু।”

অর্থাৎ ‘পীর (মুরশীদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)।’

তার কিছুদিন পরে আমি রমণ মহর্ষির পীঠস্থল তীর্থ-আন্নামালাই (শ্রী আন্নামালাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীর্থ-আন্নামালাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধারণ ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমণাশ্রম দ্রোপদী-মন্দির সব কিছু খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সাত্তদশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রোপদী-মন্দির কী রকম অদ্ভুত দ্রুতগতিতে বৃহৎ আকার ধারণ কবতে লাগল।

আমার এ-অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সম্ভব হয় না যে পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমণ মহর্ষি যোগবলে আকাশে উদ্ভীষ্যমান হন নি, কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট হস্তে গেল যে, দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কীরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন, কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব কারণ দৌড় দিয়ে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় আরোপ্নেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল আরো-

ড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, ছাত্রার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু সেই শ্রের
বধন ৭ পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর
গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরের থেকে নীচের দিকে তাকাছি বলে খাড়া নারকেল গাছ, টেলিফোনের
খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট ত দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সব কিছু যে কতখানি ছোট
হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল-লাইন দেখে। ঠিক
পাখির মত প্লেনও এক-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে এক এক ধাক্কাই উঠে যাচ্ছিল
বলে নীচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা-গঙ্গা ! অপরাধ নিয়ে না মা, তোমাকে পবননন্দন পদ্ধতিতে ডিঙিয়ে
যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা ত এই আজ বুঝলুম তোমার
উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বৃকের উপর কৃষ্ণাঘরী শাড়ি, আর তার
উপর শুয়ে আছে অগুনতি খুদে খুদে মানওয়ারী জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আর
পানসি-ডিঙির ত লেখাজোখা নেই। এতদিন এদের পাড় থেকে অস্ত্র পরি-
শ্রেক্ষিতে দেখছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু
ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু ‘আজ কী এ দেখি, দেখি,
দেখি, আজ কী দেখি—’ এই যে ছোট ছোট আঙাবাচ্চারা তোমার বৃকের উপর
নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বৃকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য।
এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বৃকের আঁচলে
আশ্রয় দিতে পার।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বপ্রকাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়ল মা-
গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জলে উঠল, কিন্তু এ
আগুন যেন শুভ মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইম্পাত বানিয়ে।

সেদিকে চোখ কিরে তাকাই তার কী সাধ্য ? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—
রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাছি ; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন
আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য ! কিন্তু এ আমি সইব
কী করে ? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূবন, আমি উপনিষদের
জ্যোতির্জ্ঞা ঋষি নই, যে বলব—

‘হে পূবন, সংহরণ

করিয়াছ তব রশ্মিজাল

এবার প্রকাশ করো

তোমার কল্যাণতম রূপ,

দেখি তারে যে-পুরুষ

তোমার আমার মাঝে এক ।'

আমি বলি, ভব রম্বিজাল তুমি সংহরণ কর, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রক্ত রূপে নয়। তোমার বদন যবনিকা বনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি পদ্যবন্ধে রিদ্ধ রক্ত-আচ্ছাদন, আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস স্বরহৃদয়েরা শুধু তাদের নৃপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ-নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি? রক্ত না হয় অজ্ঞমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভূঙ্গীরা ত রয়েছেন! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমবে চলাতেন, যদিও ওদিকে পুষনের সঙ্গে তাঁর জড়তা ছিল, তাই বলেছেন :—

‘ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসজ্জী দল

রক্ত-আঁধি !’

অষ্টটি পাখি যে-রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নৃপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, ‘সুর, সুর।’ এ কী জালা। চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রুতে করে সামনে লঞ্জেজুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি লঞ্জেজুস। লাল, নীল, ধলা, ‘স্বরেক বড়োর। লোকটা মস্তুরা করছে নাকি—আমি হোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লঞ্জেজুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, ‘বাপধন, এইটে দোলাও দেখিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে।’

এদিকে প্রকৃতির রসরস, ওদিকে লঞ্জেজুসের রস। আমি মহাবিরক্তির সঙ্গে বললুম, ‘থ্যাক ইউ’

লোকটা আচ্ছা গবেট ত! শুধালে, ‘থ্যাক ইউ, ইয়েস, অর থ্যাক ইউ, নো?’ মনে মনে বললুম, ‘তোমার মাথায় গোবর।’ বাইরে বললুম, ‘নো।’ কিন্তু এখানে আর ‘থ্যাক ইউ’ বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশীর ভাগ খেড়েরাই লঞ্জেজুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে ওদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ওই বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায়, মালুম।

ও মা, ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গলা। কাটোয়ার বাক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙল। ওকে ত আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে :—

‘ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে
ও-পাবে ??’

ভাষা ও জনসংযোগ

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র দোল সংখ্যায় (১৯৫৩) গ্রীষ্মত প্রবোধচন্দ্র সেন ‘বাংলা-সাহিত্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক একটি স্মৃতিস্তম্ভ এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। হিন্দী ইংরেজী বনাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যাবা কৌতুহলী, তাঁদের সকলকে আমি এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ কবি—তাঁরা লাভবান হবেন।

আমার আলোচনায় জানা-অজানাতে প্রবোধচন্দ্রের অনেক যুক্তি এসে গিয়েছে এবং আসবে। প্রবোধচন্দ্র না হয়ে অণু কোন কাঁচা লেখক হলে আমি আমার লেখাতে পদে পদে তাঁর উদ্ধৃতিব ঋণ স্বীকার করতুম—কিন্তু এঁর বেলা সেটার প্রয়োজন নেই, কাবল প্রবোধবাবু লক্ষপ্রতিষ্ঠা পণ্ডিত, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা যেন তাঁর স্ত্রীয়া হক্ পায় এবং সেই হক্ সপ্রমাণ কবাব জগৎ কে তাঁর লেখা থেকে কতখানি সাহায্য পেল, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং আমার বিশ্বাস, দবকার হলে তিনিও অণু লেখকের রচনা থেকে যুক্তি-তর্ক আহরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমাব লেখা তাঁকে সাহায্য না-ই করল।

প্রাচ্যে যে-সব বড় আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, সে-সব আন্দোলন শুধু যে তার জন্মভূমিতেই সফল হয়েছে তাই নয়, তার চেউ পশ্চিমকেও তার স্পৃহিতে জাগরণ এনে দিয়েছে, সে-সব আন্দোলনকে আমরা সচরাচর ধর্মের পর্যায়ে ফেলে নবধর্মের অভ্যুদয় নাম দিয়ে থাকি। ভাবতবর্ষে তাই বৌদ্ধ ও জৈনদেব দুই বৃহৎ আন্দোলনকে আমরা ধর্মের আখ্যা দিয়েছি, সেমিতি ভূমিতে ঠিক ওই রকমই দুই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি জোরাল আন্দোলন সৃষ্ট হয়—তাদের নাম খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম।

আজকের দিনে ধর্ম বলতে আমরা প্রধানত বুদ্ধি, মাহুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। পূজা-অর্চনা কিংবা কুচ্ছসাধন ধ্যানাদি করে, কী করে ভগবানকে পাওয়া যায় ধর্ম সেই পন্থা দেখিয়ে দেয়, এই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু একটুখানি

ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী চেষ্টা করেছে, মাছুষে মাছুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের আশ্রয় নির্মাণ করাতে—এক কথায়, এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে মাছুষ মাংসভ্রাতায় বর্জন করে, একে অশ্রুর সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম এই সব কাজেই মনোযোগ করেছে বেশী—ভগবানের সান্নিধ্য এবং তার সাহায্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে।

বিশ্বশালী এবং পণ্ডিতের সংখ্যা সংসারে সব সময়েই কম ছিল বলে বড় আন্দোলনকারী মাত্রই এদের উপেক্ষা কবে জনগণকে কাছে আনতে—এমন কী ‘ষেপিয়ে তুলতে’—চেষ্টা করেছেন প্রাণপণ। তাই তাঁরা বিশ্বশালী এবং পণ্ডিতের ভাষা উপেক্ষা করে যে-ভাষায় কথা বলেছেন, সেটা জনগণের ভাষা। তথা-গতের ভাষা তৎকালীন গ্রাম্য ভাষা পালি এবং মহাবীরের ভাষা অর্ধমাগধী, খ্রীষ্টের ভাষা হিব্রু গ্রাম্য সংস্করণ, আরামেয়িক এবং মুহম্মদের (দঃ) ভাষা আরবী। আরবী সে-যুগে এতই অনাদৃত ছিল যে, আরবেরাই আশ্চর্য হল, এ-ভাষায় আল্লা তাঁর কুরআন প্রকাশ (অবতরণ = নাজিল) করলেন কেন ? তারই উত্তর কুরআনে রয়েছে ,

আল্লা বলেছেন :

“Had we sent as
A Quaran (in a language)
Other then Arabic, they would
Have said : why are not
It’s verses explained in detail ?
What ! (a book.) not in Arabic
And (a Messenger an Arab ?)”

অর্থাৎ “আমরা যদি আরবী ভিন্ন অল্প কোন ভাষাতে কুরআন পাঠাতুম, তা হলে তারা বলত, এর বাক্যগুলো ভাল করে বুঝিয়ে বলা হয় নি কেন ? সে কি ! বই আরবীতে নয় অথচ পয়গম্বর আরব ?”

আল্লা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতরণের ভাষা ব্যবহার করবেন সেই ত স্বাভাবিক, অল্প যে-কোন ভাষায় (এবং সে যুগে হীক ছিল পণ্ডিতের ভাষা) সে কুরআন পাঠানো হলে মক্কা

লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা ত এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

গণ-আন্দোলনে সব চেয়ে বড় কথা—আপামর জনসাধারণ যেন বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারে।

তাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চতুর্দিকে যে-আন্দোলন গড়ে উঠল, তার ভাষা বাংলা, তুকারামের ভাষা মারাঠী (তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, সংস্কৃতই কেবল সাধুভাষা?—তবে কি মারাঠী চোরের ভাষা), কবীরের ভাষা সে-সময়ে প্রচলিত হিন্দী এবং তিনিও বলেছেন, "সংস্কৃত কুপঙ্কল (তার জন্ত ব্যাকরণের দড়ি-শোটার প্রয়োজন) কিন্তু 'ভাষা' (অর্থাৎ চলতি ভাষা) 'বহতা' নীর—যখন খুশি ঝাঁপ দাও, শাস্ত হবে শরীর।" রামমোহন, দয়ানন্দ আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে-বাংলা ব্যবহার করে গিয়েছেন, তার চেয়ে সোজা সরল বাংলা আজ পর্যন্ত কে বলতে পেরেছেন? এমন কি বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ও তাঁর বিপক্ষ দলকে উপদেশ দিয়েছিলেন সংস্কৃত না লিখে বাংলায় উক্ত দিতে। তিনি নিজেও সংস্কৃতে লেখেন নি, যদিও তিনি সংস্কৃত জ্ঞানভেন আর-সকলের চেয়ে বেশী।

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পতনের অগ্রতম কারণ সেদিনই জন্ম নিল, যেদিন বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা দেশজ ভাষা ত্যাগ করে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করলেন। দেশের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, ওদিকে সংস্কৃতে শাস্ত্রচর্চা করতে ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্য ঢের ঢের বেশী—বৌদ্ধ-জৈনদের হার মান ত হল।

পৃথিবী জুড়ে আরও বহু বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—পণ্ডিতী ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মাতৃভাষার উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে।

এইবারে নিবেদন, ইতিহাস আলোচনা করে দেখান ত পৃথিবীর কোথায় কোন্ মহান এবং বিরাট আন্দোলন হয়েছে জনগণের কথা এবং বোধ্য ভাষা স্বর্জন করে?

এ-তত্ত্ব এতই সরল যে, এটাকে প্রমাণ করা কঠিন। স্বতঃসিদ্ধ িনিস প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ কষ্টাগত হয়।

আটঘাট বেঁধে পূর্বেই প্রমাণ করেছি, এসব আন্দোলন নিছক ধর্মোন্দোলন (অর্থাৎ আত্ম-পরমাত্মাজনিত) নয়, এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজ-নৈতিক অংশ অনেক বেশী গুরুত্ববাহক।

তাই ভারতবর্ষ এখন যে নবীনরাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে এই সব আন্দোলনের পার্থক্য অতি সামান্য এবং তুচ্ছ। এই যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

করা হয়েছে, তার সাক্ষ্যের বৃহৎশ নির্ভর করবে জনগণের সহযোগিতার উপর—
এ-কথা পরিকল্পনার কর্তব্যাক্তিরা বহুবার স্বীকার করেছেন এবং ক্রমেই বুঝতে
পারছেন, উপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে কোনও দেশকে উন্নত করা যায় না—
যদি নীচের থেকে, জনগণের হৃদয়মন থেকে সাড়া না আসে, সহযোগিতা আগে
না ওঠে।

আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয়, সর্ব কুজুসাধন সম্পূর্ণ নিফল হবে যদি
আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের
সম্মুখে প্রকাশ না করি। এ-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জানি, ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। শুধু ধীরে
অস্বহীনকাল ধরে ইংরেজীর সেবা করতে চান, তাঁরা ভারতের অগ্রগামী গতিকে
স্বপ্নর করে দেবেন মাত্র।

এ বিশ্বাস না থাকলে আমি বার বার নানা কথা এবং একাধিকবার একই
কথা বলে বলে আপনাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতুম না ॥

ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা

‘হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড’এ সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার ‘কম্পালসরি
হিন্দী—ইট্‌স একেক্ট অন এডুকেশন’ শীর্ষক একটি স্মৃতিস্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন।
প্রবন্ধের পূর্বার্ধে তিনি দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। প্রথমত, অ-হিন্দী অঞ্চলের
আপন ভাষা—যথা বাংলা, মারাঠী, দক্ষিণী ভাষাগুলোর স্থান হিন্দী দখল করে
নিয়ে সে-সব অঞ্চলে একে অন্তের যোগসূত্রের এবং সাহিত্যে কলানুষ্টির মাধ্যম
হতে পারবে কি? দ্বিতীয়ত, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে আমরা যদি দুর্বলদৃষ্টি দিয়ে
দেখি, তবে এটা কি কামা হবে যে, হিন্দী ইংরেজীর জায়গা দখল করে ব্যবসা-
বাণিজ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠুক?

নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে শ্রীযুক্ত সরকার সপ্রমাণ করেছেন, বাংলা, মারাঠী
ইত্যাদির স্থান হিন্দী কখনও দখল করতে পারবে না। আমরাও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ
একমত।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন, ইংরেজীর স্থলে হিন্দী কামা হতে
পারে না। শ্রীযুক্ত সরকার তাই ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারত-
বর্ষে ইংরেজীই চালু রাখতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজীকেই শিক্ষার
মাধ্যমরূপে রাখতে চান—না হিন্দী, না বাংলা, এবং তাঁর লেখাতে তিনি এমন

কোনও ইঙ্গিতও দেন নি যে, আজ হোক কিংবা এক শ বছর পরেই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে। তাঁর ব্যবস্থা অল্পযায়ী দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজীই অজরামরূপে চিরকাল আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়ে থাকবে।

সরকার মহাশয় ইংরেজী ভাষার যে গুণকীর্তন করেছেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। ইংরেজীর মত আন্তর্জাতিক ভাষা পৃথিবীতে আর নেই, অত্কার (বিশেষ জোর দিয়ে আমিও বলছি অত্কার) দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা করতে হলে ইংরেজী ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

কিন্তু ইংরেজী চিরকাল এদেশেব শিক্ষার মাধ্যম, তথা উচ্চাঙ্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা আমরা কাম্য বলে মনে করি নে।

এ কথা ঠিক যে, আজই যদি আমরা ইংরেজী বর্জন করি, তবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হব, কিন্তু কোনও দিনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে বর্জন করতে পারব না একথা আমরা বিশ্বাস করি নে।

পৃথিবীর অত্রাণ্ড প্রাচ্য দেশেব অবস্থা আজ কী? আরব ভূখণ্ড বিশেষ করে মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানেব চর্চা কি দিল্লি-কলকাতার চেয়ে অনেক কম? মিশরে জ্ঞানচর্চার মাধ্যম আরবী, ইংরেজী না ফরাসী? ‘অজহর’ মুসলিম শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থল—সেখানে যে আববী মাধ্যম হবে, তাতে আব কী সন্দেহ! তাই সে-দৃষ্টান্ত দেব না, কিন্তু যুরোপীয় চঙে নির্মিত বাকী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ত ফরাসী নয়, ইংরেজীও নয়। অথচ তারা দিব্য আরবীর মাধ্যমেই আলোপ্যাথি, যুরোপীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিখছে, তাদের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) আরবীতেই বেরয়। বিদেশী অধ্যাপকদের আরবী শিখে সে-ভাষাতেই পড়াতে হয়।

আক্সার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ফরাসীস? বা তেহরানে?

এই যে চীনে, এতবড় রাজনৈতিক ও সামাজিক নবজাগরণ হয়েছে সে কি রাশানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম কবে? না, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশান শিক্ষার মাধ্যম, কিংবা চীনারা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা রাশান ভাষায় আরম্ভ করে দিয়েছেন? পণ্ডিতজী তাঁর চিন্তার ফল ইংরেজীতে প্রকাশ করেন, কিন্তু মাওসে তুঙ রাশানে কেতাব লিখেছেন, এ-কথা ত কখনও ভনি নি।

জাপানে শিক্ষার মাধ্যম কি ইংরেজী? জাপানীদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেরয় কোন ভাষায়?

ত্রীযুক্ত সরকার বলেছেন,—“Even in the Latin Republics of”

South America, English is fast advancing as the medium of commercial communication and displacing (except for petty purely local transactions) Portuguese and in some of the States corrupt Spanish by the people."

লাতিন-আমেরিকা সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎজ্ঞান নেই, তাই 'পেটি পুরলি লোকাল ট্রানজ্যাকশনস্' বলতে শ্রীযুক্ত সরকার কী বলতে চেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পাবলুম না। তবে কি ওইসব অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী? এমন কথা ত কখনও শুনি নি—বরঞ্চ আমার ঠিক ঠিক জানা আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, জার্মানির ইস্কুলে যারা লাতিন গ্রীক পড়ত না তাদের বাধ্য হয়ে ইংরেজী, ফরাসী এবং স্প্যানিশের মধ্যে যে-কোনও দুটো শিখতে হত এবং লাতিন আমেরিকায় ইংরেজীর চেয়ে স্প্যানিশের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল চলবে এ-তত্ত্ব জানা থাকায় বহু ছেলেমেয়ে স্প্যানিশ শিখত।

লাতিন আমেরিকা অনেক দূরের পালা—এবারে ইংলণ্ডে খুব কাছে চলে আসা যাক—ইংরেজী ভাষার গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশী জানে এবং বোঝে। এরা সংখ্যায় খুব নগণ্য তবু ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে নেয় নি। হল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে কি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী, না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে ইংরেজীতে? এদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটা বড় হিঙ্গা ইংলণ্ডের সঙ্গে, কিন্তু কই, তারাও ত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অবগুপাঠ্য করে নি? আজকের দিনের সঠিক খবর বলতে পারব না, তবে যতদূর জানা আছে, যারা উচ্চশিক্ষাভিলাষী তাদের হয় শিখতে হয় লাতিন-গ্রীক, নয় ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদির যে-কোন দুটো ভাষা।

এখন প্রশ্ন, যারা মাতৃভাষা ভিন্ন অথচ একটি কিংবা দুটি ভাষা শেখে তাদের জ্ঞানগম্যি ওসব ভাষাতে কতখানি হয়? পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না, তাঁদের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। জার্মান পণ্ডিতমাত্রই ক্লাসিক্‌স্ এবং ফরাসী, ইংরেজী, ইতালীয় পড়ে বুঝতে পারেন, ইংরেজ পণ্ডিতদেব বেশীর ভাগ ফরাসী জার্মান পড়তে পারেন—বিশেষ করে যারা অর্থনীতির চর্চা করবেন তাঁদের মাসিক পত্রিকায় জমবার্ট, স্কমপেটার পড়ার জন্ত বাধ্য হয়ে জার্মান শিখতে হত। অ্যাটম-বমের গবেষণা করেছেন আমেরিকাতে বসে জার্মানরাই, কিংবা যারা জার্মান জানতেন।

কিন্তু ইয়োরোপে আর যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী শেখে, ইস্কুল কলেজ ছাড়ার পর তারা ওই ভাষাতে জ্ঞান-চর্চা করে কতটুকু? উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজমাত্রই অন্তত আট বছর করাসী শেখেন—কিন্তু কলেজ ছাড়ার বছর পাঁচেক পরই এঁরা আর করাসী বই কেনেন না। আমি এঁদের বাড়ির কেতাবের শেল্ফ্‌ মনোযোগ করে দেখেছি—পাঠ্যাবস্থায় যে-সব করাসী বই তাঁরা কিনে-ছিলেন তার উপর আর কিছু কেনবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এঁদের ‘দ্বিতীয় ভাষা’ সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে সে সম্বন্ধে জেরম কে জেরমের ঠাট্টা-মন্তব্য পড়ে দেখবেন।

বস্তুত বহু গবেষণা করে শিক্ষকগণ এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতেই এসেছেন যে, মানুষকে ব্যাপকভাবে দোভাষী করা যায় না। গোলামদের কথা আলাদা। তারা যখন দেখে অর্থাগমের একমাত্র পন্থা ‘মুনিবের ভাষা শেখা’ তখন সব-কিছু বিসর্জন দিয়ে প্রভুর ভাষা শেখে—আমি যে-রকম শিখেছিলুম, কলে আজ না পারি উত্তম বাংলা বলতে, না পারি মধ্যম ইংরেজী লিখতে। কিন্তু আমার ছেলে গোলাম নয়—আমার আশা সে একদিন বাংলাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমার ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পারে তাতেই আমি খুশী এবং যদি সেদিন তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ করাসী আপন আপন মাতৃভাষাতে তার কেতাব অম্ববাদ করে—আজ যে-রকম মাওংসে তুঙের চীনা বই বেরনোমাত্রই ইংরেজ গায়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ স্ব-ভাষায় তার অম্ববাদ করে, এখনও যে-রকম ইংরেজ ‘শকুন্তলা’ নাট্যের অম্ববাদ করে—তবে আমি অমর্ত-লোক থেকে তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করব। অনন্তকাল ধরে আমরা শুধু ইংরেজী থেকে নেবই, কিছু দেবার সময় কখনও আমাদের আসবে না, একথা ভাবতেও আমার মন বিকল্প হয়।

তবে কি বাংলাভাষী লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম যে, আমরা কখনও বাংলাকে করাসী কিংবা জার্মানের মত সমৃদ্ধিশালী করতে পারব না?

ভাষা	ভাষীদের সংখ্যা (হাজার সহস্রতে)
বাংলা	৬০০০
আরবী	২৫০০
চীন	৪৩০০০
গ্রীক	৫৫০০
জাপানী	৫৫০০
জার্মান	৮০০০
হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী উর্দু দুই মিলিয়ে ; না হলে	
স্বল্প হিন্দীভাষীর সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম)	
	১০০০০

ওলন্দাজ	...	১০০০
ইংরেজী	...	১৮০০০
করাসী	...	৪৫০০০
রুশ	...	৮৫০০০
তুর্কী	...	৭০০০

এবারে ভাষার ভিত্তিতে না নিয়ে লোকসংখ্যা নিন, কারণ, যে বর্ষপঞ্জী থেকে এই সংখ্যাগুলি পেয়েছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন, সুইডিশ, ডেনিশ, বার্মিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয় নি।

নরওয়ে	...	২৯৫২
ডেনমার্ক	...	৩১৭৩
ফিনল্যান্ড	...	৩৭৩৪

আমার যতদূর মনে পড়ছে, চীনা, ইংরেজী, রুশীয়, জার্মান এবং স্প্যানিশের পরেই পৃথিবীতে বাংলার স্থান।

নরওয়ে, সুইডেন তাদের ২৯,৫২, ৬৫,২৩ নিয়ে আপন আপন ভাষায় দর্শন লেখে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ডাক্তারি শেখে, ইঞ্জিনীয়ারি করে আর আমরা ৬০০,০০ হয়েও চিরকাল ইংরেজীর ধামা-ধরা হয়ে থাকব ?

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আমরা করুনা করতে পারি নি, কার্শী যদি এদেশ থেকে চলে যায়, তবে আমরা বাজকার্য চালাব কী করে। ইংরেজ চোখে আবুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ইংরেজীতেও চালানো যায়। আজ আমরা করুনা করতে পারছি নে, ইংরেজী ছেড়ে আমরা যাব কোথায় ?

কিন্তু অধর্মের বক্তব্য এইখানেই শেষ নয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, পণ্ডিতজনের মতের বিরুদ্ধে যেয়ো না, কারণ পণ্ডিতের জ্ঞান আছে, তোমার নেই।

তবে কি মূর্খের বিরুদ্ধে মতানৈক্য প্রকাশ করব ? সে ত আরও ভয়ঙ্কর আমার আপন অজ্ঞানাত যে-সব অসিদ্ধ যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করব, যে-সব ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পেশ করব, মূর্খ অজ্ঞতাবশত সেগুলো মেনে নিয়ে আমাকে আরও বিপদে ফেলবে।

তাই আমি শ্রীযুত যতুনাথ সরকার মহাশয়ের সঙ্গেই মতানৈক্য প্রকাশ করছি। তিনি জ্ঞানবুদ্ধ, বয়োবুদ্ধ এবং হুপণ্ডিত; আমার মত অর্বাচীনের যুক্তি-তর্ক, বিশেষত ঐতিহাসিক নজির পেশ করার সময় যদি ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে,

তবে তিনি সেগুলো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি করে দেবেন। বাবা টেনিস-খেলোয়াড় টিল্ডেনও বলেছেন, ‘সব সময় তোমার চেয়ে ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবে—না হলে খেলাতে তোমার কখনও উন্নতি হবে না।’ ইতিহাসে শ্রীযুত সরকার ভুবন-বিখ্যাত— তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে আমিই লাভবান হব।

ইংরেজী ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার দেখে আমরা আজ কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে, এ-ভাষা বাদ দিয়ে আমরা চলব কী করে? বাংলায় এ-রকম ভাণ্ডার নির্মাণ করব কী প্রকারে?

ইতিহাস বলেন, একদা ইয়োরাপের সর্বত্র জ্ঞানচর্চা হত লাতিনের মাধ্যমে। ইংরেজী, ফরাসী, জমনের নামও তখন কেউ মুখে আনত না। ওই সব অপোগণ্ড অর্বাচীন ভাষা যে কখনও জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হতে পারে একথা কেউ বললে তখন নিশ্চয়ই তাকে পাগলা-গারদে পাঠানো হত, কিংবা ডাইনী ‘ভর করেছে’ ভেবে জ্যাস্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। অথচ এমন দিনও এল যখন ফ্রান্সের লোক লাতিন বর্জন করে ফরাসী ভাষাকেই জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মাধ্যম বলে মেনে নিল। জার্মানি তখনও শিক্ষাদীক্ষায় ফ্রান্সের অনেক পিছনে, তাই জার্মান রাজা-রাজড়, নবাব-সুবেদারবা উত্তম ফরাসী-চর্চা করাটাই জীবনের সর্বপ্রধান কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাচ্চা-বাচ্চাদের পর্যন্ত ফরাসী ‘পার্লিয়েরেন’ ‘স্প্রেঘেন’ ক্রিয়া খাটি জার্মান, তার অর্থ ‘কথা বলা’ কিন্তু জমনরা তখন অহুস্করণে এমনি মত্ত যে ফরাসী ‘পার্লো’ ক্রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—তুলনা দিয়ে বলি, আমি ছেলেবেলা থেকে ইংলিশ ‘স্পাক’ করে আসছি) করতে শেখানো হত এবং জার্মান ভাষাটাকে চাকরবাকরের ভাষা (গ্রেজিন্ডে-স্পাখে) বলে গণ্য করা হত। ফ্রিডরিক দি গ্রেট মাতৃভাষা জার্মানকে হেয় জ্ঞান কবে ফরাসীতে কবিতা লিখতেন এবং সেই রদী কবিতা মেরামত করতে গিয়ে গুলী ভলতেয়ারের নাভিস্বাস উঠত।

তারপর একদিন ফরাসী নিজের থেকেই ব্যাঙাচির ছাজের মত থসে পড়ল। জার্মানই জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হয়ে গেল।

তারপর জার্মান এল ইংরেজীর আওতায়। শ্রীযুত যত্ননাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন—

“The late German Emperor, Wilhelm II, before world-war No. I, had made English a Compulsory second language in all the secondary schools of his Empire. Wsa

; that a sign of his slavery to the British people? No, like a shrewd practical politician he felt that this was the best way of promoting Germany's trade all over the world." (Hindusthan Standard, Feb. 1st, '53.)

এবার দেখা যাক এই ইংরেজীর প্রভাব খদ্ জার্মানবা পরবর্তী যুগে কী চোখে দেখেছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত যোহান ভীসনার 'জার্মান-ভাষা শিক্ষা' ('*ডয়েচশে স্প্রাখলেহে*') নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এ-পুস্তিকা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির শিক্ষা-বিভাগ (কুলটুস্ মিনিষ্টেরিয়ুমের) কলেজের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচন করেন।

জার্মানের উপর লাতিন, ফরাসী তথা ইংরেজীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভীসনার যা বলেছেন সেটি আমি তুলে দিচ্ছি। অল্পবাদের সঙ্গে মূল জার্মান এখানে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, অল্পবাদে কোনও তুল থাকলে গুণী পাঠক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবেন। (ডবল স্পেস-ওলা শব্দগুলো ইংরেজী-পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি)।

Dem 19 Jhdt war es vorbehalten, unser Deutsch mit englischen Woertern zu ueberfluten. Die weit verbreitete Kenntniss der englischen Weltsprache, dazu der maechtige Einfluss englischer Sitte und Mode bewirkten, dass der deutsche Gentleman Smoking oder Sweater wenigstens bis zum Weltkriege den Englaender ebenso nachaeffte wie frueher der deutsche Cavalier den Franzosen, Jede Kneipe bis dahin warein Bar, jedes Dampfschiff ein Steamer, jeder Fahrstuhl ein Lift (mit einem Liftboy) jede Fuellfeder eine Fountain-pen, jeder Fuenfuhr-Tee ein Five o'clock tea, Deutsche Fabrikanten schrieben auf ihre fuer Deutschland bestimmten Erzeugnisse Kohinor made by L. & C. Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed lead, Am ueppigsten wucherte das

englische natuerlich auf dem Gebiete des S p o r t s + deutsche Mittelschulen veranstalten Foot-ball-meetings und Lawn-tennis-matches wobei alles englisch war, auch das Zaehlen, nur nicht die Auesprache, Wie leichtfertig der Deutsche sein Volkstum vollends preisgibt, wenn er mit dem Auslande in unmittelbare Beziehung tritt, sieht man an der gemixten Sprache des Deutsch-Amerikhaners; immer bissitg (busy), kauft sich dieser eine goldene W a t s c h e n (watch) s t a r t e t f o r h o m (geht nach Hause) u n d r i n g t die B e l l (laeutet die Glocke) o r d e r b e l l t (laeutet einfach). —ভীসনার, ডয়েচশে স্প্রাখলারে, পৃ ৮৫।

“আর উনবিংশ শতাব্দী রইলেন আমাদের জার্মান ভাষা ইংরেজী শব্দের বহুসংখ্যক আসিয়ে দেবার জন্য। বিশ্বভাষা হিসেবে ইংবেজীর প্রসার এবং ইংরেজী রীতিনীতির প্রভাব হওয়ার ফলে বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) না লাগা পর্যন্ত জার্মান Gentleman Smoking কিংবা Sweater পরে পরে বাদরের মত ইংরেজের অনুকরণ করেছিল—একদা যে-রকম জার্মান Cavalier ক্রাসীর অনুকরণ করেছিল। ক্রাইপেকে বলা হত bar, ডামপকশিককে বলা হত steamer, কারটুলকে lift (এবং তার ভিতরে থাকত litt-boy), ফ্যানকেডারকে fountain-pen, ফ্যানকউরটিকে five o' clock tea. জার্মান কারখানাওয়ালারা জার্মানিরই জন্ম নির্মিত মালের উপর লিখতেন, Koh-i-noor made by L. & C Hardmuth in Austria, British graphite drawing pencil, compressed leac. এই (শব্দের) আগাছা অবশ্য সবচেয়ে বেশী পল্লবিত হল sports-এর জমিতে। জার্মান হাইস্কুলগুলো football meetings এবং Lawn-Tennis-matches-এর ব্যবস্থা করল এবং সেখানে সবই ইংরেজীতে চলত, এমন কী, সংখ্যা গোনা পর্যন্ত—একমাত্র উচ্চারণটি ছাড়া (লেখক ব্যঙ্গ করে ইঙ্গিত করেছেন—ওই কর্মটি সরল নয় বলেই)। বিদেশীর সঙ্গে সোজা সংস্পর্শে এলে জার্মান কী অবহেলায় তার জাত্যভিমান বর্জন করে তার উদাহরণ দেখা যায় তার থিচুড়ি জার্মান-মার্কিন ভাষাতে, ‘বিজিক’ (Busy) বড়ি কিনলে সেটা Watschen (Watch) s r a r t e t f o r h o m (বাড়ি রওয়ানা দিল) এবং r i n g t d i e b e l l (ঘণ্টা বাজায়) কিংবা শুধু b e l t (এখানে)

লেখক একটু রসিকতা করেছেন, শুধু জর্মনে belt অর্থ ‘ঘেউ ঘেউ করা’)।”

তারপর লেখক দুঃখ করেছেন যে, এই করে করে জর্মন ভাষা একটা জোয়ার মত হয়ে উঠল যার সর্বাঙ্গে রঙিন তালি এবং সে-তালির টুকরোগুলোর নানা রঙের নানা জামা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া !

আমি অধ্যাপক ভীষনারের সঙ্গে যোল আনা একমত নই। বাংলা এখনও অতি দুর্বল ভাষা ; তাকে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশী শব্দ নিতে হবে। আমি যে এই নাতিদীর্ঘ উদাহরণটির অতি কষ্টে নকল এবং অমূল্য পেশ করলুম (ভুল করলুম, অ্যাডিন বাজারে জোর ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভাল জর্মন জানি, এইবারে অমূল্যের বেলায় ধরা পড়ব) তার উদ্দেশ্য এই যে, জর্মন যদি সুসময়ে এই পাগলামি বন্ধ না করত তবে সে এতদিনে কথামালার চিজিতা গর্ভিতা হয়ে যেত।

অর্থাৎ আমরা যদি অনন্তকাল ধরে ইংরেজীরই সেবা করি, তবে আমাদের বাংলা ভাষাটি চিজিতা মক্কা হয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে আরও অনেক বক্তব্য আছে। কিন্তু এতখানি লেখার পর আজ সকালের (রবিবারের) কাগজ এসে পৌঁছল। সে কাগজ পড়ে আমি উল্লাসে মুক্তকণ্ঠ হয়ে নৃত্য করেছি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদী-জন মাজই খবরটি পড়ে উল্লসিত হবেন। খুলে কই।

আশা করি, আমার পাঠকেরা বিজ্ঞানে শ্রীযুত সত্যেন বসু এবং শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। যে সব গুণী আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলজাত প্রশ্ন এক লহমায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন, তাঁরাই দেখছি, এই দুই পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হলেই মাথা নীচু করেন।

শ্রীযুত বসু বলেন, (আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্ছি, সভাতে যাবার আমার অধিকার নেই—তাই প্রতিবেদনে ভুল থাকলে বসু মহাশয় যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন) কেউ কেউ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিতেই হবে, কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস (confident) যতদিন না বাংলাতে বিজ্ঞানের চর্চা হয় ততদিন পশ্চিম বাঙালয় বিজ্ঞানের প্রসার হতেই পারবে না।

তাঁর বিশ্বাস বাংলাতেই প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ কিছুটা আছে, কিছুটা বানানো যেতে পারে, এবং বান্দবাকী বিদেশী ভাষা থেকে নিতে কোনও সংকোচ করার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণের সময় হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কী চাই? আমি যে-জিনিস অন্ধভাবে অনুভব করেছি, আমার যে-সব দরদী পাঠক আমার সঙ্গে এতদিন মোটামুটিভাবে একমত, তাঁরা কি এই দুই পণ্ডিতের উক্তি শুনে উল্লসিত হলেন না?

একটা জিনিসকে আমি বড় ভরাই, আপনাদের অনুমতি নিয়ে সেটি আজ আপনাদের কাছে নিবেদন করব।

গণ-আন্দোলন বাদ দিয়ে কোনও দেশেই কোনও বড় কাজ করা সম্ভব হয়। যতদিন পর্যন্ত শুধু ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই স্বরাজ-আন্দোলনের জন্ত চেষ্টা করেছিলেন ততদিন ইংরেজ আমাদের খোড়াই পরোয়া করেছিল, কিন্তু যখন ভারতের জনগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল—অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের ফলেই সম্ভবপর হল—তখন বাধ্য হয়ে ইংরেজকে এদেশ ছাড়তে হল। তাই, আবার বলছি, গণজাগরণ, গণ-আন্দোলনের শক্তিই আমাদের স্বরাজ এনে দিয়েছে।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র তার স্বরাজ্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চায় তবে তার দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্বরাজ্য-লাভ। রাজনৈতিক স্বরাজ্যের আপন মূল্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার ব্যবহারিক মূল্যের দিকটা ভুললে চলবে না—রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলে আমাদের হাতে যে-শক্তি এল তারই প্রয়োগ করে এখন আমাদের জয় করতে হবে অগ্র সর্ব-স্বাধীনতা। এক কথায় এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য, নবীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

আমরা ভাবি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ত ‘চাষাভূষা’কে ‘খ্যাপাবার’ দরকার ছিল, এখন যখন স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, তখন এদের দিয়ে আর কোনও দরকার নেই, এরা কিরে যাক ক্ষেতে-খামারে, কলাক ধানচাল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আমরা শহরে বসে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করব আর তাই দিয়ে নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলব! তাই আমরা সে-চর্চা ইংরেজীতে করব, বাংলায় করব, না বাপু ভাষায় করব তাতে কিছু আসে-যায় না, আমরা বুঝতে পারলেই হল, ওরা ওদের কম-জোর মাতৃভাষা নিয়ে পড়ে থাক। ভাবতেই আমার সর্বাঙ্গ ঘেঁষায় রী রী করে ওঠে।

বহু দেশ ভ্রমণ করে, বহু গুণীর সাহচর্যে এসে, আপন মনে নির্জনে বসে বহু

তোলাপাড় করে আমার হৃদয় প্রত্যয় হয়েছে, এ বড় ভুল ধারণা, এ অতি মারাত্মক বিশ্বাস। আমার মনে আজ কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন আমরা নবীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব না। আমি আমার সহৃদয় পাঠক-সম্প্রদায়কে কখনও কোনও তথ্যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্থাপন করতে অহুরোধ করি নি—তার পক্ষে, স্বপক্ষে যুক্তি তর্ক পেশ করেই ক্ষান্ত দিয়েছি—কিন্তু আজ যুক্তি-তর্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অহুরোধ করেও বলছি, সাহস দিচ্ছি, জনগণের ভিতর বিশ্বাস অহুপ্রাণিত করুন, তাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন—আপনারা লাভবান হবেন। এ ছাড়া অণু পন্থা নেই।

এখন প্রশ্ন, জনগণের সহযোগিতা, জনগণমন আমরা জয় করব কী প্রকারে ?

বিদেশী প্রবাদ, সব লোককে কিছুদিন ঠকাতে পাব, কিছু লোককে সবদিন ঠকাতে পার, কিন্তু সব লোককে সব দিন ঠকাতে পাববে না। আমাদের অবশ্যপতনের যুগে আমাদের সব লোককে—অর্থাৎ জনগণকে—আমরা অন্ধাধিকার করতে শিখিয়েছিলুম, কিন্তু আজ আর সে-কর্ম সম্ভবপর নয়। আমরা চাইও না। আজ আমরা চাই, জনগণ যেন আমাদের আদর্শ বুঝতে পেরে, সেই মর্মে অহুপ্রাণিত হয়ে নবীন রাষ্ট্রনিমাণে আমাদের সহায়তা করে।

তাই প্রশ্ন, জনগণ আমাদের আদর্শ বুঝবে কী প্রকারে ? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে, ভারতীয় ইতিহাসের ধাৰা অহুসন্ধান করে যদি তাবৎ বস্তু ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ করে সপ্রমাণ করে, আমাদের পক্ষে এই কর্ম কাম্য, আমাদের পক্ষে ওই নীতি প্রয়োজনীয়, আমাদের পক্ষে আরেক পন্থা স্বয়ং তবে তারা এ-সব বুঝবে কী করে ?

চট করে আপনি উত্তর দেবেন, মাতৃভাষাতে লিখলেই কী তারা সব কিছু বুঝতে পারবে ?

এর সহুত্তর দিতে হলে আপনাকে আবার একটুখানি কষ্ট স্বীকার করে ইউরোপে যেতে হবে।

ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ডে বেশীর ভাগ লোক শিক্ষা সমাপন করে ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে। এবং ওদের ম্যাট্রিক আমাদের ম্যাট্রিকের চেয়ে উচ্চস্তরের বলে তারা আর-কিছু শিখুক আর না-ই শিখুক, মাতৃভাষাটা অতি উত্তমরূপে শেখে। তারপর টাকা-পয়সা রোজগারের ধান্ডার ভিতর কেউ করে সাহিত্যের চর্চা, কেউ করে ইতিহাসের, কেউ দর্শনের—ইত্যাদি। এবং তাই প্রায়ই দেখা যায়, বহু হুসাহিত্যিক উত্তম উত্তম পুস্তক লিখে যাচ্ছেন অথচ তাঁরা হুদুমাত্র ম্যাট্রিক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রা মাড়ান নি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এই ধরনের—

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বস্বিমচন্দ্র অল্প ধরনের। কিন্তু ইয়োরোপে রবীন্দ্র-শরতের গোষ্ঠী বৃহত্তর।

এ ত হল সৃষ্টিকর্ম—এ অনেক কঠিন কাজ—এর চেয়ে অনেক সোজা, বই পড়ে বোকা এবং সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক অধ্যয়ন করে করে দেশের উচ্চতম আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। এ-জিনিসটি ইয়োরোপে অহরহ হচ্ছে এবং তাই ইয়োরোপের যে-কোনও দেশে গুণীজ্ঞানী যে শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিতরেই পাওয়া যায় তা নয়, জনসাধারণের ভিতরেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায় যারা অনায়াসে অধ্যাপকের সঙ্গে পাজা দিতে পারেন।

আমাদের দেশের বাংলা দৈনিকগুলো যে ইংরেজীর তুলনায় পিছিয়ে আছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, তবুও দেখেছি, একমাত্র ‘আনন্দবাজার’-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালী অনেক সময় ওরই মারফতে এতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে যে, ইংরেজী-জাননেওলা শহরকে তর্কে কাবু করে আনতে পারে।

আমার তখন বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতেরা ইংরেজীতে না লিখে যদি বাংলা কাগজে লিখতেন, তবে আমার গাঁয়ের পড়ুয়া জ্ঞান-লোকে আরও কত দিগ্বিজয় করতে পারত।

মিষ্টন বলেছেন :—

‘ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে চায় এরা কে দেবে এদের খাওয়া।’

আমাদের পণ্ডিতেরা এতদিন এদের বঞ্চিত রেখেছেন; স্বরাজ পাওয়ার পরও এঁরা তাদের জন্ত কিছু করতে চান না। (আমি অবশ্য এঁদের দোষ দিই নে—এঁদের কাছে আমরা বহু দিক দিয়ে ঋণী—কিন্তু এঁরা অল্প যুগের লোক, ইংরেজী লেখাতে তাঁরা এত অভ্যস্ত যে, আজ বাংলা লিখতে এঁদের সত্যই কষ্ট হয়।)

মুসলমানেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছিলেন সে কথা আমরা জানি, ক্রীষ্টান মিশনারিরাও তাই করেছিলেন, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, মুসলমানরা ফার্সী এবং ইংরেজ ইংরাজীকেই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। কলে মুসলমান যুগে যারা ফার্সী জানতেন তাঁরা ছিলেন ‘শরীফ’ অর্থাৎ ‘ভদ্র’ আর ব্রিটিশ যুগে (বলা উচিত ‘ক্রীষ্টান যুগে’ কারণ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দুই যুগ যদি ‘হিন্দু পিরিয়ড’ এবং ‘মুসলিম পিরিয়ড’ হয়, তবে তৃতীয় যুগ ‘ক্রীষ্টান পিরিয়ড’ হবে না কেন?)—এ-তথ্যটির প্রতি আমার ক্ষীণদৃষ্টি জ্যোতিমান করেছেন ছন্দ-সম্রাট শ্রীপ্রবোধ সেন) যারা ইংরেজী জানতেন, তাঁরা ছিলেন ‘ভডরোলোগ্ রাস’, অর্থাৎ ‘শরীফ’, অর্থাৎ ‘ভদ্র’।

অথচ, ভদ্র, 'ভদ্র' বলতে আমরা আবহমান কাল এমন কিছু বুঝছি যার সঙ্গে ফার্সী কিংবা ইংরেজী জানা-না-জানার কোনও সম্পর্ক নেই।

মুসলমান যুগে বরঞ্চ ভদ্রে গ্রাম্যে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল, কারণ মুসলমান যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য, অর্থাৎ জনপদ সভ্যতা ; কিন্তু ক্রীশ্চান আমলে সভ্যতা ইংরেজী-অভিজ্ঞ এবং ইংরেজী-অনভিজ্ঞের মাঝখানে এমনি এক বিরীতি, নিরেট পাঁচিল তুলে দিলে যে, আজও আমরা সে-দেয়াল ভাঙতে পারি নি, এবং ভাঙবার চেষ্টা করতে চাই নে। আমরা এখন ইংরেজী-জাননে-ওলা আর ইংরেজী না-জাননে-ওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ-ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন। সে-কথা আরেক দিন হবে ॥

টুকিটাকি

দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায় ?

দাবা খেলার ইতিহাস সম্পর্কে নানা মূনি নানা কথা কয়ে থাকেন। দাবার শেষের দিকের ইতিহাস হুস্পষ্ট এবং সেখানে তর্কাতর্কির অবকাশ নেই। ইরান জয় কবাব পরে আরবরা সেদেশে প্রথম দাবা খেলা শেখে। সকলেই জানেন, কোনও খেলা সম্পূর্ণ আপন করে নেওয়ার পরও তার মূল পরিভাষা অনেক সময় আগা-গোড়া পরিবর্তিত হয় না। তাই আরবরা ইরানী দাবা খেলা শেখার পরও দাবার রাজাকে ইরানী শব্দ 'শাহ' (রাজা) দিয়ে চিহ্নিত করে, এবং 'তোমার শাহ্ বিপদে' বলার সময়, অর্থাৎ কিস্তি দেওয়ার সময় শুধু 'শাহ্' বলত।

এর পর ক্রুসেড লড়াইয়ের সময়ে বন্দী ইয়োৰোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে দাবা খেলা শেখে এবং তারাও কিস্তি দেওয়ার সময় 'শাহ্' বলত। সেই 'শাহ্' লাতিনের ভিতর দিয়ে ইংরেজীতে রূপ নেয় 'শেক্' এবং সর্বশেষে 'চেক্' রূপে (ব্রিটন 'একসচেকারে'র নাম ওই 'চেক্' থেকে এসেছে)।

কিস্তিমাতের 'মাত' কথাটা ওই ভাবেই আরবী, 'শাহ্, মাতা' অর্থাৎ 'তোমার রাজা মারা গিয়েছে' ইংরেজীতে রূপ নিয়েছে 'চেক মেট' হয়ে।

এখন প্রশ্ন, ইরানীরা দাবা খেলা শিখল কার কাছ থেকে ? দাবা ইরানী খেলা এ-দাবি পারস্ত দেশে কখনও করা হয় নি। বরঞ্চ সে-দেশে কিংবদন্তী

প্রচলিত যে, এ-খেলা ‘পঞ্চতন্ত্র’ পুস্তকের মত ভারতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে গজনির পণ্ডিত অল-বীরুনী তাঁর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকে দাবা খেলার ছক একে দিয়েছেন ও ঘুঁটিরও বর্ণনা করেছেন। তবে আজকের দাবা আর সে-দাবার পার্থক্য প্রচুর। তখনকার দিনে দাবা খেলা হত চারজনে—ছকের চারকোণে চার খেলোয়াড় আপন আপন ঘুঁটি নিয়ে বসতেন এবং চালও দিতে হত পাশা (ডাইস বা অঙ্ক) ফেলে।

তাই নিয়ে বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আজ ভারতীয় দাবা ও বিলিতি দাবা ছবছ এক খেলা নয়।

কাজেই সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রমাণ উপস্থিত না হলে ভারতবর্ষ যে দাবা খেলার জন্মভূমি তা নিয়ে তর্ক করবার কোনও কারণ নেই।

খেলাচ্ছলে

কিছুকাল আগে পার্লামেন্টে জনৈক সদস্য যে প্রশ্ন শুধান তার সারমর্ম এই :—

হেলসিনকিতে যে ওলিম্পিক খেলা হয় সেখানে খেলার শেষে যখন সব দেশ আপন আপন জাতীয় পতাকা নিয়ে পরিক্রমা করে তখন ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই শোভাযাত্রায় যোগ দেবার জ্ঞা কোনও ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যায় নি। অবশেষে নাকি এক ফিন্ যুবক ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

প্রশ্নকর্তা কোনও কোনও ভারতীয়কে এই ঘটনার জ্ঞা তীব্র নিন্দাও করেন।

উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, তিনিও এই রকম কথা শুনেছেন।

আমাদের মনে হয়, এর একটা কড়া তদন্ত হওয়া উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতীয়রা অগ্ন্যাত্ত জাতির তুলনায় অভদ্র নয়। এককালে ভারতীয় সৌজ্ঞ-শালীনতা বিদেশী বহু পর্ঘটককে মুগ্ধ করেছিল বলে তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ভারতবাসীদের উদ্দেশে বিস্তর প্রশংসা গেয়ে গিয়েছেন। মেগাস্তেনেস থেকে এ-ইতিহাস আরম্ভ হয় এবং যদিও কোনও লেখক আমাদের কোনও কোনও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা অভদ্র, এ-কথা কাউকে বড়-একটা বলতে শোনা যায় নি। বিদেশে ভারতীয়েরা আরও সাবধানে চলে বলে সেখানেও তারা প্রচুর খ্যাতি-মত্ত পায়।

তবে হঠাৎ আজ এ-রকম একটা গীড়ানায়ক ঘটনা ঘটল কেন ?

আমার মনে হয়, আমাদের টিমের কর্তাব্যক্তির পরবর্তার কথা বেবাক ভুলে

গিয়েছিলেন, কিংবা ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মেকদারে যাচাই করতে পারেন নি বলে সবাই মিলে রক্তভূমি ত্যাগ করে শহরে ফুঁর্তিকার্তি করতে চলে গিয়েছিলেন আর তাই চ্যাংড়ারাও যে চলে যাবে তার আর কী সন্দেহ !

কর্তারা শহরে বেড়াতে যান নি, চ্যাংড়াদের তাঁরা যেতে বারণ করলেন, তবু তারা বে-পরোয়া চলে গেল, এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এ-টীমে যারা গিয়েছিল তাদের দু-একজনকে আমি চিনি। পতাকা তোলার জন্ত তাদের আদেশ করলে তারা নিশ্চয়ই, অতি অবজ্ঞাই, শহরে চলে যেত না—সেখানে শেষ পরবের জন্ত সানন্দে অপেক্ষা করত।

বিদেশে আপন দেশের পতাকা উত্তোলন করার জন্ত নির্বাচিত হওয়া কি কম শ্লাঘার বিষয় ?

কাজেই মুকুব্বীদের প্রশ্ন শোধানো উচিত, তাঁরা তখন ছিলেন কোথায়, তাঁরা কাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ সে আদেশ অমান্য করেছিল কি না ?

এরই পিঠে-পিঠে সংবাদপত্রে আরেকটা খবর পড়লুম।

পার্লিমেণ্টে যেদিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেদিনই শ্রীযুত পক্ষ জগদীশচন্দ্র জিওলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাবে বক্তৃতা দেবার সময় বলেন, ভারতের খেলোয়াড়রা যখন বিদেশে খেলতে যান তখন তাঁরা প্রায়ই অভিজ্ঞ ভাষায় লেখা বেনামী চিঠি পান এবং তাঁরা যে মন না দিয়ে ফুঁর্তি-কার্তি, আরাম-আয়েশ করে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন সে কটুবাক্যও চিঠিগুলোতে বর্ণিত থাকে।

গুপ্তমহাশয় বলেন, এ-ধারণা ভুল এবং এ-অভিযোগ কখনও সম্ভবপর হতে পারে না, কারণ প্রতি সপ্তাহে এক নাগাড়ে ছদিন জীবন-মরণ পণ করে খেলা প্র্যাকটিস করতে হয়, এ সময় ঢলাঢলির ('ঈজী লাইফ') কথাই উঠতে পারে না।

এ অতি হক কথা—বিদেশে নানা শ্রেণীর খেলোয়াড়দের সংস্রবে এসে আমারও ওই একই ধারণা হয়েছে। তবে সব অভিজ্ঞতারই আরেকটা সাবধান হওয়ার দিকও আছে, অর্থাৎ ভুরি ভুরি অভিজ্ঞতা থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার রাশে ঢিল দেওয়া বিচক্ষণের কর্ম নয়।

এ-সংসারে ছুটু লোকের অভাব নেই। দেশবিদেশের বহু জায়গায় এরা ওই সন্ধানে থাকে, খেলোয়াড়দের খেলার মাঠের বাইরে এমনভাবে বেকাবু করা যায় কি না, যাতে করে পরের দিন তারা ভাল করে খেলতে না পারে। তাই তারা খেলা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এবং যে কদিন খেলা হচ্ছে সে-কদিন রোজ সন্ধ্যায় নেটিভ-স্টেট স্টাইলে জবর জবর ককটেল পার্টি দেয় এবং দেশবিদেশের এমন

সব হোমরা-চোমরাদের নেমতন্ন করে যে, সেখানে বিদেশী খেলোয়াড়দের, ওদের সম্মান রক্ষার্থে ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে যেতে হয়। তারপর নানা কার্যদান-কৌশলে খেলোয়াড়দের মদ খাওয়াবার চেষ্টা সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলে। যারা পালা-পরবে নিত্যন্ত অল্প খায় তাদের নিস্তার নেই, আর যারা খেতে ভালবাসে তারা অনেক সময় প্রলোভন সামলাতে পারে না। দলের ম্যানেজার এবং ক্যাপ্টেন অবশ্য মূর্গার মত চিলের ছোঁ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন কিন্তু অনেক সময় পেয়ে ওঠেন না, তাই ওদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

কোনও কোনও সময় এমন প্রলোভনও রাখা হয় যে-সম্বন্ধে লিখতে আমার বাধা-বাধা ঠেকছে। ফার্সীতে বলে ‘দানিশমন্দরা ইশারা বশ অন্ত’—অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে ইশারাই যথেষ্ট।

কলং ? পরের দিন তারা এমন খেলা খেলে যে, দেখে মনে হয় এরা নিত্যন্তই খেলাধুলো করতে এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আমার ভয় হয়ত অমূলক, হয়ত আমি খামখাই বামের ফৌটায় কুমির দেখছি, হয়ত আসলে ওটা কুমির নয়, ফুসকুড়ি, কিন্তু ওকীবহাল হওয়ার জগ্ন বলতে হয়,

সাবধানের মার নেই

(যদিও জানি

‘মারেরও সাবধান নেই’)।

মনে করুন সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জাম সাহেব, ব্র্যাডম্যান, লারউড, অমরনাথ, অমব সিং, মুশতাক, ওয়াজিব আলী এবং একমাত্র এঁদের মত পয়লা নম্বরওয়ালারা যদি আজ ইহলোক পরলোক ছেড়ে দিল্লিতে একখানা সরেস ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আসেন, তবে আপনার মানসিক চাকলাটা কী রকমের হয় ?

স্বীকার করি, গেল শনিবার দিন এখানে ‘হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড’ ও প্রেসিডেন্সি এস্টেট ক্লাবে যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়, তাতে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও ‘অনিবার্য’ কারণে এঁদের কোনও মহাবতীই উপস্থিত হতে পারেন নি। তাই বলেই যদি আপনারা ভাবেন খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ‘হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড’ দিল্লির রীতিমত পুরাঙ্গস্তর কেউ-কেডা কাগজ, এবং রাষ্ট্রপতির আপন এস্টেট ক্লাবও ত আমাদের প্লাবার প্রতিষ্ঠান। অতএব বিবেচনা করুন, এ-খেলার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কি অতিশয় প্রয়োজনীয় কর্তব্য সমাধান করছি নে ?

কিন্তু হায়, আমার কারণ দুর্ভাগ্য, এ-খেলায় মল্লীনাথরূপে আপনাদের সমীপে কোনও টীকা নিবেদন করার উপায় আমার নেই। কারণ হুও-খেলাতে আমি সশরীরে উপস্থিত হতে পারি নি, যদিও আমার চিত্ত, হৃদয়, চৈতন্য, আত্মা, সর্ব অস্তিত্ব ওই খেলাতে উপস্থিত ছিল। দরদী পাঠক শুধাবেন, কেন উপস্থিত হতে পারি নি ?

অভিমান।

এই যে আমি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'র এত বড় সম্ভ্রান্ত দৈনন্দিন পাঠক, ওই কাগজের গুণী কর্মচারীগণের সঙ্গে আমার বহু যুগের হৃদয়তা, তাঁরা আমার মত একটা ওস্তাদ ক্রিকেটিয়ারকে ওই পরবের দিনে বেবাক ভুলে গেলেন ? কেন, আমি কি রান্নাবরের পিছনে বাতাবি নেবু দিয়ে ঘন ঘন সেজুরি করি নি ? অবশ্য স্বীকার করি উইকেট ছিল না—কিন্তু উইকেট ত থাকে ক্লাস্ট হলে বসবার জন্ত, আমি ত ক্লাস্ট হইনি।

ম্যাচ ড্র গেছে। যাবে না ? আমাকে না নিলে !!

পিকনিকিস্তা

গল্প শুনেছি, এক ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান এবং স্কট নাকি বারোয়ারী চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করে। কথা ছিল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে আনবেন। ইংরেজ আনল বেকন-আণ্ডা, ফরাসী এক বোতল শ্রাম্পেন, জার্মান এক ডজন সসেজ আর স্কট নিয়ে এল তার ভাইকে।

দিল্লিতে কিন্তু পিকনিকিস্তারা শুধু ভাইকে সঙ্গে আনেন না, আনেন ভাইয়ের শালী-শালাদের, তারা আনে তাদের কাকা-মামাদের এবং তারা কেবল তাদের নিয়ে আসে তার হৃদিস এখনও পাই নি। সঙ্গে আনে ক্রিকেট, ফুটবল, গ্র্যামোফোন, পোর্টেবল রেডিও, মণ তিনেক পুরি, তদ্রূপাতের তরকারি এবং মাংস, গোলগাঙ্গা (ফুচকা) এবং মিঠা পান।

এঁদের পীঠস্থল কুতুবমিনার, হাউজ-খাস এবং লোধি গার্ডেনস্। পাঁচ-সাত জনের পিকনিক হেথা-হোথা ছড়ানো থাকলে যত না গোলমাল আর উপদ্রব হয়, ভার চেয়ে চেয়ে বেনী পীড়াদায়ক হয় এই সব পাইকিরী পিকনিকে। বে-খেয়ালে থাকলে হঠাৎ যে কখন হুম্ করে ক্রিকেট-বলটা আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।

এঁরা আনন্দ কখন, আমার তাতে কি আপত্তি, কিন্তু এই যে সাক্ষাৎ মজ-

ছুমিসম দিল্লি শহরে এত তকলিফ বরদাস্ত করে বহুত মেহন্নত করে বাস গজানো হয়, তারই উপর যখন অত্যাচার চলে তখন আমার মত শাস্ত্র লোকেও এই দিল্লির শীতে উষ্ণ হয়ে ওঠে। লনে খোলা আঙুন জালানো বারণ, তাঁর জালাবেনই এবং চৌকিদার আপত্তি জানালে তাঁরা বগড়া-কাজিয়া লাগিয়ে দেন। কিংবা দেখি, চৌকিদার আর কোন আপত্তি করছে না, যেন সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রোপ্যচক্র অস্থল, তার ভিতর দিয়ে দেখবেই বা কী করে।

তাই দিল্লিতে আগমনেছু রসিকজনকে সাবধান করি, যদি শাস্ত্র সমাহিত চিত্তে স্থাপত্যানন্দ উপভোগ করতে চাও তবে রবির সকালে কদাচ কুতুব, হাউজ-খাস এবং লোধি উদ্যান দেখতে যেয়ো না।

নিতান্তই যদি যেতে চাও তবে যেয়ো সরযুকুণ্ডে। অতি চমৎকার স্থল এবং ভিড় নেই বললেও চলে ॥

সাহিত্যিকের মাতৃভাষা

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী তাঁর ‘অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী’ লিখে দেশবিদেশে সুনাম (কারো কারো মতে কুনাম) অর্জন করেছেন। বইখানা পাঠ করবার স্বযোগ—কিংবা কুযোগ—আমার এখনও হয় নি, তবে পুস্তকখানার মূল প্রতিপাত্ত বিষয় কী, সে কথা আমি চৌধুরী মহাশয়ের নিজের মুখেই শুনেছি এবং তিনি তাঁর ভুবনবিখ্যাত পুস্তক থেকে গুটিকতক অধ্যায় আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন। ওঃ! সে কী ইংরেজীর বাহার—তার ভিতর কত ভাষা থেকে, কত কেতাব থেকে কত রকম-বেরকমের আলপনা, কত ব্যঙ্গ, কত হুঙ্কার, কত বাকচাতুরী—ছাত্র ছত্রে হাউই উড়ছে, পটকা ফাটছে—মূল বিষয়েব দিকে ধ্যান দেয় কার ঠাকুরদার সাধ্যি।

তা সে বইয়ের কথা যাক। ও-রকম বই পড়ার বয়স আমার বহুকাল হল গেছে। এ ধরণের বই আনাতোল ফ্রাঁস কেন পড়েন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার সে বয়স গেছে, যখন মামুষ যা বোঝে না তাই ভালবাসে। আমি আলো ভালবাসি।’ নীরদ চৌধুরী যে-রকম এ-যুগের ভলতেয়ার, আঁখো এ যুগের ফ্রাঁস !!

শ্রীযুক্ত চৌধুরী পত্রাশ্বরে একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি এককালে বাংলায় লিখতেন এবং ইচ্ছে করলেই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন হতে পারতেন।

চৌধুরী মশাই মাহুষ ; তাঁরও নানা দোষ আছে । কিন্তু তিনি যে অত্যধিক বিনয়-ভারে অবনত এ কথা তাঁর পরম শত্রুও বলবে না ।

ইংরেজী লেখক হিসেবে মিঃ চাণ্ডরি কতখানি নাম করেছেন জানি নে—জ্ঞানার প্রয়োজনও বোধ করি নি । বিবেচনা করি অ্যাঙ্গিনে তিনি ল্যাম, রাসকিনকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি ‘হেলায় লক্ষ্য করিত জয়’ শুনে আমার মনোরাজ্যে নানা প্রকারের খণ্ড বিদ্রোহের স্বজন হয়েছে ।

তাঁর বাংলা লেখা আমার কিছু কিছু পড়া আছে । বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সাধনা আমিও করেছি, যদিও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্ততম হওয়ার চেষ্টায়, দিল্লি আমার জগ্ন এখনও বিলক্ষণ দূর অস্ত্ । তিনি কাঁচা বা নিকট বাংলা লিখতেন একথা আমি বলব না, কিন্তু তিনি যে কীটসের মত কোন ভয়ঙ্কর অমৃতভাণ্ড নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নামেন নি, সে-কথাও আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে ।

তবে এ দম্ভ কেন ? এর সোজা অর্থ কি এই নয় : ওহে বাঙালী গ—ভ-গণ, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সাহিত্যের যে এভারেস্টে উঠতে পারছ না, আমি ইচ্ছা করলে পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফেই সেখানে উঠতে পারতুম ।

দ্বিতীয়ত, ছোঃ, বাংলা আবার একটা সাহিত্য, তাতে আবার নাম করা ! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার । নাম করতে হয় ত ইংরেজীই সই ।

অর্থাৎ আপন মাতৃভাষাকেও ত্যাগিল্য ।

, বৃথা তর্ক । আমি শুধু শেষ প্রশ্ন শুধাই—স্বজাতীয় লেখক, আপন আপন মাতৃভাষাকে ত্যাগিল্য করে কে কবে সত্য বড় হয়েছে ??

আঙ্গা-যাওয়া

পূব ও পশ্চিম দেশবাসীদের ভিতর মেলা মিল আর গরমিল দুইই রয়েছে বলে কেউ বলেন (কিপলিং), এ দুয়ে মিলন অসম্ভব, আর তার বহু পূর্বে গ্যোটে বলে গিয়েছেন, ‘পূব পশ্চিম এখন আর আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না ।’

যেখানে কিপলিং, গ্যোটে, রবি ঠাকুর, লিন্‌ যুটাং একমত হতে পারছেন না সেখানে আমি কথা কইতে যাব কোন্ সাহসে ? যেখানে কৈয়াজ্ঞানে আর হীক গাঙ্গুলীতে লড়াই লেগে গিয়েছে সেখানে আমি বেমজা বে-সমে হাততালি দিয়ে মরি আর কী ?

তবু সামান্য একটা কথা নিবেদন করতে চাই ।

পশ্চিমের লোক কখনও কারও সঙ্গে কথা ঠিক না করে, অর্থাৎ পাকাপাকি

এনগেজমেন্ট না করে দেখা করতে আসে না। এবং টম যদি ডিকের বাড়িতে কিংবা আপিসে আসতে চায় তবে ডিকের অহুমতি না নিয়ে কখনও আসবে না। কিন্তু, পশা, টম ডিকের অহুমতি নিয়ে এল বটে—ক’টার সময় ভেট হবে—কিন্তু সে যখন খুশি চেয়ার ছেড়ে বলতে পারে, ‘তবে এখন চলনুম’—তার জ্ঞাত ডিকের কোন অহুমতি প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ইয়োরোপে কারও বাড়িতে যাওয়াটা তার হাতে, বেরিয়ে আসাটা আপনাব হাতে।

প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থাটা উঠে। আপনি যখন খুশি রায় মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। ‘এই যে রায় সাহেব’ বলে হকার দিয়ে আপনি রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকবেন, আর রায়ও ‘এই যে চৌধুরী মহাশয়, আসতে আজ্ঞে হোক, বসতে আজ্ঞা হোক’ বলে কোল-বালিশ আর হুকোর নলটা আপনার দিকে এগিয়ে দেবেন। আপনি বালিশটা জাবড়ে ধরে ফুরং ফুরং করে আলবোলায় দম টানতে টানতে মৃদু মৃদু পা দোলাতে থাকবেন।

কিন্তু যখন বললেন ‘এবারে উঠি?’ তখন কিন্তু রায়ের পালা। আপনি যে ছম করে চলে আসবেন সেটি হচ্ছে না, সে অধিকার আপনার নেই। রায় বলবেন, ‘আরে, বসুন. স্তাব। এত তাড়া কিসের।’ আপনার তখন জোর করে চলে আসাটা সম্ভব বে-আদবী।

এর গুহ্য কারণ, হয়ত আপনি বহুদিন পরে এসেছেন, হয়ত কাশীবাস সেয়ে ফিরেছেন, রায়-গৃহিণী খবর পেয়ে আপনার জ্ঞাত সিঙাড়া ভাজবার তোড়জোড় করেছেন, আপনি হট করে চলে এলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, অতএব আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে।

অর্থাৎ বিদায় নেবার বেলা আপনাকে অহুমতি নিতে হবে।

বিশেষ করে ইরান-আফগানিস্তানে এ-নিয়ম অলঙ্ঘ্য। ভেঙেছেন কি, আপনার নামে গোটা পাঁচেক ব্যঙ্গ-কবিতা লেখা হয়ে যাবে। মাহমুদকে নিয়ে ফিবদৌসীর ব্যঙ্গ-কবিতা তার সামনে লজ্জায় বোরকা টানবে।

রুশ দেশ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যখানে। তাই তারা খানিকটে এদের মানে, খানিকটে ওদের মানে। শার্ট তারা সায়েবদের মত পাতলুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু তারা যখন আপন ‘গ্রাশনাল ব্লাউস’ জাতীয় কুর্তা পরে, তখন সেটা আমাদেরই পাঞ্জাবির মত সামনে পিছনে ঝুলিয়ে দেয়।

তারা দেখা করতে আসে খবর দিয়ে, না-দিয়ে, দুইই। বিদেয় নেবার সময় তারা কিন্তু তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করে। গাল-গল্লের মাঝে একটুখানি মোকা

পেলে বলে, 'এইবার ভাই, তোমার সঙ্গে আরেকটি পাগিরসি খেয়ে বাড়ি যাব।'

এ বড় উত্তম পন্থা। আস্তান যদি ভ্যাচোর-ভ্যাচোর করে আপনার প্রাণ এতক্ষণ অতিষ্ঠ করে তুলে থাকে, তবে আপনি তদুত্তেই উল্লসিত হয়ে উঠবেন, 'বাক, লক্ষীছাড়াটা তাহলে আর বেশী ভোগাবে না।' আপনার তখন উপেক্ষার ভাবটা বেড়ে ফেলে খুশী মুখে দু-চারটি কথা বলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে আস্তান যদি আপনার দিলের দোস্ত হয় তবে তার আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনাটার জন্ত আপনি নিজেকে ধানিকটা সামলে নিতে পারবেন।

এবং দ্বিতীয়ত, ইয়োরোপে দেখা হওয়া মাত্রই প্রথম প্রয়োজনীয় কথা পাড়া হয়, পরে গাল-গল্প। প্রাচ্য দেশে তার উলটো—পাঁচটি টাকা চাইবার হলে বিদেয় নিয়ে দোরের গোড়ায় এসে তখন আমতা-আমতা করে চাইতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই হুকুম দিয়ে নয়।

রুশ দেশে ওই শেষ সিগারেটের সময় যা কিছু 'বিজিনেস talk' এবং শিবরাম চক্রবর্তী অল্পপুণএ 'টক বিজিনেস' ॥

দেহলি-প্রাপ্ত

দিল্লি ছাড়ার সময় আমার ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লিতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পন্থস্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয় মুখে রওয়ানা দেন। এমন কা সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি।

তবে কি ধারা এখানে পড়ে থেকে শেষটায় শিব হয়ে যান, তাঁরা অবিবেচক? আদপেই না। এই হুশমনের ভূমি, গরমে শিককাবাব-বানানেওলা, শীতে কুলকৌ-জমানেওলা, সেক্রেটারি-জয়েন্ট লুস্কু-আণ্ডার-তন্তু-আণ্ডারকাভার, জাত-বেজাতের-কর্মচারী-কণ্টকিত এই ভূমিতে যে ব্যক্তি 'অশেষ ক্লেণ ভুঞ্জিয়া' পরলোকগমন করে সে 'পরন্তরামী' স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে ছন্দ রসালাপ করতে পারুক আর নাই পারুক, তাকে অন্ততপক্ষে নরকদর্শন করতে হয় না। কারণ এক নরক থেকে বেরিয়েই অগ্র নরকে যাবার ব্যবস্থা কোনও ধর্মগ্রন্থই দিতে পারে না। আমি বিস্তর ধর্মের ঘাটে মেলা জল খেয়েছি—এ কথাটা আপনাদ্বী প্রায় আপ্ত বাক্যরূপে যেনে নিতে পারেন।

কিন্তু এসব নিছক রাগের কথা।

এই যে আমি দেহলি-বাসীদের সঙ্গে রাশানদের মত শেষ একটা (না, দু-

তিনটে) সিগারেট খাওয়ার ছমকি দিচ্ছি সে শুধু তাঁদের আপন জন ভেবে অভিমানবশত।

আপনারা আমার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কদর করলেন না, আমার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আপনাদের সাহিত্য-সভায় পড়তে দিলেন না, যদি বা প্রধান বক্তা কোন আঙুর সেক্রেটারির নেমস্তম্ভ পেয়ে শেষ-মুহুর্তে কামাই দিলেন বলে আমাকে রচনা পড়তে দিলেন, তখন আবার আমার গুরুগম্ভীর রচনা শুনে আপনারা হাসলেন, যখন রসরচনা (আহা আজকাল রসরচনা লিখে কত লোক রাতারাতি নাম কিনে নিলে) পড়লুম তখন আপনারা গম্ভীর হয়ে গেলেন, সেক্রেটারিদের মন্তব্য করে কবিতা পড়ে শুনালুম—আপনারা সভয়ে গোপনে একে একে সভাস্থল ত্যাগ করলেন, যখন তাঁদের প্রশস্তি গেয়ে রচনা পাঠ করলুম তখন স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আপনারা ফিসফিস কবে বলছেন আমি তেলমালিশের ব্যবসা (মাসাজ ইনস্টিটিউট নয়) খুলেছি, কিছু না পেরে শেষটায় যখন গান গাইলুম তখন পাড়ার ছোঁড়ারা ঠিক সেই সময় গাধার লেজে টিনের কেনেস্কাবা বেঁধে তাকে পাড়াময় খেদিয়ে বেড়াল, ভরতনৃত্য নাচি নি—তাহলে বোধ হয় আপনারা হুম্যানের ছবি এঁকে তার তলায় আমার নাম লিখে বছরের শেষে ‘নরসিং দাস’ প্রাইজের বদলে এই প্রাইজ দিতেন।

তবু আমি আপনাদের উপর এক ফোঁটাও রাগ করি নি। বরঞ্চ আমি আপনাদের কাছে উপকৃত হয়ে রইলুম। আপনাদের সংস্রবে না এলে এই যে সাহিত্যরচনার মামদো ভূত আমাদের কাঁধে ছিল সে কি কন্ঠিনকালেও নামত?

বিবেচনা করি এখন কলকাতা ফিরে গেলে পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে দেখা মাত্রই পরিত্রাহি চিৎকার করে পালাবে না, তরুণীরা হয়ত কিঞ্চিৎ ঘাড় বঁকিয়ে ‘এই যে’ বলে একটুখানি মিঠে হাসিও জানাবেন, ‘ওইরে, আবার এসেছে’ বলে ছুঁকাড় করে দরজা জানলা বন্ধ করবেন না।

ব্যালাটা বেচে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিগুলো কাজিলালকে ‘অবদান’ করেছি। তার বন্ধু পরিমল দত্ত নাকি গাঁটের পয়সা খরচা করে সেগুলো ছাপাবে। তা ছাপাক; আপনারা শুধু নজর রাখবেন সে যেন অ্যাকাউন্টস বিভাগে বদলি না হয়—ছোকরা তাহলে তবিল তছরুপের দায়ে পড়বে। পরিমলকে আমি স্নেহ করি।

যতই ভাবছি, ততই দিল্লি দেখি খারাপ নয়।

দিল্লির গরম অসহ্য! কিন্তু বিবেচনা করুন সেই গ্রীষ্মের শেষে যখন কালো ঝম্মনার ওপার থেকে দূর-দিকন্ত পেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিয়ে বিজয় মন্ডের মত গুরুগুরু করে নবীন মেঘ দেখা দেয়, তারই আবছায়া অন্ধকারে আপনি

খাটিয়াখানা বাইরে পেতে নব বরষণের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনেন, আপনার জিহ্বা-যামিনীর সখা তারার দল একে একে স্নান মুখে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেয়, অল-ইণ্ডিয়া-রেডিয়ার ঘড়িটা আবার তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করেই আপনারই চারপাইখানার কাছে এসে আপনাকে সঙ্গমুখ দেয়, দূর বৃন্দাবনের প্রথম বর্ষণে ভেজা মিঠে হাওয়া এসে আপনার গালে চুমোর পর চুমো খেয়ে যায়, হঠাৎ আকাশের এম্পার ওম্পার ছিঁড়ে-ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে নিজাম প্রাসাদের চূড়ো, রাশান রাজদুতাবাসের ফটক, নিমগাছে এর গায়ে ওর বৃকে মাথা কোটা এক ঝলকের তরে দেখিয়ে দেয় এবং তারপর সবশেষে অতি ধীরে ধীরে রিমঝিম করে বৃষ্টিধারা যখন আপনার সর্বাঙ্গে গোলাপজল ছিটিয়ে দেয়—তখন আপনি খাটিয়া ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যাবার চিন্তাটা পর্যন্ত করেন না, ভিজ্ঞে মাটির গন্ধ দিয়ে বৃকের রক্ত ভরে নেন, ইতিমধ্যে স্নান পান—আরকিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দরোয়ান রামলোচন সিং তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ স্মরণ করে পাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন, আর আপনার প্রতিবেশী সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে ভৈরবীতে গান ধরেছে।

দিল্লি কি সত্যই খুব মন্দ জায়গা ?

কিংবা এই শীতকালের কথাটাই নিন। নিতান্ত যদি সন্ধ্যার পর আপনাকে না বেরতে হয় তবে পুনরায় বিবেচনা করুন...

এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন ? সকাল-বেলায় সোনালী রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে লেপ কাঁথা গরম হয়ে উঠল, নাকে টোস্ট স্যাকার সোদা সোদা গন্ধ এসে পৌঁছেছে, এইবার হাঁৎ করে ভিম-ভাজার শব্দ আর গন্ধ আসবে, আপনি ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন।

আহা ! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শাস্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বৃগনভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রথর হতে প্রথরতর রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো-সবুজের স্নেহ-চিকণ আলিঙ্গন, আপনার আমার মত গরিবের কালি অঙ্গনটুকু নন্দনকানন হয়ে উঠল—আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বপ্ন-রৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ শুধু দিল্লিতেই সম্ভব।

দিল্লি ত্যাগ তাই সহজ কর্ম নয় ॥

পঞ্চতন্ত্র

২য়. পর্ব

ডাক্তার রণজিৎ রায়কে
স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার
চিহ্নস্বরূপ

সৈ. মুজতবা আলী

ঐতিহাসিক উপগ্রাস

কলকাতায় এসে শুনতে পেলুম, বর্তমানে নাকি ঐতিহাসিক উপগ্রাসের মরহুম যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগলো। বন্ধিম আরম্ভ কবলেন ঐতিহাসিক উপগ্রাস দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সামাজিক - কিংবোমাষ্টিক-ঘাঘা—উপগ্রাস, শরৎচন্দ্র লিখলেন মধাবিক্ত শ্রেণী নিয়ে, তারাগন্ধব তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় নিয়ে। এর পর আবাব হঠাৎ ঐতিহাসিক উপগ্রাস কি করে যে ডুব-সাতারে রিটার্নজার্নি মারলে ঠিক বোঝা গেল না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কাজেই আর পাচ-জনের মত হতভম্ব হতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ঐতিহাসিক উপগ্রাসের নাকি এখন জোব কাটতি। আবাব একাধিক জন বলছেন, এগুলো রাবিশ। পাচজনের মত আমি আবাব হতভম্ব।

কিন্তু এতে কবে আমার ব্যক্তিগত উপকাব হয়েছে। বছর পঁচিশেক পূর্বে আমাকে বিশেষ কাবণে মোগল সাম্রাজ্যেব পতন ও মাঝাঠা শক্তির অভ্যুদয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা কবতে হয়। সে যুগেব প্রায় সব কেতাবপত্রই ফার্সীতে। বহু কষ্টে তখন অনেক পুস্তক যোগাড় কবেছিলুম। তাব কিছু কিছু এখনো মনে আছে। মাঝে মাঝে আজকেব দিনের কোনো ঘটনা ছবছ ‘শেষ মোগলদের’ সঙ্গে মিলে যায় এবং শোভ হয় সেদিকে পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সে সব কেতাবপত্র এখন পাই কোথায়? স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ইতিহাসেব প্রতি অবিচার কবা হবে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উপগ্রাসই এক্ষণে আমার পবিত্রাণ এনে দিয়েছে। ধবে নিম্ন, আমি ঐতিহাসিক উপগ্রাসই লিখছি।

মারাঠারা যখন গুজরাত জুবা। বা জুবে অর্থাৎ প্রদেশ, প্রতিষ্ঠা) দখল কবে তার রাজধানী অহমদাবাদে ঢুকল তখন সেখানকার দেওয়ান (প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী) মুহাক্কিজখানার (আর্কাইভ্‌স্-এর) তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে গুজরাত-কাঠিয়াওয়ার্দের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখেন। বইখানি তিনি দিল্লীর বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ বঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন। ইতিহাসের নাম ‘মিবাৎ-ই-আহমদী’। পুস্তকের মোকদ্দমায়^১ তিনি

১ বাংলায় মোকদ্দমা বলতে মামলা, ‘কেস’ বোঝায়। আরবীতে অর্থ অবতরণিকা। ‘কদম’ মানে পদক্ষেপ (‘কদম্ কদম বঢ়ায়ে যা’) ; মোকদ্দমা প্রথম পদক্ষেপ, অবতরণিকা। আবাব প্রথম পদক্ষেপ বলে তার অর্থ মামলা রুজু

বাদশা-সালামৎকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে রাজনীতি অনুসরণ করার কলে দিল্লীর বাদশারা গুজরাতে মত মাথার-মনি প্রদেশ হারালেন সে নীতি যদি না বদলানো হয় তবে তাবৎ হিন্দুস্থানই যাবে। সেই নীতির প্রাথমিক স্বর্ণযুগ, ক্রমবিকাশ ও অধঃপতন তিনি সেই ইতিহাসে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। স্বাতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখছি—তাই আবার বলছি ভুলচুক হলে ধরে নেবেন, এটি ঐতিহাসিক উপগ্ৰাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার পর পর কয়েক বৎসর ধরে গুজরাতে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে লোক অহমদাবাদ পানে ধাওয়া করে; সেখানে যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে। অগণিত পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করে দেয়। গুজরাতি মেয়েরা যে টাকা-মোহর ফুটো করে অলঙ্কার হিসেবে পরে সেগুলো পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। বিস্তর লোক উপবাসে মরলো।

গুজরাতে স্ববার স্ববেদার (গভর্নর, কিন্তু বর্তমান গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরতেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে এক জোটে প্রদেশ চালাতেন) তখন অহমদাবাদের সব চেয়ে ধনী শ্রেণীকে পরামর্শের আমন্ত্রণ জানালেন। এইসব শ্রেণীরা প্রধানত জৈন, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন (বর্তমান দিনের শ্রেণী কস্তুরভাই লালভাই, হটিসিং এই গোষ্ঠীরই লোক)।

স্ববেদার সেই শ্রেণীকে শুধালেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্ত কিছু করা যায় কি না। শ্রেণী বললেন, মালওয়া অঞ্চলে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে, সেখানে গম-চাল পাওয়া যাবে। তবে দুই প্রদেশের মাঝখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ। মালবাহী গাড়ি লুট হবে। অতএব তিনি দুই শর্তে দুর্ভিক্ষ-মোচনের চেষ্টা করতে পারেন :

- ১) স্ববেদার নিরাপদে মাল আনানোর জন্ত সঙ্গে গার্ডরূপে ফৌজ পাঠাবেন,
- ২) মাল এসে পৌঁছেলে স্ববেদার শ্রেণীতে মিলে যে দাম বেঁধে দেবেন মদীরা যদি তার বেশী দাম নেয় তবে তদুৎপত্তি তাদের কঠোর সাজা দেবার জিদ্দাদারা স্ববেদার নেবেন। স্ববেদার সানন্দে সম্মতি দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রেণী স্ববেদারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চান নি।

করার প্রথম কদম—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে লাভিতনে যাকে বলে প্রিমা ফান্সি কেস—কিন্তু বাঙলায় এখন মোকদ্দমা বলতে পুরো কেসটাই বোঝায়।

বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী বংশাহুক্ৰমে সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার-জুহুৱাং বের করলেন ;
 কত্নাকে তাঁদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিতে বললেন ।

সেই সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীরা স্বেদারের কোঁজ সহ
 মালওয়া পানে রওয়ানা দিলেন । কিছুদিন পরেই মুখে মুখে অহমদাবাদে খবর
 রটে গেল, মাল পৌঁছল বলে । পথে লুটতরাজ হয় নি ।

সেই সব গম ধান ও অগ্ন্যস্ত শস্ত যখন অহমদাবাদে পৌঁছল তখন শ্রেষ্ঠী
 তাঁর একাধিক হাভেলি—বিরাত চক মেলানো বাড়ি, একসঙ্গে গোষ্ঠীর বহু পরিবার
 একই বাড়িতে বসবাস করতেপারে—খুলে দিয়ে আঙ্গিনার উপর সেসব রাখলেন ।
 তারপর স্বেদারের সঙ্গে হিসেব করলেন, কি দরে কেনা হয়েছে, রাহ-খর্চা
 (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে এবং তাহলে এখন কি দর বেঁধে দেওয়া যায় ?
 স্বেদার বললেন, ‘আর আপনার মুনাফা ?’ শ্রেষ্ঠী বললেন, ‘যুগ যুগ ধরে মুনাফা
 করেছি ব্যবসা বাণিজ্যে । এ ব্যবসাতে করবো না । যা খর্চা পড়েছে সেই দর
 বেঁধে দিন । মুদীর সামান্য লাভ থাকবে ।’ দাম বেঁধে দেওয়া হল ।

এবারে শুনুন, সব চেয়ে তাজ্জবকী বাৎ ! শ্রেষ্ঠী শহরের তাবৎ মুদীদের ডেকে
 পাঠালেন এবং কোন্ মুদী কটা পরিবারের গম যোগায় তার স্তমারী (গণনা)
 নিলেন । সেই অহুযায়ী তাদের শস্ত দেওয়া হল । সোজা বাঙলায় আজকের
 দিনে একেই বলে রেশনিং । এবং তাব সঙ্গে গোড়াতেই ব্যবস্থা, যাতে হোর্জিং
 না হতে পারে । এবং ফেয়ার প্রাইস ।

অহমদাবাদে চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস । ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠীর চর এসে জানালে
 অমুক মহল্লার দু’জন মুদী গ্রাযামূল্য থেকে এক না দু’ পয়সা বেশী নিয়েছে ।

শ্রেষ্ঠী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেই মহল্লায় গিয়ে সর্বজন সমক্ষে তদন্ত করলেন । এবং
 সঙ্গে সঙ্গে সোজা স্বেদারের বাড়ি গেলেন । স্বেদার তখন ইয়ার-বক্সী^২ সহ
 গমাগমন সেলেক্টে করছিলেন । কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞা অহুযায়ী বেরিয়ে এসে সব
 কিছু শুনে সেপাই পাঠালেন মুদীদের ধরে আনার জন্ত । সাক্ষীসাবুদও যেন সঙ্গে
 সঙ্গে আনা হয় ।

২ বক্সী বা বখলী (বখশিশ কথ্য একই ধাতু থেকে) অর্থ, একাউন্টেন্ট
 জেনারেল, অডিটার জেনারেল ও কোঁজের চীফ পে-মাস্টার—এ তিনের সমন্বয় ।
 কায়স্থরা প্রধানত এই দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতেন । প্রধান বা মীর বখলী নিয়োগ
 করতেন স্বয়ং দিল্লির বাদশা-সালামৎ । আর সরাসরি নিয়োগ হতেন কাজী উল
 কুজাং অর্থাৎ চীফ জাস্টিস, সদর-উল-সদর (সেই অঞ্চলে বাদশা-সালামতের

তদুত্তরেই হুবেদারের সামনে সাক্ষীসাব্দ তদন্ত-তক্‌তীশ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল সত্যই তারা বেশী দাম নিয়েছে।

হুবেদার হুকুম দিলেন, বড় বেশী 'খেতে চেয়েছিল' বলে মুদী দুটোর পেট কেটে ফেলা হোক। তাই করা হল। নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে গেল।

সবাই যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে সজাগ সতর্ক হুঁশিয়ার খবরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে হুবেদার হুকুম দিলেন, শহরের সব চেয়ে উঁচু দুটো উটের পিঠে তাদের লাশ বেঁধে দিয়ে নগর-পরিক্রমা করা হোক।

সমস্ত রাত ধরে তাই করা হল।

এরপর ঐতিহাসিক যেন নিতান্ত সাদামাটা ডালভাতের কথা বলছেন, ঐভাবে মস্তব্য করছেন, 'অতঃপর আর কেউ অগ্নাঘা মুনাকা করার চেষ্টা করে নি।'

(আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপিখানা পৌঁছেছিল তাতে দেখি এ জায়গাটায় এ যুগের কোন্‌ এক ণ্ডরসিক পাঠক লিখছেন, 'we are not surprised!')

* * *

আমি আর কি মস্তব্য করবো? রেশনিং, ফেয়ার-প্রাইস, নো চান্স ফর হোডিং, তনুহুর্তে তদন্ত, তদুত্তে দণ্ড, জনগণকে হুঁশিয়ারী দেওয়া এসবই হয়ে গেল চোখের সামনে। অবশ্য আমি নিরীহ প্রাণী, পেট কেটে নাড়িভূঁড়ি বের করার আদেশ শুনে আমার গা শিউরে উঠে। তবে যারা দিনের পর দিন রেশন-শপের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, চোখের সামনে কালো-বাজার এবং যাবতীয় অনাচার দেখেছেন, পুত্রকন্যাকে কচুঘেচু খাওয়াতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিভ্রাটলীরা কি কোঁশলে তোফা খানাপনা করছেন সবশেষ অবগত আছেন, তাঁরা হয়তো উল্লাস বোধ করবেন। আমি আপত্তি করবো না—কারণ পূর্বেই বলেছি, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি ॥

আপন জমিজমা তদারকের জন্ত, তথা কেউ নিঃসন্তান মারা গেলে তার সম্পত্তি অধিকার করতে)। সরকার=চীফ-সেক্রেটারী, কানুনগো=লিগেল রিমেম-ব্রেনসার পরে নিযুক্ত হতেন। বখ্‌শীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সামনের বাজারে ছুটি কাটতো বলে, সে বাজারকে 'বখ্‌শী বাজার' বলা হত। বখ্‌শী সরকার ইত্যাদি বড় বড় এডমিনিস্ট্রেটিভ চাকরি প্রধানত কায়স্থরাই করতেন। ইংরেজ মোটামুটি এই পদ্ধতিই চালু রাখে।

কচ্ছের রাণ

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর বলছিলুম, এতে করে আমার বড়ই উপকার হয়েছে। ইতিহাস নিজেকে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে। চোখের সামনে যখন তাই কোনো কিছু একটা ঘটে, তখন স্মৃতিপথে আসে প্রাচীন দিনের ঐরকম কোনো একটি ঘটনা। প্রথম যৌবনে কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। সে বই এখন আর পাবো না। একে ফার্সীতে লেখা, তদুপরি বইখানা হয়তো সে ভাষার পুস্তকের মাঝেও দুপ্রাপ্য। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ঐতিহাসিকের প্রতি আবিচার করা হবে।

ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এসে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি ক্রটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি।

গুজরাতের ইতিহাস ‘মিরাত-ই-আহমদী’র কথা হচ্ছিল। বইখানা লেখা হয়, নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ লণ্ডও করে যান মোটামুটি সেই সময়। এ পুস্তক গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন জৈন সাধু মেরুভূজাচার্যের সংস্কৃত লেখা গুজরাতের প্রাক-মুসলিম যুগের ইতিহাসের সারাংশ নিয়ে, তারপর আছে গজনির হুলতান মাহমুদ^১ কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।

হুলতান মাহমুদ এমনিতে বলতেন, তিনি কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, কিন্তু সিদ্ধদেশ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান অধিকারে। সে দেশ কি করে আক্রমণ করা যায়? হুলতান বললেন, ‘সিদ্ধদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির-ভুল্য—তারা হেরেটিক; অতএব আক্রমণ করা যায়।’

তা সে যাই হোক, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল কাঠিওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরাট ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করা। সেটা সিদ্ধদেশ জয় না করে হয় না।

কিন্তু তার পরই আসে কচ্ছের রাণ। সেটা অতিক্রম করা সিদ্ধ-বিজয়ের চেয়েও কঠিন। মাহমুদের সাক্ষোপাঙ্গ তাঁকে^২ নিরস্ত করার চেষ্টা দিয়ে নিফল হলেন।

কচ্ছের রাণ অতিক্রম করতে গিয়ে মাহমুদের কৌজের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব

১ সংস্কৃত বইখানার নাম আমার মনে পড়ছে না। বোধ হয় ‘প্রবন্ধ চিন্তামণি’।

২ মাহমুদ ও মুহম্মদ দুই ভিন্ন নাম। যে রকম হাসন, হুসেন ও হাসান (হুজাওয়ারী), তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

তৃষ্ণায় প্রাণ হারালো। চোরাবালিতেও অনেকে। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা তার জন্ত গাইডকে জিম্মাদার করেছেন; সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু মাহমুদকে বাধ্য হয়ে ঐ পথেই ফিরে যেতে হয়েছিল। মাহমুদ ছিলেন ল্যাণ্ডলক্ট (অর্থাৎ যে দেশের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো সংস্পর্শ নেই) দেশের লোক— হিটলারেরই মত।^৩ তাই দ্বারকা থেকে নোঁবহর যোগাড় করে ‘ঠাট্টা’ (করাচীর কাছে প্রাচীন বন্দর) যাবার সাহস করেন নি।

*

*

*

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুগলক এই কচ্ছের রাণের কাছে মার খান।

ফার্সী ঐতিহাসিক লিখেছেন ‘তগী’, ফার্সীতে ‘ঠ’ ধ্বনি নেই—শব্দটা বোধ হয় তাই ‘ঠগী’। সেই তগী মধ্য-পশ্চিম ভারতে লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাদশাহী ফৌজ বার বার তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে বার বার বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লি ফিরে আসে। মুহম্মদ রেগে উঠে। বললেন, ‘আমি স্বয়ং যাবো।’

একটা সামান্য ডাকুর বিরুদ্ধে স্বয়ং হজুর যাবেন!

না যাবোই।

হজুর স্বয়ং আসছেন জেনে তগী অহমদাবাদ পালালো। হজুর বললেন, চলো অহমদাবাদ। পারিষদরা মহা অসন্তুষ্ট। সেই সূদূর অহমদাবাদ—দিল্লি থেকে কত দিনের রাস্তা! হজুর কিন্তু গৌঁ ছাড়লেন না। অহমদাবাদে পৌঁছলে পর জানা গেল, তগী পালিয়েছে কাঠিয়াওয়াড়ে। হজুর বললেন, ‘চলো কাঠিয়াওয়াড়।’ কিন্তু তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে। এবং শ্রান্তি-ক্লান্তিতে হজুরের হল জর। কি জর, আমি বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নি। ম্যালেরিয়া খুব সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া বোধ হয় এ-দেশে পরে এসেছে। তা সে যাই হোক, হজুর তামাম বর্ষাকালটা অহমদাবাদে জরে ধুঁকে ধুঁকে রোগা-দুর্বলা হয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষা-শেষেও গৌঁ ছাড়লেন না—তঁাকে যে পাগলা রাজা বলা হত সেটা প্রধানত তাঁর গৌর জন্তই—চললেন কাঠিয়াওয়াড়। তগী পালালো কচ্ছ। হজুর গেলেন কচ্ছ। তগী পালালো কচ্ছের রাণেব উপর দিয়ে সিন্ধুদেশে। সে ডাকাত—রাণের কোথায় কি, জানে—সেখানে একাধিক বার আশ্রয় নিয়েছে। ততুপরি

৩ ফ্রান্স জয়ের পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এর নাম অপারেশন ‘সী লায়েন’ (সমুদ্রসিংহ, ‘জ্যে ল্যোয়ে’) কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বহুবিধ কারণ নিয়ে নানা গুণী নানা আলোচনা করেছেন। অগ্রতম কারণ বলা হয়, হিটলার ল্যাণ্ডলক্ট দেশের লোক ছিলেন

সে তো আর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে না ; তার দানাপানির আর কত-টুকুই বা দরকার !

এবারে পারিষদরা তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন । গজনির মাহমুদ বাদশা যে রাণে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন । সঙ্গে ছিলেন রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী (ইনি ‘দিল্লি দূর অন্ত’-এর সাধ নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমির খসরুর নিভালাপী বন্ধু ছিলেন) ; তিনিও নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেছিলেন । তত্পরি তুগলুক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত । ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপেই জানতেন । কিন্তু হিটলার যদিও অত্যন্তমরূপেই নেপোলিয়নের রুশ-অভিযান ও তার মারাত্মক কলাকল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং যদিও তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে বার বার রুশ-অভিযান থেকে নিরস্ত থাকতে উপদেশ দেন, তবুও তিনি সেই কর্মটি করেছিলেন । এখানেও তাই হল । তুগলুক নিরস্ত হলেন না ।

কচ্ছের রাণে বাদশা মুহম্মদ তুগলুকের কী নির্দারূণ দ্রববস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা একাধিক ঐতিহাসিক দিয়েছেন । আজ আমার আর ঠিক মনে নেই, তাঁর সৈন্য এবং ঘোড়া খচ্ছরের ক’আনা বেঁচেছিল, আর ক’আনা মরেছিল ।

এ সময়ের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন । রোগে জীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোড়ার উপরে বসে মুহম্মদ তুগলুক ধুকতে ধুকতে এগোচ্ছেন । এমন সময় তিনি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীকে ডেকে পাঠালেন—কাউকে ডেকে না পাঠালে হুজুরের কাছে যাবার কারো অনুমতি ছিল না । বরনী কাছে এলে তুগলুক তাঁকে বললেন, ‘আচ্ছা বরনী, তুমি তো জানো আমি আমার প্রজাদের কতখানি ভালোবাসি । আমি যে-সব ফরমান-হুকুম জারি করেছি সে তো একমাত্র তাদেরই মঙ্গলের জন্ত । তবে তারা একগুঁয়েমি করে আমার আদেশ অমান্য করে কেন ?’ তারপর শুধোলেন, ‘আচ্ছা বরনী, তোমার কি মনে হয়, আমি বড় কড়া হাতে শাসন করেছি, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছি ? তবে কি এখন আমার উচিত আরো ক্ষমা-দয়ার সঙ্গে শাসন করা ?’

বলে সমুদ্রে বাঁপ দিতে দু’আত্মা করতেন । খ্রীস জয় করার পর-তিনি তাই মন্টারীপ আক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে ভুল করেন । ফলে রমেলও পুরো সাহায্য পেলেন না । এ-দেশের মোগল-পাঠান রাজাদের বেলাও তাই । নৌ-বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না বলে তাঁরা ইংরেজকে অবহেলা করেন । ফলে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিজিত হয় ।

বরনী লিখছেন, ‘এই শেষকালে যদি হুজুর হঠাৎ তাঁর নীতি বদলান তবে হয় তো আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ভেবে আমি নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলুম।’

ওদিকে দিল্লিতে বসে তুগলুকের প্রধান মন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। হুজুরের কোনো খবর নেই। রাণ থেকে তো দূত পাঠানো যায় না, যে দিল্লি আসবে। দূত আর তার পাঠি পথে জল পাবে কোথায়? পিছনপানে অবশ্য মৃত্যু—সম্মুখ দিকে তবু বাঁচবার আশা আছে। কাজেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, হুজুরের কোনো খবর নেই। প্রধান মন্ত্রীর ভয়, খবরটা রটে গেলে তুগলুকের কোনো আত্মীয় বা অগ্র কোনো চুঃসাহসী রাজা মরে গেছেন এই সংবাদ রটিয়ে কিছু সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে দিল্লির তপতে না বসে যায়। রাজকোষ তখন তার হাতে এসে যাবে এবং ফলে সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে নেবে। হুজুর যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গে সৈন্যদল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। হুজুর তখন লড়াই দেবেন কি করে? প্রধান মন্ত্রী তখন শুরু করলেন শেষ ধাপ। হুজুর রোজ সকালে যে ঝরোকাই দাঁড়িয়ে দেখা দিতেন সেখানে প্রধান মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলতেন, ‘বড় আনন্দের বিষয়, আজও হুজুরের চিঠি পেয়েছি। হুজুর বহাল তবীয়তে আছেন। শিগগীরই রাজধানীতে ফিরে আসছেন।’ তারপর আশ্রয়ার্থী (অঞ্জরক্ষা) ভিতরের ছেব থেকে বগাস্ চিঠি বের করে, গভীর সম্মানের সঙ্গে সেটি চুম্বন করে উচ্চকণ্ঠে সেটি পড়ে শোনাতে—আগাগোড়া নিছক গুল! তার পর আরো সম্মানে চিঠিখানা চুম্বন করে পকেটে রেখে দিতেন।

প্রধান মন্ত্রী হওয়া চাটিখানি কথা নয়। ধাপা, গুল, থিয়েটারি সব বৃহৎক এলম পেটে ধরতে হয়।

ওদিকে অশেষ ক্লেশ ভুঞ্জে হুজুর সিন্ধুদের তীরে এসে পৌঁছলেন। তগীর ক হল আমার মনে নেই। পৌঁছেই হুজুর দিল্লি-পানে খোঁড় সওয়ার বণ্ডা করলেন। তারা দিল্লি পৌঁছেলে প্রধান মন্ত্রীর ধড়ে জান এল।

হুজুর আর কচ্ছের রাণ ধরে দিল্লি ফিরলেন না। স্থির হল, নৌকায় করে সিন্ধু উড়িয়ে উজিয়ে তারই উপনদী দিয়ে লাহোর পৌঁছবেন। উত্তম ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রোজার মাস বা রমজান এল। হুজুর বললেন, ‘উপোস করবো।’ আমীর-ওমরাহ বললেন, ‘হুজুর একে অস্বস্থ, দুর্বল। তত্পরি ভ্রমণকালে উপবাস করা ইচ্ছাধীন—কুরান শরীফের আদেশ।’ হুজুর তেড়ে বললেন, ‘যে মুসাক্কিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতাল্লা সেইটের কথাই বলেছেন। আমরা তো যাচ্ছি আরামসে নৌকায় শুয়ে শুয়ে। আমি উপোস করবোই।’

পুনরায় গোঁ। তর্ক করবে কে? মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করবার মত এলেম কারো পেটে ছিল না। (আরেক ধর্মুধর পণ্ডিত ছিলেন ঔরঙ্গজেব)।

কয়েকদিন পরে ধরা পড়ল একটি চমৎকার মাছ। কিন্তু এ জাতের মাছ দিল্লিবাসীরা কখনো দেখেন নি। তারা বললেন, ‘যে মাছ চিনি নে সেটা খাব না।’ হুজুর বললেন, ‘কুরান, হাদীস কোনো শাস্ত্রে এ জাতীয় মাছেব বর্ণনা দেয় যেতে যখন বারণ করা হয় নি তখন আমি ইটি খাবই।’ আবার গোঁ।

খেলেন! দারুণ তেলওলা মাছ ছিল। হুজুরেব শরীরও ছিল রোগা, রাণের ধকলে দুর্বল। পেট ছাড়লো। কিছুতেই বন্ধ হয় না। বোধ হয় তৃতীয় দিনে হুজুর ইস্তিকাল করলেন, অর্থাৎ পটল তুললেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখছেন, ‘এই প্রকারে হুজুর তাঁব অবাধ্য প্রজাকুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রক্ষা পেলেন; প্রজাকুলও হুজুরেব হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলো!’

*

*

*

আমি বঙ্গসন্তান। মাছের নামে অজ্ঞান। আমাব মনে প্রবল জাগলো, বাদশা-সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন।

বরনী, মিবাৎ দিয়েছেন মুসলিম চান্দ্র মাসের হিসাবে তুগলুকেব মৃত্যুদিবস। তাঁব থেকে কোন্ ঋতুতে তাঁব মৃত্যু হয়েছিল ধবা যায় না। বিস্তব ক্যালেন্ডার খেঁটে যোগবিযোগ করে বের করলুম ঋতুটি।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন, ঐতিহাসে তাঁর বড় শখ। তার বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুধালুম।

তিনি বললেন, ‘নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পান্না মাছ।’

*

*

*

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিলসা। নমদা উজিয়ে ঐ মাছটা যখন আসে তখন ব্রোচেব (broach—ভুঙকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বিম্। সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পান্না।

অনেকেই অনেক কিছু চড়ে স্বর্গে যান, ঐরাবত, পুষ্পকরথ, কত কি?

শাহ-ইন-শাহ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার!

দর্শনাভীত

ছমের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিরাট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে। সবে এসেছি ‘ছাশ’ থেকে—হাইকোর্টটি দেখিয়ে দেবার মতও কোনো খাটাশকে পাচ্ছি নে। কিন্তু রমণীজাতি দয়াশীলা—বেদরদীরা বলে হরবকৎ শিকার-সজ্জানী—আমার সঙ্গে কথা কইলে নিজের থেকে। আমি তখন বিবর্ণ বিশ্বাস বদখদ কোন এক মাংস, তদধিক বিজাতীয় হর্স-ক্যাবেজ (সচরাচর এ বস্তু ঘোড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়া হয়) খাবার চেষ্টা করছি, চোখের জলে নাকের জলে। সব শুনে বললে, ‘দর্শন? তাহলে শ্লিটকে মিস্ করো না; বুড়ার বয়স আশী পেরিয়ে গেছে, কখন যে পটল তুলবে (জর্মনে বলে ‘আপজেগ্‌লেন’) ঠিক নেই।’

পোড়ার দেশে লেকচার-রুমে সীট রিজার্ভ করতে হয়। পাণ্ডুলিপি যুবতীটি ধানী-লংকার মত এফিশেন্ট। সাত দিন পরে প্রথম লেকচারে গিয়ে দেখি, একদম পয়লা কাতারে পাশাপাশি দু’খানা চেয়ার রিজার্ভ করে বসে আছে প্রফেসরের চেয়ার থেকে হাত আঠেক দূরে।

অধ্যাপক এলেন ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক পরে। বয়েস আশী না, মনে হবে সোয়া-শো—যেভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে নর টুকলেন। ইয়া বিরাট লাশ। ফ্লাইন উরজুল লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। বড়ো রোষকষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত দু’খানা অল্প তুলে ধরলেন। উরজুল এক দিকের ওভারকোটটা তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করার পর তিনি অতি কষ্টে শরীরে একটি মোচড় দিলেন। এই গুহুতম তাত্ত্বিক মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ তিনি তাঁর ওভারকোটের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করলেন। শেষনাগকেও বোধ হয় তাঁর বাৎসরিক খোলস থেকে মুক্ত হতে এতখানি মেহন্নৎ বরদাস্ত করতে হয় না।

ধীরে ধীরে প্র্যাটফর্মে উঠে চেয়ারে আসন নিলেন। সচরাচর অধ্যাপকরা প্র্যাটফর্মের নিকটতম কোণে উঠেই বক্তৃতা ঝাড়তে আরম্ভ করেন। ইনি চূপচাপ বসে রইলেন ঝাড়া পাঁচটি মিনিট। ধবধবে সাদা কলারের উপর হাঁড়িপানা তাঁর বিরাট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাতে অস্তুত ডজনখানেক কাটাকুটির দাগ। লেকচার আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা কইতে বারণ নেই। আমি ‘উরজুলকে শুখালুম, ‘মুখে ওগুলো কিসের দাগ?’

‘ফেনসিঙের। সিনেমাতে দেখ নি, লম্বা সরু লিকলিকে তলওয়ার দিয়ে

একে অগ্নের কলিজা ফুটো করার পায়তারা কষে ? পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হনই নি, মাথাটা পর্যন্ত পিছনের দিকে ঠেলে দেন নি। প্রত্যেকটি কাটাতে ক'টা ষ্টিচ লেগেছিল ঠুকে শুধোতে পারো !

আমি বললুম, ‘উনি না দর্শনের অধ্যাপক !’

‘হ্যাঁ, কিন্তু ঠুর বাপ-পিতামো ছিলেন কটর প্রাশান ঐতিহ্যের পাড় জেনারেল গুপ্তি। তাঁদের বর্ষের মত শক্ত হৃদয় ভেঙে ইনি দর্শনের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। কৈশোরে বোধ হয় সে মতলব ছিল না। তাই ছুঁদে ছুঁদে ফেনসারদের চলেজ করে এসব অস্ত্র-লেখার কলেকশন্ আপন মুখে নিয়ে বাকী জীবন দর্শন পড়াচ্ছেন। তাইতে বাপ-দাদার ততোধিক মনস্তাপ যে, এমন পয়লানখরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।’

আমি বললুম, ‘পেন্ ইজ মাইটিয়ার দেন সর্ড !’

‘ছোঃ ! ভ্রলোক জীবনে এক বর্ণ কাগজে কলমে লেখেন নি—সাত ভলুমি কেতাব দুয়ে থাক, এক কলমের প্রবন্ধ পর্যন্ত না। কলমই ওর নেই। বোধ হয় টিপসই দিয়ে—’

অধ্যাপক ছাদ-ছোয়া গ্যালা'রর উপর-নিচ ডান-বা'র উপর চোখ বুলিয়ে আরম্ভ করলেন—ওঃ, সে কি গলা ! যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে, ‘মাইনে ডামেন্ উনট্ হেরেন্ !’—‘আমার মহিলা ও মহোদয়গণ !’ তার পর দম নিয়ে বললেন, ‘অন্যবারের মত এবারেও আমি রেকটরকে’—তার পর গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেও সমস্ত ক্লাসই শুনতে পেল—‘আস্ত একটা গাধা—’

আমার তো আক্কেল গুডুম। রেকটর যিনি কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, তাঁকে গর্দভ বলে উল্লেখ করা—তা সে বিড়বিড় করেই হোক আর রাসভ-কণ্ঠেই হোক—এ যে অবিশ্বাস্য !

অধ্যাপক বলে যেতে লাগলেন, ‘রেকটরকে আমি অমরোথ জানালুম, আমাকে এই টাম থেকে নিষ্কৃত দিতে। অবাচান বলে কিনা, আমাকে না হলে তার চলবে না। এ উত্তর আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি। তার পূর্বের রেকটর—’ আবার বিড়বিড় করলেন, ‘বলদ, বলদ ! শ্রেফ বলদ—তাকেও আমি একই অমরোথ করেছিলুম, এবং একই উত্তর পেয়েছিলুম। তার পূর্বের রেকটর—কিন্তু কাহিনী সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই—এবং তার পূর্বেরও সবাই একই উত্তর দেয়। বস্তুত, মাইনে ডামেন্ উনট্ হেরেন্, গত বাইশটি বৎসর ধরে আমি এই একই উত্তর শুনে আসছি। মনে হচ্ছে, অরিজিনালিটি রেকটর সম্প্রদায়কে

এড়িয়ে চলেন। তা সে যাক, তাদের বক্তব্য, আমাকে ছাড়া চলবে না, আমি ইনডেসপেন্‌সিবল।’

এবারে তিনি স্বয়ং সিন্ধী বলদের মত ফৌস করে নিখাস ফেলে বললেন, ‘তবে কি সাতিশয় সন্তাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, জার্মনি এমনই চরম অবস্থায় পৌছেছে যে, এদেশে আর দার্শনিক নেই? কিন্তু এই আমার শেষ টার্ম। আমি মনস্তত্ত্ব করে ফেলেছি।’ তার পর চোখ বন্ধ করে খুব সম্ভব প্রথম বক্তৃতায় প্রথম কি বস্তু দিয়ে আরম্ভ করবেন তার চিন্তা করতে লাগলেন। উরজুল আমার কানেক কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ‘তার শেষ টার্ম। এ ভয় তিন নিদেন পঁচিশ বছর ধরে দেখাচ্ছেন—প্রতি টার্মের গোড়ায়।’ বুড়াব চোখ বন্ধ হলে এক হয়, কান দিবা সজাগ। চোখ খুলে বললেন, ‘নো, আবার নো। এই আমার শেষ টার্ম—কেউ ঠেকাতে পারবে না।’

তাব পর গ্রীক দর্শন নিয়ে আবস্ত করলেন। তাঁর পড়বার পদ্ধতি অঙ্কুরণ করা অসম্ভব। কারণ, তাঁর পড়ানোটা সম্পূর্ণ নিভর কবিতা তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর। সে স্মৃতিশক্তি বিদিত্ত। কোন্ শালের, কোন্ বইয়ের, কোন্ অধ্যায়ে, এমন কি মাঝে মাঝে কোন্ পাতায় এক তথ্য সারবেশিত হয়েছে সেগুলো বলে যেতে লাগলেন কোনো প্রকারের নোট না দেখে। প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাষা সরল। এবং মাঝে মাঝে প্রাতো, আরিস্ততল বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ মারেন ছুঁতাজার বছরের ডুব-সাতার। এ যুগের কে তার সবোত্তম ব্যাখ্যা করেছেন, কোথায়, কোন্ পারচ্ছেদে—তার সবিশদ বর্ণন। আমি হতভম্ব।

খন্টা পড়তে আস্তে আস্তে উঠলেন। ফ্লাইন উরজুল তাঁকে পুনরায় ওভার-কোট পরিয়ে দিলেন। ধীরে মন্থবে কারডরে নামলেন।

আমি উবজুলকে বললুম, ‘এ কী কাণ্ড! গণ্ডাখানেক রেকর্টরকে ইনি গাথা-বলদের সঙ্গে—?’

‘ওঃ! এঁরা সবাই এসব জানেন। এঁরা সবাই তাঁর ছাত্র।’

‘ওকে ছুটি দেয় না কেন?’

‘সকলেরই বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল তুলবেন বলে। মাধ্যাকর্ষণ নয়, দর্শনাকর্ষণ তাকে ইহলোকে আটকে রেখেছে।’...

এখানে রোল-কল হয় না। টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন ‘স্টুডেন্টস বুক’ অধ্যাপকের নাম দু’বার সই করিয়ে নিতে হয়।

গোড়ার দিকে ভিড় ছিল বলে হাঙ্কা হলে পর আমি আমার ‘বুক’ নিয়ে পাতলুম। এযাবৎ অন্ত কারো সঙ্গে তিনি বাক্যবিনিময় করেন নি। আমাকে

দেখে চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে বললেন, ‘আঃ! বাঃ বাঃ! তার পর? আচ্ছা। বলুন তো আপনি কি জার্মান বেশ বুঝতে পারেন?’

‘আমি বললুম, ‘অল্প, অল্প।’

‘বেশ, বেশ। তা—তা, আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?’

‘ইণ্ডিয়া।’

কেন যে এতখানি তাজ্জব হয়ে তাকালেন বুঝতে পারলুম না। বললেন, ‘ইণ্ডিয়া? কিন্তু ইণ্ডিয়াই তো দর্শনের দেশ। আপনি এখানে এলেন কেন?’

আমি সবিনয় বললুম, ‘নিশ্চয়ই, কিন্তু আধুনিক দর্শনে জার্মানির সেবা ও দান তো অবহেলার বিষয় নয়।’

কী আনন্দে, কী গর্বে অব্যাপকের সেই কাটাকুটি-ভরা মুখ যে প্রসন্ন হাস্তে ভরে গেল, সেটি অবর্ণনীয়। শুধু মাথা দোলান আর বলেন, ‘বস্তুত তাই, প্রকৃতপক্ষে তাই।’

এবারও যখন তিনি ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করলেন তখন আমি যেন ‘তুমি’ শুনতে পেলুম। তাঁর বিরাট সাদা মাথাটা আমার দিকে ঠেলে কাছে এনে বেদনা-ভরা গলায় বললেন, ‘কিন্তু জানো, ভারতীয় দর্শন—অবশ্য সব দর্শনই দর্শন—শেখবার স্বেচ্ছা আমি পাই নি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার যৌবনে ভারতীয় দর্শনের জার্মান-ইংরিজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি সব পবন্যবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ। আমি বললুম, “এ কখনই হতে পারে না। ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরকম কথা বলতে পারেন না। যারা অনুবাদ কবেছেন তাঁরা কতখানি জার্মান জানেন জানি নে, কিন্তু দর্শন জানেন অত্যন্ত, এ৷ং ভারতীয় দর্শনে তাঁদের অপরিচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ সেটা আদৌ বুঝতে পারেন নি।” ছেড়ে দিলুম পড়া, বিরক্তিতে। কিন্তু জানো, বছর দশেক পূর্বে আমার ছাত্র—’ তিনি রেকর্ডেরেব নাম করলেন—‘অমুক—ভারী ব্রিগিয়াট ছিলে—আমাকে বললে, এখন নাকি কম্পিউটেন্ট অনুবাদ বের করেছে। কিন্তু ততদিনে আমি বড় বড়িয়ে গিয়েছি। নতুন করে নতুন “স্কুলে” যাবার শক্তি নেই। বড় দুঃখ বয়ে গেল।’

আমি একটু ভেবে যেন সাস্থনা দিয়ে বললুম, ‘তার জগৎ আর অত ভাবনা কিসের, শূন্য? হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। আপনি এবারে জন্ম নেবেন কাশীর কোন দার্শনিকের ঘরে।’

এবারে তাঁর যে কী প্রসন্ন অট্টহাস্ত! শুধু বলেন, ‘ঐ তো! ঐ তো! বাঃ, বাঃ! বেশ, বেশ। যাক, শেষ হুশিয়ারি গেল।’

তারপর শুধালেন, 'বক্তৃতা সব বুঝতে পারো তো ?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, জর্মন ভালো জানি নে বলে মাঝে মাঝে বুঝতে অস্ববিধে হয়।'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন হাত তুলো ; আমি সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।'

আমি কাঁচু-মাচু হয়ে বললুম, 'আমার জর্মন জ্ঞানের অভাববশত সমস্ত ক্লাস সাফার করবে—এটা কেমন যেন—'

গুরু গুরুগভীর কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে—'আমি একশজনকে পড়াবো না একজনকে পড়াবো, কাকে পড়াবো আর কাকে পড়াবো না, সেটা স্থির করি একমাত্র আমি।'

*

*

*

আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশী দিন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাই নি। পরের টার্মেই তিনি ওপারে চলে যান।

তার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কেটে গিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত সংস্কার যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গাটিতে একবারের বেশী দু'বার পাঠান না। একই নিষ্ঠুর স্থলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোনও বৈদগ্ধ্য (রিফাইনমেন্ট) নেই। তবু যখন কোনো যুবাক্কনের মুখে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুনে মনে হয়, এ-তরুণ এর কিছুটা গভীরে ঢুকতে পেরেছে, তখন আপন অজান্তে তার চেহারায় জর্মনগুরুর বিরাট কাটাকুটি-ভরা, হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি ॥

মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ

একদা রম্য রচনা কি রীতিতে উত্তমরূপে লেখা যায়, এই বাসনা নিয়ে কলেজের ছেলের বয়সীরা আমাকে প্রশ্ন শুধাতো ; অধুনা শুধায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কি প্রকারে লেখা যায় ? আমি বাঙালী, কাজেই বাঙালীর স্বভাব ধানিকটে জানি—পাচু, ভূতো আর পাচজন যে ব্যবসা করে—যথা পার্লিশিং হাউস কিংবা লণ্ডনী—পয়সা কামিয়েছে, সে সেইটেই করতে চায়, নতুন ব্যবসার খুঁকি নিতে সে নারাজ। অতএব হাল-বাজারে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারের চেয়েও সাদা-বাজারে লাভ বেশী, তবে চলো ঐ লালকেন্দ্রা কতেহ্ করতে ; মা-মেরীতে বিশ্বাস রাখলে কড়ি দিয়েও কিনতে হবে না,

সায়ের মুনশীও ঐ আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা পণ্ডিত লোক, ইতিহাস জানেন ও উপগ্রাস লেখার কায়দাটাও যাদের রপ্ত আছে, তাঁরাই ঐতিহাসিক উপগ্রাস লিখতে পারেন। আমি ও আমার মত আর পাঁচজন পারে না, আমরা পণ্ডিত নই। কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও দিব্য বুদ্ধিতে পারি, ঐতিহাসিক উপগ্রাস লিখতে যাওয়ার বিপদটা কি?—পাখীর মত উড়তে না জেনেও চমৎকার বুদ্ধিতে পারি মন্থমেন্টের উপর থেকে লাফ দিয়ে পাখীর মত ওড়বার চেষ্টা করলে হালটা মোটামুটি কি হবে।

এই তো হালে একটি সাপ্তাহিকের পাতা ওন্টাতে ওন্টাতে অলস নয়নে পড়লুম, ‘তুমি ওমরাহ নও।’

সর্বনাশ! এটা কি প্রকার হল? ‘ওমরাহ’ তো ‘আমীরের সাদামাটা বহুবচন—যে রকম ‘গরীব’ থেকে ‘গুরবাহ’; তাই বলি ‘গরীব-গুরবো’। সেই আইনেই বলি ‘আমীর-ওমরাহ’ (‘আমীর-ওমরো’ও শুনেছি; আকারান্ত শব্দ বাঙলায় ‘এ’ ‘ও’-তে আকছারই পরিবর্তিত হয়, যেমন ‘ফিতে’ ‘জুতো’—এর কোনো পাকা নিয়ম নেই)। আরবী বা ফার্সী শব্দের একবচন এবং বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে আমরা অনেক সময় বাঙলায় কালেকটিভ নাউন তৈরি করি—যেমন ‘আমীর-ওমরাহ’ অর্থাৎ ‘আমীরসম্প্রদায়’ কিংবা ‘গরীব-গুরবো’ ‘দীনসম্প্রদায়’ ‘দীনজন’। তা সে যাই হোক, ‘ওমরাহ’ কথাটা বরহক্ বহুবচনেই আছে। কাজেই যে রকম আপনি ‘আমীরসম্প্রদায় নন’ ব্যাকরণে ভুল, তুমি ‘ওমরাহ নও’ ভুল।

(ঠিক সেই রকম ‘আলিম্’ পণ্ডিতের বহুবচন ‘উলেমা’—জমিয়ৎ-ই-উলাম-ই-হিন্দ; অনেকেই না জেনে ইংরিজীতে লেখেন ulemas।)

কাজেই প্রথম চোরাবালি শব্দ নিয়ে। ঠিক ঠিক অর্থ না জানলে আমাদের মত অপণ্ডিত জন খায় মার। ঠিক সেই রকম গুপ্তযুগের উপগ্রাস লিখতে গিয়ে না ভেবে ফুটিয়ে দিলুম রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া—শব্দ দুটো থেকে বিশেষ করে যখন সংস্কৃতের হৃগন্ধ বেরিয়েছে—অথচ দুটো ফুলই এদেশে এসেছে অতি হাল আমলে। এবং শুধু শব্দার্থ জানলেই হয় না—রূঢ়ার্থে তার ব্যবহার জানতে হয়। তসবী১-

১ কত না হস্ত চুমিলাম আমি

তসবীমালার মত,

কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল

আমার গ্রন্থি যত।

খানা কথাটির দুটো শব্দই আমরা চিনি—যে ঘরে বসে বাদশা তসবীমালা জপ করেন। মোগল আমলে কিন্তু ঐ ঘর ছিল অতিশয় গোপন (top secret) মন্ত্রণালয়।

কেউ যদি লেখেন ‘অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্তা সমাধানের জন্য সমস্ত রাত কুরান শরীফ খেঁটেও কোনো হদীস পেলেন না’, তবে বাঙালী পাঠক এবাক্যে কোনো দোষ পাবেন না। কারণ হদীস বা হাদীশ বলতে বাক্সালা পাঠক প্রিন্সিডেন্স বা পূর্ব উদাহরণ বোঝে। কিন্তু কুরানে হদীস খোঁজা আর বেদে মনুসংহিতা খোঁজা একই রকমের ভুল। কুরানে আছে পয়গম্বরের কাছে প্রেরিত ঐশী বাণী—আপ্তবাক্য। আর হদীসে আছে পয়গম্বর কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, কাকে কখন কি করতে আদেশ বা উপদেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি (এগুলোও অতিশয় মূল্যবান—কিন্তু আপ্তবাক্য নয়)। কাজেই এগুলোর (হদীসের) সন্ধান কুরানে পাওয়া যাবে কি করে? বস্তুত কোনো অর্থাচীন সমস্তা ও তার সমাধান কুবানে না পেলে আমরা হদীসে (শাস্ত্রে ‘স্মৃতি’র সঙ্গে তুলনীয়) যাই। সেখানে না পেলে ইজমাতে এবং সর্বশেষে কিয়াসে। কিন্তু শেষের দুটো স্মৃতিশাস্ত্রের গভীরে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত। তা’ সে যাই হোক, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে কিছুটা জ্ঞান বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেটা প্রধানত বিষয়বোধক বাক্যে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ফরাসী উপন্যাসের ইংরিজী অনুবাদে ‘মঁ দিয়ো’ ‘পার ব্লা’ ‘ভাঁজ ব্লা’-গুলো ইংরেজ ফরাসীতেই রেখে দেয়; জার্মান উপন্যাসের অনুবাদে ‘মাইন গট’ ‘হার গট’ ‘ডনার ভেঁটার’ মূলের মত রেখে দেয়। এগুলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, মঁ দিয়ো, মাইন গট এবং মাই গড একই জিনিস, একই বাক্য হলেও ইংরেজের পক্ষে ‘মাই গড’ বলা নিন্দনীয়; নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইংরেজ ‘মাই গড’ বলে না। পক্ষান্তরে ফরাসী জার্মান কথায় কথায় ‘মঁ দিয়ো’ ‘মাইন গট’ বলে থাকে। তাই ইংরিজী অনুবাদের সময় মূলের আবহাওয়া রাখবার জন্য অনুবাদক এগুলো অনুবাদ করেন না।

অলহমদুলিল্লা, মাশালা, ইয়া আল্লা, তওবা তওবা, বিসমিল্লা এগুলো অবস্থা-অর্থাৎ তসবীমালা জপ করে এক সাধু অথ সাধুর হাতে তুলে দেন, কিন্তু কেউই দ্বন্দ্ব করে মালার হুতোটি কেটে মুক্তোগুলোকে মুক্তি দেন না।

ভেদে ব্যবহৃত হয়। ‘আপনার ছেলে এম-এ পাস করেছে ? তওবা তওবা !’ (বা তোবা তোবা ।) বললে যে ভুল হয় সেটা সাধারণ জনও বোঝে । তাই এসব বাক্যে সতর্ক হুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেকটা কারো প্রথম বংশধর জন্মালে আপনি যদি উচ্চকণ্ঠে ‘বল হরি, হরিবোল বলে ওঠেন’ তা হলে যেয়কম হয় । এসব ভুল সাধারণ সামাজিক উপন্যাসে থাকলে পাঠক শুধু একটুখানি মূচকি হাসে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর কাছে থেকে পাঠক একটু বেশী প্রত্যাশা করে ।

‘শাক্তদেব’র মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে ধারা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, পাঠান-মোগল যুগের সঙ্গীত তথা এদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল ; এ নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁদের কতখানি ফার্সী ভাষার সন্ধে পরিচিত হবার প্রয়োজন । ঐতিহাসিক উপন্যাসিকের অভ্যর্থনা ফার্সী জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি রানী রিজিয়ার দরবারে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেই আপত্তি জানাবেন । আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করি । মৌলানা আজাদ আমাকে বলেন, ‘সেতার তৈরি কবেন আমীর খুসরো । এটা বীণার অঙ্কুরেণে তৈরি, কিন্তু বীণার চেয়ে সহজ ।’

আমি উত্তরে বললুম, ‘আমি আরেক পণ্ডিতব কাছ থেকে শুনেছি, বাণ্যযন্ত্র-নির্মাণের পক্ষে সেতার-নির্মাণ বীণার চেয়ে কঠিনতর । কিন্তু বাজানেওলার পক্ষে ‘সেতার বাজানো সহজতর । ঐ পণ্ডিত আমাকে বলেন, “অনেক সময় যে জটিল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয় সেটা বাজানেওলার পক্ষে বাজানো সহজ করে দেবার জন্ত” ।’ (শাক্তদেব হয়তো খাঁটি খবর রাখেন ।)

এসব ঝামেলার মাঝখানে পাঠান বা মোগল দরবারের গানের মজলিস বর্ণনা করা যে বিপদসঙ্কুল, সে কথা পাঠকমাত্রেরই বুঝতে পাবেন ।

ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিস্তির বর্ণনা । কোরমা, কালিয়া, কোক্তা কবাব (শিক-কবাব প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল—শৃগাপক মাংস—কিন্তু সেটা আঁকাবাঁকা শিকের ভিতর ঢুকিয়ে করা হত, না শুলের ডগায় ঝুলিয়ে ঝলসানো হত, তা জানি নে,) যে সব কটাই যাবনিক খাণ্ড তা জানি, কিন্তু মোগল ক্রিষ্টিতে বাঁধাকপির পাতার ভিতর কিমা দিয়ে যে দোলমা তৈরি হয়, সেটা কি চলবে ? কপি জাতীয় জিনিস এদেশে এল কবে ? এমন কি যে সিম জিনিসটা ঘরোয়া বলে মনে হয় সে সতর্কও একখানি চিরকুটে দেখি ঋষিভূলা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, ‘সংস্কৃতে আপনি সিম জিনিসটার

উল্লেখ পেয়েছেন কি ?

মোগল ছবিতে তাদের জামাকাপড় গহনাগাটি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু সব কটার নাম তো জানি নে। মা-দুর্গার নাকের নথ দেখে দ্বিজেননাথ চিত্রকারকে শুধান, ‘নথ কি মুসলমান আগমনের পূর্বে ছিল ?’

কিন্তু আপত্তি কি ? গদাযুদ্ধে নামার সময় ভীমের পকেটে যদি ফাউন্টেনপেন দেখা যায়, তবে কী আপত্তি ! জেরুজালেমের এক মেরী মূর্তির বাঁ-কজিতে দেখি, ছোট্ট দামী একটি রিস্টওয়াচ ! ভক্তের চোখে মা-মেবীর বাঁ-হাতখানা বড় গাড়া-গাড়া দেখাচ্ছিল, তাই। জানি নে, বারোঘাষি দুর্গাপূজায় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কি না !

অনুবাদ সাহিত্য

কিছুদিন ধবে লক্ষ্য করছি, অনুবাদ যে অনুবাদ সেটা স্বীকার করতে প্রকাশক, সম্পাদক, স্বয়ং লেখকেরও কেমন যেন একটা অনিচ্ছা। কেন, এ প্রশ্ন শুধাতে একজন প্রকাশক সোজাহুজি বললেন, ‘বাঙালী অনুবাদ পড়তে ভালবাসে না, তাই অসাধু না হয়ে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তথ্যটা চেপে রাখি।’ কিছুকাল পূর্বে আমিও একটি বড়-গল্প অনুবাদ করি ও তার প্রথম বিজ্ঞাপনে সেটি যে অনুবাদ সে কথা প্রকাশিত হয় নি। আমি সেই সম্পাদককে বেনিফিট অব ডাউট দিয়ে মনকে সাধুনা দিচ্ছি এই বুঝিয়ে যে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে এই গাফিলতি মেরামত করা হবে। ঐ সময়ে আমারই সহকর্মী (কারণ ছ’জনাই ‘দেশ’-সেবক, এবং তিনি অগ্রার্থেও) শ্রীযুত বিদুর ঐ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে যা বলেন তার নির্ধাস, যত বড় লেখকই হোন না কেন, তিনি যদি অনুবাদ-কর্ম করেন তবে সেটা যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়। অভিশয় হক কথা। তবে এটা আমি গায়ে মাখছি নে, কারণ আমি ‘যত বড়’ কেন অ্যাটটুন বড় লেখকও নই। আমি বরঞ্চ গোড়াতেই চেয়েছিলুম যে ফলাও করে যেন বলা হয়, এটি অনুবাদ। এবং সেই মূল প্রথ্যাত লেখকের অনুবাদ প্রসাদাৎ তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিও কিছুটা খ্যাত হয়ে যাবো—‘রাজেন্দ্র সংগমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।’^১ কিংবা কালিদাস রঘুবংশের অবতরণিকায় যে কথা বলেছেন—বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র

১ এই স্ববাদে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। গুরুদেব আমাকে কয়েক পাতা প্রুফ মেরামত করতে দেন। সেটা তৈরী হলে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে

হওয়ার পর আমি নৃত্যে মগ্ন করে বেতক্লিক উৎরে যাবো।

এবং এম্বলে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, কালিদাস বা মধুসূদন কেউই বাঙ্গালিকর আক্ষরিক কেন, কোনো প্রকারেরই অম্ববাদ করেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব, মৌলিক কৃতিত্ব দেখিয়েও তাঁরা অতখানি বিনয় দেখিয়েছেন। মডার্ন কবিতা যে আমার পিণ্ডি চটিয়ে দেয়, তার অম্বতম কারণ তাঁদের অনেকেরই অম্বংলিহ দম্ভ। ‘আধুনিক’ গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই স্মর শুনতে পাই। আর মডার্ন পেনটাররা কি করেন—অম্বত তাঁদের দু’জনার বাবহার সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা থাক। আমাব প্রশ্ন, অম্ববাদ পড়তে বাঙালী ভালবাসে না কেন?

আমার কিন্ত কথাটা কেন জানি বিশ্বাস কবতেই ইচ্ছে যায় না।

বাংলা ভাষার কচিকাঁচা যুগে কালীপসর সিংহ মহাভারতের অতি বিশুদ্ধ আক্ষরিক অম্ববাদ করেন। আজ পর্যন্ত যে তার কত পুনর্মুদ্রণ হল তার হিসেব হয়তো আজ বসুমতীই দিতে পারবেন না। পাঠকদের শতকরা ক’জন নিছক পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে এ অম্ববাদ পড়েছে? এমন কি রাজশেখর বসুর অম্ববাদও—যদিও একটি বারো বছরের ছেলেকে বলতে শুনেছি, ‘ঐ বসুমতীরটাই ভালো। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা—দীরেস্থে পড়া যায়। রাজশেখর বাবুরটায় বড় ঠাসাঠাসি।’ ‘বেতালপঞ্চবংশতি’ ‘বত্রিশ সিংহাসন’ এ যুগের ছেলেমেয়েরাও তো গোগ্রাসে গেলে। (বিষ্ণুশমার ‘পঞ্চতন্ত্র’র আরবী অম্ববাদ ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত আজও ‘আরব্য রজনী’র সঙ্গে পাল্লা দেয়।) ঈশান ঘোষের জাতক জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল—(পরম পরিতাপের বিষয় যে এখনো তার পুনর্মুদ্রণ হল না) অথচ তার থেকে নেওয়া বাচ্চাদের জাতক তাদের ভিতর খুব চলে। জ্যোতিষ্ঠাকুরের সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী কথা-সাহিত্যের অম্ববাদ এককালে বিদগ্ধ বাঙালীই পড়তো। ওদিকে এসবের বহু পূর্বে আলাওল অম্ববাদ করলেন—যদিও আক্ষরিক নয়—জয়সীর ‘পদুমাবৎ’। এবং তার পর, গিয়ে দেখি তিনি ৬ক্ষতিমোহন ও ৬বিধুশেখরের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি খামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনি, তিনি বলছেন, ‘বনমালী (কিংবা সাধুও হতে পারে, কিন্ত সে গুরুদেবের সঙ্গে ছিল অল্প দিন) তো গেল আমার সঙ্গে এলাহাবাদ। আমি বললুম, “ওরে বনমালী, প্রয়াগে এসেছিস ; স্নান করে নিল।” কিন্ত মশাই কি বলবো, সে ও-পাশই মাড়ালো না। বোধ হয়, আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেবদ্বিজ ওর আর ভক্তি নেই। কিংবা ঐ ধরনেরই।’ মাইকেলের কথা জ্ঞা হলে সব সময়ে ফলে না।

পর পর বেকুলে ‘ইউহুক-জোলেখা’, ‘লায়লা-মজনু’ ইত্যাদি। মোল্লার বাড়িতে এবং পূর্ব-বাঙলার খেয়াঘাটে, বটতলায় এখনো তাদের রাজত্বের অবসান হয় নি। ওদিকে কাশীরাম, কৃত্তিবাস। ‘আরব্যোপন্যাস’, ‘হাতিমতাই’, ‘চহারদরবেশ’ উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙলা দেশে নাম করেছে। তারপর ‘রবিনসন ক্রুসো’, ‘গালিভার্স ট্রেল’ এবং ফরাসী থেকে ‘লে মিজেরাবল’ এদেশে কী তোলপাড়ই না সৃষ্টি করলে।

আমি অতি সংক্ষেপে সারছি। কিন্তু আমার বয়েসী কোন্ পাঠক ‘তীর্থসলিল’ ‘তীর্থরেণু’র কথা ভুলতে পারবেন? সত্যেন দত্ত অহুবাদের যাদুকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের শোকসভাতে বলেছিলেন, ‘যে-দিন দেখলুম সত্যেন আমার চেয়ে ঢের ভালো অহুবাদ করতে পারেন ও ছন্দের উপর তাঁর দখল আমার চেয়ে অনেক বেশী, সেই দিনই অহুবাদ-কর্ম থেকে অবসর নিলুম। তারপর ভাল কবিতা চোখে পড়লেই সত্যেনকে অহুবাদ করতে বলতুম।’ (এস্থলে যদিও অবাস্তব তবু স্বরণে আনি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা কিছুক্ষণের জন্ত ক্ষান্ত দিয়ে সত্যেন দত্তের ‘চম্পা’ কবিতাটির ইংরেজি অহুবাদ করেন।)

আর বর্তমান যুগের হীরেন দত্ত মশায়ের ‘তিন সঙ্গী’ যারাই পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, এরকম অনবদ্য অহুবাদ হয় না।

এর একটু তথাকথিত ‘নিম্নপর্ষায়ে’ নামলেই দীনেন্দ্রকুমারের ‘রহস্তলহরী’। বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-নরকে এঁর অহুবাদ আনন্দ দিয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার লিখতেন অতি সরল, ছলছল-গতির বাংলা—পাঠককে কোনো জায়গায় হৌচট খেতে হত না। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ ‘পল্লীচিত্র’—নামটি আমার ঠিক মনে নেই—পড়লে তাঁর বাংলা-শৈলী ও ভাবার সরলতা ও আপন বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরাম ও চমক দুই-ই দেয়। (অরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদায় চাকরি নিয়ে বাংলা শেখার জন্ত গুরুর সন্ধান করেন, তখন দীনেন্দ্রকুমারকে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী যুগে যখন তিনি তাঁর অভুলনীয় মধুর বাংলায় পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে তাঁর জীবনযুতি—বিশেষ করে বরোদার ইতিহাস ও শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দু’একটি বিতর্কমূলক তথ্য বলে কেলেন। আমার ব্যক্তিগত মতে তিনি সম্পূর্ণ সত্যভাষণই করেছিলেন। ও আমার অগ্রজ, কাঙাল হরিনাথ, দীনেন্দ্রকুমার, মীর মুশ্বরফ হুসেন সম্বন্ধে কুঠিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন। ফলে তখনকার দিনের মাসিক-সাহিত্য মহলের এক বলবান ক্লিক দীনেন্দ্রকুমারকে, জাস্ট হাউণ্ডেড্ হিম আউট অব বেঙ্গলী লিটারেচার। সেই অল্পময় জীবনযুতি শেষ করার সুযোগও তখন

তিনি পাননি। অথচ আমি যখন তাঁর লিখিত শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী খাসেরাও যাদব অংশ বরোদার যাদব গোষ্ঠী ও অন্যান্য মারাঠীদের অনুবাদ করে শোনাই তখন তাঁরা অশ্রুবিসর্জন করে বলেন, ‘বাংলাদেশই শুধু সে যুগের মারাঠী বিপ্লবীদের অরণে রেখেছে। বাঙালী প্রাদেশিক, এ কুসংস্কার আমাদের ভাঙলো।’ এর পর হঠাৎ যখন দীনেন্দ্রকুমারের ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গেল, তখনো তাঁরা উদ্গ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন পরের পর্বের কথা। আমি কোন্ লজ্জায় স্বীকার করি কেন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল।)

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার বহুদিনের মনস্তাপ—আজ বেমোকায় বেরিয়ে গেল, পার্সক ক্ষমা করবেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। প্রাচীন যুগের সব অনুবাদই যে উত্তম ছিল, একথা ঠিক নয়। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই উত্তম সংস্কৃত ও তৎকালীন প্রচলিত বাঙলা ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এবং পণ্ডিতজন যত বাক্য বাংলাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তাঁদের শব্দভাণ্ডারে দৈন্য ছিল না বলে অনুবাদ মূল থেকে দূরে চলে যেত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পিয়ের লোতির ‘ইংরেজবর্জিত ভারত-’ এর অনুবাদ পড়লেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। লোতির শব্দভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত (উত্তর-মেরু-সমুদ্রের আলো-বাতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি পর পর তিনটি শব্দ দিয়েছেন, ডায়াকনাস, এফিমেরাল, কাইমেরিক—এর অনুবাদ তো দীন শব্দভাণ্ডার নিয়ে হয় না!)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন অভ্যুত্তম সংস্কৃত—ভাসের নাটক তখনো ছাপায় প্রকাশিত হয় নি বা তাঁর হাতে পৌছয় নি—ভাসকে বাদ দিলে তিনি সংস্কৃতের প্রায় সব নাট্য-লেখকের অনুবাদ করেছেন—তাই সে ভাষা থেকে তিনি অনায়াসে শব্দচয়ন করে মূলের বৈচিত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। অক্ষম অনুবাদকের হস্তে সে-স্থলে অনুবাদ হয়ে যায় একেঘেয়ে—পড়তে গিয়ে পাঠকের ক্লান্তি এসে যায়।

অধুনা একাধিক যোগ্য ব্যক্তি অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, ইংরাজী সাহিত্য বহু ভাষা থেকে বহু বস্তু অনুবাদ করে কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, নব নব অনুপ্রেরণা পেয়েছে, নব নব অভিযানে বেরিয়েছে—সেই আদিযুগের শুভক্ষণ থেকে।

আমি অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে নিজের কাছ লাঞ্ছিত হয়েছি। এই লেখাটি তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

বাবুর শাহ্,

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হয়ে প্রমাণ করে এদেশে খেত (আমি বলি খল কুঠ) রাজত্ব যুক্তি ও ন্যতির উপর খাড়া করা। এক কথায় যাকে বলে, ‘হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন’ যে কী ভীষণ ভারী এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-আগা ঘোড়দোড়ের জুয়োখেলা, গোকশেয়ালি শিকার করা স্বচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই ‘নচ্ছার’ দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবে-সৈবে দু’একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভগ্নামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হস্তরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন—‘বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জ্ঞা খ্যাঙ্কা-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা ঐ হতভাগাদেরই ঝাড়ে।’

কিন্তু প্রাপ্তকৃত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি ‘আপ্তবাক্য’ নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলতো, ‘পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানতো না—শুধু লড়াই আর লড়াই।’

অল্প দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজীতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু ‘লড়াই আর লড়াই’ নয় (আহা! তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মত অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মত নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবী ফার্সী চর্চা করে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, ‘ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে; সব রাবিশ।’

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজী ‘শিক্ষিতেরা’ এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছু দিন ধরে ‘শেষ মোগলদের’ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপভ্রাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয়

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ পাঠক এই করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই ছাড়াও একটা ম্যাট্রিক-কেল ছোকরা—কিন্তু ব্যাপিড রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনি-খিলার পড়তে পারতো—আমাব কাছ থেকে শেখা সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘আই ক্লাউডিউস’ পড়ে এমনই ‘ক্ষেপে যায়’ যে, সে তারপর দুনিয়ার ছত রোমান ইতিহাস পড়তে আবন্ত করে, এতক জুলিয়াস সীজারের ‘ব্রিটন বিজয়’ পর্যন্ত।

তালে বাবুর বাদশাব আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদে। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুবেব মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চুগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্তানের তুর্কী, টার্কিব (যাব বাজবানী আন্ধারা) ভাষা ওসমানলি তুর্কী। আমাব যতদব জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দবদারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথা-বার্তা বলেছেন, উদ্ভূত কবিতা লিখেছেন—দিল্লীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুশাবেবায় (কবি-সম্মেলনে) দত্ত মাবফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন উদ্ভূত সব শ্রদ্ধ কবি গালিব)—এবং বাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুবেব সেই আত্মজীবনী অন্বদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরেজীতে ও বিবেচনা করি, এটা বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরেজী থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমাব নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশী জখম হয় গীতিবস, এবং বাবুবেব সাহিত্যশৃঙ্গার গীতিরসপ্রদান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে, তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুবেবের পর্যবেক্ষণশক্তি। তারতবর্ষ—প্রধানতঃ দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নির্ভর সঙ্গে তাব বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলাম তখন বাবুর বর্ণিত, কাবুল পাজশীর (পাজশীর অর্থ পক্ষ-ক্ষীর, সংস্কৃত ‘ক্ষীর’ শব্দ ফার্সীতে ‘শীর’, কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাজ অর্থ পক্ষ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী

১ ‘ভুনেছ, রাজা কবিতা লেখে, এ আবার কেমন রাজা!’ এই বলে তখনকার দিনের ইংরেজ বাদশা-হাসালামৎকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। পরবর্তী যুগের এক জহরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে লেখেন, ‘ঐসব বর্বর ইংরেজ জানতো না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শাহ তুলনায় অতিশয় নিরেস।’

বয় ; আমাদের পায়সকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরজ্জ—বিরজ্জ্ অর্থ চাল) ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে ধারা কাবুল দেখে ফিরেছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তথৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাদের এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত বিশ্বপার্থক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, ‘আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কি করেছিল? কল্পনা করতে পারেন, সেই নরদানব ইব্রাহিম লোদীর অন্তঃপুরের গুণ্যশীলা অন্তঃস্পন্দাদের খোলা বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল! এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।’

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপর না ছিল আচ্ছাদন (একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে, কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরী অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালী ইনফ্রেশন করে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোকা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালী তাই বাবুরের ইনফ্রেশন-জ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লী-জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরাহ্ বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, ‘এ বারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবী করা যাক।’ বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্ধুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আগার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আষ্ট গণ্ডা (কিংবা ঐ ধরনের কিছু-একটা—বইখানা আমার হাতের কাছে নেই)। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যা নিত্যা আগা খেতে চাইবে।

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালী পাঠক আনন্দ পাবেন সেটি কাশীতে লেখা বাঙলার (খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ) ইতিহাস। ‘বাহারিস্তানে গায়েরী’^২ —

২ বাঙলা আজগুবী অর্থ—‘আজ’ মানে ‘হতে’ ‘from’; ‘গায়েরী’ মানে

অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে দেখে বাঙলার দেহলিশ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্রামলে শ্রামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে।

ফেউর্ডিনাণ্ট্ জাওয়ারক্ৰথ

বৈষ্ণরাজ জাওয়ারক্ৰথকে নিয়ে আবার সুইস জার্মান কাগজে বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দলের বক্তব্য, সত্যই বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল; অগ্র দলের বক্তব্য তিনি পূর্ব-বাল্লিনের সোভিয়েৎ কূটনীতির বলির পাঠা হয়েছেন। বাল্লিনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল ‘শারিতে’ (charite—চারিটি—খয়রাতি) প্রতিষ্ঠানের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বাল্লিন ভাগাভাগির পর শারিতে পড়েছিল পূর্ব-বাল্লিনে, রাশান আওতায়।

এই কলকাতা শহরের অন্তত একজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে আমি চিনি, যিনি জাওয়ারক্ৰথের শিষ্য। তিনি ম্যানিকে তাঁর কাছে বৃকের যক্ষ্মার অপারেশন শেখেন—জাওয়ারক্ৰথ বহু বৎসর ম্যানিক হাসপাতালেরও বড় কর্তা ছিলেন। এছাড়া তাঁর অগ্নাগ্ন শিষ্যও হয়তো কলকাতায় আছেন। অবশ্য বৃকের, মাথার ও ক্যানসারের সার্জারি নিয়েই যাদের কারবার তাঁরাই জাওয়ারক্ৰথের গবেষণার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত।

জার্মান সার্জন-সমাজ মনে করেন, পৃথিবীর তিনজন সার্জনের নাম করতে হলে জাওয়ারক্ৰথের নাম কালাহুক্রমে তৃতীয়। অগ্র দুজন বোধ হয় হিপপোক্রাতেস ও নেপোলিওনের সার্জন—কিন্তু আমি কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি সে শাস্ত্রের ইতিহাস কোনোটারই বিন্দুবিসর্গ মাত্র জানি নে বলে হলফ খেয়ে কিছুই বলতে পারবো না। তহপরি এ ধরনের নির্ঘণ্ট নির্ণয় সুব সময়েই কিঞ্চিৎ উদ্ধাম হয়ে থাকে—যেরকম পৃথিবীর সপ্তমাশ্বর্ষ নির্ণয়ে ভিন্ন লোক ভিন্ন নির্ঘণ্ট দেয়।

অতএব অতিশয় সারবান আপত্তি উঠতে পারে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছুই যখন আমি জানি নে, তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারক্ৰথ বিরাজ করছেন, তাঁর প্রতি আমি উদ্বাহ হয়েছি কেন? উত্তর অতি সরল। এই শল্যরাজ মৃত্যুর পূর্বে একখানি নাতিবৃহৎ আত্মজীবনী লেখেন—বসন্ত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং সেটি আদৌ শল্যরাজ বা বৈষ্ণ-সম্প্রদায়ের ‘অজানা’ ‘লুপ্ত’ ‘অদৃশ্য’ ‘বিধিকৃত’। অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অনুভূত।

উদ্দেশ্যে রচা হয় নি ; রচনা হয়েছে আপনার আমার মত মানুষের জন্ত । এমন কি সে পুস্তকে ক্যানসার সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও সাধারণ জনের উদ্দেশ্যে লিখিত, কারণ তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জার্মান রেডিও থেকে বেতারিত করেন । অতি সরল জার্মানে, সর্বপ্রকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে বর্জন করে তিনি এই বেতার-ভাষণটি নির্মাণ করেছিলেন বলে সেটি জার্মান-বালকেও বুঝতে পারে—বাঙলায় অনুবাদ করলে বঙ্গবালকও বুঝতে পারবে ।^১

কিন্তু এইটাই সর্বপ্রধান বা সর্বশেষ তত্ত্ব নয় । তাঁর আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য আছে, এবং তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হস্তকৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি প্রকাশ পায় । তাঁর সামান্য একটি উদাহরণ দি ।

বাস্করস অতিশয় প্রাচীন রস—করণ ও বীর রসের সমন্বয়সী সে । প্রাচীনতম গ্রীক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে । কিন্তু অস্ফা সে-রসের উৎস বলে আমাদের রসগ্রিয় মনও সেটা সব সময় গ্রহণ করতে পারে না । বিস্তৃত হান্সরস—যেটা সৃষ্টি করার জগৎ কাউকে পীড়া দিতে হয় না, নট আট দি কস্ট অব এনি ওয়ান—আপন আনন্দে উচ্ছল এবং সেটা বাস্করসের বহু পববর্তী যুগের রস । এবং আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হান্সরসের, সেই বাস্করসের উদ্দেশ্যে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে বাস্ক করেন, লাক্স অ্যাট হিড ওন কস্ট । তারই একটি উদাহরণ দি :

জাওয়ারকথ বলছেন, তাঁর সময়কার এক বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক

১ এবং এর অনুবাদ করার বাসনা আমার ছিলও—অবশ্য সাবধানের মার নেই বলে ক্যানসার-বোগ-বিশেষজ্ঞ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে সেটি সেনসর করিয়ে নিতুম । এ বেতারভাষণটি এখনো আর্নে গাজীমিয়ার বস্তানীতে আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ আউট-অব-ডেট হয়ে যায় নি । ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদেশে আমি সর্বাধুনা প্রকাশিত জার্মান-বিশ্বকোষে সবিস্তর লিখিত ক্যানসার প্রবন্ধটি পড়ি । এবং যদিও সব জিনিস বুঝতে পারি নি (বিশেষ করে কুআল্টুম থিয়োরি দিয়ে ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয়ের আধুনিক প্রচেষ্টা !) তবু এটা লক্ষ্য করলুম যে ক্যানসারের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জাওয়ারকথ অজ্ঞজনকে যে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, সর্বাধুনিক জার্মান-বিশ্বকোষও তাই বলেছেন । ...উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানসার গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জাওয়ারকথ বার্লিনের ইওলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খবর নেন, প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ক্যানসার সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন ।

ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিবারেই অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, ‘এই পৃথিবীতে বিস্তর গর্দভ নিজেদের ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়ে নির্ভয়ে অগুনতি লোক মেরে বেড়াচ্ছে ; তার উপর যদি আরো একটা গর্দভ বাড়ে তাতে করে কণামাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তুমি পরীক্ষা পাস করলে।’ জাওয়ারকথও তাই তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের সমক্ষে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু অন্তত একবার তাঁরও শিক্ষা হয়ে যায় এ বাবদে। জাওয়ারকথ লিখছেন, ‘সকাল দশটায় তিনটি ছেলে আসবে আমার কাছে ভাইভা দিতে। আমি নার্সকে বললুম, ক্যাণ্ডিডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো—তার পেটে ছিল টিউমার।’ ওরা এলে আমি কাগজপত্র দস্তখত করতে করতে একজনকে বললুম, রুগীকে পরীক্ষা করে বলতে তার কি হয়েছে। আমি কাজে ডুব মারলুম। দশ মিনিট পরে শুধালুম, “কি হল?” ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বললে, “কিছুই তো পেলুম না, স্তর।” আমি হুকার দিয়ে বললুম, “গেট আউট”—আর নামে দিলুম ঢাবা কেটে। তারপর একই আদেশ দিলুম দু নম্বর ক্যাণ্ডিডেটকে। একেও যখন শুধালুম, কি পেল সে—সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে একই উত্তর দিল। ছাড়লুম আরেক হুকার, কাটলুম আবেক ঢাবা। এবারে তিন নম্বরের পালা। সে-ও যখন ফেল মারলে তখন আমি ছাড়লুম শেষ হুকার। এ ছেলেটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাওয়া না হয়ে শাস্ত কণ্ঠে বললে, “তা হলে আপনি দেখান না, স্তর, কি হয়েছে।” কী! এত বড় আশ্পদা! দেখাচ্ছি। লম্ব দিয়ে গেলুম রুগীব কাছে, গোট দিলুম হাত। ও হরি! কোথায় টিউমার! ভুলে অঙ্ক লোক পাঠিয়েছে নার্স! তখন শুরু হয় আমার আর্তরব। “আরে, আরে, কোথায় গেল সেই দুই ক্যাণ্ডিডেট। নিয়ে এসো ওদের।” এস্থলে যে-ক্যাণ্ডিডেট বিখবিত্যাত জাওয়ারকথকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাকে বোঝ হয় আর কোনো পরীক্ষাতে না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পয়লা নম্বর ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

এ বকম আরো বহু মজার মজার কথা আছে এই অসাধারণ পুস্তকে ; বস্তুত পুরো বইখানাই হাস্যরসের কুমকুমে কুমকুমে ভর্তি। পাঠকের চটুলহৃদয়ে একটুখানি চাপ পড়লেই আবারে আবারে ছয়লাপ। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ট্রাজেডির করুণ রসও আসে বলে সে রস যেন জল এনে দেয় চোখের পাতায়, বুক ভরে দেয় নিবিড়তর ব্যথায়—আরো বেশী।

একবার একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, তাঁর নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের জাতগোত্রের বিচার হয়। নানাবিধ

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁরা চানাই এক বাক্যে সম্মুখে বললেন, 'ক্যানসার নয়'।

সব শুনে মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, হেঁচ প্রফেসর, এটা ক্যানসারই বটে।'।

মহিলাটি কয়েক দিন পর আবার এসে ক্যানসারের ফরিয়াদ করলেন। আবার গোড়ার থেকে তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল, আবার নিঃশব্দ নেতিবাচক উত্তর এল। এই করে করে ছ'মাস ধরে মহিলাটি আসেন—তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর উদ্ভববেদনা ক্যানসারজনিত।

শেষটায় জাওয়ারকথ স্থির করলেন, কাটাচাই যাক পেট। মাদামকে তখন বলতে পারবেন, স্বচক্ষে দেখেছি পেটে কোনো ক্যানসার নেই। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, অনেক বর্ষায়সী মহিলার এই অপারেশন-মেনিয়া থাকে; হয়তো তাঁরা আপন জানা-অজানায় সেন্টার অব অ্যাক্টাকশন বা কোতূহলের কেন্দ্র হতে চান। তাকে অস্ত্রোপচারের জগৎ তৈরি করা হল।

তারপর কবিরাজ জাওয়ারকথ যা বলেছেন, তার মোদা কথা : 'আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পেট খুললুম। সর্বনাশ! এ কি দেখি। পেট ভর্তি ক্যানসার! এবং এখন যে চরমে পৌঁচেছে সে অবস্থায় অপারেশনের কোনো প্রগতি ওঠে না। সন্তপ্ত চিন্তে আমরা পেট সেলাই করে দিলুম। মহিলা সাধুতে ফিরলে আমি তাঁকে বললুম, 'হ্যাঁ, ক্যানসারই ছিল, আমরা সেটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি।'।

জাওয়ারকথ তার পর বলেছেন, 'মহিলাটি প্রথম যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করতুম, তবে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু প্রাণ, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন নগ্নরূপে উত্তর দেয়, তখন শুধুমাত্র রোগীব অল্পমানের উপব নিভর করে পেট কাটা যায় কি প্রকারে?'

জাওয়ারকথ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আরো নিবেদন-করার বাসনা রইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো বাঙলাভাষী সার্জন সেটা করলেই ভালো হয়; আমার মত আনাড়ী তা হলে অনধিকার-প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সব ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে ধবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ জনকে সাবধান করে দেন, শরীরে কোন্ কোন্ আকস্মিক বা মন্দগতিতে বর্ধমান পরিবর্তন দেখলে ক্যানসারের সন্দেহ করতে হয়। এগুলি আমি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পড়ি।

ঠিক ঐ একই সুবাদে প্রফেসর ডক্টর গেহাইম্বাট জাওয়ারকথ অবতরণিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছেন এবং আপন বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এমন একটি

অত্যাংকষ্টে বিরল তুলনা দিয়েছেন, যেটি ব্যবহার করতে পারলে যে কোন যশস্বী সাহিত্যিকও ভ্রাণা অসুভব করবেন। বৈষ্ণৱাজ্ঞা বা বলেছেন, তার নির্ধাস : অধিকাংশ যোগই কোনো না কোনো সাবধান-বাণী, ইঙ্গিত, ওয়ার্নিং দিয়ে আসে। যেমন, সামান্ত মাথা ধরলো—সেইটে ওয়ার্নিং—পরের দিন জ্বর হল। কিন্তু ক্যানসার কোনো ওয়ার্নিং তো দেয়ই না, বরঞ্চ সে নিতান্ত নিরপরাধীর মত দেখা দেয়। যেমন, আপনার জিতে একটি দানা দেখা দিল। সেটাতে কোনো বেদনা নেই, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আপনি ভাবলেন, এরকম তো কত দানা এখানে সেখানে দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা চিকিৎসকের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর সেটা অত্র ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু কোনো বেদনা বা অসুস্থি নেই বলে আপনি তখনো কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপর একদিন ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে আপনার অসুবিধা হতে লাগলো। আপনি তখন গণন ডাক্তারের কাছে, কিন্তু হয়, ততদিনে বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, তখন আর অপারেশন করা যায় না। আপনি যদি, দানা যখন ছোট ছিল, তখন আসতেন, তবে সার্জন আপনাকে অনায়াসে ক্যানসারমুক্ত করতে পারতেন—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর। তাই জাওয়ারকথ বলেছেন, ‘দানাটি আদৌ অপরিচিত শত্রুরূপে বেদনা যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে এল না। ক্যানসার এল যেন আপনার কোনো বন্ধুজনের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটি মুখোশ তৈরি করে সেটা পরে। তার পর কাছে এসে হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে ফেল আপনার বুক মারলো ছোরা!’

এর পরই অব্যাপক কতকগুলো চিহ্নের উল্লেখ করেছেন—এগুলোকে তিনি ওয়ার্নিং বলেন নি বটে, কিন্তু সেগুলো দেখলেই তৎক্ষণাত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। জ্বিতে বা অন্ত কোথাও দানা বা ঐ জাতীয় বস্তু বা পরিবর্তন, কণ্ডুস্বর অকারণে করুণ হয়ে যাওয়া, আপনার পেটের অসুখ ছিল না—হঠাৎ আরম্ভ হল দিনের পর দিন পেট খারাপ হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা আমার অনধিকারপ্রবেশ। আপনার উচিত, আমাদের যে কোনো ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের হস্তলিখিত প্রামাণিক বিবৃতি সংগ্রহ করা। বিবৃতিতে সব ক’টা চিহ্নের পরিপূর্ণ (exhaustive) লিস্ট থাকে। আমি এযাবৎ যা লিখেছি, সেটা ভুলে গিয়ে ঐ বিবৃতি মন দিয়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো আমাদের জন্যই লেখা—ডাক্তারদের জ্ঞান নয় ॥

হিডজিভাই পি মরিস

একদা ‘স্ট্যান্ড’ পত্রিকা একটি নতুন ধরনের অহুসঙ্কানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের স্তোত্র, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে ‘মোহনে’র ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে : যেমন, কথার কথা কইছি—বার্নার্ড শ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ?

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্য-সেবক যে তাঁরা যেন তড়িৎদ্রুত শ্রীযুত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বই-খানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ জাতীয় দু’চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বড় প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিডজিভাই মরিস।

তাঁর পুরো নাম হিডজিভাই পেস্তন’জ মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে ; যেমন গান্ধী, জিন্মা (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডাওয়াটার-বটল্‌ওপনারওয়ালা !

বোম্বাইয়ের পতীত পারবার বিখ্যাত। ‘এ বা ফরাস’ ‘পতা’ (Ietit) ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীতওয়ালা ও পরে পতীত নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিসওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যাভূতম’ ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি একাধিক সঙ্জন পাঠকের কাছ থেকে অহুরোধ পেয়েছি, ক্যানসার সম্বন্ধে জাওয়ারক্সের প্রাক্তন প্রবন্ধটি যেন আমিই অহুবাদ করি। আমি করজোড়ে কমা ভিক্ষা করছি, কারণ অহুস্থতাবশত আমার দেহে শক্তি মনে উৎসাহ বড়ই হ্রাস পেয়েছে। তবে এটাও নিবেদন, আমিত্যু দুটি প্রবন্ধ অহুবাদ করতে পারার দুরাশা আমি কখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো না ; ক্যানসার সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ও অধ্যাপক ভিষ্টারনিত্স রচিত ক্ষুদ্রাকার রবীন্দ্র-জীবনী।

শাস্তিনিকেতন পৌছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাটি বাঙালী—সেটিমেন্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতি ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শাস্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। (নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সংকল্পটা করে কে? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হুক কথা কইলে পুলিশে ধরবে।) তাই গুজরাতি মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপচে পড়ল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন

“তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার

নামাতে পারি যদি মনোভার” শুনে।

অল্পজ্ঞ আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই ‘ত’ এবং ‘ট’-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর খাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণ স্বলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রজ উপত্যকার আসাম-বাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দু’টি বেরুতো :

“টাহাটে এ জগটে ক্ষতি কার

নামাটে পারি যদি মনোভার।”

আমরা আর কি করে গুঁকে বোঝাই যে ‘ত’ ‘দ’-এর অনুপ্রাণ ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুকে বিশীদাকে ‘বেটা ভূত’ বলেছিলেন তার চেয়েও আরো মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন, এবং অক্সেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরো কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে ‘তুমি’ বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, ‘চমৎকার। শাস্ত্রী মশায়। সটিয়, আপনি একটি আস্টো ঘুষু।’

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির। একটু চূপ করে থাকার পর গুরু, গুরু—

যতপি ছাত্র, তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, ‘মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে?’

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিদাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আমেজ করতে পেরে বললেন, ‘ভিন্ডা (দিনদা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উনি বলেছেন ওটার অর্ট “অসাধারণ বৃদ্‌ভিমান”। টবে কি ওটা ভুল?’

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, ‘আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।’

দিল্লীবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার জন্ত বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভা লেভি স্ত্রীক শাস্ত্রনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁরা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্স না গিয়ে মাহুশ কি করে এরকম বিস্ময় ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রল্লার ‘যীশুজীবনী’ পড়ান। এ বই আমার মহত্বপূর্ণ করেচে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য বিজ্ঞেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন; বলতেন, ‘এরা সব তো জানে কোন্‌ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংব একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কান্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কান্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।’ মরিস সাহেব তাঁকে তখন অমুনয়-বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু’ মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অগ্র ভব্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়তে খুস্টের কথা; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন ‘লেট দি চিলড্রেন কাম্‌ আনটু মী’।

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্ত প্রস্তুত হতে রাজী হলেন।

প্যারিসের গ্রাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা।

আমাকে আপনি বলে সঙ্ঘোদন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, ‘তুমি এখন বড় হয়েছ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক-বয়েসি।’ আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, ‘তোমাকে ভালো করে এণ্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।’ আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই, মরিস সাহেব অগ্রাগ্র দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা ‘ধার’ দিয়ে দিয়ে মাসের বেশীর ভাগ দেড়লে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিস্ত্রশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শাস্ত সংযত প্রশ্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং, দিল্লীবাবু—এমন কি জগদানন্দবাবুর মত রাণভারী লোক—অজিন ঠাকুর এঁরা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুদ্ধান্ত বিষম্বদন মরিস সাহেব। আমি হোম্‌টাস্ক না করলে তাঁর মুখে যে বিষম্বতা আসতো তিনি যেন তারই গোটাদেশক ‘হেলপিং’ নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিল্লীবাবু কাচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অহরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পাট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মুহূহান্ত সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পাটেরই বিলি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, ‘ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠার পাট দিচ্ছি।’ হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠার পাট আদৌ ছিল না, ঐটে মরিস সাহেবের জগ্ন ‘ইস্পিসিলি’ তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পাটগুলোর বটন ব্যবস্থা আছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠার অভিনয় করবেন ‘নটরাজ’ মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরাচি (ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সৃষ্টিকরণও বটেন)—মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুধুন, পাটটি কি?

রাজা : ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী : আদেশ করুন, মহারাজ!

রাজা : এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও ।

শ্রেষ্ঠী : যে আদেশ ।

বাস্ ! ঐটুকু ! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে ; গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সহজে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে । কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জানু ওরুর্—ড্যাম্‌গ্যাড—হোক না পাট ছোট, তাতেই বা কি ? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, “The rose which is single need not envy the thorns which are many ?”

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল । গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুভে হল কষ্টকশ্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুলশযায় নয়—যাঁও থর্ন মাত্র একটি । গুরুদেব যতই বলেন ‘আদেশ করুন, মহারাজ’ মরিস বলেন, ‘আদেশ করুন, মহারাজ ।’ মহা মুশকিল । মরিস আপন মরাচ-তাপে ঘর্মাক্তবদন । শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিঘুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের ‘ত’ ‘ট’র জট ছাড়িয়ে দেন । আকটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন ; বিপদ, একস্কিউজ মি—বিপদটা তো টাঁরই টৈরি ।

মরিস সাহেব ছম্মের মত হয়ে গেলেন । সেই প্রফেট জরথুষ্ট্রের আমল থেকে কোন্ পার্সী-সন্তান এই ‘ত’ ‘ট’য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড়িসার মরিস বিদেশ-বিভূঁইয়ে একা একা এই ‘ত’য়ের তাবৎ ‘দ’য়ের দানব—আই মীন ডানব, টাবড ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে ?

মরিস ছম্মের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে । আমি বললুম, ‘নমস্কার, স্তার ।’ সম্মিতে এসে বললেন, ‘আ ! সায়েড (সৈয়দ) —’ ও হরি ! এখনো ‘সায়ৈড’ ! তবে ওটা আদেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত—‘শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না “আদেশ করুন, মহারাজ” ।’ আমি সমস্ত গিঙে চূপ করে রইলুম । বার দশেক আদেশ আদেশ করে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন ।

একটা ডরমিটরি-বয়ের কোণ ঘূবতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন ‘আদেশ আডে—’ রেললাইনের কাছে নির্জনে ‘আদেশ—’ দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাধা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে । চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোবে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ

ছায়ামূর্তি? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন, গুরু তো লাখে লাখে, উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এতক শিক্ষা-বিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেনে করতে অনুরোধ করেন তাঁর আডেশ আডেশামুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিগুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানানেন ‘আদেশ’র বদলে অল্প কোনো শব্দ দিতে, যেটাতে “ত” “দ” নেই। গুরুদেব বললেন, ‘না; মরিসকে “ত” “দ” শিখতেই হবে।’

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সন্ধ্যার সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল ‘আদেশ’ অত্যন্ত ‘দ’ সহ। আমি ‘ইয়াজ্ঞা’ বলে লক্ষ্য দিলুম। কেউ ‘সাদু সাদু’, কেউ বা ‘কনগ্রাচুলেশনস’ বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আডেশ-এ ল্যাপস করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে ‘দ’ ক্ষণে ‘ড’। কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সমুখে আশার আলো।

এর পর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন টাচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিকলক শিশিরবিন্দুর গ্রায় ‘দ’ বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুষ্ট্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ!

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবার ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে ‘দ’ উচ্চারণ করেন।

মরিস সাহেব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সব-কিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের লেটার-বক্স প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুটাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে বলেছিলেন, ‘তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠ। তোমরা যা পরবে তাই হবে শ্রেষ্ঠের বেশ।’

নাট্যালা গম গম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এখন দেখাচ্ছে রাজ-পুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেজায়ফালন! আশ্রমে বেতের বেসাতি বিলকুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যেন হুতোপবীত-দ্বিজ লুপ্তি যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রক্তমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

মরিস সাহেব—হে ইম্র, তোমার বস্ত্র কেন তৎপূর্বই অবতীর্ণ হল না ?

উৎকর্ষা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, ‘আ ডে শ।’

অট্টহাস্তে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগপাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্ত শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জ্ঞাত অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।^১

‘আধুনিক’ কবিতা

‘স্থলীল পাঠক—’

ছেলেবেলায় এ ধরনের সম্বোধন পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হত। মনে হত, কত মহান লেখক এই কালীপ্রসন্ন সিং, যিনি কিনা মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ অম্লবাদ করেছেন, তিনি আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলেছেন! এটা যে নিছক সাহিত্যিক টং, বলার একটা আড়, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। বিশেষ করে যখন আমার ধারণা হল—সেটা হয়তো তুল—যে দরদ-ভরা কথা কয়ে যখন তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান, তখনই ‘পাঠক’ বলে সম্বোধন করেন। এবং আরো বেশী করে ‘সহৃদয় পাঠক’ বলে সম্বোধন করতেন সিং মশাইয়ের মত দরদী লেখককুল যখন তাঁরা এমন কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে যেতেন, যেটার মোক্ষম মার বেশীর ভাগ পাঠকই খেয়েছে। এ অধম প্রাচীনপন্থী। সে এখনো পাঁচকড়ি দে পেলে গোপনে পড়ে। এবং বটতলাতে কিছুক্ষণ হল একথানা ‘সচিত্র প্রেমপত্র’ কিনে সে বড় ভরসা পেয়েছে। যোঁবনে ভাষার উপর দখল ছিল না—এখনই বা হল কই?—মরমিয়া প্রেমপত্র লিখতে পারতো না বলে রায়ের ভাষায়, “উনিশটি বার প্রেমেতে সে ঘায়েল করে থামলো শেষে।” আর ভয় নেই! এখন এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে নকল করে ফিলিমস্টার থেকে মেয়ে-পুলিস সকলেরই ‘সজ্জল নয়নে হৃদয়-হুয়ারে ঘা’ দেওয়া যাবে।

১ মরিস সর্বদাই ঈর্ষং বিষন্ন বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে ‘মেলানকলিয়া’। প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

বইখানার প্রথম চার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ এর থেকে কতখানি পিছিয়ে আছেন :—

‘প্রিয়তমা চারুশীলা পিতৃগৃহে গিয়ে

আছ তো স্থখেতে তুমি গোষ্ঠিজন নিয়ে ?

তুমি মোর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ধন ।

তুমি মোর হৃদয়ের শান্তিনিকেতন ।’

জানি, জানি - বাধা দেবেন না, জানি আপনারা বলবেন, এই মডার্ন যুগে এসব পণ্য অচল । কিন্তু আপনারা কি এ তত্ত্বটাও জানেন না যে, ক্যাশান হর-হামেশা বদলায় এবং আকছারই প্রাচীন যুগে ফিরে যায় ? পিকাসসো ফিরে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর দেয়াল-চবিত্তে, অবনটাকুর মোগলযুগে, নন্দলাল অজন্তায়, যামিনী রায় কালীঘাটের পটে । কাব্যে দেখুন, ছুবোধ্য মালার্মে র‍্যাঁবো যখন অল্পবাদের মারফৎ ইংলণ্ডে জয় করে বসে আছেন, তখন হাউসম্যান লিখলেন সরল প্রাঞ্জল ‘অপশার ল্যাড’ । বলা হয়, ইংলণ্ডে কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর একখানা বইয়ের এত বিক্রির অল্প উদাহরণ নেই । কোনো ভয় নেই । বাঙলা দেশের মডার্ন কবিতাও একদিন ‘পাখি সব করে রবে’র অনবদ্য শাস্ত্রত ভঙ্গিতে লেখা হবে ।

আমি মডার্ন কবিতা পছন্দ করি নে, তাই বলে মডার্ন কবিতার কোনো ‘রোজোঁ দেত্রু’ রাজন ফর এগজিস্টেন্স অথাৎ পুচ্ছটি তাব উচ্ছে তুলে নাচাবার ‘রোজোঁ’ রাজন, গায়াহক্ক নেই এ কথা কে বলবে ।

প্রথমেই নিন মিলের অত্যাচার । এবং এই মিলটা আমাদের খাটি দিশী জিনিস নয় । সংস্কৃতের উত্তম উত্তম মহাকাব্যে, কাব্যে মিল নেই । যদিষ্ঠাৎ থাকে, তবে সেটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রায় কবির অনিচ্ছায় ঘটেছে । সংস্কৃতে প্রথমে মিল পাই—আমার জানা মতে—মোহমুদগবে । এবং তিনিও সেটা বহিরাগত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন, এমত সন্দেহ আছে । সংস্কৃতে সহোদরা ভাষা গ্রীক লাতিনে কি মিল আছে ? এ দেশেই দেখুন, উর্দু’তার জননী সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে, জোকা-জোকা পরে প্রায় মুসলমান হয়েছ (প্রায় বললুম কারণ এখনো বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু’ ; উর্দু’কবি-সম্মেলনে তাঁরা সম্মানিত সক্রিয় অংশীদার । কিঞ্চ, পণ্ডিত নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্ত ইত্যাদির মাতৃভাষা ছিল উর্দু’), তথাপি আজও উর্দুতে বিনা মিলে দোহা রচনা করা হয়, সংস্কৃত স্তোত্রবিত্তের অনুকরণে । ‘মিল’ শব্দটা কি শুদ্ধ সংস্কৃত ? সংস্কৃতে একে বলে ‘অন্ত্যাহুপ্রাস’—স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপদে পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে ম্যানু-

কেকচাঁদ এরজাংস্ মাল। অতএব যদি মর্ডার্ন কবিতা সে-বস্ত্র এড়িয়ে চলেন তবে পাঠক তুমি গোস্সা করো ক্যান্? ঠরা তো মাইকেলেরই মত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করছেন। এই যাবনিক স্বেচ্ছাচারের যুগে সেটি কি চাঙ্কিখানি কথা!

তারপর ছন্দ? ছন্দহীন কবিতা হয় না, আপনাকে বলেছেন কোন্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোমাই? উপনিষদ পড়েছেন? তার ছন্দটি কান পেতে শুনেছেন? ছন্দে বাঁধা কবিতা আসতে পারে তার কাছে? বস্তুত বেদমন্ত্রে ছন্দ মেনে মেনে হায়রান হয়ে ঋষিকবি উপনিষদে পৌঁছে কি যুগপৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক মোক্ষ লাভ করলেন না? এ অধম অশিক্ষিত—তথাপি গুণীজনের কাছে শোনা উপনিষদের একটি সামান্য সাদামাটা প্রশ্ন নিন :—

‘স্বয়ং অস্ত্র গেছে, চক্রও অস্ত্র গেছে, আগ্ন নির্বাপিত (অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে যে একে অগ্নিকে দেখবো তার উপায় নেই), কথাও বন্ধ (অর্থাৎ চিৎকার বন্ধে ডাকবারও উপায় নেই)। তখন কোন্ জ্যোতি নিয়ে মানুষ (বেঁচে) থাকে, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য?’

এবার সংস্কৃতটা শুনুন :—

‘অন্তমিতি আদিতো, যাজ্ঞবল্ক্য, চক্রমন্ত্রমিতে, শাস্তেঃগৌ, শাস্তায়ং বাচি, কিংজ্যোতিরৈবায়ং পুরুষঃ?’

প্রচলিত মন্দাক্রান্ত বা শাদুলবিজ্রীড়িত ছন্দে এই অতুলনীয় সন্দীপিতমস্তিত-ম্পন্দিত ছত্র বেঁধে দিলে কি প্রভু যীশুর ভাষায় লিলিফুলের উপর তুলি নিয়ে বঙ বোলানো হত না?

এতেও যদি আপনাদের মন না ভরে তবে পড়ুন ইংরিজী অনুবাদে বাইবেল—রাজা দায়ূদের গান, সুলেমান বাদশার গীতি (সং অব্ সংজ, সং অব্ সলোমন)। সে তো গন্ধে, এবং স্বয়ং বার্নার্ড শ বলেছেন, ঐ সলোমনের গীতিটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

আবার আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে তো কথাই নেই। আপনি জানেন প্রাক-পয়গম্বর যুগেও আরবদের ছিল বহু বিচিত্র ছন্দে, মিলেব কঠোরতম আইনে বাঁধা অত্যাংকষ্ট কাব্যাস্তি। গদ্য ছিল না, কিংবা প্রায় না থাকারই মত। তথা প আল্লা-তালা পয়গম্বরকে যে কুরানের বাণী পাঠালেন সে তো গন্ধে। অথচ আরবী-ভাষা নিয়ে ধারা সামান্যতম চর্চা করেছেন তাঁরাই শপথ করে বলবেন, এঁর ছন্দোময় গদ্য যে কোনো বাঁধা কাব্যকে হার মানায়। পয়গম্বরকে যখনই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ কোনো প্রকারের মিরাকুল (অলৌকিক কীর্তি) দেখাতে আহ্বান

করতো তখনই তিনি সবিনয় বলতেন, ‘আমি নিরক্ষর আরব। তৎসঙ্গেও আল্লা-
তাল্লা আমার কণ্ঠ দিয়ে যে কুরান পাঠালেন তার কাছে কি আসতে পারে
তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কাব্য? এইটেই হল সবচেয়ে বড় মিরাক্বল।’

অতএব মর্ডান কবিতা যদি ছন্দ অস্বীকার করেন তবে আপনি চটেন ক্যান?

তৎসঙ্গেও মর্ডান কবিতার দুশ্মনরা হয়তো বলবেন, তারা হৃদয় হৃদয়
জিনিসের সঙ্গে বিংকুটে সব জিনিসের তুলনা দেয়—যেমন তালগাছের ডগায় চাঁদ
দেখে লিখলে, এ যেন আকাশের হুচিকণ স্মরণ তাল। কিংবা প্রিয়ার বিহুনি
দেখে কবির মনে এল পানউলীর দোকানে ঝোলানো অগ্নিমুখ নারকোলের
পাকানো দড়ি—যার ডগায় লাগিয়ে আমি আকছারই বিড়ি ধরাই। সেই দড়ি
হাওয়ায় তুলে কবির কুর্ভা পুড়িয়ে দিয়ে পিঠে ছাঁকা দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রিয়ার
বিহুনি দেখা মাত্রই তাঁর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে।

এটা পড়ে তাজ্জব মানছেন কেন?

রাজা শূদ্রকের ‘মৃৎ-শকটিকা’ পড়েন নি? জর্মনরা সংস্কৃতের সমজ্ঞার এক্ষেপ
গ্যোটে হাইনে সংস্কৃত না জেনেও ভারতীয় নাট্যের স্বরণে উদ্বাহ হয়ে নৃত্য
করতেন। শূদ্রকের এই নাটকটি জর্মন ভাষাতে ক’বার যে ভিন্ন ভিন্ন রসিকজন
দ্বারা অনূদিত হয়েছে বলা কঠিন, ক’বার যে জর্মনিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা বলা
তার চেয়েও কঠিন। সেই নাট্যে আছে, ক্ষুধিত শূদ্রদ্বার বাড়ি ফেরার সময় গভীর
হুশিষ্টায় মগ্ন—বাড়িতে তো চালডাল কিছুই নেই, গৃহিণী কি আদৌ রন্ধন করতে
পেরেছেন? বাড়ি ঢুকই শূদ্রদ্বার সানন্দে সবিস্ময়ে দেখেন, সাদা মাটির উপর
লম্বা লম্বা কালো কালো আঁজি আঁজি দাগ—কালিমাখা হাঁড়ি মাটিতে ঘষে ঘষে
গৃহিণী সাক্ষরো করেছেন। অতএব ধূম্র দেখলে যে রকম বহির উপস্থিতি স্বীকার
করতেই হয়, হাঁড়ি পার্কার করা হয়ে থাকলে রান্নাও যে হয়েছে সে বিষয়ে কি
সন্দেহ? শূদ্রদ্বার তখন সোল্লাসে উপমা দিয়ে বললেন, ওহো! সাদা মাটির
উপর এই কালো কালো আঁজি যেন তুষারধবলা গৌরীর ললাটে কৃষ্ণাঞ্জন-তিলক।

কী মারাত্মক গতময় হাঁড়িকুড়ি, মাটিতে সেগুলো ঘষার ফলে নো রা কালো
আঁজির সঙ্গে শিবানী গৌরীর অসিত তিলকের তুলনা। এ যে রীতিমত হেরেসি,
এ হেন তুলনা চার্বাকের বেদ নিন্দার চেয়েও ধর্ম্ম কটু-ভাষণ।

এর পরও আপনি আপত্তি করে বলবেন মর্ডান কবিতা ন দেবায় ন ধর্ম্মায়?

বুদ্ধিমান তথা না-ছোড়-বান্দা পাঠক, আমি বিলক্ষণ জানি, আপনার প্রধান
আপত্তি কোন্‌খানে—ছোটখাটোগুলো উপস্থিত না হয় বাদই দিলুম। আপনি
বলবেন ওদের কবিতা পড়ে মাথাযুত্ব কিছুই বুঝতে পারি নে। আশো পারি নে

—খান্না না মেরে হক্ কথাই কই। সে তো আপনার দোষ, আমার দোষ ? আপনি আমি পরসাত্তালার ছেলে হয়ে জন্মালে সত্যকার অপ্‌টুডেট্, chic, dernier cri, লেটেস্ট মডেলের হাইয়ার এডুকেশন পেতুম ; আপনি, আমি আমরা নিদেন যদি অধ্যাপক হতুম, তারো নিদেন যদি আমরা তাঁদের শিষ্য হবার সুযোগ পেতুম, তবে তো আজ এ প্রশ্ন তুলতুম না। কিন্তু এহ বাহ।

‘বুঝতে পারি নে’ কথাটার অর্থ কি ? আপনি ভৈরবী বা পূরবী শুনে যদি রস না পান তবে কি গায়ককে এ প্রশ্ন শুধান, ‘ভৈরবীর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দাও ?’ আরো সহজ দৃষ্টান্ত দি। পদ্মাবক্ষে আপনি সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হলেন, মাঝি হলো না। সে যদি আপনার ভয় ভাব দেখে শুধায়, ‘কত্তা’, সূর্যযি তো উঠলেন, কিন্তু আপনি এমন বে-এক্সেয়ার হলেন কেন ? এ সূর্যযি ওঠাতে কি আছে আমাকে বুঝিয়ে দেন’, তাহলে আপনি কি বোঝাবেন ? তাজমহল দেখে হাকসলি মুগ্ধ হন নি, কিন্তু তিনি তো গাইডকে এ প্রশ্ন শুধোন নি, ‘তাজমহলের অর্থ আমায় বুঝিয়ে বলো’। কিংবা ভরতনাট্যম দেখে আপনি যদি ‘অর্থ’ বুঝতে চান, তবে হয়তো অভিনয়াংশের অর্থ আপনাকে বোঝানো যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরসের (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতের) ‘অর্থ’-ই বা কি, আর বোঝাবেই বা কে ? চিত্রে একদা লোকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে কিছুটা অর্থ পেত কিন্তু এখন কুাবিজম, দাদাইজমে কেউ সাদৃশ্য খোঁজে না, অর্থও খোঁজে না। কাঠের একটা গুঁড়ি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্কর হুমাস ধরে প্রাণপণ খাটলেন ; প্রদর্শনীর মধ্যাক্ষেপে সেটি স্থাপিত করে তলায় নাম লিখলেন, কাঠের একটা গুঁড়ি। কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি ; ভৈরবী, ভৈরবী। তার আবার অর্থ কি ?

মনে হচ্ছে আপনি তত্ত্বের কিছুই জানেন না। তত্ত্বের নিগূঢ়তম মস্তকের অর্থ শোধন না গুরুকে ? যদি তিনি প্রকৃত গুরু হন তবে আপনার হাড় ক’খানা আর আন্ত থাকবে না। আর অত গভীরে যাবার কি প্রয়োজন ? এই যে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী উপাসনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, তার ক’টা ভাষা লোকে বোঝে ? আপনি উত্তরে হয়তো বলবেন, আমরা রস নিয়ে বিচার করছি। তা হলে স্মরণে আনুন, সেই বুড়ি—দাড়িওয়ালা কথকঠাকুরের কথকতা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল—কথকতার এক বর্ণ না বুঝেও। তার স্মরণে কি এসেছিল সেটা অবাস্তব। তার কান্নাটা সত্য। তার রসবোধটা সত্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তলিয়ে দেখুন, অর্থ বোঝা মাত্রই রসোৎপন্ন হয় না—অর্থ পেরিয়ে যে ব্যঞ্জন যে ধ্বনি যে অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়, রস সেই গভীর গুহায়। উপনিষদে আছে সত্য (এবং সত্যই অহুভূতির ক্ষেত্রে রস—

কারণ সৎ আনন্দ এবং চিং নিয়ে সচ্চিদানন্দ) আছেন সোনার পাত্রে লুকানো । সাধারণ জন সোনার পাত্র দেখেই মুগ্ধ, ভিতরে তাকিয়ে দেখে না । কাব্যে, সঙ্গীতে সর্বত্রই অর্থ জিনিসটা স্ববর্ণপাত্র, তাই দেখে লোক মুগ্ধ । রস কিন্তু ভিতরে । তার সঙ্গে পাত্রের কি সম্পর্ক ? পাত্রস্থিত অমৃতরসের সঙ্গে যে ধাতু (অর্থ) দিয়ে পাত্র নির্মিত হয়েছে তার কি সম্পর্ক ? কিছুই না । তাই, এ সব বুঝেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,

‘জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ !’

মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিজা শ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি রকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না । আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জ্ঞাত এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাশ্বরসাদ আছে । এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশী, এবং তুর্কীতে খুবই কম । তুর্কীরা নাকি বড় বেশী সিরিয়াস । অতএব গোড়া । অতএব রসকযহীন ।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে । কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃষ্টান—সকলেই জানতে চায় মহা-প্রলয় (আরবীতে কিয়ামৎ) কবে আসবে ? সর্ব ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই । একদা নাকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দান-ধর্য্যরাত্রে উড়িয়ে দেয় ।

১০০০ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পন্থিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জ্ঞাত সাবধান হওয়া ভালো । এখন ১৯৬৬ । যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয়, তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটি ভেবেচিন্তে দান-ধর্য্যরাত্ন করেন ।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে ।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ক্রিশ্চিয়ান (বাঙলায় কেরেস্টা) লেখা হয় ;
 'অর্থ এঙ্গেল, দেবদূত) জিব্রাইলকে (ইংরাজিতে গেব্রিয়েল) ডেকে আদেশ
 দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে । যে কোনো একজন মানুষকে
 শুধোও, জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন ? জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে
 একজন মর্ত্যবাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন । লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললো
 'এরকম বেকায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কি ? আমার এসব জিনিসে কোনো
 কৌতূহল নেই, তবে যখন নিভাস্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলছি ।' লোকটি
 দুই লম্বা চিন্তা করে বলল, 'হঁ, ঠিক বলতে পারবো না—তবে এ বিষয়ে কোনো
 সন্দেহ নেই, সে (আরবীতে ইংরাজীর মত he-র সম্মানার্থে) কোনো 'তিনি' শব্দ
 নেই এখন পৃথিবীতে । বেহেশতে নয় ।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে
 উত্তরটা জানালে তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে ।' তার পর কেটে যাবে আরো
 বহু সহস্র বৎসর । তার পর আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে
 শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন । এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো
 হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশী । বললে, 'কি আশ্চর্য ! এখন মানুষ এরকম সম্পূর্ণ
 বাজে বেকার প্রশ্ন করে । হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়
 না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই । আচ্ছা...'
 এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে...',
 কের দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই
 কোথাও—আমি চললুম ।' জিব্রাইল বেহেশতে ফিরে এসে আল্লাকে সব কিছু
 বয়ান করলেন । আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে ।' তার পর কেটে যাবে আরো
 কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর । আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে
 ধরাভূমিতে আসবেন । এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমত চটে গেল—
 'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন...ইত্যাদি ।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কান্ডুতি-মিনতি
 করাতে সে নরম হয়ে বললো, 'তাহলে দেখি ! হঁঃ, স্বর্গ নয়, পৃথিবীতে ।'
 তারপর আরেক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও ।' তারপর
 আরো দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য, যে এরকম মস্তুরা
 করো । তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছো কেন ?' এবারে জিব্রাইল সব
 খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহাপ্রলয়ের শিঙা বাজাতে ।

কথিকাটির তাৎপৰ্য কি ?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে করে এমন জায়গায় গিয়ে
 পৌঁছাবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না ।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিত্যাচচার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈবয়িক, প্রাকটিক্যাল জিনিস নিয়ে।^১ ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে স্বর্গে যাবে না নরকে জলে পুড়ে থাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কোতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অগ্রসন্ধান করলো না। এমন কি সৃষ্টিকর্তা আল্লা—দীন দুনিয়ার মালিক—যাকে পাবার জন্য কোটি কোটি বৎসর ধরে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব করনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়াল-খুশী মর্মে মাস্তিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। তারই ফলে হয়তো বেকরবে শত শত আইয়মান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

* * *

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যত্বপি সেই চক্র দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যমন্দের অল-হুক্ অল-জমীল) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনে বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ, মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌছে যেতে পারে।

পরগম্বর বলেছেন, “আল্লাহর থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।” সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব প্রত্যেক সত্য-জ্ঞানার্থীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীতিকলাপ কি প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আগ্রহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুধুমাত্র আচার-

১ ইমাম গজ্জালী মুসলিম জগতের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সুফী (রহস্যবাদী ভক্ত) ছিলেন। আরব্যোপন্যাস যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্জালী তার রেক্টর (শেখ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি, তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের (মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে) লোক শুধু প্রাকটিক্যাল বিজ্ঞা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

অল্পাধীন সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয় ; জ্ঞানার্হসন্ধান নিত্য-প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে :—

একদা শয়তানের রাজ্য, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সংপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপটক (জাহানদাদা) রূপে অপরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মায়া কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অল্পাধীন এসে ধাড়ি বললে, ‘কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার। আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। হাটির আদিম কাল থেকে ওরাই আমাদের আদিম দুশমন।’

শাগরেদ ক্ষুদ্রে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, ‘সে কি কথা। আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে ; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই ? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেনই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মুখ নিকমার বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাঙা বোলায়। নিজের মেস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ ?’

খেড়ে হেসে বললে, ‘খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কি হয় সেটা বোঝা যাবে পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।’

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিক্যাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হুগার এলিম হাতেনাতে বাংলাতে হয়। আমাদের ইন্সট্রুন্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যে রকম সেটাকে ‘শয়তানী’ নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে ‘সাধুমী’ বলে গুরু কান মলে দেয় শিষ্যের।’

খেড়ে আদেশ দিলেন, ‘ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমন্স্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।’

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুনলো। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিতপাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মত চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম। না জানি, আজ কপালে কি আছে।

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দকে দকে স্মরণে আনলো। তার

পরে বিএলজব্ব, ইব্লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্শয়াতীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! ধেড়ে, আগু, সব শয়তানকে লড়তে হয় কিরিশ্চা অর্থাৎ দেবদূতদের সঙ্গে—তাই ঠুঁদের চালচলন বেশ ভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ যুগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিছু জার্মানদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্তের উদ্য। সেই উদ্য পরে তারা ‘আক্রমণ’ করে একটি জার্মান বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জার্মান সীমান্তে। সেই ‘আক্রমণ’র ও ‘আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্ত’ব ছবি হিটলার বিশ্বময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে, পোলরাই প্রথম জার্মানি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইসমান, হোস এঁ বা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।^২ ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কি ‘কৈশল’ দেখাবেন।

বাচ্চা শয়তান ধারণ করলো দেবদূত—কিরিশ্চার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেৎছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দান্সৌরভ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপরাধিনিদ্দিত সঙ্গীত-নিরঞ্—সঙ্গে এসেছে বসন্তপবনের মূহ হিরোল মলয়ানিল বিলোলানন্দোল্লাস!

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হল সাধুর। বললে, ‘তোমার তপস্চর্য্য পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তাল! আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্ত। তুমি আমার স্বন্ধে আরোহণ করো।’

বলা মাত্রই সে ব্রাকের বেশ ধারণ করলো।

ব্রাক অনেকটা পক্ষীরাজের মত। সর্বাঙ্গ অতুল্যম অশ্বখায় এবং উভয় স্বন্ধে দুটি পক্ষ।^৩

২ অনেকে মনে করেন এ-অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেবড়ক চড় কনায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না। না হয় তিনি নিলফকাম হতেন। তাতেই বা কি! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিফল হওয়া অপকর্মে (ক্লশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ!

৩ মুসলমানী ও পার্সী রেন্তোরাঁতে নাতুহাসিক হিন্দু পাঠকও এই ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই ব্রাকে চড়েই সৃষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি; তাঁর রূহ, অর্থাৎ আত্মা

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরিটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে চলতে ভয়ে বেপথু-কম্পমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না ধরে ফেলেন !

কিন্তু খেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচারনিষ্ঠ জন বড় দস্তী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বস্বত্ব আমি পাবো না কেন ?

এই দস্তই তাঁদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।^৪

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল ব্রাকের স্বক্ষে।

তারপর কি হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাঁকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাঁকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহবরে।

স্বশীল পার্থক্য। তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সঙ্কল্পের এই অসঙ্গতি হল কেন ? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধাই।

তিনি শাস্তকণ্ঠে বললেন, ‘পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিন্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।’

এবারে খেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে, ‘ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান।’

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটি, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তাঁর মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের নেশায় তাঁর কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ ?!

গিয়োছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

৪ কবি রবীন্দ্রনাথ রুচ্ছসাধনে দস্ত দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শব্দরকে উদ্দেশ করে বলছেন—

‘আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।’

সর্বত্যাগী শব্দর হিন্দুর উপাত্ত। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের অন্ধাঙ্কুরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দস্ত, সেই ত্যাগের luxury, যেমন মূর্থ চেলারা করেন, কবি সেইটে-এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

পূর্ববৎ দেবদূত-বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা (Moses), ঈসা (যীশু), হজরৎ পয়গম্বর—বাস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ ‘প্যাকম্বর’ নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্ত ডেকে পাঠাবেন।

‘বটে রে, ব্যাটা!’ মনে মনে বললেন পণ্ডিত। ‘মস্তুর করার জায়গা পাও না। আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।’

স্বহাস্ত-আস্ত্রে মৌলবী বললেন, ‘কী আনন্দ, কী আনন্দ! স্বর্গে যাবার জন্ত তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এ যুগে বড় ভেজাল চলছে। কি করে জানবো, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি দেবদূতেরা মুআজ্জিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।’

বাচ্চা শয়তান বলল, ‘আপনি কি মিরাকুল্ দেখতে চান, বলুন।’ তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেলা ফতেহ্ করে ফেলেছে।

পণ্ডিত বললেন, ‘শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?’

‘নিশ্চয়!’

‘তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার ওই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?’

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অল্প কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানান নি বলে। তাকে ভো অনায়াসে তিনি আরবীস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের স্বর্ষ বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তমুহুর্ভেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না ব্যাটা বদমাশ। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাকুল্, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল ; টায়ে টায়ে বদনায় সেটে যায়।

এবং চিৎকার :—

‘গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উলুনটা। ব্যাটাকে আজ সেন্দ করে হালুয়া বানাবো। ব্যাটা আমার সঙ্গে মজরা করতে এসেছে। শা—, হা— জা—, বা—’^৫

হেঁট হেঁট রৈরৈ কাণ্ড। বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে বেপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়লো।

বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জ্ঞান সন্ধি-আপোস করতে চায়।

সন্ধির শর্ত হল, শয়তান এবং তন্তু গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

*

*

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-ফাদার-দস্তুর সুকুমার প্রায়াকটিকাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

*

*

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমরা তাই। কী দরকার সেই মহা-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২।১০।৬৫

৫ পণ্ডিত মাত্রই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অন্ত্রীল গালাগাল দেন। ‘তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন’ আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষার ‘বন্ধ্যাগমন’ করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা।

আলবের্ট শ্বোয়াইৎসার

“আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিনীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
হৃন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব,—উদয়শৈলের তলে আজি
নবস্থ্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নবছন্দে, নূতন আনন্দগানে ?”

এই কবিতাটি রচিত হ'বাব পব প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমার চেনা-অচেনা অনেক প্রখ্যাত পুণ্যলোক জন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নটি তাদের উদ্দেশে শুধাই নি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর এ প্রশ্ন না শুধিয়ে থাকা গেল না।

কারণ এই মহাপুরুষ জীবনে সত্য হৃন্দর শিবের যে সাধনা করেছিলেন সেটা সর্বযুগেই বিরল। এবং তাব চেয়েও আশ্চর্য, তিনি একই পথে আজীবন সাধনা করেন নি।

আলসেসের কাইজারবের্ক অঞ্চলে ১৮ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম।^১ সে অঞ্চল তখন জার্মান ছিল বলে তিনি জার্মান। ধর্মতত্ত্ব প্রটেস্ট্যান্ট বা এভানজেলিক) পড়ে তিনি চব্বিশ বছর সহপাদরূপে জঁস্বর-মাহুয়-গিজার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বছর তিন যেতে না যেতেই খৃষ্টবর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনা গিজার সেবায় নিযুক্ত থেকে হয় না। তাই তিনি বিখ্যাত স্ট্রাসবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে কাজে যোগ দেন। এই অঙ্গ বয়সেই তিনি যে গবেষণা করেন সেটা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য সঞ্চয় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ আদৌ নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি প্রকারে খৃষ্টের বাণী ও তৎপরবর্তী খৃষ্টবর্মের প্রথম উৎপত্তিযুগের এমন একটি অর্থপূর্ণ সর্বাঙ্গহৃন্দর ছবি পাওয়া যায় যেটা আজও এবং আবার নূতন করে খৃষ্টসমাজে নূতন প্রাণ, নূতন ভক্তি, চরিত্রসংগঠন ও সমাজবাস করা'ব জন্য নূতন নীতি নির্মাণ করে দেবে।

এদেশে রামমোহন তাই করেছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের স্বর্ণযুগ পুনরায়

আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।

সউদী আরবের রাজা ইব্ন্ সউদ যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহ-হাবও তাই করেছিলেন।

খোয়াইংসার এই সব তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানধারণায় নিযুক্তকালীন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সঙ্গীতশ্রষ্টা যোহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাথ্-এর উপর। এখানেও সেই নবাবিষ্কারের কথা। এটা সত্য যে, বহু বৎসর দু-চারটি কেন্দ্র ভিন্ন অল্প সর্বত্র বাথ্, অনাদরে থাকার পর সঙ্গীতশ্রষ্টা মেডেলজোন্ পুনরায় রসিকজনের দৃষ্টি বাথ্-এর দিকে আকৃষ্ট করেন। এর পরেই বাথ্-এর অল্পতম প্রধান ভাষ্যকার খোয়াইংসার। গির্জার অর্গেনসঙ্গীত তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে পুনরায় নবজীবন লাভ করে। (অর্গেন ও অর্গেল এদেশের সঙ্গীতকে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। এই নিয়েই কিঞ্চিং গবেষণা কিছুদিন পূর্বে এদেশে হয়। তাঁর অল্পতম প্রপ্ন তখন ছিল, অর্গেনকে কেটে হারমোনিয়ামরূপে প্রবর্তিত করে কে জনপ্রিয় হন কি করে, এর প্রতি আকাশবাণীর এত রাগ কেন, যদিও থান আবদুল করীম খানের মত মহাপুরুষ যখন এরই সঙ্গতে গেয়েছেন? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভাল হয়। আবার কৃতজ্ঞাচক্ষে শাঙ্গ'দেবের শরণ নিচ্ছি। এবং এর সঙ্গে আরেকটি নিবেদন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারচয়কামী নবীন ভারতীয় শাগরেককে একাধিক ইয়োরোপীয় বাথ্ নিয়ে আরম্ভ করতে বলেন। বাথ্-এর রস পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর। এ বিষয় নিয়েও তুলনাত্মক সঙ্গীত-মহলে আলোচনা হওয়া উচিত।) এমন কি বলা হয় খোয়াইংসার স্বহস্তে উত্তম অর্গেনও নিৰ্মাণ করতে শেখেন।

উপরের দুটি সাধনা—থুষ্টের জীবনানুসন্ধান ও বাথ্,—ভিন্ন তাঁর প্রধান অনুসন্ধান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রচালনায়, ধর্মনীতিকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করা।

*

সাধনা, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা, বাথ্-এর ভগবদসঙ্গীত এ সমস্ত নিয়ে যখন খোয়াইংসার তন্ময়, যখন তাঁর খ্যাতি জন্মনির বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছে, তখন এই মহাত্মা হঠাৎ একদিন ত্রিশ বৎসর বয়সে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। কারণটি সরল অথচ হৃদয়ে নিহিত।

করাসী-কঙ্গ অঞ্চলে যে-সব অনাচার হয়ে গিয়েছে তার খেসারতি মেরামতি করতে হবে। কঙ্গর গভীরতম জঙ্গলে যে শত শত আফ্রিকাবাসী কুষ্ঠরোগে দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে।

তার পূর্বে কিন্তু তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। ঠিক সেই জিনিসটিই সমাধান করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশনারি ডাক্তাররূপে িনি ফরাসী-কঙ্গর দুর্গম অরণ্যের লাবারেনে-অঞ্চলে গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল খুললেন। তাঁর জী দেশে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেবিকার কাজ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এই কঙ্গবাসী কুষ্ঠরোগীদের অর্থসামর্থ্য কোথায়? খোয়াইংসার আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম সহকর্মী নিয়ে চিকিৎসা করতে যান! তার জন্য অর্থ কোথায়?

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ। তাতে আছে আদর্শবাদ, নৈরাশ্র, অকস্মাৎ অবাচিত দান এবং সর্বোপরি খোয়াইংসারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস: “মাহুয়ের জীবন বিধিদত্ত রহস্যবৃত্ত—এর প্রতি প্রত্যেকটি মাহুয়ের ভক্তি বিশ্বয় ভয় থাকা উচিত।” এই অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কিছুদিন পর পর সেই দুর্গম জঙ্গল অতিক্রম করে, ইয়োরোপে এসে অত্যুৎকৃষ্ট স্বরচিত আপন অভিজ্ঞতাপূর্ণ (বিশেষ করে অঙ্ককার-কঙ্গর) পুস্তক প্রকাশ করে। প্রাচীন দিনের বাধ-এব সঙ্গীত বাজিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। প্রথম যুদ্ধের সময় তাঁর কাজে বাধা পড়ে; কারণ তিনি জাতে জর্মন হয়েও বাস করছেন ফরাসী কলনিতে—কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি এতই ভুবনবিখ্যাত যে দুই যুযুধান সৈন্যদলই তাঁর হাসপাতালকে এড়িয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে।

কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯১৫—এই দীর্ঘ বাহান্ন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা স্তো ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। যদি কখনো সে সাধনার সিকি পরিমাণ খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি তবে পুনরায় চেষ্টা নেব।

মরকুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

বিসমিল্লাতেই অতিশয় সবিনয় নিবেদন—আরজ্ করে রাধি, এ অধম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মারপ্যাচ বিলকুল বোঝে না, ভারত থেকে আরম্ভ করে ধূর্জটিপ্রসাদ ভক্

২ খোয়াইংসার ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৯৩৫ নাগে Die Weltanschauung der indischen Denker নামক একখানা বই লেখেন। এ বই সম্বন্ধেও অনেক-কিছু বলার আছে। আমি বহু বৎসর পূর্বে পড়েছি। সেখানি ফের পেলে কিছু লেখার দুরাশা আছে।

যে সব গুণীজ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত রাগরাগিণীর পুত্রকন্যা গোষ্ঠীকুটুম কে যে কোন্ মেলে পড়েন, কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব, আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি, অতি দুঃখে অতি অনিচ্ছায়। অবশ্য নিতান্ত সত্যের অপলাপ হবে—তাই এটাও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে রাখি, ক্ষুণ্ণের রেওয়াজ করতে গিয়ে আমার হাতের কড়াতে আর্টরাইটিস হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ক্ষুণ্ণ রচনাটি মজলিস-রোশন সমঝদারদের জন্ম নয়, নয়, নয়। আমি খান সাহেবকে পেয়েছিলুম মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, সম্বোধিত করেছিলেন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে—যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, আমি তাঁর জয়-জয়ন্তীতে যত না রস পাই, তার চেয়ে বেশী পাই তাঁর কাফি হোলিতে।

তাই দয়া করে মেনে নিন, এ লেখাটি সাধারণ পাঁচজনের জন্ম, যারা যুগার্ধি শ্রষ্টাদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সম্বন্ধে জানতে চায় মাত্র—কারণ তারা আমারই মত স্বরকানা, তালকানা হওয়া সত্ত্বেও গান শুনতে ভালোবাসে এবং যেহেতু সঙ্গীতের গভীরে পৌঁছতে পারে না, তাই শ্রষ্টাদের জীবনটা, তাঁদের চালচলন, ওঠনবৈঠন নিয়েই সন্তুষ্ট। অশ্বখামার সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

১৯৩৫ সালে, এই সময়ে, আজ হতে ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এ-অধ্যম বরদা শহরে চাকরি নিয়ে পৌঁছয় এবং স্টেট্‌ গেস্ট্‌ হাউসে অতিথিরূপে স্থান পায়। মহারাজা স্বর্গত সয়াঙ্গীরাওয়ার সঙ্গে দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমার মনে যে অদম্য বাসনা জাগলো সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ওস্তাদের ওস্তাদ রাজাশুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীযুত ফৈয়াজ খান বাস করেন এই বরদা শহরেই। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনতে না পেলে এই দুনিয়াতে জন্মালুমই বা কেন, আর এই বরদা শহরে এলুমই বা কেন? তার চেয়ে বাঁ-হাতের তেলোতে জল নিয়ে সেটাতে ডুবে আত্মহত্যা করলেই হয়।

খবর নিয়ে শুনতে পেলুম, তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় মহফিল-জলসা বসে, আর প্রায় প্রতি সকালে শাগরেদান সহ রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অজানা-অচেনা বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম বলবো না, কারণ ছেলেটি এখনো বড় লাজুক। তবে সে যদি চিঠি লিখে আপত্তি না জানায় তবে অল্প সুবাদে তার নাম প্রকাশ করে দেব। উপস্থিত

ধরে নিন, তার নাম পরিতোষ চৌধুরী। ওস্তাদের শিষ্য—অবশ্য ন'সিকে পাকা কথা বলতে হলে, ওস্তাদের বড় ভাইয়ের কাছেই সে রেওয়াজ করে বেশী। কারণ একাধিক সমঝদার আমাকে বলেছেন—আমার টুটি চেপে ধরবেন না।—যে যদিও দাদাটি নিজে সভাস্থলে গাইতেন না, তবু সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি জানতেন ওস্তাদ ফৈয়াজের চেয়ে বেশী। তাঁরাই বলেছেন, ওস্তাদ তাই শাগরেদদের কণ্ঠ স্বর স্থলিত গভীর মধুর করার ভার নিতেন নিজে—অহা 'কাজে'র জ্ঞান ভিড়িয়ে দিতেন দাদার কাছে, বিশেষ কবে অচলিত, প্রায়-লুপ্ত বাগবাগিনীতে যাদের দিল্লিসঙ্গী-শব্দ অত্যধিক।

চৌধুরী তার গুরু খান সাহেবকে কি বলেছিল জানি নে, এক রবিবার সকালে তিনি সশরীরে আমার ডেরায় এসে উপস্থিত। আমি হতভয়। কোথায় তাঁকে বসাবো, কী আপ্যায়ন করবো, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। মহারাজ সয়াজীরাও এলেও আমি এতখানি গর্ব এবং নিজেকে এত গুরুত্ব অহুভব করতুম না।

আর ওস্তাদ—বিশ্বাস করবেন না—বার বার শুণ্ড আমাব হাত ছুঁখানা ধরে নিজের বুক চেপে ধরেন। তিনি আমার চেয়েও বে-এক্কেয়ার! ছাব বার বার দরবারী (কানাড়া নয়!) কায়দায় আমাকে দর্শিত করেন।

বহুদিন ধরে সে বেইমান পানগুকে খুঁজেছি যে আমায় দশমনী কবে তাঁকে বলেছিল, আমি গুরুদ্বরের ছেলে এবং মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রভূমি কাইরোতে এ্যাসন্ মুসলিমশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে স্বয়ং মহারাজা আমাকে সেখান থেকে বরদা রাজ্যে নিয়ে এসেছেন।

আমি আদৌ অস্বীকার করছি নে আমি গুরুবংশের ছেলে, এ ভারতে সে রকম শতলক্ষ আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার গুরুতর আপত্তি, আমার ক'পুরুষ পূর্বে কে যে শেষ-গুরু হয়ে গেছেন, সেটাও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এবং আমার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আপত্তি: কাইরোতে আমি যেটুকু আবদা শিখেছি সেটি আমি আপনাকে ছ'মাসে শিখিয়ে দিতে পারি।

এ বিগয়টা আমি উল্লেখ করলুম কেন? এই যে গানেশ রাজার রাজা, এই ফৈয়াজ খান কী অদ্ভুত সরল ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য। পরে আমি চিন্তা করে বুঝেছি, তিনি সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন বলে সরল বিশ্বাসে ভাবতেন, সয়াজীরাও যখন আমাকে খাতির করেন তখন আমিও নিশ্চয়ই আমার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জ্ঞান তিনি যখন রাজবল্লভ হয়েছেন, তখন আমিও তাই। একই লজিক।

এর পর কতবার আমাদের দেখাশোনা হয়েছে—গানের মজলিস-মহফিলের তো কথাই নেই। আমি প্রতিবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ‘দেখুন ওস্তাদ! কত রাজা আসবে যাবে, কত শম্‌স্‌ উল্-উলিমা (মহামহোপাধ্যায়) কত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাবেন—এমন কি এই যে আমাদের বরদার দেওয়ান সাহেব, যার হাছাই-তাহাইয়ের অস্ত নেই—তিনিও চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেক দেওয়ান এসে উপস্থিত হবেন, কিন্তু আপনার মত লোক আবার কবে আসবে কে জানে? আমি বৈচে থাকলে আরো রাজা দেখব, আরো দেওয়ান দেখব, কিন্তু আপনার মত কাকে পাবো?’

আর কী স্মরণশন পুরুষ ছিলেন তিনি! চেহারা রং গোঁপ সব মিলিয়ে তিনি যেন তাঁরই গানের ‘(বন্দে) নন্দকুমারম্’—শুধু নন্দকুমার ছিলেন শ্রাম, আর ইনি গোরাক্ষাদ।

আমাকে শুধোলেন, ‘কবে এসে একটু গান—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘তওবা, তওবা! আপনি আসবেন এখানে! আমি যাবো যে কোনো সন্ধ্যায়, আপনার ইজাজৎ পেলেই।’

তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কতবার তিনি সন্ধ্যা সাতটায় এসে ভোর পাঁচটায় উঠেছেন। আমাকে কতবার তিনি বেহেশৎ দেখিয়েছেন। তাঁর ওকাতের (মৃত্যুর) পর আর কেউ দেখায় নি।

বিশ্বাস করবেন না, আমি নন্দকুমার গানটি ভালোবাসি জেনে একদিন তিনি আমাকে—আবার বলছি আমার মত অতি-সাধারণ শ্রোতাকে—পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ গানটি শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু কত লিখব! আমার স্মৃতির কত বড় অংশ জুড়ে এখনো তিনি বিরাজ করছেন।

তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করি।

একটি বরদাগত বাঙালী মহিলার অহুরোধে আমার বাড়িতে মহফিল বসেছে। ওস্তাদ সেদিন বড় মৌজে।

হুপুরে বরদায় ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল। রাতহুপুরেও অসহ্য গরম, বর্ষা নামতে তখনো হুঁমাস বাকি। ওস্তাদ অনেক-কিছু গাওয়ার পর শুধোলেন, ‘আদেশ করুন, কি গাইব।’ সেই মহিলাটি অনেক চাপাচাপির পর ক্ষীণ কণ্ঠে অহুরোধ জানালেন, ‘মেঘমল্লার।’

ওস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন।

যেন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত ঘরানা (হয়তো ভুল হল, কারণ 'রঙিলা' স্বরানা মেঘমল্লারের প্রতি কোনো বিশেষ দিল্‌চস্পী ধরেন কিনা আমার জানা নেই), সমস্ত স্বজনীশক্তি, বিবিদত্ত গুরুদত্ত সর্বকলাকৌশল সেই সঙ্গীত সম্মোহন ইন্দ্রজালে চেলে দিলেন। আমরা নির্বাক নিম্পন্দ হয়ে যেন সর্ব লোমকণ দিয়ে সে মাধুরী শোষণ করছি।

এমন সময় বাইরে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

মহাকিলে হলখুল পড়ে গেল। কে কি ভাবে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কে স্তম্ভমাত্র কুমড়ো-গড়াগড়ি দিয়েছিল, কে ওস্তাদের দিকে নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মাত্র—এ সবের বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তো শুধু তিনিই দিতে পারেন যার লেখনীতে অলৌকিক শক্তি আছে।

অন্য দিন ওস্তাদ আমাদের অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, মরহাবা যতখানি বুঁকে বুঁকে সেলাম জানিয়ে গ্রহণ করতেন, আজ তিনি সেরকম করলেন না। দু-একবার সেলাম জানিয়ে গালে হাত দিয়ে চূপ করে বসে রইলেন। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো।

অবশ্য তার পরও তিনি গেয়েছিলেন ভোর অবধি।

শেষ ভৈরবী গেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। আমি বললুম, 'ওস্তাদ, বড় ক্লাস্ত হয়ে পড়েছেন ; একটু বিশ্রাম নেবার জ্ঞা বহুন।'।

অনেকক্ষণ চূপ করে বসে থাকার পর যে কী বিমগ্নতা মুখে যেখে আমার দিকে তাকালেন তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, লোকে আমাকে এরকম লজ্জা দেয় কেন বদুন তো ? আমি কি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি ?'

আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'সে জানেন আল্লা। আমি শুধু জানি, অন্তত আজ রাতে তিনি আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।'।

২।১০।৬৫

'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'

'কটা ভাষা ?' 'হা কপাল ! বাঙলাই হল মা।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো করিষাদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে এ-সব তর্কের ভিতর

আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্ব-সংসারটা রিকর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্বন্ধে চাপানি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করবো। শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটিরিস্টিক—অর্থাৎ গল্পটি শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীব একটি বিশেষ স্টুলাঙ্গের ডবি।

‘সুনন্দ’ রাগে বিতুষায় বিকৃত কণ্ঠে তাঁর জুর্নালে ইন্টারভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইন্টারভ্যুর রাজার রাজা ‘অভিশিনিং’ নামক খাটাশটির দাঁত ভাংচানি দেখেছেন—ঈভন ফ্রম এ ভেরি লগ্ড সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা ঝারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক ‘অভিশিনিং’ বোর্ডের বড়কর্তা ছিলাম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ স্ত্রবাদে সম্পূর্ণ অগ্রা ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করবো।

একদা ‘গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল’ যবে যে, কী বড় কী ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই ‘ভদ্র’ নাম অভিশিনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, ‘বাজারে ষাঁদের গ্রামোফোন রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অভিশিনিং-এর কি প্রয়োজন? ষাঁদের নেই তাঁদের কথা খালাদা।’ কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাঙাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন ধরুন, এই লখনৌ শহরে ছোট বড় তাবৎ গায়োয়ীয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঁট্রি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখন চরমে, তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখনৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্ণু-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, ‘হ্যাঁ মিয়া, “অভিশিনিং অভিশিনিং” চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈ, সো ক্যা ব্লা?’ (পাঠক, আমার উদ্ভৃজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী!) মোকদা কথা তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই অভিশিনিং অভিশিনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কি বলাই (আপদ, গেরো)।

শিল্পেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে ‘বলাইয়ের’ জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি

গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপমানকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, ‘সে কি? ইম্তিহান-পরীক্ষা দিতে তোমাদের কি আপত্তি? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতাবের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসস্বাষ্টি করতে পারবো কি না, তার দিল ভিজিয়ে নরম করতে পারবো কি না? সোজা কথায় বলতে গেলে, মহাফিলের সবাই প্রতিবারেরই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বক্তা, তারা না বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতে কীই বা এমন ফারাক?’

শিয়েরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, ‘মৈঁ তো জাউংগা জরুর।’

শিয়েরা বজ্রাহত। আতঁরব ছেড়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আর্জু করলে, ‘আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পী—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হজুর?’

হজুর বললেন, ‘য়েকীনা— নিশ্চয়ই।’

শিয়েরা তখন ‘ফারাম’ (form)-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রণ আছে। ওস্তাদ বললেন, ‘সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুড়টা বাবাকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না? ওসব বাদ দাও। ফাবাম ভর দো।’

*

*

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাঁদের ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেন্ট নেই বলে শেষ-মেগ যদি সবকুছ বরবাদ-ভুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্ত হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করতো না।

লখনৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মত খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর ‘চ্যাংড়াদের’ যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কত বার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিস্টেন্ট কুলীনশু কুলীন ব্রাঞ্চসম্মান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু

গুরু পায়ে ধরে বসে আছে। এঁদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদেরই রুচির অভাব—ওপরওলারা যারা সঙ্গীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।^১

ছোকরা কর্মচারীরা তো তম্বুহুতেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে চুকিয়ে দিলো অভিশনিং রুমে—যেখানে ‘পরীক্ষকরা’ বেকার উকীলদের মত অহুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিফল আক্রোশে আর্টিকিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কাণ্ড! যে-সব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেস্তের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ার প্রোগ্রামের জন্ত ধন্য দেয় তারা পর্যন্ত আসে নি অভিশনিঙে—আর এই ওস্তাদের ওস্তাদ লখনোয়ের কুৎবুর্মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিদ্বান, বিলকুল গয়ের মুমকিন্ তিলিস্মাং।

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্তিক্বাল (অভর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চালান দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগলদান্

১ প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাহুষ্ঠান কর্তাদেব নেকনজর পায় নি শুনে ভলতেয়ার সেই সঙ্গীতশ্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সাঙ্গনা জানান, ‘হায়, বড়লোকদের যে কানও বড় হয়’ (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সঙ্গীতাদিনায়ক। গান্ধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি তাঁকে ডেকে ছুঁম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গান্ধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, ববদলৈ, উপবাস, সলট্-মার্চ—প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু ‘কম্পোজ’ করেন। বিহ্বল, প্রায়াক্ষ উদ্ভাসদৃষ্টি রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে আচমকা কলিশন। সম্মিলিত এসে আমাকে দেখে করণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, ‘এ কখনো হয়?’ আমি বললুম, ‘আপনি যখন বাজান তখন আমার মত সঙ্গীতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হেঁ, হেঁ —সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিভী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আমেজ করছেন, এ দেশেই বা হবে না কেন?’ রবি শুধোলেন, ‘করি কি?’ আমি সবিনয়ে বললুম, ‘একটা বাবদে আমার মত আকাটও একটা সজেশন দিতে পারে।’ ‘কি কি?’ ‘ঐ সলট্-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-ছুন মাথিয়ে নেবেন।’

(পিকদান) নিয়ে এসে সামনে ধরলো ।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, ‘সব যব্ জম্গয়ে তব কুছ হো জায়—’ অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা ! সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন । নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলতো ? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, ‘কি গাইবো ?’ তারদ্বয়ে চিংকার উঠলো, ‘সে কি, সে কি ? গজব কী বাৎ ! আপনার যা খুশী !’ (সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিংকুটে, অচেনা রাগ বংখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া ।)

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অভিনিং বয়কট করে কেদ্দিনে চা খাচ্ছিল তারা টাটু ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে সঙ্গত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করেছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে ।

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি । আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো । যখন তালে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়্যার কুস্তলদামে পরাবেন বলে ।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশির ছটা ! জানুটা যেন ফুটিতে ভরপুর ! ক্ষণে সারেঙ্গীওয়ার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, ‘ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ !’ ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুকুর দেন, ‘শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন !’ যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে ! ঠর কোন কৃতিত্ব নেই !

গান থামলো ! আনন্দে বিম্বয়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠলো ।

ইতিমধ্যে ‘পরীক্ষক’দের একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরদের কাছ থেকে অগ্র সকলের অজ্ঞানতে সেই ‘কারাম্’খানা চেয়ে নিয়েছে । ঐটেতে পাস না ফেল, কোন হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সে-সব লিখে দিতে হয় ।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো, যেখানে প্রশ্ন, ‘আপনি কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণী জানেন ?’ তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ : ‘তোড়ি’ ।

বিম্বয় ! বিম্বয় !! এ কখনো হয় !!! পবনশ্রুতের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখতো ডজন দুই । ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও করনার বাইরে ।

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাক চেয়ে সেই ‘পরীক্ষক’টি বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাসি হেসে, ‘ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না?’

সকলের মুখেই প্রসন্ন মুহূর্ত হাওয়া। সারেকী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে কোনো বিঘাতেই তোমাব যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো,—আমাব জীবনে তাঁর উত্তরটি নির্বিড়ঘন আধারে ঞ্জবতাবাব মত জলে—তিনি কি উত্তর দিলেন।

ঠেগী মাস লে কর দাঈনিখাস ফেলে ওস্তাদ বললেন, ‘পচাশ সালশে তোড়ি গা রহাছ’—অভী ঠিক তব্বসে নহী নিকলতী।’

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমত বেবয় না। অত্ন রাগ-রাগিণীর কথা কেন বুঝা শুধোও ॥

১৬।১০।৮৫

ইন্টারভ্যু

‘ইন্টারভ্যু’ নামক চবম পৌছজতাব মস্কবা যে কত নব নব রূপে প্রকাশিত হয় তাব বর্ণনা আবেক দিন দেব। ‘দেশে’ এই মর্মে একাধিক চিঠি পেরিয়েছে, এবং আগে-ভাগে কাকে চাকরি দেওয়া হবে সেটা ঠিক কবে নিয়ে যে চোড়ামীর ইন্টারভ্যু-প্রহসন কথা হয় তাবও বর্ণনা এ-চিঠিগুলোতে ও আমাব সতাত্থের মূল প্রবন্ধে আছে। তবে এ বাবদে শেষ কথা বলেছে আমার এক তুখোড় তালেবব ভাগিনা। ভাঙর নোকবি করে, টাউস যা গাড়ি ব্যাক দিয়েছে তার ভিতর একপক্ষে মা সহ, তাব তিন মাসী অত্ন পক্ষে তার তিন মামী বাতমত ব্যুহ নির্মাণ করে কাশ্মীর-শিয়ালকোট-কচ্ছের রণেব^১ রণমোহড়া দিতে পারেন (বলা বাহুল্য মামীরাই হাবেন, কারণ তাঁরা এসেছেন তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে)। ভাগিনাটিকে প্রায়ই ইন্টারভ্যু নিতে হয়—অর্থাৎ সিট্‌স্ অন দি রাইট সাইড্ অব দি টেবল্। একাদিন বেজায় উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে শোনালে। তাতে ওমেদারের বয়স কত হবে, কি কি পাস থাকা

১ আমার যদুব জানা, কচ্ছবাসীবা জায়গাটার নাম কচ্ছী বা শুজরাতী বা কাঠিয়াওয়াড়ীতে বানান করে কচ্ছের ‘রণ’—‘রান’ বা ‘রাণ’ নয়।

চাই, এপেন্‌ডিক্সের দৈর্ঘ্য তার কতখানি হবে, তার পরিবারে নিদেন কটা খুন হয়ে থাকে চাই ইত্যাদি বেবাক বাৎ ছিল। ভাগিনা তারপর জরুজিত করে খানিকক্ষণ খুঁত খুঁত করে বললে, ‘খাইছে! ফোভোগেরাপ্টা ছাওনের বাৎ বেবাক ভুল্যা গ্যাছে। হইডার তলায় লেখা থাগ্‌বো, “None need apply whose appearance does not resemble the above photograph” কি কন, মা’মু?’ আমি আর কি বলবো? এটা করলে তো মৃত্যু সাধুজনোচিত আচরণ হত। এর চেয়ে ঢের ঢের নাষ্টি (ইচ্ছে করে নাষ্টি উচ্চারণ করতে, সে উচ্চারণে যেন ঘোঁরাটার খোলতাই হয় বেশী যেমন ‘পিশাচ’ বা ‘পিচাশ’ না বলে সবোৎকৃষ্ট হয় ‘পিচেশ’ বললে!) উদাহরণ আমি একটা জানি।

ফার্সীর লেকচারার নেওয়া হবে। আমাকে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে হবে। আমি বে-কহুর না মঞ্জুর করে দিলুম। যদিও চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হল না, এর ভিতরে কোনো নষ্টামী আছে। তবু, আমি এই ‘জামাই ঠকানোর’—স্বন্দের ভাষায়—কিষ্কিরি-মস্করার হিস্তেদার হতে চাই নে। দু’দিন পর মোলানা আজাদ ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি যেতে আপত্তি করছি কেন? তখন বুঝলুম, উনিই আমার নাম স্পেশালিস্ট-রূপে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হচ্ছি বলে কতৃপক্ষ তাঁকে সেটা জানিয়ে ফরিয়াদ করেছেন—। মোলানার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অসাবারণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই কাচুমাচ্ হয়ে এই ইন্টারভিউ বাবদে পরীক্ষক হিসেবেই, আমার পূর্ব পূর্ব নোঁরা (নাষ্টি!) তজ্ঞবা-অভিজ্ঞতা জানালুম। দেখি, মোলানা সমুচাহ্ ওয়াকিফ-হাল। কোনো প্রকারের তকাতকি না কবে বললেন, ‘আপনি গেলে ওরা সোজা পথে চলবে। যদি অগ্নায় আচরণ দেখেন, আমাকে জানাবেন।’ ইন্টারভিউতে যে-সব অনাচার হয় তার কোনো বিচার নেই বলে, আমি টোঁবলের কি এদিকে কি ওদিকে কোনো দিকে বসতে চাই নে (পেচায় না পেলে শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্যকে শুধোন!); কিন্তু এক্ষেত্রে মোলানা আমার কাছ থেকে অনাচার-সংবাদ পেলে যে ওদের কান মলে দেবেন সেই ভরসায় গেলুম।

আমার সঙ্গে আরেকটি স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাকীরা পাকা মেসার। তাদের একমাত্র কামনা, কাম খতম করে বাড়ি ফেরার। বিশেষত ‘লেডে’র ব্যাণার—চাকরিটা মিথষ্কল্পা পেল না মৃদম খান পেল সে নিয়ে তাদের ‘মাতাবাতা’ হবে কেন, ছাই!

তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা দু-একটি প্রশ্ন শুধোলেন। সে ভারী মজা। যেমন,

‘আপনার মাদ্রাসায় ইংরিজীও পড়ানো হত?’—কথাবার্তা অবশ্য আংরেজীতেই হচ্ছে। কারণ প্রশ্নকর্তারা ফারসী ও ফরাসীর তফাৎ জানেন না।

‘জী, হ্যাঁ।’

‘কি পড়েছেন?’

‘জী, রাস্কিনের “সিসেম অ্যাণ্ড লিলিজ”, মিলটনের “এরিয়োপেজি—”,

‘শেকস্পীয়র?’

‘জী।’

‘কি?’

‘হামলেট।’

এবারে প্রশ্নকর্তা দ্বারগ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘বাব্বা, বাব্বা! বেশ, বেশ। সুপ্রস্তাব!’

তার পর তিনি সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, হামলেটের আত্ম-আর্তনাদ—সলিলকি—“To be or not to be—”। তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমার দিকে, ওমেদারের দিকে না—আমার অপরাধ? ইংরিজী খবরের কাগজেও একটা অত্যন্ত বেকার খবর বেরিয়েছে, আমার কি একটা বই কি যেন একটা প্রাইজ পেয়েছে, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নাকি আমাকে প্রাইজটি দেবেন স্বহস্তে! আমাকেই ইম্প্রেস করা এখন তাঁর জীবন্যত্বের চরম কাম্য—বলা তো যায় না, এখন থেকেই যদি রীতিমত আমাকে তোয়াজ করে ইম্প্রেস করা যায় তবে তো আমি হয়তো প্রাইজ নেবার সময় কানে কানে রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবো, ‘হুঁজুরের আঙুর সেক্রেটাৰি অনন্তভূত-পরাশরলিঙ্গম্কে এখন একটি প্রমোশন দেওয়া উচিতত্ত্ব উচিত!’ অবশ্য সেটা সেরকম মোকা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না—যদি হয়েই যায়। নেপোলিয়ন (আজকালকার ‘জানীরা’ থাকে নাপোলেওঁ বলেন, যেন আমাদের মত সে-যুগের রাম-পটকরা খাটি উচ্চারণ জানতো না বলে বাংলাতে তঁদলুযায়ী সঠিক বানান লিখতে পারে নি।) বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কখন কি ভাবে কাকে লুব্রিকেট-তেলাতে হয়!

তা সে যাই হোক, আমাকে ন’সিকে ইম্প্রেস করে হকচকিয়ে দেবার পর ওমেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাকিটা কও কি?’ “Or to take arms against a sea of—” বাকিটা বলে যাও তো?’

কালো চামড়ার তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট স্প্রিং-সম্বলিত, পঞ্চাধিক ক্যুশনবিজড়িত গভীর আরাম-কেন্দ্রার তলা থেকে তিনি হান্তরসের তুফানে ওঠা-নাবা করতে

করতে বার বার বলেন, ‘তার পর কি, go on ! ইউ সেড্ ইউড্ রেড্ হ্যামলেট, against a sea of troubles—আরো সাহায্য করলুম তোমাকে। বাকিটা বলে যাও।’ আবার তিনি সোঁকাতে বৃন্দাবনের রসরাজস্থলভ হিন্দোল-দোলে তুলতে লাগলেন।

আমি তাজ্জব ! বেচারী ওমেদার এসেছে ফার্সী ভাষার মের্টারির চেষ্টায়। আঁ পাশা, বেচারী একটুখানি ইংরিজী শিখেছিল বটে, কিন্তু সেইটেই তার ফর্ট, সেইটেই তার pièce de résistance, সেইটেই তার বলতে গেলে, কিছুই নয়—ইংরিজীর মাধ্যমে ফার্সী পড়াতে গেলে যতখানি ইংরিজী জানবার প্রয়োজন তার চেয়েও সে বেশী জানে, সেটা তো ইতিমধ্যে তার কথাবার্তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তা সে যাকগে। ওমেদার বেচারী তো খেমে-নেয়ে ঢোল। আমি তখন তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললুম, ‘ওরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কতখানি ইংরিজী জানেন না-জানেন তার গুরুত্ব সামান্যই। ওটা আপনি ভুলে যান। এবারে চলুন ফার্সীতে। সেইটে কিন্তু আসল। ঐ যে আপনার সামনে ফার্সী বই কয়েকখানা রয়েছে তারই যে কোনো একখানা থেকে কয়েক লাইন পড়ুন—প্রথম আপন মনে চুপে চুপে, পরে আমাদের শুনিয়ে। অহুবাদ ? না, না, অহুবাদ করতে হবে না। আপনার পড়ার থেকেই তো বুঝে যাবো, আপনি ফার্সী বোঝেন কি না। আর যেটা পড়বেন তার দু-একটা শব্দ আপনার জানা না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। সবাই কি আর সব ফার্সী শব্দ জানে ? তা হলে হুনিয়াতে অভিধান লিখত কে, পড়ত কে ? তা সে যাক। আমার আর কোনো প্রশ্ন-ট্রাশ নেই।’

এবারে ছেলেটার—হ্যাঁ, আমার ছেলের বয়েসি—মুখে শুকনো হাসি ফুটলো ; একটুখানি ভঙ্গি পেয়েছে। সেই হ্যামলেটওলা লোকটিও আসলে কিন্তু মাহুষ ভালো। পাঁচটা ক্যাশন্ হুলিয়ে ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তঁারই হ্যামলেটের স্বরণে—‘জিস্ ডিলেড হয নি। হা হা, হা হা।’

ছেলেটি হৃন্দর উচ্চারণে গড় গড় করে ফার্সী পড়ে গেল। কান্দীবী ব্রাহ্মণ-সন্তান ; এবং পরে দেখা গেল, আরো হিন্দু ওমেদার ছিল। ফার্সীর আবহাওয়াতে আপন ঠাকুদার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। চেয়ারমেন বললেন, ‘আপনি এখন যেতে পারেন।’ ছেলেটি সবাইকে মুসলমানী কায়দায় সেলাম জানালে, আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার একটু শুকনো হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেল—কি জানি ওটা ঠিক হবে কি না, যদি ওতে করে নখর কাটা যায়। আমি মনে মনে বললুম ‘মারো ঝাডু, জা নোকরি ওর উসকী ইন্টারভু পর্।’

উহঁ ! এটা শেষ নয়, এটা আরম্ভ মাত্র। ছেলেটির সেলামপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গের দ্বিতীয় স্পেশালিস্টটি বললেন, ‘একটু বসুন’—এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন।’

হায় বেচারি ক্যাণ্ডিডেট ! ভেবেছিল, তার গুরুত্বস্বপূর্ণ শেষ হল। এখন এ আবার কি ফাঁসি ! বেচারী পর্চাখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। স্পেশালিস্ট দশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর গুঁতোচ্ছেন, ‘পড়ুন। পড়ছেন না কেন ?’ ছেলেটি হোঁচট ঠোকর খেতে খেতে খানিকটে পড়লো। স্পেশালিস্ট বললেন, ‘অনুবাদ করুন।’ বাম পাঠা ! পড়ার কায়দা থেকেই তো পরীক্ষার হয়ে গেছে যে পাঠ্যবস্তু তার এলেমের বাইরে, তবে স্টাডিস্টের মত মড়ার উপর খাঁড়ার বা কেন ?

ছেলেটা নড়বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি পর্চাটির জন্ত স্পেশালিস্টের দিকে হাত বাড়ালুম। তিনি ‘কুছ নহী, কুছ নহী’ বলে সেটি পকেটে পুরে নিলেন। ছাত্রী ক্যাণ্ডিডেট এল। এবারে ছামলেটের বদলে থের কবিতা। সর্বশেষে আবার ঐ অভিনয় সেই পর্চা নিয়ে। আমি স্পেশালিস্টের উদ্দেশ্য মনে মনে বললুম, ‘তুমি ব্যাটা খোটা মুসলমান, আশ্রা হালা বাস্তাল পাতি লাডে ! দেখাচ্ছি তোমাকে।’ এবারে ক্যাণ্ডিডেট পর্চাটি যেই কেরত দিতে যাচ্ছে অমনি, তৈরী ছিলুম বলে, আমি সেটা নিয়ে নিলুম। ওয়া ! যত পড়ি, আগা-পাক্সলা ঘুরিয়ে দেখি, ততই কোনো মানে ওংরায় না। ইতিমধ্যে আরেক ওমেদার এসে গেছে এবং চসার না পৌণ্ড কি যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টি ঐ পর্চাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইয়ান্না ! অব্ সমব্লন বা। যে হু’লাইন কবিতা ছিল সেটা অনেকটা আমাদের।

হরির উপরে হরি

হরি বসে তায়

হরিকে দেখিয়া হরি

হরিতে লুকায় !

‘হরি’ শব্দের কটা মানে হয়, আমি সত্যই জানি নে—কান ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু ছিঃ ! কারো বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষা যদি নিতাস্তই নিতে হয় তবে এই ধরনের ‘জামাই-ঠাকানো’ কবিতাই কি ন্যায্যতম, প্রশস্ততম ? !

কিন্তু এহ বাহ !

পরে, অন্তত আমি বুঝতে পারলুম দই খাচ্ছেন কোন্ রমাকান্ত আর বিকার

হচ্ছে কোন্ গোবন্দনের ?

জু-একটি পাকা মেঘরও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি। লেখা-পড়ায় এক-একটি আন্ত বিচ্ছেদাগর বলেই ঠন্দের নাসিকায় থাকে সারমেয়বিনিমিত্ত গন্ধসন্ধানী অন্ধিসন্ধি।

ক্যাণ্ডিডেটের পরে ক্যাণ্ডিডেট—কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মাঝারি, সংসারে যা হয়—ইন্টারভ্যু স্বয়ংবরে আমাদের মত ইন্দুমতীর সামনে স্বপ্রকাশ হলেন। কিন্তু সবাই মার খেলেন, ঐ পর্চাটুকুর সামনে, ঐ চিরকুটটি সন্সাইকার ওয়াটারলু।

ইতিমধ্যে কী আশ্চর্য, কী তিলিন্মাং—একটি ওমেদার পর্চাটি পাওয়া মাত্রই সেটি গড়গড়িয়ে পড়ে গেল, আতঙ্ক! যেন তার প্রিয়র আড়াইশ' নম্বরী প্রেমপত্র।

*

*

ইন্টারভ্যু শেষে লাঞ্চ। সরকারী লাঞ্চকে আমি বলি লাঞ্ছনা। অবশ্য সর্বোচ্চ মহলে নয়। সেখানে লাঞ্চের অজুহাতে আপনার জন্ম পেলেটে করে রোলস্-রয়েস গাড়ি আসতে পারে তত্ত্বজী পরী-পয়্কারী চালিতা। ড্রাইভারিগীটি ফাউ, থ্রোন ইন্ ক্রস গুড মেঝার।

পালাবার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়লুম সেই পঞ্চ-ক্যাশন-মর্দন মহাজনের হাতে। বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের ঐ স্পেশালিস্টটি আপন ওমেদারকে একটু ভালো করে রিহার্সেল করালেন না কেন? ও যদি সাত বার টোক গিলতো, এগারো বার হৌচট খেয়ে খেয়ে চিরকুটটির কবিতা পড়তো, তবে হয় তো, আমাদেরও বিশ্বাস জন্মাতো, সে ঐ কবিতাটি ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি।'

অর্থৎ অর্থৎ

একটা 'ফরেন'-ওলার কথাই বলি।

ইন্টারভ্যুতে আমিও ছিলাম। সেই ছাব্বিশ বছরের 'ফরেন'—বাঁই ডায়াম কালা আদমী ছোকরাটা তার বাপের বয়সী ওমেদার অধ্যাপককে যা বেহায়া প্রা শুধোতে লাগলো তাতে আমি স্তম্ভিত। কারণ সেই অধ্যাপকের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ যুগে আর কটা হিন্দু ফার্সী লিখে ভারতবর্ষের সাতশ,' বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে? ইনি তাঁদেরই একজন। অথচ ওই

‘করেন’-পণ্টক কার্সার এক বর্ণও জানে না। শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক—ঠিক ইতিহাসও নয়, ইণ্ডলজির—বলেই গুণধর বোর্ডে এসেছেন, এবং যে-মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিরেট আকারে, সেই সম্বন্ধে চোখাচোখা প্রশ্নবাণ ঝাড়ছেন। সেগুলো তৈরি করে নিয়ে এসেছেন গতকাল লাইব্রেরি থেকে, দু’তিনখানা মোগল ইতিহাসের ইংরেজী অমূল্য পড়ে—প্রধান উদ্দেশ্য, বাদবাকী মেঘরদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। সে সব মেঘররা এসেছেন অপরাপর ঘূনি থেকে। কলে সে সব ঘূনিতে তিনি একস্টেনশন লেকচারে নিমজ্জিত হবেন, এগজামিনার হবেন, বহুবিধ কনকারেন্সে নিমজ্জিত হবেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রের অধ্যাত্ম খীসে তাঁরা একস্টারনেল পদবীক্ষক হিসেবে ডিটো মারবেন, তিনো এ-বাগে তাই করবেন, গয়রহ, ইত্যাদি, এটসেটরা। কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, তবে রেডুক্‌সিয়ো আড্‌ আব্‌হুডুমে পরিণত করতে যদি অহুমতি দেন তবে কাল্পনিক দু-একটি পেশ করতে পারি : ‘আকবর যখন আহমদাবাদ আক্রমণ করছিলেন তখন সাবরমতী নৈয়ে হাওয়া পূব না দক্ষিণ থেকে বইছিল ?’ ‘সিলেটের শাহজালাল মসজিদে পূর্বে যে জালালী কবুতর ছিল তারা এখন চলে যাচ্ছে কোথায় ?’

এবং এমনই খাজা ইংরিজী উচ্চারণে যে আমি একবার দু’প্রশ্নের ফাঁকে তাঁকে কানে কানে বললুম, ‘I am glad, Oxbridge has not been able to damage your original pronunciation.’

আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমি সে অধ্যাপককে বাঁচাতে পারি নি। সেই প্রাচীন গল্প তা হলে আবার বলি। বার্নার্ড শ’র একটি নাট্য করে থিয়েটার থেকে গম্‌ গম্‌ তুলে ধরেছে, অষ্টাদের সপ্রশংস চিৎকার, ‘নাট্যলেখককে স্টেজে বেরুতে বলো, আমরা তাঁকে দেখব।’ শ’ এলেন। মিনিট পাঁচ ধরে চললো তুমুল হর্ষরব, করতালি, যাবতীয়। সবাই যখন শান্ত হলেন, এবং শ’ তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জঘ মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সর্বশেষ সন্তা গ্যালারি থেকে একটা আওয়াজ এল ‘বু ব্‌ ব্‌ ব্‌!’ শ’ ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাদাও, ঠিক বলেছ; এ নাট্যটা রদী। কিন্তু তোমাতে-আমাতে, মাত্র দুজনাতে, এই শত শত লোকের পাগলামি ঠেকাই কি করে!’

*

*

তার পরই আমি বিদেশে চলে যাই। না, স্তর! Sorry, কোনো সোভিয়েট, মার্কিন, বার্লিন ডেলিগেশনে নয়। তা সে যাক। ফিরে এসে বোম্বায়ে আমার বন্ধু প্রসাদদাস মানিকলাল শুক্লের বাড়িতে উঠলুম। ওই অক্সব্রিজগলার কথা কি

করে উঠলো জানি নে, কারণ লেখাপড়ির ব্যাপারে আমরা charleton-ধাঙ্গা-বাজীদের নিয়ে কখনো আলোচনা করতুম না।

শুরু বললে, ‘সে বড় মজার ব্যাপার। তোমার ওই ব্রাদার চৌধুরী শর্টন: শর্টন: উঠতে লাগলেন খ্যাতির শিখর পানে। আজ এই কলেজে, কাল অল্প যুনিভার্সিটিতে—আন্ত একটা হুমানের মত চড় চড় করে পদোন্নতির অশথগাছের মগ-ডালে, বয়েস পইত্রিশ পেরুতে না পেরুতে। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব উম্মা গ্যোবেল্‌সী শানাই তাঁর গুণের রাগ-রাগিণী বাজাতে বাজাতে এটাও জাহির করেছে যে, ওই চৌধুরী স্বচেষ্টায় করাচী, জর্মন, রুশ গয়রহ ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন।’

শুরু ফিক করে একটুখানি হেসে বললে, ‘সে বড় মজার। তোমার ওই চৌধুরীর তখন এমনই আশ্পন্দা বেড়ে গেছে যে, সে ছাপিয়ে দিলে বুনফের একটি অচলিত ছোট লেখার অহুবাদ ইংরিজীতে—চটি বই, ব্রশ্চার বলতে পারো। আসলে সে সেটা করেছিলো এক আনাড়ি ছোকরার সাহায্যে, যার ফরাসী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কাঁচা—কিন্তু ছোকরা ধাঙ্গা মারতে জানতো চৌধুরীর চেয়েও দুই বাঁও বেশী।

শুরু বললে, ‘ওঃ! সে বই নিয়ে এ দেশে কী তুলকালাম, ফাঁ ফাঁর! অবশ্য তার চোদ্দ আনার উৎপত্তি চৌধুরীর গ্যোবেল্‌সী কলসী থেকে। এবং এখনো এ ‘দেশের লোকের বিশ্বাস এ রকম অহুবাদ হয় না। মাত্র দু’একটি প্রাণী জানে যে, কি করে যেন ওই অহুবাদ প্যারিসে পৌঁছে গেলে তাদের এক পত্রিকায় বেরোয়—
“The originality of the translator has come out with extraordinary success in those passages where he has failed to understand the original !” অবশ্য তাতে করে চৌধুরীর রক্তিম লোকসান হয় নি, কারণ এই ফরাসীতে লেখা সমালোচনা—তাও প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিতীয়া কাগজে—এ দেশে পড়ে কটা লোক! তা সে যাক।

‘ইতিমধ্যে এ-দেশে একটি পোলিটিশিয়ানের প্রাণ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো জননী ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্ত। আসলে তুমি তো জানো, এ সব নির্জলা ব্লাক্। তত্ত্বলোক চান, তিনি যেন ‘কলচর’-জগতেও সম্মানিত হোন। অবশ্য পরের হাত দিয়ে তামাক খেয়ে। সেই “পরে”রও অভাব হল না। এ অঞ্চলের শেঠীয়াদের টাকের ঠিক জায়গায় হাত বুলাতে পারলে গৌরীশঙ্করের শিখরে মরুত্থান নির্মাণের জন্তও পিল পিল করে টাকা বেরিয়ে আসে।

তারপর জানায় জানায় কুলোকুলি। তোমার এই প্যারা চৌধুরী—

আমি বললুম, ‘শট অপ্।’

‘আহা, চটো কেন? তারপর সাড়স্বর স্থাপিত হল, “জম্মুদ্বীপ-সমষ্টিভাসমুদ্র—” যাকগে যাক্, আমার নামটা ঠিক মনে নেই, ওই “কলচর” “মলচর” নিয়ে কি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, আর চৌধুরী হলেন তার “সর্বাধিকারী” “মহাস্ববির” না কি যেন একটা।...কিছুদিন পর—ইতিমধ্যে অবশ্য প্রায় মাসিক দু-দশখানা ভালো-মন্দ-মাকারি “কলচরল” বই “জম্মুদ্বীপসমষ্টিভাস—” দুচ্ছাই আবার ভুলে গেলুম প্রতিষ্ঠানের নামটা—বই বেরিয়েছে। সর্বাধিকারী চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে বোঝালেন—

(ক) ঋগ্বেদের যে সব অম্মুবাদ গত এবং এই শতকে ইংরিজী-বাংলা-ফরাসী-জার্মনে বেরিয়েছে, সেগুলো ইতিমধ্যে বিলকুল বেকার শুট অব্ ডেট হয়ে গিয়েছে, (খ) একটি নূতন অম্মুবাদ দরকার, (গ) সেটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে হবে, (ঘ) এবং তাঁদের দক্ষিণ এবং ছাপা বাবদ লাগবে আশী হাজার টাকা।

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, ‘কি বললে, আশী হাজার টাকা? বলো কি।’

‘বিলক্ষণ! আশী হাজার টাকা! ব্যাপারটা হল গিয়ে, ওই যে প্রতিষ্ঠাতা পলিটিশিয়ান কলচরড্ হতে চান, তিনি শেয়ারবাজার, টেভয় টিন্ থেকে ওমরা ভুলো, শিবরাজপুর মেজানীজ সব বোঝেন, কিন্তু—কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতদের, তেজীমন্দী বাবদে বিলকুল না-ওহ্যাকিফহাল। ঢেলে দিলেন টাকাটা। তার পর বেকতে লাগলো কিস্তিতে কিস্তিতে বেদের নবীন ইংরিজী অম্মুবাদ। যে রকম আমাদের হরিবাবুর বাংলা কোষ বেরিয়েছিল। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু, ব্রাদার, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এই দক্ষ সংসারে কোথায়? হঠাৎ পুণার এক পণ্ডিত আমাদের কলচর-প্রতিষ্ঠাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অম্মুবাদের খুনিয়া খুনিয়া সব ভুল দেখাতে লাগলেন। যেমন মনে করো—কথার কথা কইচি, আমি তো ওখানে ছিলাম না—“রবিকর” অম্মুবাদে হয়েছেন, “শূর্য যে খাজনা দেন” কিংবা “রাজকর” অম্মুবাদে হয়েছেন, “রাজা যে রশ্মি দেন”।...এ রকম বিদকুটে বরবাদ অম্মুবাচ্ কেন হল কিছুই বোঝা গেল না। সামান্ততম বৈদিক ভাষা যে জানে সেও তো এরকম ভুল করবে না। হ্যাঁ, আলবৎ, ‘ক্রন্দসী’ ‘রোদসী’ ধরনের অচলিত শব্দ

১ ‘চলন্তিকা’ বলেন ‘সজ্জান’ থেকে সেয়ানা। বড়বাবু বলেন, শ্রেনদৃষ্টি রাখে যে জন তার থেকে শেয়ানা, জানা।

নিম্নে সাতিশয় সাধু মতাস্তর হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আকাট, বর্ষর—? রহস্তটা তবে কি ?

আমিও সায় দিয়ে বললুম, ‘রহস্তটা তবে কি ?’

‘ওই কল্‌চরকারী প্রতিষ্ঠাতা বেদবেদান্ত বাবদে বেকুব হতে পারেন, কিন্তু তিনি “ইছুরের গন্ধ পান”—শয়তানীর খাস পান। নইলে সাদা-কালো-গেঙ্কয়া বাজার কনট্রোল করছেন বুধাই। তিন দিন যেতে না যেতে স্বয়ং চৌধুরীই এসে যা বললেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কি ভারতীয়, কি ফরাসী, কি ইংরেজ, কি জার্মান কোনো পণ্ডিতকেই অম্মবাদ-কর্মে নিযুক্ত করেননি। তাবৎ কর্ম করিয়াছেন একটি দুঃস্থা জার্মান রমণীকে দিয়ে। সে বেচারী সংস্কৃতেরও এক বর্ণ জানে না—বেদের ভাষা মনোজের ভাষায় কহাঁ কহাঁ মূল্যকে! সে শ্রেফ জার্মান পণ্ডিত গেন্টনার-কৃত কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বেদের অনবদ্য জার্মান অম্মবাদ ইংরিজীতে অম্মবাদ করে গেছে। মেয়েটি ভালো জার্মান জানে বটে, কিন্তু তার ইংরিজী কাঁচা। কিন্তু সেইটেই মূলতত্ত্ব নয়। আসল বিপদ হয়েছে, বেদের অনেক বস্তু অস্পষ্ট, রহস্তময়, দ্ব্যর্থ কেন—বহু অর্থহৃচক। সেগুলো জার্মান পণ্ডিত গেন্টনারও করেছেন সন্তুর্ণনে, আবছা-আবছা রেখে—যেন সাক্ষাভাষায়। এ নারী তাই তার অম্মবাদে—আদৌ সংস্কৃত জানে না বলে—রবিকর, রাজকর, নরকর, হাতীর কর (কথার কথা কইচি!) গুবলেট করে বসেছে। তখন পরিক্ষার হল রহস্তটা।

তত্ত্ব বিগলিতার্থ, চৌধুরী দশ-বিশজন পণ্ডিত লাগিয়ে, তাদের ভ্রাতা দক্ষিণা দিয়ে অম্মবাদ করান নি। মেমসাহেবকে দিয়ে কন্মটি করিয়ে নিয়েছেন।

আরো অর্থাৎ এবং সেখানেই অর্থ, মেমসাহেবকে তিনি দিয়েছেন এক হাজার টাকা, ছাপার খরচা বাদ দিয়ে তিনি পকেটস্থ করেছেন সত্তর হাজার টাকা। হল ?

*

*

চৌধুরী এখন ফটুকা-বাজারে ভালো পয়সা কামায় ॥

অত্মাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায় ।

মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

এই ‘দেশ’ পত্রিকাতেই আমার এক সতীর্থ কিছুদিন পূর্বে ‘করেন, ডিক্রী’-ধারীর দম্ভের প্রতি ক্ষণতরে ঈষৎ ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্মঘাতীঃআপন মূল

বক্তব্যে চলে যান। হয়তো সে-স্থলে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করার অবকাশ ছিল না, অর্থাৎ তিনি শেখ চিল্লীর মত মূল বক্তব্যের লাভ এবং ঈশ্বর অবাস্তুর বক্তব্যের ফাউ দুটোই হারাতে চান নি।

ওঃ! গল্পটি বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ শেখ চিল্লী জাতে খোন্টা এবং বাঙলা দেশে কখনো পদার্পণ করেন নি। যত্বপি শ্রীযুক্তা সীতা এবং শাস্তা এবং খুব সম্ভব তাঁদের অগ্রজও মিয়া শেখ চিল্লীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন উপকথার মারফতে—স্বর্গত রামানন্দের পরিবার যে খোন্টাই দেশে বাল্যকাল কাটিয়েছেন সে কথা আগে জানা না থাকলেও তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে বহু বাঙালীই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এস্থলে আমার যে গল্পটি স্মরণে এল সেটি বোধ হয় তাঁরা ইতিপূর্বে সবিস্তর বয়ান করে আমাদের পরবর্তী যুগের ‘চোর’ প্রতিপন্ন করার স্ব্যাবস্থা করে যান নি—এই ভরসাতেই সেটি উল্লেখ করছি। করে গেলেও বুটমুট ‘বেপবার’ ভয় নেই—কারণ গল্পটি ক্লাসিক পর্যায়ের, অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের কার্যকলাপে নিত্য নিত্য সপ্রকাশ হয় বলে এটি নিত্যদিনের ব্যবহার্য গল্প।

মা-সরস্বতীর বর পাওয়ার পূর্বে কালিদাস যে আক্কেল-বুদ্ধি ধারণ করতেন, হিন্দী-উর্দুভাষীদের শেখ চিল্লীও সেই রকম আস্ত একটি ‘পন্টক’ (‘কন্টক’ থেকে ‘কাঁটা’—সেই সূত্রানুযায়ী ‘পন্টক’ থেকে কি উৎপন্ন হয় সে তত্ত্ব সূচতুর পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না; আসলে এই গুঁচ তত্ত্বটি আবিষ্কার করার ফলেই শ্রীযুত সুনাতি চট্টো অস্বদেশীয় শব্দভাষিকদের পণ্ডিত্বের আপন তথ্য-ই-তাউসে গ্যাট হয়ে বসবার হক্ক কজা করেন)।

সেই শেখ চিল্লীকে তাঁর মা হাতে একটি বোতল আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে তেল কিনে আনবার আদেশ দিলেন এবং পুত্রের পেটে কি পরিমাণ এলেম গজগজ করছে সেটা জানতেন বলে পই পই করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসল তেলটা পাওয়ার পর সে যেন ফাউ আনতে না ভোলে। শেখ চিল্লী এক গাল হেসে বললেন, ‘তা-ও কখনো হয়!’

আমি জানি, আজকের দিনের পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে, কোনো জিনিসের দাম বাজারে কখনিকালে কখনো কমে। কিন্তু করতেই হবে, এই হালের স্ক্রুমার রায়ের যুগেও ‘বাড়তি’ ‘কমতি’ ছিল—এমন কি বয়সের বেলাও। আমি যে যুগের বয়ান দিচ্ছি সেটা তারও বহু পূর্বেকার। তাই মিয়া চিল্লীর আম্মাজানের অজ্ঞানতেই বাজারে তেলের দর হঠাৎ কমে গিয়েছিল। হয়তো কোনো ‘রাধা’কে নাচাবার জন্ত নবাব সাহেবেয় ‘ন মন তেলে’র প্রয়োজন

হওয়াতে তিনিও শায়ের্তা খানের মত তেলের দর সস্তায় বেঁধে দিয়ে বাজার শায়ের্তা করেছিলেন। সেটা এ যুগের 'সল্‌দে' শায়ের্তা করতে গিয়ে স্বহস্তে স্বপুটে ভুতের কিল খাওয়া নয়।

তা সে যা-ই হোক, তেল সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মূল তেলেই বোতল কানায় কানায় ভরে গেল। শেখ চিল্লীর ঘটে বুদ্ধি কম ছিল সত্য কিন্তু তার স্মৃতিশক্তিটি আমাদের 'দাদখানী তেল, মহরির বেল'-এর মত ছিল না! তিনি দোকানীকে বললেন, 'ফাউ ?'

দোকানী বললে, 'কী আপদ, বোতলে জায়গা কোথায় ?'

শেখ বললেন, 'বটো! চালাকি পেয়েছ ? এই তো জায়গা।' বলে তিনি বোতলটি উপড় করে, বোতলের তলার গর্তটি দেখিয়ে দিলেন। মেরি মাগডেলেন যে খুঁটের পদদ্বয় তৈলাক্ত করেছিলেন সেটাকেও হার মানালেন শেখ—অবশ্য স্বহস্তে। দোকানী মুচকি হেসে সেই গর্তটি এক কাঁচা তেল নিয়ে ভরে দিয়ে শেখের ফাউয়ের খাইও ভরে দিল।

বোতলটি অতি সন্তর্পণে 'স্টাটুস কুয়ো' বজায় রেখে ধরে ধরে শেখ বাড়ি পৌঁছে মাকে বললেন, 'এই নাও আম্মা, তোমার ফাউ।' তারপর বোতলটি উন্টে ঝাড়া করে ধরে বললেন, 'আর ভিতরে তোমার আসল।'।

আম্মা-জানের পদদ্বয় অবশ্য খুঁটের তুলনায় অল্পই অভিষিক্ত হল।

*

*

দেশ থেকে যে বোতলটি নিয়ে এ-দেশের ছাত্র বিদেশে বিচার তেল—না ভুল বললুম, ডিগ্রীর তেল—কিনতে যায়, সেটি নিয়ে সে কোন শেখ চিল্লীর মত কি বেসাতি করে সে তত্ত্বটি অনেকেরই জানা নেই। না জানারই কথা, কারণ ইংরেজ আমলের পূর্বে এ-দেশে কখনো এই 'ফরেন' ভুতের উপদ্রব হয় নি। মুসলমান আমলে কি হয়েছিল সেটা পরের কথা। তার পূর্বে কোনো ভারতসন্তান 'ফরেন' ডিগ্রীর জন্তু কামচাটকা থেকে কাসাবান্কা কোথাও গিয়েছে বলে শুনি নি। তবে জালাল পড়লে পাই, ঐ যুগে তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং বারাণসী ছিল সনাতন ধর্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার জন্তু সর্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ। তাই জাতকের একাধিক গল্পে পাই, বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধভাবাপন্ন বারাণসী গৃহী পুত্রকে তক্ষশিলায় বিদ্যার্জনের জন্তু পাঠাতেন। তদ্রূপ কাশী সর্বকালেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি থাকা সত্ত্বেও হয়তো বিক্রমাদিত্যের যুগে সার ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে কিছু ছাত্র উজ্জয়িনীতে বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে রাজকাৰ্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞান চৰ্চা কাৰ্সীতে হত। (বৌদ্ধধৰ্ম লোপ পাওয়াৰ কলে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোপ পায় ; কিন্তু কাৰ্সী ও পৰবৰ্তী যুগে বৃন্দাবনে হিন্দুশাস্ত্র চৰ্চাৰ ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল এবং এধনো আছে।) কিন্তু কাৰ্সী যদিও পাৱস্ত্ৰেৰ ভাষা, তবু এ-দেশেৰ কোনো কাৰ্সী শিক্ষাৰ্থী তেহ্ৰান বা মেশেদ শহৰে কাৰ্সী শিখতে যেত না। ধৰ্মচৰ্চাৰ জগু ছাত্ৰেৰা পড়তো আৱবী, কিন্তু তাৱাও মক্কা, মদিনা বা কাইৰোতে গিয়ে ‘কৱেন’ ডিগ্রী নিয়ে আসতো না। অবশু কোনো কোনো ছাত্ৰ এ-দেশে পাঠ সমাপন কৰে মক্কায়ে গিয়ে হজ্জ কৱাৰ সময় কাবাৰ চতুৰ্দ্ধিকে যে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেগুলো শুনে নিত। অধীনেৰ মাতামহ তাই কৰেছিলেন।

বিদেশে না যাওয়াৰ কাৰণ এ-দেশেই আৱবী-কাৰ্সীৰ মাধ্যমে উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ব্যবস্থা ছিল। এবং পাঠান-মোগল যুগেও কাবুল, কান্দাহাৰ বা মজাৰ-ই-শৰীফে কোনো বড় কেন্দ্ৰ গড়ে ওঠে নি—উঠেছিল দেওবন্দ, ৱামপুৰ, হুৱট অঞ্চলেৰ ৱাদেৱে, হায়দ্ৰাবাদে, ঢাকায়, সিলেটে। বস্তুত কাবুল অঞ্চলেৰ মেধাবী ছাত্ৰ মাত্ৰই আমাৰুৱাৰ আমল পৰ্যন্ত দিল্লী অঞ্চলেই পড়াশুনো কৰতে আসত। আমি কাবুলে যাই ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন যে কয়টি আৱবী-কাৰ্সীজ পণ্ডিতেৰ সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ-পৰিচয় হয় তাঁৱা সকলেই উহুও জ্ঞানভেন, কাৰণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস কৰেছিলেন ভাৱতে। ঠিক যে ৱকম বৌদ্ধ যুগে চীনা তথা অগ্ৰাণ্ণ বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বী অমণৱা এদেশে শিক্ষালাভেৰ জগু আসতেন, এধনো অৱবিস্তৰ আসেন।

এমন কি, যে কাইৰোৰ আজহৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক হাজাৰ পনৱো বছৰ ধৰে ধীৰে ধীৰে মুসলিম শাস্ত্রচৰ্চাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰব্বহুৎ সৰ্বাপেক্ষা বিত্তশালী কেন্দ্ৰৰূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও ভাৱত থেকে কখনো খুব বেশী ছাত্ৰ যায় নি। আমি যখন (১৯৩০-৩৫) কাইৰোতে ছিলুম তখন পাক (বৰ্তমান) ভাৱত উভয়ে মিলিয়েও ত্ৰিশ-পঁয়ত্ৰিশ জনাৱও বেশী ছাত্ৰ ছিল না। পক্ষান্তৰে, সেখানে আৱবী দৰ্শনেৰ যে পাঠ্যপুস্তক সম্মানিত ছিল, সেটি জনৈক ভাৱতীয় মৌলানা দ্বাৱা লিখিত।

[এস্থলে সম্পূৰ্ণ অবাস্তৱ নয় বলে উল্লেখ কৰি, সাত শ বছৰ আৱবী-কাৰ্সীৰ কঠিন একনিষ্ঠ সাধনা কৰে ভাৱতীয় মৌলবীৱা জ্ঞানবিজ্ঞান ধৰ্মচৰ্চায় ধ্যাতি অৰ্জনী কৰেছিলেন সত্য, কিন্তু আৱবী দূৰে থাক, কাৰ্সী সাহিত্যেও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পাৱেন নি। তাৱ এক মাত্ৰ কাৰণ মাতৃভাষা ভিন্ন অগ্ৰ কোনো ভাষায় সাহিত্যেৰ কুৎস্নিনাৱ গড়া অসম্ভব। তাই যখন দেখি, মাত্ৰ এক শ বছৰ ইংৰেজী

চর্চায় পর এদেশে, কেউ কেউ সে সাহিত্যে ঢিপি তৈরি করে ভাবছেন সেটি মিনার, তখন বড়ই বিষয় বোধ হয়। তাঁরা কি সত্যই ভাবেন, সেই সাত শ বছরের ভাষা শুণীজ্ঞানীরা—এবং তাঁরা রাজার্থীমূল্য পেয়েছিলেন চেরাপুঞ্জির বর্ণণের চেয়েও বেশী—এঁদের তুলনায় অভিশয় কুকুটমস্তিকধারী ছিলেন? তাই যখন দেখি র'য়্যাবোর বদলে হ'য়্যাবো—তা হলে 'rare' অর্থাৎ 'বিরল' হবে 'হ্রাস', France হবে 'ফ্রাঁস' এবং যেখানে 'r' অক্ষরের সঙ্গে উ-কার যুক্ত, যেমন 'প্রকৃত', সেখানে গতি কি? কারণ 'প'র নিচে 'হ' এবং তারও নিচে উ-কার দিয়ে তৈরি কোন 'হাঁসজারুই' (হাঁস + সজারু + রুই) জাতীয় অক্ষর তো বাঙলা ছাপাখানায় নেই—তখন শুধু সবিনয় সকাতর সভয়ে প্রশ্ন শুধোতে ইচ্ছা করে, 'আপনারা তরুণরা, যে নানাবিধ ভাষা শিখছেন সেটা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু একবার একটু ভেবে নিলেই তো হয় যে মাইকেল, জ্যোতি ঠাকুর, বীরবল, ধনিবিদ্বদ সুনীতি চট্টো, শহীদুল্লাহঁরা কেউই এই বিদকুটে ফরাসী 'র' ধ্বনি যে আলাদা সেটা লক্ষ্য করলেন না, এটা কি প্রকারে সম্ভবে?' এবং শেষ নিবেদন—জানি আপনারা পেতায় যাবেন না, ফরাসী জর্মন এমন কি ইংরাজি 'r'ও বাঙলা 'র'-এর মত নয় সেটা সত্য, কিন্তু তাদের 'r'র সঙ্গে যে আমাদের 'র' মিলছে না সেটা আমরা 'র'-এর উচ্চারণ করার সময় মুখগহ্বরের অগ্র জায়গা থেকে করি বলে নয়—তাদের আপত্তি আমরা 'r' উচ্চারণের সময় সেটিকে 'ট্রিল' করি বলে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি 'প্যারি' (প্যারিস) তখন ফরাসী স্তন্যপায় যেন আমরা 'r'টা তিনবার উচ্চারণ করে বসে আছি। বিচক্ষণ ফরাসী গুরু তদুত্তরে বলেন, 'কিন্তু মসিয়ো Paris শব্দে মাত্র একটি "r" আপনি তিনটে "r" উচ্চারণ করলেন যে?' আমি আরো জানি—আপনারা আরো পেতায় যাবেন না যদি বলি, ফরাসী জর্মন উভয় অভিনেতাই [এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধনিবিদ্বদ পণ্ডিতের চেয়ে এঁরাই সর্বসাধারণের কাছে অধিকতর সম্মান লাভ করেন—ইংলণ্ডেও বার্নার্ড শ-কে যে বি বি সি উচ্চারণ-বোডে সম্মানে নিমন্ত্রণ করা হত তাঁর কারণ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, নাটো উচ্চারণ বাবদে তাঁর ওয়াকিকহালত্ব] চেষ্টা করেন বাঙালীর 'র'র মত আপন 'r' উচ্চারণ করতে !!! —কিন্তু ট্রিল না করে! অর্থাৎ জর্মনে যাকে বলে হ্যাল—উজ্জল—ফরাসীতে

১ কথাটা জর্মনে hell, কিন্তু বাঙলায় আমি 'হেল' না লিখে হ্যাল কেন লিখলুম সে বিষয় নিয়ে হৃদয় ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি। কারণ জর্মনে পত্রলেখক ইটিকে আমার 'হিমালয়ান ব্লাগার' পর্যায়ে ফেলেছেন।

যাকে বলে ক্লার—ক্লয়ার, পরিষ্কার, স্বচ্ছ ‘r’ উচ্চারণ করাটাকে আদর্শ ‘r’ উচ্চারণ মনে করেন। তাই মোটামুটি ভাবে বলা যায় করাঙ্গী বা জর্মন এমন কি ইংরিজী ‘r’ উচ্চারণ করার সময় যদি জিহ্বাটাকে মুখের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে— অর্থাৎ সেটাকে তালু, মুখ বা দাঁতের পিছনে ছুঁতে না দিয়ে, এবং কাজে কাজেই কোনো প্রকারের ট্রিল বা ফ্ল্যাপ করবার সুযোগ না দিয়ে—বাঙলা ‘র’ ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে ঐ তিন ভাষায় ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতরাই আদর্শ “r” উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন। তার পর অবশ্য যদি কেউ সেটাকে খাঁটি প্যারিসিয়ান করতে চান তবে সেটা গলা থেকে আরবী ‘গাইন’ ঘেঁষা করবেন, দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত করতে হলে ফার্সী ‘খে’ ঘেঁষা করবেন এবং জর্মন বলার সময় কলোন-বন্ অঞ্চলের ‘r’ উচ্চারণ করতে হলে সেটাকেও ঐ ফার্সী ‘খে’ ঘেঁষা করবেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যে, ট্রিলিং ছুঁকমটি যেন করা না হয়। বীরভূম অঞ্চলে যখন ‘রাম’-এর পরিবর্তে ‘আম’ উচ্চারণ শোনা যায় তখন ঐ ট্রিলটি করা হয় না বলে—এবং রেডুক্‌সিয়ো আড্‌ আব্‌সুড্‌ম হয়ে যাওয়ার ফলে ‘র’-এর সর্বনাশ হয়ে ‘অ’ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। ইংরিজীতেও তাই, কিংবা প্রায় তাই হয়—যখন ‘r’ কোনো স্বরবর্ণের পরে আসে। যথা ‘hard’ ; এখানে ‘r’ শুধু আগের a-টিকে দীর্ঘ করে। ‘r’-এর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম লোপ পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কোনো কোনো ধ্বনিবিদ্ উচ্চারণ দেখাবার সময় তাই ‘r’ হরফটি উন্টো করে দিয়ে লেখেন এবং ছাপাখানায়ও হরফটি উন্টো করে ছাপা হয়—লাইনো বা টাইপ রাইটারে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। আর ‘r’ বলার সময় যদি বাঙলার মত সেটাকে ট্রিল করতে চান, তবে প্রাণভরে করা যায় ইতালির ‘r’ উচ্চারণ করার সময়। ইংরিজীতে যে স্থলে ‘Irregular’ বলার সময় প্রথম যে ছুটো ‘r’ একসঙ্গে এল, সে ছুটোকে দু’বার উচ্চারণ করতে তো দেয়ই না, একবারই—বাঙলার হিসেবে—প্রাণভরে করতে দেয় কই? সেখানে ইটালিয়ান ‘birra’ (বিয়ার) বলার সময় যদি ‘r’-টা প্রেমসে ট্রিল না করেন—কম-সে-কম দু’বার—তবে বিয়ারের বদলে সেই যে ফুটোয় ভর্তি এক রকম পনির হয় বেয়ারা তারই ফুটোগুলো শুধু প্লেটে করে হয়তো নিয়ে আসবে! এবং শেষ কথা : করাঙ্গী জর্মন ধ্বনিবিদ্ যে তাঁদের ‘r’ পরিষ্কার ক্লার হাল উজ্জল রাখতে চান, তার অগ্রতম কারণ, গ্রীক এবং লাতিন যে ‘r’ আছে সেটা সংস্কৃত ‘র’-এরই মত পরিষ্কার উজ্জল—এবং জানা-অজানাতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মাত্রই গ্রীক-লাতিন থেকে খুব দূরে চলে যেতে চান না।

[এরই উদাহরণ ‘গুড্‌বাই, মি: চিপ্‌স্‌ ফিল্মে আছে’।]

সত্য জ্ঞানলাভের জন্য তৃষার্ত জন যুগে যুগে বিদেশ গিয়েছে, বিধর্মীর কাছে গিয়েছে। পয়গম্বর বলেছেন, ‘জ্ঞানলাভের জন্য যদি চীন যেতে হয় তবে সেখানে যেয়ো’—বলা বাহুল্য, তাঁর আমলে চীন দেশে কোনো মুসলমান ছিলেন না এবং তাই ধরে নিতে পারি বিধর্মী ‘কাফের’র কাছ থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করতেও তিনি আপত্তিজনক কিছু পান নি।

কিন্তু এই যে ‘ফরেন’ যাওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল প্রায় শ’ খানেক বছর আগে এবং স্বরাজ পাওয়ার পর—কিম্বাশ্বৰ্যমতঃপরম্—এখনো বাড়তির দিকে, তার বেশীর ভাগই ছিল ‘ইস্টাষো’ নিয়ে আমার উদ্দেশ্যে—পেটটাকে এলেমে ভর্তি করার জন্য নয়। পাঠান এবং মোগল রাজারা এ-দেশেই বাস করতেন, এইটেই তাঁদের মাতৃভূমি, কাজেই বিদেশের ইস্টাষোর প্রতি তাঁদের কোনো অহেতুক মোহ ছিল না—যদিও বিদেশাগত হুমুরী গুলীকে তাঁরা আদর করে দরবারে স্থান দিতেন। কিন্তু ইংরেজ কলকাতায় বসেও চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো লণ্ডনের দিকে, Kedgerie (‘কেজরী’—খিচুড়ি—কুশর, কুশরার ?—) খাওয়ার সময় চিন্তা করতো আল্লায় মালুম কিসের।

অতএব সেখানে থেকে যদি কপালে একটি ‘ইস্টাষো’ মারিয়ে নিয়ে আসা যায় তবে পেটে আপনার এলেম গজ্‌গজ্‌ করুক আর নাই করুক, আপনি ‘ফ্রেন্স্‌ ক্রম্‌ ক্রিস্টিয়ান হোম’, আপনিও এখন গোরা রায়। তাই স্বরাজ লাভের পরও

অতাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।

দিবাভাগে মন্দ ভাগ্যে তার মার খায় ॥

সাবিত্রী

দক্ষিণ ভারতের একটি সানারিয়ারামে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যামো গোড়াতেই ধরা পড়েছিল বলে কেস্‌ খারাপ হতে পায় নি। আমাকেও তাই কোন প্রকারের সেবা-শুশ্রূষা করতে হত না। হাতে মেলা সময়। তাই কটেজে কটেজে—এ-সব কটেজে থাকে অপেক্ষাকৃত বিদ্রশালীরা আর বিরাট বিরাট লাটের একাধিক জেনারেল ওয়ার্ড তো আছেই—ডাক্তাররা সকাল বেলাকার রোগী-পরীক্ষার রোঁদ সেরে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরতাম আমার রোঁদে। বেচারাদের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন একা-একা শুয়ে

স্বয়ে কাটাতে হয় বলে কেউ তাদের দেখতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ যে কী রকম খুশীতে উজ্জ্বল—এবং যে-ক’টি ফোঁটা রক্ত গায়ে আছে, সব ক’টি মুখে এসে যেত বলে রাঙা—হয়ে যেত, সেটা সত্যই অবর্ণনীয়।

করে করে প্রায় সবাইকেই আমি চিনে গিয়েছিলুম—তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীই বেশী।

একটি কটেজে আমি কথখনো যাই নি, ডাক্তার ভিন্ন আর কাউকে কখনো যেতেও দেখি নি। রোগীর পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত একটি যুবতী—বরঞ্চ তরুণী-বৈধা যুবতী বললেই ঠিক হয়—মোড়ার উপর বসে উলের কাজ করে যাচ্ছেন; তাই বোধ হয় কেউ তাঁদের বিরক্ত করতে চাইতো না।

একদা রোঁদ শেষে, পথিমধ্যে হঠাৎ আচমকা বৃষ্টি। উঠলুম সেই কটেজ-টাতেই।

যুবতীটি ধীরে ধীরে মোড়া ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতি ক্ষীণ হ্রাস হাসি হেসে বললেন, ‘আস্থন, বস্থন। কী ভাগ্য বৃষ্টিটা নেমেছিল। নইলে আপনি হুতো কোনদিনই এ-কটেজে পায়ের ধূলি দিতেন না।’

কী মিষ্টি গলা! আর সৌন্দর্যে ইনি রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সে কী শাস্ত সৌন্দর্য! গভীর রাত্রে, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে, আমি নিস্তরঙ্গ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে দেখেছি এই শাস্ত ভাব—দিক্-দিগন্ত জুড়ে। আমরা প্রাচীন যুগের বাঙালী। চট করে অপরিচিতার মুখের দিকে তাকাতে বাধা বাধা ঠেকে। এঁর দিকে তাকানো যায় অসঙ্কোচে।

রোগীও সুপুরুষ, এবং এই পরিবেশে খাটে শুয়ে না থাকলে বলতুম, রীতিমত স্বাস্থ্যবান। শুধু মুখটি অস্বাভাবিক লালচে—যেন গোরা অফিসারের মুখের লাল।

জীর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললেন—গলাটা কিন্তু রোগীর—‘রোজ চারবেলা দেখি আপনাকে এ-পথ দিয়ে আসতে যেতে। পাশের কটেজে শুনি আপনার উচ্চহাস। শুধু আমরাই ছিলাম অম্পৃশ্য! অথচ দেখুন, আমি মুখজ্যো বায়ুন—’

আমি গল্প জমাবার জন্ত বললুম, ‘কোন্ মেল? আমার হাতে বাঁড়ুজ্যো ফুলের মেল একটি মেয়ে আছে।’

এবারে দুজনার আনন্দ অবিমিশ্র। এ লোকটা তাহলে পরকে ‘আপনাতে’ জানে। তিন্মুহূর্তে জমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, ‘আপনারা দুজনাই বড় খাটি বাঙলা বলেন, কিন্তু একটু যেন পুরনো পুরনো।’

মুখ্যো বললেন, ‘আমি ডাক্তার—অবশ্য এখন অবস্থা “কবরাজ ! ঠেকাও আপন যমরাজ।” তা সে যাকগে ! আসলে কি জানেন, আমরা দুজনাই প্রবাসী বাঙালী । তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ে । আমার মা কাশীর, ঠাকুরমা ভট্ট-পল্লীর । সেই ঠাকুরমার কাছে শিখেছি বাঙলা—শাস্ত্রীঘরের সংস্কৃতবেঁধা বাঙলা । সেইটে বুনিয়াদ । সবিতা আমাদের প্রতিবেশী । আমার ঠাকুরমার ছাত্তী । আমরা দুজনা হুবহু একই বাঙলা পড়েছি, শিখেছি, বলেছি । তবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত উর্দু শিখেছি বলে মাঝে মাঝে দু-একটি উর্দু শব্দ এসে যায়—আমার ভাষাতে, সত্যি তার না । আপনার খারাপ লাগে ?’

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, ‘তওবা, তওবা ! আমি বাঙালী মুসলমান ; আমরা ইওহী দু-চারটে কালতো আরবী-কার্সী শব্দ ব্যবহার করি।’

পাশ কিরে, আপন দুই বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন । আমি আমার হাত দিলুম । দু’হাত চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে, গভীর আত্মপ্রসাদের কীর্ত্তনাস ক্লে বললেন, ‘বাঁচালেন । আপনি মুসলমান !’

আমি একটু দিশেহারা হয়ে চূপ করে রইলুম ।

জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি যত্নতত্ত্ব খান এখানে ? ডাক্তার হিসেবে বলছি, সেটা কিন্তু উচিত নয় ।’

আমি বললুম, ‘আমি যত্নতত্ত্ব যা-তা খাই, এবং ভবিষ্যতেও খাবো । অপরাধ নেবেন না ।’

‘বাঁচালেন !’ এবারে আমি আরো দিশেহারা । আমি তাঁর পরামর্শ অমান্য করছি দেখে তিনি খুশী ।

‘বাঁচালেন ! জানেন, প্রথম দিনই আপনার চেহারা দেখে, অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলুম আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে ।’

জীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমায় বলি নি, সবিতা ?’

সবিতা একক্ষণ ধরে শুধু উল বুনো যাচ্ছিলেন । মাথা তুলে সত্মতি জানিয়ে বললেন, ‘এমন কি, চলার ধরনটি, গলার স্বরও !’

মুখ্যো বললেন, ‘সেই বন্ধুটি যদি আজ এ-লোকে থাকতো, তবে আজ আমার এ-দুর্দশা হত না । সে কথা থাক । মূল বক্তব্য এই : ঠাকুরমা প্রাস তামাম পরিবার, প্রাস সেই সখার পরিবার—সবাইকে লুকিয়ে, বিস্তার ছলনা-জাল বিস্তার করে আমি ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি ওর মায়ের তৈরী মর্গী-মটন । সে খেত আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে । আপনি বোধ হয় জানেন না—’

‘বিলক্ষণ জানি, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আপনার ঠাকুরমার পাড়ার লোক -

বাড়িতে দিল্লী-বিদেশী সবাইকে খাওয়াতেন। তাঁর ছেলে, স্বর্গত বিনয়তোষ তিনিও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। ঝাড়া আটটি বছর প্রতি রোববারে, তাঁর সামনে বসে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছি আমি, মুসলমান।’

ডাক্তার বললেন, ‘তারপর ঠাকুরমা মা আর সবাই গত হলেন। রইল ঐ দোস্ত-ইয়ার-সখা বেদার-বখ্শ। একই বছরে দুজনায় ডাক্তারি পাস করলুম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়েছে। সবিতা রাঁধে ভালো, কিন্তু তার মা তাকে বলে দিয়েছিলেন, ‘অন্তত রান্নার ব্যাপারে বাপের বাড়ির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে, স্বামী যেভাবে খেতে চায় ঠিক সেইভাবে খাওয়াবি।’ তাই সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি। অতএব স্ত্রীর, কাল দ্বিপ্রহরে এখানে একটু হবিষ্যন্ন করবেন—’ হেসে বললেন, ‘অবশ্যই, মোগলাই! আসলে কি জানেন, এই যে চোখের সামনে সবিতা উদয়াস্ত উল বোনে, এটা, it gets on my nerves! আর সবিতা একটা পারফেক্ট আর্টিস্ট। রন্ধনে। তার অহুশীলন নেই, রেওয়াজ নেই। আপনারা ক্লেশক হয় না? আমার তো ওসব খাওয়া বারণ। নিজের জন্ত—’

আমি সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলুম; বাড়িতে কেউ না থাকলে মা হাঁড়ি পর্যন্ত চড়াতো না। তেল-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তো। আর এই সবিতা নাকি বিশ্বাস বিবর্ণ মাছসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ, পাতলাসে পাতলা যেন কড়াই-দোয়া-জল রূপ নামে পরিচিত গরবয়স্কা স্বামীকে খেতে দিয়ে নিজে গণ্ডার-গ্রাসে খাবে বিরয়ানী, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!

আমি বললুম, ‘ফিন্‌সে তওবা! তা-ও কখনো হয়। কিন্তু আমি একা-একা খাব?—কেমন যেন?’

অর্তনাদ করে বললেন, ‘আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, রান্নাঘর থেকে সবিতার রেওয়াজের গন্ধ আমার নাকে আসবে—আচ্ছা, আপনি না-হয় আড়ালেই থাকেন, শুধু আমি পদগুলো কম্পোজ করে দেব। আপনাকে এ-নিমন্ত্রণ সাহস করে জানালুম, আপনি যত্নতত্ব খান শুনে। নইলে—’

আমি বললুম, ‘ডাক্তার, আমি জানি আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা বারণ। কাল সকালের রৌদ সেরেই আসবো। দুপুরে খাব।’

সবিতা রাস্তা অবধি নেমে এসে বললেন—মাথা নিচু করে, প্রায় হাতজোড় করে, ‘এই দু’বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এই প্রথমবার তিনি পুরো আধ ঘণ্টা ধরে খুশিতে আনন্দে সময় কাটালেন। আপনি দয়া করে আসতে ভুলবেন না। বড় ডাক্তার বলেছে, উনি ফুর্তিতে থাকলে ভাড়াভাড়ি সেরে উঠবেন। আমি

ঠকে বাঁচাতে চাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—’

হঠাৎ ধপ্ করে রাস্তার পাশে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর তার মাথা ঠুকে দিল। এত হুংখের ভিতরও আমি দেখলুম, বহুর জলের মত একমাথা গোছা গোছা গাদা গাদা কালো চুল ঘোমটার বাঁধ সরিয়ে আমার দুই গোড়ালির হাড় পেরিয়ে, মাঝ-হাঁটু অবধি ছাপিয়ে দিল। এ-চুল আমি দেখেছি, অতিশয় শৈশবে, আজ মনে হয়, যেন আধাস্থপে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে, আমার মায়ের মাথায়।

সতীসাক্ষী যুবতীকে স্পর্শ করা গুনাহ্। জাহান্নামে যাক গুনাহ্।

দু’হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরলুম। বললুম, ‘মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।’

সীমন্তিনী বললে, ‘আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।’ ॥

আধুনিক

থেকে থেকে ‘মর্ডান’ মেয়েদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানা জাতের চিঠি বেরোয়। সেগুলোর মূল বক্তব্য কি, তার সবিস্তার বয়ান দেবার প্রয়োজন নেই এবং সেগুলো যে সর্বৈব ভিত্তিহীন সে-কথাও বলা যায় না। হালে পাড়ার বুড়োরা আমাকে দফে দফে মডার্নদের ‘কুকীর্তি’র কাহিনী কয়ে গেলেন। সেই স্ববাদে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এদেশে ‘পেট-কাটা’ ‘নখরাঙানো’ মডার্নদের আবির্ভাব হয় নি, এ তো জানা কথা, কিন্তু ‘মর্ডান’ মেয়ে সর্বযুগে সর্বদেশেই থাকে। আমার মনে হত, সে যুগের মডার্নতম দেখা যেত চাঁদপুর—নারায়ণগঞ্জ—গোয়ালন্দী জাহাজে। এরা ঐসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-বৈজ্ঞ-কায়স্থদের মেয়ে—তবে বৈজ্ঞই বেশী—কলকাতায় আসতো, যেতো কলেজে পড়বে বলে। এক একটির চেহারা ছিল অপূর্ব। তরী, শ্রামঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী—আপন আনন্দে খার্ড ক্লাস ডেকের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, চায়ের স্টলে বসে খেতেও ওদের বাধে না। প্রাচীনরা ওদের দিকে একটু ঝাঁক নয়নে তাকালেও একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না, ওরা বেহায়া বা বেশরম ছিল।

সে-আমলে ইন্টার ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জগৎ দুটো জালে ঘেরা কামরা—বা খাঁচা থাকতো। একটা পুরুষ, একটা মেয়েদের। খুব যে আরামের ছিল তা নয়, তবে যে-সব লাজুক বউঝিরা পরপুরুষের সামনে কখনো বেরোয় নি তারা সেখানে

খানিকটে আরাম বোধ করতো।

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাতেই শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, থার্ড ক্লাস ডেক ও দুটো খাঁচা অঞ্চলে হঠাৎ আন্দোলন উদ্ভেজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বয়েস আমার তখনো কম, তাই কৌতূহল ছিল বেশী। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে শুধোই, ব্যাপারটা কি ?

হট্টগোল হচ্ছে বটে, কিন্তু যাকেই প্রশ্ন শুধোই সে-ই পাশ কাটিয়ে যায়। এন্তেক চা'র স্টলের দোকানটি পর্যন্ত এমন ভাব করলে যেন আমার প্রশ্নটা আদৌ শুনতে পায় নি।

সু-রিয়ালিজম দাদাইজম খারা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি যদি তখনকার অবস্থার বর্ণনাটা দিতে গিয়ে বলি, ডেকের সর্বত্র যেন 'ছি ছি' আঁকা, কানে আসছে 'ছি ছি' স্বর, নাকের ভিতরও যেন 'ছি ছি' ঢুকছে।

টুয়েটিনাইন খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দশ-পঁচিশের দান একদিকে অবহেলে পড়ে আছে, এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটালা, আর সারেক্স জাহাঙ্গময় হস্তদস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু সর্বোপরি ঐ ছি ছি ভাব।

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, মেয়েদের ইন্টার ক্লাসের খাঁচা বেবাক ফাঁক—খানিকক্ষণ পূর্বেও যেটাকে কাঠাল-বোঝাই দেখে গিয়েছি—অবশ্য আড়ময়নে। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খাঁচাটার এক কোণায় আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা কি যেন একটা বস্তু—মাগুঘই হবে—পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হল, সেটা গোঙরাচ্ছে, কিন্তু ঐ 'ছি ছি'-র ভিতর দিয়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারলুম না।

এমন সময় খানসামার সঙ্গে দেখা। পূর্বেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে সিলেটি।

ইতিউতি করে বললে, 'কেলেকারি ব্যাপার। ইন্টার ক্লাসের ঐ মেয়েটি গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার! একে কেউ সাহায্য করছে না কেন? ষ্টিমারে, তো গাওয়া গাওয়া বুড়ী-হাবড়ী রয়েছে যারা কুড়িবুড়িতে আঙাবাচ্চা বিইয়েছে?'

খানসামার পো ঈষৎ লাজুক প্রকৃতি ধরে। আবার গাই-গুঁই করে বললে, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে, হুজুর, মেয়েটার বিয়ে হয় নি।'

'তা হলে এল কোথেকে? সঙ্গীসাথী নেই?'

'যা শুনেছি, তাই বলছি হুজুর। কেউই সঠিক খবর জানে না। মেয়েটার সঙ্গে একটা ছোকরা ছিল ওরই বয়সী। সে মাঝে মাঝে ওকে চা-টা পৌঁছে

দিয়েছে। ছেলেটা আমার কাছেই মূর্গা-কারি খেয়েছে। মেয়েটা কোনো কিছুই খেতে রাজী হয় নি। শুধু চা-টি খেয়েছে অনেক চাপাচাপির পর—বোধ হয় জাতঘরের হিন্দু মেয়ে।’

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললুম, ‘তা তো বুঝলুম, কিন্তু ছেলেটা কোথায়? সেই তো জিজ্ঞেসার।’

‘গর্ভযজ্ঞগার প্রথম লক্ষণ দেখা দিতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে মাঝখানের স্টেশনে নেমে পড়ে পালিয়েছে। লোকে অনুমান করছে, মেয়েটাকে সে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য। দেশ থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়, তাই হঠাৎ এ গর্দিশ এসে পড়েছে।’

আমি বললুম, ‘সেও বুঝলুম, কিন্তু মেয়েটা বিপদে পড়েছে, আর কেউই সাহায্য করছে না! এটা একটা কথার কথা হল?’

অসহায় ভাব দেখিয়ে বললে, ‘হিন্দুদের ব্যাপার, কি করে বুঝি বলুন! হু’ একটি মুসলমান আছে। তারাও হিন্দুদের ঐ সব দেখে বোধ হয় সাহস পাচ্ছে না।’

আমি বললুম, ‘জাহাজে ডাক্তার নেই? প্যাসেঞ্জারের ভিতরেও?’

‘তারই সম্ভান চলছে, ছজুর।’

তারপর খানসামা বিজ্ঞভাবে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে যেন আপন মনে বললে, ‘যত সব নাদান বেকুবের কারবার। আরে বাপু, মেয়েটার মাথায় এক খাবড়া সিঁচুর আগে লেপটে দিলেই তো পারতো!’

(জানি নে, তাতে করে কি হত! হালে এ্যারোপ্লেনে নাকি এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেন্স সাহায্য করতে রাজী হয় নি)।

আপন ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় এক সহদয় প্যাসেঞ্জার আমাকে পাকড়ে বললে, ‘আপনি চলুন না, স্ত্রীর।’

তাজ্জব মেনে বললুম, ‘আমি।’

‘কেন? আপনি তো ডাক্তার!’

বুঝলুম, আমার ট্রাকে বা রিজার্ভেশন কার্ডে দেখেছে, লেখা, Dr.। কাতর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, সেটা ভিন্ন বস্তু, বেকার, ‘ফরেন’। এটা দিয়ে মাছিটার ছেঁড়া পাখনাও জোড়া দেওয়া যায় না। লোকটি বড়ই সরল। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, চিকিৎসার ডাক্তার এক প্রাণী, আমার ডক্টরেট জিসংসারে কারো কোনো কাজে লাগে না। এ ধরনের গেরো আমার জীবনে আরো হুঁহুবার হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে জাহাজে নতুন চাকল্য। কোথেকে পাওয়া গেছে এক না-পাস কম্পাউণ্ডার। সে বোধ হয় ‘শ্মশান-চিকিৎসার্তা’ করতে রাজী হয়েছে। তবে বলছে, একটি মেয়েছেলের সাহায্য পেলে ভালো হত।

তারপর যা দেখলুম, সে দৃশ্টি আমার জীবনে ভুলবো না।

ঐ যে পূর্বে বলছিলুম, জাহাজে তখনকার দিনের কলেজের দু’পাচটা ‘আধুনিকা’ নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরই একটি—লম্বা, ছিপছিপে শ্রামবর্ণ, পরনে সাদামাটা শাড়ি ব্লাউজ—গমগম করে কম্পাউণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল, দু হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তখন চতুর্দিক থেকে উঠেছে তার দিকে ‘ছ্যা ছ্যা ছি ছি’ রব। সকলের টার্গেট তখন ঐ আসন্নপ্রসবা নয়—তখন এই ভদ্রকন্যা।

আমি জীবনে দু’জন পরমহংস দেখেছি।

আর এই দেখলুম, একটি পরমহংসী। ঠোটে ঠোটে চেপে নয়, সর্ব দিক্কার, সব ব্যঙ্গ, সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করে প্রসন্ন বদনে সে এগিয়ে যাচ্ছে !!

ফরাইজ্

‘বাপের বাড়ি’, ‘শ্বশুরবাড়ি’, ‘পিতৃগৃহ’, ‘পতিগৃহ’, ‘মুখ্যগৃহ’, ‘গোপ গৃহ’ ইত্যাকার বৃহৎ প্রকার ‘গৃহ’ের নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রাস্তরে হয়ে যাচ্ছে। এই স্ববাদে মুসলমানদের ভিতর কি রীতি প্রচলিত আছে সেটার উল্লেখ বোধ হয় সম্পূর্ণ অবাস্তব হবে না। কারণ হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের লোকাচারে, বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন বাবদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উভয় ধর্মাবলম্বীরই ভাষা বাঙলা এবং মুসলমান মেয়েও বলে ‘বাপের বাড়ি’ ‘শ্বশুরবাড়ি’। তবে একটা ব্যাপারে সামান্য তফাত আছে।

অন্ন হোক, বিস্তর হোক, পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান মেয়ে বাপের সম্পত্তির কিছুটা হিস্তে পায়। অর্থাৎ পৈতৃক ভদ্রাসনেও তার আইনত অংশ বিদ্যমান থাকে। একেই বলে ‘ফরাইজ্’।

কার্যত কিছু সে এ-ফরাইজ্ দাবি করে না। এমন কি পতিগৃহে তার লোভী স্বামী যদি তাকে গ্রায্য হক পাওয়াব জ্ঞান ক্রমাগত টুইয়ে দিতে থাকে তবে সে সেটার দাবি করে না, মোকদ্দমা করতেও রাজী হয় না—আর স্বামী নিজের থেকে কোনো দাবি-দাওয়া করতে পারে না, কারণ হক তার জীর, তার নয়।

বোন কেন মোকদ্দমা করে না, তার একাধিক কারণ আছে। লোকাচারে বাধে (এতে হয় তো কিছুটা প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাব আছে), এবং দ্বিতীয়ত তার অল্প স্বার্থ আছে। সে যদি তার গ্ৰায্য পাওনা নিয়ে নেয়, তবে সে অর্থ হয়তো খৰ্চা হয়ে যাবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে যদি কোনো কারণে অসহায় হয়ে যায়—দেবর ভাণ্ডার তাকে অবহেলা করে—তবে তার অল্প আশ্রয় থাকে না। পক্ষান্তরে সে যদি ফরাইজ্ না নেয়, তবে সে তারই হকের জোরে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি স্বস্তর ভাণ্ডার স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও যদি তার উপর অত্যধিক চোটপাট হয় তবে সে ফরাইজের হকে বাপের বা (বাপ মরে গিয়ে থাকলে) ভাইয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আরো একটা কারণ আছে। মুসলমান মেয়ে মাত্রই আশা করে, সে যেন বছরে অন্তত একবার তার বাপ-মা, ভাইবোন, ছেলেবেলার পাড়াপ্রতিবেশীকে দেখতে যেতে পায়। এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়ের নাম পদবী বদলায় না। মুসলমান বিবাহ অনেকটা সিভিল ম্যারিজের মত কনট্রাক্ট ম্যারিজ—সেক্রেমেন্টাল নয়। অপরাধ যদি না নেন, তবে উল্লেখ করি, আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ সিকন্দর আলী। অথচ আমার মা চিরকালই নাম সই করেছেন, আমতুল মন্সান খাতুন চৌধুরী। মিসেস আলী, মিসেস সৈয়দ—বা বেগম আলী এসব হালে ইংরেজের অঙ্করণে হয়েছে।

*

*

এবারে গরীব দুঃখী চাষীবাসীদের একটি উদাহরণ দি। পূব বাঙলার।

মনে করুন চাষা কেরামতুল্লা মারা গেছে। তার মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছে বেশ দূরে ভিন্ গাঁয়ে। জয়নবের বাল্যাবস্থায় তার মা মারা যায় বলে কেরামতুল্লা দুসরা শাদী করেছিল। সে পক্ষের ছেলে আকরম বিধবা মাকে নিয়ে, বিয়ে করে মোটামুটি স্বখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। সৎ বোনকে আর স্মরণেই আনে না। তার মাও সতীনের মেয়ে জয়নবকে ছ' চোখে দেখতে পায় না। অতএব জয়নব বেচারী বাপের বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। জয়নবের স্বস্তরবাড়ির গায়ের লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। ওদিকে লোভী স্বামীও বলে, 'ফরাইজ্, চেয়ে নে।'

জয়নব বেচারী তখন যদি দৈবযোগে বাপের গায়ের কাউকে পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠায় তাকে যেন এসে বাপের বাড়িতে কয়েকদিনের ক্ষুদ্র নিয়ে যায়—একেই বলে 'নাইওর' যাওয়া। ভাই খবর পেয়েও গা করে না—আর সৎমার তো কথাই নেই। বেচারী জয়নব একাধিকবার খবর পাঠিয়ে

হয়রান হয়ে গেল। ওদিকে বাপের গাঁয়ের লোক তো আর তার স্বভবের গাঁয়ে নিতি নিতি আসে না যে নিতি নিতি খবর পাঠাবে।

তখন সে ধরে অস্ত্র পছা। নদীতে জল আনতে গিয়ে স্রোত পেলেই সমস্ত কাটায় বিস্তর। এবং স্বভাবতই তার গাঁয়ের সব মাঝিদের সে চেনে। তাদের কাউকে দেখতে পেলে পাড়ে বসেই চিৎকার করে তার করিয়াদটি জানিয়ে দেয়। সবিস্তারে বলতে হয় না—সবাই সব খবর জানে।

তাতেও যদি ওষুধ না ধরে, তখন সে ধরে রক্তমূর্তি।

শাসিয়ে দেয়, তাকে নাইওর না নিয়ে গেলে সে ফরাইজের মোকদ্দমা করবে। এইবার ভাইয়ের কানে কিঞ্চিৎ জল যায়। তাও পুরোমাত্রায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মুফব্বীদের কানেও তাবৎ করিয়াদ পৌঁচেছে—বিশেষত সেই সব বৃদ্ধদের কানে যারা বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। তাঁরা তখন ছোকরাকে বুঝিয়ে বলেন, ‘তোর আছে কুলে আড়াই বিষত জমি—আচ্ছা, তার না হয় কিছুটা গেল; কিন্তু তোর বসত-বাড়িতেও যে ছুঁড়ির হিশ্তে রয়েছে। সেইটেও তুই লাটে তুলবি নাকি? যা, যা, বোনকে নিয়ে আয়।’

আমি এতক্ষণ যা বললুম, এসব পূর্ব-বাঙলার লোকসঙ্গীতেও আছে। তারই একটির শেষ দুই লাইনে আছে,

“থাকো গো বোন, থাকো গো বোন,

কিলগুঁতা খাইয়া,

আষাঢ়^১ মাসে লইয়া যাইমু

পঞ্জীরাজ ওড়াইয়া ॥”

ভাই নৌকা নিয়ে আসার খবর পাওয়া মাত্রই বোন লেগে যায় নানারকম মিষ্টি পিঠে বানাতে। শাশুড়ী গজর গজর করে, কিন্তু জা-রা তো একই গোয়ালের গাই তারা সাহায্য করে।

নৌকা এল। বোন সগর্বে হাঁড়ি-ভর্তি মিঠে পিঠে নিয়ে নৌকায় চাপলো। গাঁয়ের মেয়েরা এখন আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না। এ তো সতীর নিঃসঙ্গ হিমালয়-যাত্রা নয়।

*

*

১ লেখকের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, এস্থলে ভাই বোধ হয় বোনকে কিঞ্চিৎ খাশা দিচ্ছে। বোনকে সচরাচর নাইওর নেওয়া হয় অজ্ঞান মাসে ধান কাটার পর। কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারবো না। কারণ দেশ ছেড়েছি দুই যুগ পূর্বে।

বুদ্ধিমত্তা মেয়ে বলে বাপের বাড়ি গিয়ে জয়নব পাড়াময় চাকিবাজি মেয়ে দিন কাটায় না। অবশ্য সর্বপ্রথম মিঠে পিঠে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সইটইদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কিন্তু তারপরই লেগে যায় নূতন ধানচাল যা উঠেছে তার দ্রুত-ব্যবস্থা করতে। অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ তা সে যে কোনো জীপুরুষই হোক যদি হুবো-শাম বেঘোরে ঘুমোয় তবে লোকে প্রবাদটা বলে, ‘দেখো খোদার খাসিটা ঘুমুচ্ছে যেন “নাইওরী-মাগিটার” মত !’

এই করে করে ‘নাইওর’ বাস যখন শেষ হয়, তখন বাপের বাড়িতে আবার মিঠে পিঠে তৈরী আরম্ভ হয়—এগুলো সে নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। ভাই অস্তুত একখানা শাড়ি, একটি কুর্তা কিনে দেবে বোনকে—জামা-ক্রক ভায়েভায়িকে !

জয়নব কিন্তু ধান ভানা কোটাতে এমনই সাহায্য করে যেন ভাই, সৎমা স্ত্রী চীপ-লেবারের প্রলোভনে তাকে আসছে বছর নিজের থেকেই ‘নাইওর’ নিয়ে আসে—করাইজের মোকদ্দমার শাসানি যেন মাঝি-মাল্লা মারফত না পাঠাতে হয় শ্বশুরবাড়ি ফিরে জয়নব আবার দেমাক করে, ‘আমি মাগনা থাই নে পরি মে। যদিও ওখানে ছিলুম সৎমাকে কুটোটি পছন্দ কুড়োতে দি নি !’

*

*

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম এটা হিন্দুদের বেলাও প্রযোজ্য। প্যাটার্ন মোটামুটি একই, তবে তফাৎটা কোথায় ?

তফাৎ ঐ করাইজের হক্ক, ডুরেস, ব্র্যাকমেল (অবশ্য বেআইনী নয়) দিয়ে সে বাপের বাড়ি যাবার হক্ক আজীবন জিইয়ে রাখে। স্বামীর সঙ্গে না বনলে সেই হক্কের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সেখানে বসে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্রায্য স্ত্রীধনের মোকদ্দমা লাগায়। কিংবা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ভাস্কর-দেওর তাকে অসম্মান করে তবে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে, ঠুকে দেয় ওদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। এগুলোই আসল তত্ত্ব বলে পুনরাবৃত্তি করলুম।

*

*

এ সব সম্ভব বাপের বাড়ির করাইজের জোরে।

ভাই সেটি সে কখনো হাত-ছাড়া করে না। লোভী স্বামী যতই চোটপাট করুক না কেন।

হিন্দু মেয়েরা একটু চিন্তা করে দেখবেন ॥

চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ ‘গ্যাগা’—এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। ‘গ্যাগা’ শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন-বক্সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা ‘গাগা’, ‘গ্যাগো’ ‘গ্যাগ্যা’ গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্বেসাইল, ইডিয়ট (‘পণ্টক’ বললুম না, কারণ হুনীতিবাবুর শব্দটির কপি-রাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে ‘কণ্টক’ থেকে ‘কাঁটা’, ‘পণ্টক’ থেকে ‘পাঠা’ বের না করে আড়াল থেকে আমাকে ‘পন্ঠক’ বলতে আরম্ভ করেছে) গোবর-গণেশ যে কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেযোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মত আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জর্নৈক অধ্যাপক নাকি প্রকাশ সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডেকেলান্স ‘চোখের জলের লেখক’! আচ্ছা, পাঠক তুমিও কও, সেস্থলে তুমি কি করতে! শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন! শরৎচন্দ্র হাসান নি! সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি!—কাঁদাবার জন্ত নয়, যন্ত্রণায় চিংকার করার জন্ত। ব্যঙ্গ, জ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাব্দিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরপ্স উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাথা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন ‘দত্তা’র ‘রাসবিহারী’ চরিত্র আঁকেন, ঠিক তেমনি ‘নারীর মূল্য’ও লিখতে জানেন। (আশা করি বলার প্রয়োজন নেই যে শরৎচন্দ্র এই অনূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্ত লেখেন নি; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারবো না; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার

১ যে-কোনো কারণেই হোক, বঙ্গুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুখোই নি।

প্রাণ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হুকুও সঞ্চয় করতে হয়।)

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘অন্ধভক্তের’ দল—ডেকে আন বুললে যারা বেঁধে আনে—(যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি) লাগলেন শরৎচন্দ্রের গিছনে। তার জের আজও চলছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষাকরে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-‘দলে’র নাও হতে পারেন। তিনি হয়তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অলুয়ায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব ‘বৃথা বাক্য’। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি ‘তুলনামূলক’ কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, ‘বৃথা বাক্য থাক্’। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অলুয়ায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু জাঁকুঝাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মত শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্ম পাতা উন্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাক্রূপী ‘বউকুণী’র আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ফীণ কর্তে বললেন, ‘দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার’—ইতিমধ্যে খড়ম পেটাতে পেটাতে (আহা, কী সুন্দর ছবিটি !) কটুবাক্য, ‘খোটার ব্যাটার কাঁঠাল পাকা দিয়া’—এবং সুবশেষে পিসিমার সাত পাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্রাকটিকাল সময়োপযোগী সদুপদেশ,—কাটা জাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্ম—সেকালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভল্টের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পান না দি ;—শরৎচন্দ্র যে বাড়লা দেশকে হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ-গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্কস্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদবাকি কুলে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিফল প্রচেষ্টা করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে ‘সেব্রামীয়’ টিপ্পন কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিকে পাঠানো যায় এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—খাক, ‘বৃথা বাক্য থাক্’। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অল্প একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে বাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসতো, ‘আহা বেচারি, কাল রাতে তার ছেলেটি

—জানিস, কি হয়েছে?’—বাকিটা শুনে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, ‘কেন রে, কি হয়েছে?’ টাইকয়েডে একটা চোখ গেছে।’ আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিরা রান্নাঘরে কিস কিস কন্ধে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে গিয়ে শুধবো না, ‘হ্যাঁ বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন?’

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে আমি হস্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইবো তারা এরকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন? অর্থাৎ হাসি একে অন্ধের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

*

*

শরৎচন্দ্র ‘চোখের জলের লেখক’? আর বিভূসাগর? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি?—না? তাঁর ‘শকুন্তলা’ পড়তে পড়তে আমি তো হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অগ্রচূর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন কেন, ‘কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিভূসাগরের “সীতার বনবাস” বা “শকুন্তলা” হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া, অল্পনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।’

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দু’খানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি! তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যাগা।

সাহিত্যিক বিভূসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর ‘চোখের জল’র বইয়ের জন্ত। অবতার বিভূসাগরকে বাঙালী চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিভূসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে ঝাঁপ সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নাক্ষা তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়,

তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।^২

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসী মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাক্ষী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিদ্বার শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের ‘তুলনাহীন’ লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যে রকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেই রকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোন্সার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোন্সার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

এই পৃথিবীর পরম শোভাগ্য সেরাত্রে জোন্সার কোন কিছু করার ছিল না। এটা এটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়লো। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে, বুড়া হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ফেপে। তখন লিখল জাকাজ (J'accuse) ‘আই একুজ’। ‘ফরাসী সরকারকে আমি একুজ করি’।

তারপর কি হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দুখানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক’বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে ‘কাঁদানো’র লেখক জোন্সার রূপায় ড্রাইফুসের প্রতি স্মৃতিচিহ্ন হল।

শেষ কথা : বহু বহু প্রকৃত লেখক, ‘চোখের জলের লেখক’ নন কিংবা শুধু ‘হাসাবার’ লেখক নন। দুইই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই “অরুণগীয়া” মেয়েটি যখন পড়ি-মরি হয়ে ‘সেজেগুজে’ কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যাগা। আমি মোল বছর বয়সে কঁদেছিলুম ॥

৪১২।৬৫

২ বিদ্যুৎসাগর ছদ্মনামে হান্স—বরঞ্চ বলা উচিত—ব্যঙ্গরসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সেজন্য নয়। বস্তুত তাঁর সে সব ছদ্মনামে লেখা পুনরাঙ্ক ‘আবিষ্কৃত’ হয় বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

ছাত্র বনাম পুলিশ

(১)

‘দেখি ! বের করো অভিজ্ঞান-পত্র—আইডেনটিকেশন কার্ড !’

কী আর করে বেচারী—দেখাতে হল কার্ডখানা। নামধাম ঠিকানা তো রয়েছে, তুপারি রয়েছে বেচারীর ফোটোগ্রাফ, তার নিচে ছোকরার দস্তখত, এবং দুটোর দু’কোণ জুড়ে যুনিভার্সিটির স্ট্যাম্প। হোমিওপ্যাথিক পাসপোর্ট আর কি !

হায় বেচারী ! যখন যুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করার ওক্লে সগর্বে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ফোটোগ্রাফের নিচে দস্তখত করেছিলে তখন কি জানতে এটা ‘দস্তখত’ নয়, এই ‘কুকর্ম’ করে তার ‘দস্ত’ (হাত) ‘ক্ষত’ হয়েছিল—এ ‘পান’টি আমার নয়, বিত্তেসাগর মশাইয়ের। তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান করতেন প্রচুর, স্বয়ং বিত্তেসাগর ‘পান’ করতেন অত্যল্পই !

প্রাপ্তকৃত সরস প্রেমমালাপ হচ্ছিল জার্মানির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পুলিশম্যানে (চলতি জার্মানে ‘শুপো’)। ছোকরা রাত্তায় দাঁড়িয়ে রাত দুটোর সময় কঁাকর ছুঁড়ছিল একটি বিশেষ জানলার শাসিকে নিশান করে, এবং যেহেতু তৎপূর্বে—অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-শ্রোকারদের মত এ্যাটুখানি, মানে ইয়ে, ঐ যাকে বলে বিয়ার—পান করেছিল বলে তাগটা স্বভাবতই টালমাটাল হয়ে পাশের যার-তার জানলার শাসির উপর পড়ছিল। অবশ্য একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কাপুরুষের মত শুপোর হাতে আত্মদমপণ করে নি—আগ্রাণ পলায়ন-প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তবে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা সবিস্তার কি ?

অতি সরল। জার্মান ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী লাভের পূর্বের তিন বৎসর ভূতের মত থাকে। কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে রবির সকাল পর্যন্ত দল বেধে ‘পাবে’ ব’সে প্রেমসে বিয়ার পান করে। এবং যেহেতু বাড়াবাড়ি না করলে খৃষ্টধর্ম মত্তপান সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না, তাই কোনো কোনো ধর্মাহুসারী ছেলে ভোর সাতটার ‘মেস’ (উপাসনায়) যোগ দিতে যায় ‘পাব’ থেকেই, সোজা গির্জার দিকে—শনির সন্ধ্যা থেকে রবির ভোর ছ’টা, সাড়ে ছ’টা অবধি বিয়ার পান করার পর। অবশ্যই মত্তাবস্থায় নয়—তবে ইংরিজীতে যাকে বলে ঈষৎ মডলিন।

তা সে যাক। এ লেখনের বিষয়বস্তু—পুলিশ বনাম স্টুডেন্ট (‘স্টুডেন্ট’ বলতে জার্মানে একমাত্র যুনিভার্সিটি স্টুডেন্টই বোঝায়—স্কুলবয়কে বলে ‘শ্যুলার’)। এই দুই দলের মধ্যে হামেহাল—অবশ্য সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত

এবং বিশেষ করে শনির দিনগত রাতে—একটা অঘোষিত বৈরিতা বিরাজ করছে, যুনিভার্সিটি স্ট্রিটের প্রথম দিন থেকে। আমি যা নিবেদন করতে যাচ্ছি তার ঐতিহাসিক পটভূমিটি কিন্তু কিংবদন্তীমূলক, অর্থাৎ পুরাণ জাতীয়। সেইটুকু সয়ে নিন। তার পরই মাল।

আমরা সকলেই জানি কতকগুলো উপাধি মানুষের নামের অচ্ছেদ্য অংশ : যেমন (১) রেভারেণ্ড, (২) কর্নেল, বা (৩) ডক্টর (শুধু চিকিৎসক অর্থে নয় ; যে কোনো বিষয়ে পি এচ ডি ; ডি এস সি জাতীয় ডক্টরেট পাস করা থাকলে) । প্রথম শ্রেণীর উপাধিগুলো বিদিত, দ্বিতীয়গুলো রাজদত্ত এবং তৃতীয়গুলো যুনিভার্সিটি-দত্ত ।

রাজ্যে চার্চে লড়াই বহু যুগ ধরে চলেছে। এ-লড়াইয়ে শেষের দিকে এলেন যুনিভার্সিটি। তার পূর্বে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল প্রধানত পাদ্রীদের হাতে। কিন্তু মহামতি লুথারের আন্দোলনের ফলে বহু পিতা পুত্রকে আর ‘কুসংস্কারাচ্ছন্ন’ যাজক সম্প্রদায়ের কাছে মানসিক, হার্দিক এমন কি আধিভৌতিক উন্নতির জগ্গ পাঠাতে চাইলেন না। এ ছাড়া আরো বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলো এখানে অবাস্তব না হলেও নীরস। মোদা কথা, চার্চ ও রাজার লড়াইয়ের মধ্যখানে যুনিভার্সিটিগুলো তাকে তাকে রইল আপন আপন স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-স্বরাজ্য লাভের জগ্গ। তাদের মধ্যে অনেকেরই ছিল লুথারপন্থী এবং তাদের মূল নীতি ছিল অনেকটা—‘যখন পোপের “গুরু-বাদ” ত্যাগ করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে বাইবেল পড়তে চাও, এবং তদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একমাত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে চাও, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিতে হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (অটোনমাস ইণ্ডিপেনডেন্স)—নইলে তারা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ করবে কি প্রকারে ?’

যে করেই হোক সে স্বাধীনতা যুনিভার্সিটি-টাউনগুলোর (অর্থাৎ যে শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রধান সর্বজনমাত্র প্রতিষ্ঠান) রাস্তাঘাটেও সক্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ নিতান্ত খুন, ধর্ষণ জাতীয় পাপাচার না করলে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন জেলে (?) পুরে দিতো—বিচারের ভার নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল’ বা আইন, জুরিসপ্রুডেন্সের প্রফেসরগণ—‘ছাত্র আসামী’ এঁদেরই একজন বা একাধিকজনকে আপন উকাল নিয়োগ করতো—এবং সবকুছ ক্রী-গ্র্যাটিস-এ্যাণ্ড-কর্-নাথিং !

সে-সব দিন গেছে। তবু শুনেছি, হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য কোনো একটা হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই—জেলখানাটি নাকি এখনো

মিউজিয়ামের মত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সেটি নাকি সত্যই দ্রষ্টব্য বস্তু।

যে-পাঠক বাঙলা ভাষার অতুলনীয় (আমার মতে বাঙলা ভাষার অধিতীয়) পুস্তক, উপেন বাদুঘ্যের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়েছেন, তিনি হয়তো স্বরণে আনতে পারবেন (আমিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলছি ; তাই ভুলচুক হবে নিশ্চয়ই, এবং তার জ্ঞান মাক্ চাইছি) যে, যখন অরবিন্দ-বারীন-উল্লাস-উপেন-কানাই-সত্যেন এট আল-এর বিরুদ্ধে আলীপুরে বোমার মামলা হয় তখন হাজতে থাকাকালীন ছোকরাদের মধ্যে যাদের অদম্য কবিত্বপ্রকাশব্যাপি ছিল . তারা লেখনীমস্তাধারাভাবাৎ কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে পত্র লিখত। তারই একটি,

‘ছি’ড়িতে ছি’ড়িতে পাট

শরীর হইল কাঠ

সোনার বরণ হৈল কালি

প্রহরী যতেক ব্যাটা

বুদ্ধিতে তো বোকা-পাঠা

দিনরাত দেয় গালাগালি।’

যতদূর মনে পড়ছে, ‘উপীন’বাবু যেন মুচকি হেসে মন্তব্য করছেন, আহা কী ‘সোনার বরণ’ই না বঙ্গসন্তানের হয় !

তারপর যা লিখছেন তার সারমর্ম ; মাঝে মাঝে হু’একটি ভালো কবিতাও চোখে পড়ত। উদাহরণ-স্বরূপ দিয়েছেন,

‘রাধার দুটি রাঙা পায়ে

অনন্ত পড়েছে ধরা,

ওঠে ভাসে কত বিশ্ব

চিদানন্দে মাতোয়ারা।’

এবারে তিনি যেন তাঁর চোখে একফোঁটা জল আসতে না আসতে দুঃখ করছেন, -হায় রে মানুষের মন ! কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের ভিতরেও রাধার দু’টি রাঙা পায়ের জ্ঞান সে আছাড় খায়।^১

•

•

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের আপন জেলখানার কথা হচ্ছিল। তার

১ অধীন প্রারতপক্ষে আপন বইয়ের বরাত দেয় না, কিন্তু এ-স্থলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে নিবেদন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’র উপর মল্লিখিত প্রশস্তি ময়ূরকণ্ঠিতে পত্র। তবে অমুরোধ এই, মূল বইখানা প্রথম পড়বেন। তারপর আমার বই পড়ার প্রয়োজন আশা করি আর হবে না।

অন্ততম প্রাচীনতমের নিঃসন্দেহ সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক টুয়েন্। সে বর্ণনাটি এমনই সব-জাতের-বাড়া চৌধুরী আকর্ষণীয় বর্ণনা যে তারই টানে আমারই চেনা এক সহযাত্রী জার্মান-সীমান্তে পৌঁছেই নাক-বরাবর চলে যান ঐ জেল দেখতে—শী প্রাসাদ, ড্রেসডেনে সঞ্চিত রাখায়েলের মাদোনা নৃত্য করে!

আলীপুরের যে সব ‘কবিরা’ গ্রহরীকে পাঠা নাম দিয়েছেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে রাধার দুটি রাঙা পায়ে ধ্যান মজে গেছেন, তারা কিন্তু বিলক্ষণ জানতেন, তাঁদের জন্ম মৃত্যু জেলের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা কবি, অকবি সকলেরই প্রায় সমান। কিন্তু জার্মান-বিশ্ববিদ্যালয়-জেলে ছাত্রেরা যেত অল্প কয়েক দিনের জন্ম, ফাঁসির তো কথাই ওঠে না। তাই মার্ক টুয়েনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অপূর্ণ হস্তুরসে রঞ্জিত করে সেই জেলটির বর্ণনা দেবার। কাজেই উপস্থিত আলীপুরের কথা ভুলে যান।

*

*

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলে ফাঁসি-কাঠ না থাকতে পারে, ক্যাবারে কাঁ কাঁ’র ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু লেখনী-মস্তাদারের অভাব!—এটা কল্পনাভীত। যদিও ঐ জার্মানীরই সর্বোৎকৃষ্ট দশ লিটার বিয়ার প্রসাদাৎ কল্পনাটা করেই ফেলি, তখন চোখের সামনে, বিকল্পে ভেসে উঠবে পেন্সিল—এ-কথা তো ভুললে চলবে না, এদেশের কেতাবপত্রে মহামান্য কাইজারের (ভারতীয় কাইসর-ই-হিন্দ পদক, লাতিন সীজার ইত্যাদি) নাম পড়ার বহু পূর্বেই ভারতীয় ছেলেবুড়া ব্যবহার করেছে, Koh-i-noor, made by L. & C. Hardmuth in Austria, graphite^২ drawing pencil, compressed lead.

তাই সেই পেনসিল অরূপ হস্তে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র-‘কয়েদী’র দল দ্বারা বংশপরম্পরায়—সাদা দেয়ালের উপর। শুধু কবিতা না বহুবিধ অন্যান্য চীজ!

কিন্তু তৎপূর্বে তো জানতে হয়, এরা জেলে আসতো কোন্ কোন্ ‘অপরায়’ করে। এর অনেকগুলোই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং সাতিশয় সন্তোষ

২ এসব বাবদে জার্মানী অস্টিয়া একই ধরা হয়। হিটলার নিজে অস্টিয়ান হয়েও জার্মানীর ফ্যারার হয়েছিলেন, এ সব তো জানা কথা। উভয় দেশের ভাষাও এক।

সহকারে স্বীকার করছি, সবল সক্রিয় হিতৈষীও হয়েছি বহু ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্যুপো-স্টুডেন্টেন, পুলিশ ভর্সন্স ছাত্র ‘যুদ্ধে’—কিংবা যুদ্ধ আসন্ন দেখে দ্রুততম গতিতে পলায়নে। কিন্তু সেটা অন্য অধ্যায়।

॥ ২ ॥

‘পাজীটা এখনো এল না যে, ব্যাপারটা কি? বলেছিল না, তাব কাকা আসছে ডান্ংসিগ থেকে, ওর জন্ম নিয়ে আসবে কয়েক বোতল অত্যাংকুট ডান্ংসিগার গোর্ন্ট ভাসার (ডান্ংসিগের স্বর্ণবারি—সোমালী সোমরস), আমরা সবাই হিন্তে পাবো।’

‘একটা ফোন করলে হয় না?’

‘হঁ! সেই আনন্দেই থাকো! টেলিফোন! বুড়ির বাড়িতে এখনো দড়ি টেনে ভিতরের ঘন্টা বাজতে হয়। ইলেকট্রিক বেল্ পযন্ত নেই। তবে, হ্যাঁ, গার্ল ফ্রেন্ডের যখন তখন আপন কামরায় নিয়ে যেতে দেয়। তত্পরি বুড়ি বন্ধ কালা। শুনেছি, পায়ের উপর গরম ইপ্তিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছিল—শুনতে পায় নি!’

রসালাপ হচ্ছিল শনির সঙ্ঘায় ‘পাব’-এ। জনসাতেক মেঘের জমায়েৎ ছায়া একটা গোল টেবিল ঘিরে বিয়ার পান করছেন। সেটার উপর কোনো টেবিল-ক্লথ নেই। আছে গত একশ বছরের স্টুডেন্ট খদ্দেরদের নাম, যারা প্রতি শনিবারে এই টেবিলটা ঘিরে গুলতানি করেছে—ছুরি দিয়ে খোদাই করা। আমাদের পলের বাপ ভিল্ হেল্মের নামও এই টেবিলে আছে। সমস্ত টেবিলটা নামে নামে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে—আর নতুন নাম খোদাই করার উপায় নেই।

এদের গুলতানির বর্ণনা বা ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সবাই জানেন, সেই সোক্রাতেসের যুগ থেকে ইয়োরোপের গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মজালায়ে বসে বিশ্রান্তাগাপ করেছেন, এবং সৃষ্টিই অমূল্য, চোরচোট্টারা প্রাতের ‘আইডিয়া’র সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ছোরাছুরি করে নি, আর সোক্রাতেস প্রতিবেশীর তালাটি কি প্রকারে নিঃশব্দে বে-কার করা যায় তাই নিয়ে মজাপান করতে করতে শিষ্যদের সঙ্গে কূট যড়যন্ত্রে ত্রিষায়া যামিনী যাপন করেন নি। অর্থাৎ যে যার বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যাতে তার চিন্তাকর্ষণ তাই নিয়ে কথাবার্তা কইতে ভালোবাসে। তবে হ্যাঁ, মজাপানের মেক্দার

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু যে ঈশৎ নিম্নস্তরে নেমে যায় সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। জার্মানির স্টুডেন্টদের বেলায়ও তাই।

আমার ছিল মেজাজমজি অত্যন্ত ধারাপ। ঠিক সেদিনই খবর পেয়েছি ইংরেজ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডকে তালাক দিয়েছে। তারই ফলে আমার কুলে বচ্চরের ধরচার জন্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক-তৃতীয়াংশ (বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে, এতকাল পর সঠিক বলা কঠিন) কর্পূর হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন যে য়ুনিভার্সিটি রেন্টোরার সবচেয়ে সস্তা ডিনারটি (সে যুগে লাম ছিল এদেশী পয়সায় কুলে বারো আনা) খাবো, তারো উপায় রইল না। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত্তিরের খাওয়াটা নিজেকেই রাখতে হবে। ওদিকে দেশের ইয়াররা ভাবছেন, ‘লেখাপড়ায় আস্ত একটা গর্দভ ঐ ছেলে জার্মানি গিয়ে তোপা মজাটা লুটে নিলে, মাইরি!’

ইতিমধ্যে এসব ‘পাবে’ শনির সন্ধ্যায় যা-সব হয় সে-সবই হয়ে গেছে। ঠেলায় করে গরম গরম সসেজ এসেছে, দু’চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাজোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে, পিকচার পোস্টকার্ড জুতোর কিতে বিক্রির ছলে ভিথিরি তার রৌদ মেরে গেল।

করে করে রাত একটা বাজলো। বিশ্বয়বোধক চিহ্ন দেবার জন্ত ঐ চিহ্নেরই বিন্দুটির বিন্দুবৎ প্রয়োজন নেই। শনির রাত্রি জার্মানিতে আরম্ভ হয় বারোটায়—যত্বপি গ্রিনিজ কয়তা ঝাড়ে ঐ সময়টায় নাকি তার পরের দিন আরম্ভ। কিন্তু রাত একটার পর সাধারণ মতালয় বন্ধ। এর পর করা যায় কি? আমি বিশেষ করে তাদেরই কথা ভাবছি যাদের তখনো তেষ্ঠা মেটে নি—জার্মানদের বিশ্বাস তারা বিয়ার পান করে তৃষ্ণা নিবারণার্থে। সাধারণ মতালয় যখন বন্ধ তখন খোলা রইল অসাধারণ মতালয়। সেগুলো একটু ইয়ে অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর মহিলায় ভর্তি আর কি। তবে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে যখন সেখানে ঢুকে আপন গালগল্লো মত্ত হয় তখন ঐ পূর্বোক্ত ‘ইয়েরা’ ওদের জ্বালাতন দূরে থাক্—ডিস্টার্বও করে না। ওদের পকেটে আছেই বা কি?

ইতিমধ্যে সেই যে আমাদের টেওডর ফাকে নিয়ে কাহিনী পত্তন করেছি, তার হঠাৎ পুনরায় শোক উত্থলে উঠলো ঐ ডানৎসিগ নগরীর প্রখ্যাত স্বর্ণবারির জন্ত। বার বার বলে, ‘দেখলে ব্যাটার কাণ্ডখানা! রাত একটা শুক আমাদের বসিয়ে রাখলে একটা সুরালয়ে—যখন কিনা প্রত্যেক বাপের প্রত্যেক স্পুস্তুরের কর্তব্য আপন আপন স্ননিমিত স্নেহময় নীড়ে নিদ্রাদেবীর শাস্ত্যঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া।’

কে একজন বললে, ‘এই ধানিকঙ্কণ আগেই না তুইই বললি, পেটারের

বাড়িটা আসলে অ্যাডাম এবং ঈভ তৈরী করেছিলেন খুবখুশে খুবখুশে ?

টেওডরের কিন্তু তখন কারো টিলনীতে কান দেবার মত মরজি নয়—সে তখন যোজ্জে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, যেন এক নবীন রিলেটিভিটি আবিষ্কার করার উৎসাহে শেখিয়ে বললে, ‘আর পেটার ব্যাটা নিশ্চয়ই আরামসে ঘুমচ্ছে। চলো, ব্যাটাকে গিয়ে জাগানো যাক।’

এস্থলে কারো পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া জার্মান-স্টুডেন্ট-মহু-শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের চেয়েও গুরুতর পাপ। তুমি তা হলে আস্ত একটা কাপুরুষ! পুলিশকে—অর্থাৎ দুশমনকে—ডরাও। তোমার কলিজা বক্রিয়, তোমার সীনা চিড়িয়ার। অতিষ্ঠ হয়ে আপনি শুধোবেন, ‘রাত্রি একটাই হোক, আর তিনটেই হোক, কেউ কাকে জাগালে পুলিশের পূর্বতর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের কিবা ক্ষতিকর, জখম-লোকসান? ওদেশে কি রেতে-বেরেতে টেলিগ্রাফ পিয়ন আসে না?’

দাঁড়াও পাঠকবর, জন্ম যদি তব বন্ধে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এসব ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বলা বাহুল্য রাত তেরোটীর সময়—গ্রিনিজ যদিও সেটাকে দিবাভাগ বলেন—আপনি যদি বাড়ির, অবশ্য অত্র বাড়ির, দোস্ত দুশমন—যে-ই হোক কাউকে জাগাবার চেষ্টা করেন, তা সে সীমেন-হালাস্কে-শুকেটের নব্যতম বিজ্জলি-বেল্ বাজিয়েই হোক, আর পৌরাণিক যুগীয় ঘণ্টাকর্ণ কানে যে-ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতো যাতে করে সে তার জন্মবৈরী শ্রীহরির নাম-কীর্তন শুনতে না পায়—সেই ঘণ্টাটিই বাজান, বাড়িউলী দরজা খুলে শনির রাতে ঐ জ্বাকুহুমসঙ্কাল টেওডরের নয়নযুগল দেখতে পাবে—আমরা আর-সবাই না হয় পাশের গলিতে গা-ঢাকা দিয়েই রইলুম—তখন তার কণ্ঠ থেকে—ভুল বললুম, নাভিকুণ্ডলী থেকে যেসব মুরজ-মুবলীধ্বনি বেরুবে তার ঈষদমাংশ শুনতে পেলো, ঐ যে ঋণিকক্ষণ আগে কি-সব ‘ইয়ে’দের কথা বলছিলুম তারা পর্যন্ত নোকের সামনে নজ্জা পাবে। অতএব ঐ কবোক্ষ অঙ্ককারেও আমাদের কাছে জাজল্যমান হল যে ফ্রন্টাল এটাকের স্ট্রাটেজি বিলকুল ঠুট্ অব্ ডেট।

আমাদের হস্তে তৎসম্বন্ধে আশার একটি ক্ষীণ প্রাণীপ মিদ্রি মিদ্রি করছে। পেটারের কামরাটা দোতলায়, এবং একদম রাস্তার উপরে। অতএব আমরা সেদিক বাগে যেতে যেতে হেথাহোথা ক্ষুদ্রাকারের হুড়ি, কাঁকর, সোডার ছিপি ইত্যাকার মারণাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে হুসজ্জিত হয়ে পৌছলুম পেটারালয়ে—বক্সি সর্কার পথ দুর্গম নির্জন পেরিয়ে।

পেটার থাকে মাউল কাডে (সার্থক নাম, বাবা,—‘ইহরের পথ’)।

টেওডরই আমাদের হিগেনবুর্গ বলুন, লুডেনডর্ক বলুন, আমাদের রাইখ মার্শাল। কিন্তু কাঁধেজে দেখা গেল, যদিও সে পেটারের ঘরে আসে সপ্তাহে নিদেন দশ দিন, তবু তার জানলা যে ঠিক কোন্টা সেটা ঠাहर করতে পারছে না—আশা করি তার কারণ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশেষে হান্স-ই লোকেট করলে জানলাটা। হান্স বটনির ছাত্র—পেটারের জন্মদিনে তাকে একটা অদৃষ্ট-পরিমাণ সাতিশয় বিরল কণীমনসা উপহার দেয়। একটা জানলার বাইরের চৌকাঠ-পানা কালি কাঠের উপর হান্স সেটি আবিষ্কার করলে—রাজ্যের হিম ধাওয়াবার জন্য পেটার সেটি ঐ সিল্ না লেজ্ কি যেন বলে ইংরাজীতে—তারই উপর রেখে দিয়েছিল। কালিদাসের যুগে ঘারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র—হেথায় কেঁকটাস্।

পয়লা রৌণ্ডে টেওডর ছুঁড়ে মারল সোডার ছিপি। লাগলো গিয়ে ডান-পাশের জানলাটায়। আমরা ফিসফিস করে পেটারকে সাবধান করতে কহুর করি নি, কিন্তু কেবা শোনে কার কথা, সে তখন জাঁদরেল জনরৈল সিং, আমরা নিতান্ত ভালভাত দাবাখেলার বড়ে-পেয়াদা। দূসরা রৌণ্ডে টেওডর বোধহয় ‘কইন্স’ করেছিল একটা স্নো কোঁটোর ঢাকনা। এটা ধন-ন্-ন্ করে গিয়ে লাগলো বাঁ-পাশের জানলাটায়। আমরা তাকে কিছু বলতে যেতেই সে ধমক দিয়ে বললে, ‘চোপ! এই হল আর্টিলারির আইন। প্রথম মারবে তাগের চেয়ে দূরে, তার পর তাগের চেয়ে কাছে, শেষটার ম্যাথম্যাটিকলি মেজার করে ঠিক মধ্যখানে।’ হবেও বা। ও তো প্রশান যুংকার ঘরের ছেলে—জানার কথা। এবং আমাদের তুলনায় তার পকেট-শস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। কারণ আমরা জর্মণীর ধোপ-দ্রুস্ত রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি কীই বা এমন কামান-ট্যাক। পক্ষান্তরে যুয়ুধান টেওডর ঘিনপিং উপেক্ষা করে ‘পাবে’র সামনের ‘বিন্’ থেকে মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে। তাই এবারে ছুঁড়লে ছোট্ট একটি মার্কিং ইঙ্কের খালি শিশি। লাগলো গিয়ে তেতলার একটা জানলায়। তখন বুকতে পারলুম জর্মণী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জিততে পারে নি। দ্বিতীয়টা তখনো হয় নি। সে সময় হিটলার যদি আমাকে কনসল্ট করতো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে বারণ করে দিতুম—বিশেষত এই অভিজ্ঞতার পর।

তার চেয়েও পষ্ট বুঝতে পারছি, টেওডর এখন যে অবস্থায় পৌঁচেছে সেখানে আপন নাক চুলকোতে চাইলে গুস্তা মারবে পিঠে। কিন্তু সে-তব্বটি তখন তাকে বলতে গেলে সেই সুপ্রাচীন জর্মণ কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র; এক মাতাল রাত চৌকটায় বাড়ি তুল করে বার বার চেঁচা করছে চাবি দিয়ে সদর দরজা

খোলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কটুকাটব্য। সেই শব্দে শেষটায় দোতলায় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিচের দিকে মাতালকে দেখে বললে, ‘হেই, তুমি ভুল বাড়ির ভালা খোলবার চেষ্টা করছো’। মাতাল উপরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, ‘হে হে হে হে। তুমিই ভুল বাড়িতে ঘুমুচ্ছে।’

এই একতরফা লড়াই—আইনে যাকে বলে ইন্ আবসেন্শিয়া—কিংবা বলতে পারেন ডন্ কুইকস্টের জল-যন্ত্র-আক্রমণ আধঘণ্টাটাক চলার পর টেওডর ছাড়লে—বলতে গেলে তার প্রায় শেষ সিক্স পোণ্ডার—সার্ডিনমাছের খালি একটা টিন। বন্ বন্ করে শব্দ হল। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল সে যেন ওস্তাদ এনায়েৎ খানের সেতার—কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু ছাপিয়ে কানে গেল পুলিশের ভারি ভারি বুটের শব্দ। এটা হল কি প্রকারে? সচরাচর শানবাঁধানো রাস্তার উপর রোঁদের পুলিশের বুটের শব্দ সেই নিরুন্ম নিশীথে অনেক দূরের থেকে শোনা যায়, এবং টেওডর ছাড়া আমাদের আর সকলের আধখানা কান খাড়া ছিল তারই আশঙ্কায়। অতএব দে ছুট, দে ছুট! কোন্ মুখ বলে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষের কর্ম! ইংরেজ আফ্রিকাদের সঙ্গে যুদ্ধে পালালে পর এ-দেশের জোয়ানদের বুঝিয়ে বলতো, ‘এর নাম বাহাদুরীকে সাখ্ পিছে হঠনা।’

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি শুধু ভাবছি, এতগুলো বুটের শব্দ এক সঙ্গে হল কি করে? রোঁদে তো বেরোয় প্রতি মহল্লায় হার্টের, sorry, হার্টলেস্ সিংগ্‌ল্‌টন। তা সে যা-ই হোক, এখন তো প্রাণটা বাঁচাই।

পূর্বেই বলেছি, পেটারের গলিটার নাম মুষিকমার্গ। আসলে কিন্তু বন্ শহরের আঁকাবাঁকা হাঁহুলি বাঁকের মোড়, পায়ের ‘বেঁকি’-গয়নার প্যাঁচ-খাওয়া আড়াই বিঘৎ চওড়া নিরানব্বুইটি ‘রাস্তাকেই’ মুষিকমার্গ বলা যেতে পারে—তার জন্ত কল্পনাশক্তিটিকে বহু হৃদয়ে সম্প্রসারিত করতে হয় না।

কিন্তু একটি তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। এই গলিঘুঁচি কোথায় যে হঠাৎ বেঁকে গেছে, কোথায় যে রাস্তার একপাশে বহু প্রাচীন কালেই পঞ্চম্প্রাপ্ত একটি কারখানার অঙ্ককাব অঙ্কনে অশরীরী হওয়া যায়, অর্থাৎ লুকানো যায় (হংসমিথুনের কথা অবশ্য আলাদা), কোথায় যে একটা গারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিকেই ছাতে ওঠা যায়, এ সব তথ্য পুলিশ যতখানি জানে আমরাও ঠিক ততখানিই জানি। এমন কি লেটেস্ট খবরও আমরা রাখি : অমুক দেউড়ির ঠিক সামনের রাস্তার বাতিটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে, এখনো মেরামত হয় নি, কিংবা অমুক জায়গায় পরশুদিন থেকে এক ডাঁই পিপে জুটেছে—পিছনে দিবা অন্ধকার। অর্থাৎ পুলিশ তার আপন হাতের তেলো যতখানি

চেনে, আমরাও আমাদের ভেলো ততখানিই চিনি।

স্বধিকমার্গ ধরে খানিকটে এগোলেই দেখানে তেরাত্তা। আমাদের স্ট্র্যাটেজি অতি সনাতন, সুপ্রাচীন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ছ'দিকে ছুট লাগলাম। আবার তেরাত্তা পেলে আবার ছ' ভাগ হব। ধরা যদি পড়িই তবে বলহুত্ব ধরা পড়বো কেন? এবং যুদ্ধের নীতিও বটে, 'আক্রমণের সময় দল বেঁধে; পলায়নে একলা-একলি।' খুদে বন শহরে পুলিশ গিস্ গিস্ করে না— আর এই রাত চোদ্দটায় ফাঁড়ি-খানা ক'টাই বা স্পেয়ার করতে পারে? কাজেই প্রতি তেরাত্তায় তারা যদি আমাদেরই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে তবে যাদের 'মেন পাওয়ার' কম বলে, কয়েকটা রাত্তা কোলো অপ্ করতে পারবে না বলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই 'গুপো' নন্দনগণ ঘড়েল। এবস্ত্রকার বহু যুদ্ধে তারা জয়ী এবং পরাজয়ী হয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটা তাদের শেখায় অল্প স্ট্র্যাটেজি।

পাঠক, তুমি কখনো পোষা চিতে বাঘ দিয়ে হরিণ-শিকার দেখেছ? না দেখারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সেই রাজারাজড়াদের আমলেও এ খেলাটি অস্বদেশে ছিল বিরল। আমাদের দেখিয়েছিলেন বরোদার বড়ো মহারাজ।

মহারাজার খাস রিজার্ভ করেস্টে ছিল বিস্তর হরিণ। তাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হত একটা পোষা, ট্রেন্ড্ চিতে বাঘ। বাঘ দেখা মাত্রই হরিণের পাল দে ছুট দে ছুট। এবং মাচান্ডের উপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটু সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা ছ' ভাগ হয়ে গেল, তার পর আবার ছ' ভাগ, ফের ছ' ভাগ—ক'রে ক'রে হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেলো চিত্তিরমিস্তির।

কিন্তু আমাদের নেকড়ে মহাশয়টিও অতিশয় সুবুদ্ধিমান। এ ভাগ, ও ভাগকে খামোখা তাড়া করে সে বর্বরস্ত্র শক্তিক্ষয় করলো না। সে প্রথম থেকেই ভাগ করে নিয়েছে একটা বিশেষ হরিণ। প্রতিবারে পাল যখন ছ' ভাগ হয়, তখন সে ঐ বিশেষ হরিণটার ভাগেরই পিছন নেয়। পরে চিতার ট্রেনার আমাদের বলেছিল, 'সব চেয়ে যে হরিণটা ধুমসো, চিতে সব সময়ই একমাত্র ঐটেরই পিছন নেয়—এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শক্তিক্ষয় করে না, কারণ চিতে জানে ঐটেই হাঁপিয়ে পড়বে সকলের পয়লা। ধরতে পারলে পারবে ঐটেকেই—সব সময় যে পারে তাও নয়।'।

বন শহরের গুপো সম্প্রদায় ঠিক তাই করলে। আমাদের মধ্যে যে দুটি ছিল সব চেয়ে হোঁৎকা ওরা প্রতি ছ' ভাগ হওয়ার সময় ওদেরই পিছন নিল। শেবটার

ধরতে পেরেছিল অবশ্য একজনকে। সে কিন্তু টেওডর নয়, এবং জস্ট টু কীপ কম্পানি, ছুঁড়ে ছিল মাত্র নিভাস্ত খুঁদে ছ'চারটি কঁকর। তার কথাই আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আগের জমানায় পুলিশ তাকে দিয়ে দিত যুনিভার্সিটির হাতে—সে যেত যুনিভার্সিটির জেলে। শুনেছি, এন্ড্রেক স্বয়ং প্রিন্স আউটো এডওয়ার্ড লেওপোল্ড ফন বিসমার্ক অবধি গেছেন। এবং সে তখন জেলের দেয়ালের উপর পেঙ্গলিযোগে আপন জিবাংসা, কিংবা অম্মুশোচনা, কিংবা মধ্যখানে, কিংবা কটুবাক্য—যথা যার অভিরুচি—কতু গড়ে কতু ছন্দে, সেও কী বিচিত্র, কখনো আলেকজেন্ড্রিয়ান কখনো—সে কথা আরেক দিন না হয় হবে—লিখতো : আমার আমলে আমাদের যেতে হত শহরের জেলে—একদিনের ভরে (সেও এক মাসের ভিতর দিনটা বাছাই করে নেওয়া 'আসামী'র এক্সেয়ারেই ছেড়ে দেওয়া হত, বাইরে থেকে আপন থানা আনানো যেত, এবং যেহেতু যেসব সহযুগ্মদানবর্গ সে যাত্রায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা নেমকহারাম নন, তাঁরাই চালা তুলে উত্তম লক্ষ ডিনার বাইরে থেকে পাঠাতেন) ; কিংবা (ভারতীয় মূন্ডায়) সোয়া ভিন টাকা জরিমানা দান—যথা অভিরুচি।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলো পুলিশ সে রাতে হঠাৎ এক জোট হল কি করে ?

খাঁটি বন-বাসিন্দারা আমাদের যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কঁকর বা সোডার ছিপি যদি তার জানলায় লেগে গিয়ে তার নিশ্চিন্ত করে তবে সে জানলা খুলে কটুবাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই আমরা অকুস্থল ত্যাগ করি। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক ঝটকায় জানলা খুলে আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ্ হিমশীতল জল। আমরা অবশ্য এজাতীয় অহেতুক উপভ্রবের জন্ত সন্দাই সতর্ক থাকি।

কিন্তু আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ। টেওডরের সঙ্কলের পয়লা ব্লেট, বা সোডার ছিপি, যাই বলুন, পড়ে একদম পাশের ফ্লাটে এক নবাগত বিদেশীর জানলায়—কেন যে বিদেশীগুলো বন-শহরটাকে বিবাক্ত করার জন্ত আসে, আল্লায় মালুম—সে কিন্তু জানতো, বন-শহরের ধাস বাসিন্দারা এই (মোর্ দ্যান্) হান্ড্রেড ইয়ার ওয়ারে ভদ্র হুইটজারল্যাণ্ডের মত সেই যুদ্ধারম্ভের রাত্রি থেকেই নিরপেক্ষ, জোর কটুকটাক্য (অর্থাৎ ডিপ্লোমাটিক প্রটেক্ট)। কিংবা এক জাগ্ জল। তা সে এমন কীই বা অপকর্ম ? ইউরোপীয়রা তো চান করে একমাত্র যখন জাহাজ-ডুবি হয়। জল ঢেলে সে তো পুণ্যসঞ্চয় করলো, ডাক্তারদের জাহাজজন হল। কিন্তু আজকের এই বিদেশী পাণিষ্ঠটা কটুবাক্য করে নি, জল

জালে নি, করেছে কি, সে-দ্রাঘটে কোনছিল বলে চুপিসাড়ে ফাঁড়ি-খানাকে জানিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আবার ইয়ার টেওডরের অশুনতি সখা এই শহরে। এবং বছর দুই ধরে সে প্রাণ্ডুর পদ্ধতিতে শহরের এ-মহল্লায়, ও-মহল্লায় শনির রাতে—এবং সেটা যত গভীর হয় ততই উম্মা—আজ একে, পরেব শনিতে অন্য কাউকে আগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুলিশ বিস্তর গবেষণার পর লক্ষ্য করলো যে সর্বত্রই ওয়ার্কিং মেথড বা মডুস অপেরাণ্ডি ছবছ এক—বড় বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যে রকম পুলিশের এই জাতীয় গভীর গবেষণার ফলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাই তারা সেই ডেঞ্জরস্ ক্রিমিনাল টেওডরের প্রতীক্ষাতেই ছিল।

আর আপনাদের সেবক এই অধম? সে কি কখনো ধরা পড়েছিল?

॥ ৩ ॥

অধীর পাঠক! শাস্ত হও, তোমার মনে কি কুচিন্তা সে আমি জানি; ইতিমধ্যে ঐ বাবদে দু'খানা চিঠিও পেয়েছি, আমার কিন্তু কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না। আমি জানি, তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, তাই জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীধরবাস করেছিলুম কিনা। আমার সে 'দুরাবস্থা'র^৩ বর্ণনা শুনে তোমার হৃদয়মনে কোন্ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হবে সেই নিয়ে আমার হুঁতাবনা। তাহলে একটি ছোট্ট কাহিনী দিয়ে আমার সঙ্কোচটা বোঝাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে, এই ১৬ই অগ্রহায়ণ, আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম। এঁর বহু বহু সদৃশ ছিল, তার অন্ততম, তিনি নিজের সাহিত্য নাট্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন সে যুগের সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁর মত শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ জন বাঙলা দেশে বিরল—এবং শুদ্ধমাত্র রসজ্ঞ হিসাবে অদ্বিতীয়। তাই কাঁচা পাকা সর্ব লেখকই তাঁকে তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। ওদিকে গুরুদাস ছিলেন কর্মবাস্ত পুরুষ। সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই? তাই একখানা পোস্টকার্ডে^৪ বা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন তার মোটামুটি মর্ম এই :—‘মহাশয়, আপনার

৩ এ-যুগের ছেলে-ছোকরারা বিভ্রাসাগর পড়ে না বলে বলতে দোষ নেই যে একলা এক পিতা-পুত্র বিভ্রাসাগর মশায়ের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী শেষ করলে এই বলে, ‘আমাদের দুরাবস্থাটা দেখুন।’ বিভ্রাসাগর নাকি মুচকি হেসে বললেন, ‘তা সেটা আকার (আ-কার) থেকেই বুঝতে পারছি।’

পাঠানো পুস্তকের অল্প কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি উহা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। সভ্য বলিতে কি পড়িতে পড়িতে—'এখানে এসে থাকতো একটা লম্বা লাইন, এবং তার উপরে ছাপা থাকতো, 'হাস্ত সম্বরণ করিতে পারি নাই' এবং লাইনের নিচে ছাপা থাকতো 'অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।' তিনি নাকি পাঠানো বইখানা পড়ে যথোপযুক্তভাবে হয় লাইনের উপরের 'হাস্ত সম্বরণ' বা নিচের 'অশ্রু সম্বরণ' কেটে দিতেন। তিনি ছিলেন অজ্ঞাতশত্রু, তাই নিশ্চয়ই কোনো বদরসিক কাহিনীটির সঙ্গে আরো জুড়ে দিত যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিজে বইখানি পড়তেন না, তাঁর সেক্রেটারি সেটি পড়ে বা না পড়ে উপরের 'হাস্ত' কিংবা নিচের 'অশ্রু' কেটে দিত।^৪

তাই আমার কিন্তু-কিন্তু, তুমি লাইনের উপরের না নিচের, কোন্ বাক্যটি কাটবে—আমার কাহিনী শুনে। তা সে যাক্গে, বলেই ফেলি। কোন্ দিন আবার দুই করে মরে যাবো।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, চিতে বাঘ হরিণের পালের গোদাটাকেই সব সময় ধরবার চেষ্টা করে তারই পিছনে ধাওয়া করে যখন সব কটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—শহরের পুলিশও ঠিক সেই রকম আমাদের মত 'পিশাচ-সম্প্রদায়ের' সব চেয়ে হোঁকাটাকেই ধরবার চেষ্টা করতো, আমরা যখন তাড়া খেয়ে হরিণের টেকনিকই অহুসরণ করে ইদিকের ওদিকের গলিতে ছড়িয়ে পড়তুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা লক্ষ্য করলুম, একই গোদাকে বার বার শিকার করে পুলিশ যেন আর খাটি স্পোটসম্যানের নির্দোষানন্দ লাভ করছে না। তখন তারা দুসরা কিংবা তেসরা মোটাকাটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদেরও ট্রেনিং হচ্ছে, আম্মোগোরও। কখনো তারা জেতে, কখনো আমরা জিতি। সেই যে

৪ ভিক্টর য়ুগো (Hugo) সম্বন্ধে বলা হয়, একবার এক অধ্যাতনামা কবি য়ুগোকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে য়ুগোর সানন্দ অভিনন্দন এসে পৌঁছল সেই কবির হাতে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে য়ুগো শেষ করেছেন এই বলে, 'হে নবীন কবি, আমি তোমাকে সাদর আলিঙ্গন করে, ফ্রান্সের কবিচক্রের আমন্ত্রণ জানাই।' তিন দিন পরে বুক-পোস্টে পাঠানো কবির সেই কবিতার বই কেরত এল তাঁর কাছে। উপরের পিঠে পোস্ট অফিসের রবর স্ট্যাম্পে ছাপ, 'ষথেষ্ট টিকিট লাগানো হয় নি বলে গ্রহণকারী বেয়ারিং হারে ফালতো পয়সা দিতে নারাজ অতএব প্রেরকের কাছে কেরত পাঠানো হল।'

গুলিখোর শিকারী বয়ান দিচ্ছিল, 'তারপর আমি তো কইর করলুম বন্দুক, আর কুস্তাকেও দিলুম শিকারের দিকে লোলয়ে। তারপর বন্ধুকের গুলি আর কুস্তাতে কী রেস। কভী কুস্তা কভী গোলা, কভী গোলা কভী কুস্তা।' আমাদের বেলাও তাই, 'কভী ইস্টুডেন্ট কভী পুলিশ, কভী পুলিশ কভী ইস্টুডেন্ট।' আমার অবস্থা কোনই ডর ভয় ছিল না। কারণ আমি তখন এমনিতেই ছিলুম বেহুদ রোগা টিঙটিঙে—পাঁচ ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি নিয়ে একশ' পাঁচ পোণ্ড ওজন—অর্থাৎ হৌংকা মোট্কা জার্মান সহপাঠীদের তুলনায় তো আখটিপ নস্তি! তত্পরি আমি সর্বদাই স্তনির্মল বহুর দেই তিরস্কারটি মনে রাখি, 'বাঙালী হয়েছো, পালাতে শেখ নি।'

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই রাত্রে দেখি, পুলিশ অস্ত্র ব্যবস্থা করেছে। এতদিন যেই আমি একা হয়ে যেতুম, পিছনে আর বুটের শব্দ শুনতে পেতুম না। সেরাত্রে দেখি, পুলিশ নিতান্ত আমাকেই ধরবার জন্ত যে মনস্থির করেছে তাই নয়, আগের থেকে, বেশ সূচিস্তিত ফাইভ ইয়ারস প্র্যানিং করে যেন জাল পেতেছে। আমি তাড়া খেয়ে ঘোড়কেই যাই, পিছনে তো বুটের শব্দ শুনতে পাই-ই, তত্পরি দেখি, ঐ দূরে গলির মুখে আরেকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন বিরহজর্জরিত ফিল্মের নায়ক প্রোথিতভতৃকা নায়িকাকে আলিঙ্গনার্থে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি মহাভারত পড়েছি, জানি, এ আলিঙ্গন হবে ধার্তরাষ্ট্র। অতএব মারি গুলি অস্ত্র বাগে।

অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। ইতিমধ্যে আমি কয়েক সেকেন্ডের তরে সব পুলিশের দৃষ্টির বাইরে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলুম একটা 'পাব'। ঝটকা মেরে 'বার' থেকে অস্ত্র কারো অর্ডারী এক কাপ কফি যেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলুম, 'পাব'-এর সুদূরতম প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা পুলিশ।

খাইছে। এবারে এসে পাকড়াবে। বৈষ্ণুরাজ চরক বলেন, 'এ অবস্থায় হরিনামের বটিকা খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

সে কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমটায় 'বার' কীপারের মুখোমুখি হয়ে, আমার দিকে পিছন করে এক গেলাস বিয়ার কিনে একটা অতি দীর্ঘ চুমুক দিলে। আমি বুকলুম, মাইকেল সত্যই বলেছেন, সীতাদেবীকে রাবণের রাক্ষসী গ্রহরিনীরা কোনো গাছতলায় বসিয়ে বেপরোয়া বোরাঘুরি করতো,

‘হীনগ্রাণা হরিনীরে রাখিয়া বাধিনী

নির্ভয় হৃদয়ে যথা করে দূর বনে’

গল্পময় ইংরিজীতে বাকে বলে নিতাস্তই 'ক্যাট অ্যাণ্ড মাউস প্লে'। বরঞ্চ

রবীন্দ্রনাথেরটাই ভালো, 'এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালেক খেলা'।

এবারে সে গেলাস হাতে করে 'বার'-এর দিকে পেছন করে আমার দিকে মুখ করে তাকাল।

আমিও অলস কোঁতুহলে একবার তার দিকে তাকালুম। 'পাব'-এ নতুন নিরীহ খন্দের ঢুকলে ঘেরকম অগ্নি নিরীহ খন্দের তার উপর একবার একটি নজর বুলিয়ে অগ্নি দিকে চোখ ফেরায়।

আমি যদিও তখন মাথা নিচু করে কাপের দিকে তাকিয়ে আছি—বেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণু পর্যবেক্ষণ করছেন—তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটা কি ভাবছে। তারপর শুনলুম, 'গুটে নাখট'! আমি মাথা তুলে দেখি পুলিশ তার বিয়ার শেষ করে 'পাব'ওলাকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে যাচ্ছে। (জার্মানীর অলিখিত আইন, 'বিয়ার খাবে ঢক ঢক করে, ওয়াইন খাবে আ-স্তে, আ-স্তে।')

ঠিক বুঝতে পারলুম না কেন? তবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বলি নি। এদের তো রাবণের গুপ্তি। এবার যিনি আসবেন, তিনি এঁয়ার মত বাপের সুপুতুর নাও হতে পারেন। আবার বাইরে যাবারও উপায় নেই। জাল গুটিয়ে সবাই চলে গেছেন, না ঘাপটি মেরে বসে আছেন, কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পর যখন 'পাব' নিতান্তই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দেখি সব ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই। অকুস্থলের উন্টো মুখে রওয়ানা দিয়ে অনেকখানি চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরলুম 'তড়পত হুঁ জৈসে জলবিন মীন' হয়ে।

*

*

তার দু-তিনদিন পর সকালবেলা যখন পাতাড়ি নিয়ে যুনি (ভার্সিটি) যাচ্ছি, তখন একজন পুলিশ হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বুটের গোড়ালি গোড়ালিতে ক্লিক করে আমাকে সেলুট দিলে। আমি হামেশাই পুলিশের সামনে ভারী স্ববিনয়ী—বার তিনেক 'গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন' বললুম, যতপি একবারই যথেষ্ট।

কোন প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা শুধোলে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান?'

তালেবর পুলিশ মানতে হবে! বলেছে 'ইণ্ডার'। 'ইণ্ডিয়ানার' বা রেড ইণ্ডিয়ান বলে নি। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও সে পার্থক্যটি জানে না। বললুম, 'হ্যাঁ।'—

শুধোলে, 'এখান থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর?'

আমি বললুম, 'এই হাজার পাঁচেক মাইল হবে। সঠিক জানি নে, তবে।'

জাহাজে যেতে ১২১৩ দিন লাগে।’

বললে, ‘বাপ-মা এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছে বাদরামি শেখবার জন্তে।’

এতক্ষণে আমার কানে জল গেল। বললুম, উইথ রেকারেনন্স টু দি কনটেকস্ট বে, লোকটা সেই রাজের আমাদের দলের দুর্কর্ম এবং পরবর্তী লুকোচুরির কথা পাড়ছে। আমি তবু নাক-টিপলে-ছুধ-বেরোয়-না গোছ হয়ে বললুম, ‘কিসের বাদরামি?’

জর্মনে ‘জ্বাকা’ শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ পুলিশমান প্রয়োগ করলে তার অর্থ ঐ দাঁড়ায়। তারপর নামলো সন্মুখসমরে! বললে, ‘সেরাজে কয়েক সেকেন্ডের জন্ত চোখের আড়াল হয়ে যেতে পেরেছিলে বলে তোমাকে ধরি নি। এবারে কিন্তু ছাড়বো না।’

‘অনেক ধন্যবাদ!’ তারপর আমিও রণাঙ্গনে নেমে বেহায়ার মত বললুম, ‘সে দেখা যাবে।’

যেন একটু দরদী গলায় বললে, ‘কিন্তু কেন, কেন এসব করো?’

আমিও তখন একটু নরম গলায় বললুম, ‘এদেশে কি শুধু যুনিতে পড়তেই এসেছি? ওদেশে বসেও তো এ-দেশের বই কিনে পড়া যায়। আমি এসেছি সব শিখতে, আর-সব স্টুডেন্টরা যা করে, তাই করি।’

‘সব ছেলে এরকম বাদরামি করে?’

আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল সবাই করে না।

‘তবে?’

তখন বললুম, ‘বাদার, শোনো। এই স্টুডেন্ট বনাম পুলিশ লড়াই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে হাইডেলবের্গে। এখানে আরম্ভ হয় ১৭৮৬তে। তারপর কয়েক বছর যুনি বন্ধ ছিল—কেন, সঠিক জানি নে, বোধ হয় নেপোলিয়ন তার জঙ্গ দায়ী—কের যুনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ থেকে। এবারে তুমিই কও, বৃকে চাত দিয়ে, এই আমরা আজ যারা স্টুডেন্ট, আমরা যদি আজ লড়াই কাস্ত দি তবে ভবিষ্যৎ-বংশীয় স্টুডেন্টরা ইতিহাসে লিখে রাখবে না “অতঃপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক দল কাপুরুষ ছাত্র আগমনের ফলে—তাহাদের মধ্যে একটা অপদার্থ ইণ্ডিয়ানও ছিল—সেই সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়—স্টুডেন্টরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।” তারপর ভারতীয় নাটকীয় পদ্ধতিতে ‘হা হতোম্বি হা হতোম্বি’ করার পর বললুম, ‘এই কে মহাকবি হাইনে, তিনি পর্বস্ত এখানে—’

এই করলুম ব্যাকরণে ভুল। বাধা দিয়ে শুধালে, 'তুমি তার মত কবিতা লিখতে পারো ?'

নিশারণে সে জিতেছিল না আমি জিতেছিলুম, সেটা সমস্তায়, সেটাকে 'ডু' বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে এই তর্ক-যুদ্ধে আমি হার মেনে বললুম, 'বাকিটা আর একদিন হবে, ব্রাদার। এখন তোমার নামটা বলো। সেই শনির রাত্রে যেখানে আমাদের প্রথম চারি চক্ষুর মিলন হয়েছিল সেখানেই দেখা হবে। আমি কোন করে ঠিক করে নেব। এখন চলি, আমার ক্লাস আছে।'

সে হেসে যা বললে সেটাকে বাঙলায় বলা চলে, 'ডুছু খাবে টামাকও ছাড়বে না।'

*

*

এবারে ধরতে পারলে ছাড়বে না—সে তো বুঝলুম। ওদিকে এক মাস পরে আমার পরীক্ষা। তিনটে ভাইভা। শনির রাত জেগে তামাম রকবার শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। হাসি পায় যখন এদেশে শুনি, এখানে বড্ড বেশী মুখস্থ করানো হয়; মুখস্থ না করে কে কবে কোন্ দেশে কোন্ পরীক্ষা পাশ করেছে। তা সে পেসতালদজির দেশেই হোক আর ফ্রোবেলের দেশ, এই জর্মনিতেই হোক। তাই আমাকে আর যুদ্ধে না ডেকে আমাদের ফীলড মার্শেল আমাকে রিজার্ভে রাখলেন। মাত্র এক রাত্রে ডাক পড়েছিল, তবে সেটা শহরের অগ্ন্য্রাস্ত্রে। আর এক দিন, সেই দৈত্যাকুলের প্রহ্লাদ-পোটির সঙ্গেই একটা 'পাব'-এ বসে হু-দু রসালাপ করেছিলুম। লোকটি সত্যি অমায়িক।

*

*

এদেশে পরীক্ষার পূর্বে এত সাতায় রকমের কাগজপত্র মায় থিসিস, ডীনের দক্ষতরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেয় আনুকোরা হালের যে ছ'দিন আগে পাস বা ফেল করেছে। তারাই শুধু এসব হাবিজাবির লেটেস্ট খবর রাখে। সে রকম হুজনা অনেকক্ষণ ধরে বসে, দফে দফে, একাধিক বার মিলিয়ে নিয়ে এক বাঙালি কাগজ, কর্ম, সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, 'এইবারে যাও বৎস, ডীনের দক্ষতরে। সব মিলিয়ে দিয়েছি। আর, শোনো, সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের (তখনকার কালে পাঁচ টাকার একটু কম) নোট। এটা কেরানীর অজ্ঞাত্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।'

হুক্ হুক্ বুক্—প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সীমান্তে পৌঁছে—দাঁড়ালুম গিয়ে ডীনের দক্ষতরে, কাউন্টারের সামনে। পাঁচ টাকার চেয়ে বেশীই রেখেছিলুম।

যে কেরানী এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন তাঁর এ্যাকডা হিঙেনবুর্গা গোক, আর

বয়েসে বোধ হয় তিনি যুনির সমান। সাতিশষ গম্ভীর কণ্ঠে আমার গুড়, মনিঙের কি একটা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়ে দকে দকে কাগজ গুললেন, টাকাটা কি কায়দায় যে সরালেন ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। বরঞ্চ গম্ভীর কণ্ঠে গম্ভীরভর করে শুধোলেন, ‘অমুক সাটিকিকেটটা কই?’

আমি তো সেই দুই যোগানদারদের উপর রেগে টঙ। পই পই করে আমি শুধিয়েছি, ওরা আরো পই পই করে বলেছে, সব কাগজ ঠিকঠাক আছে, এখন এ কা গেরো রে বাবা! বুঝলুম, কি একটা সাটিকিকেট আনা হয় নি। কিন্তু সে সাটিকিকেট কিসের, কোনোই অহুমান করতে পারলুম না। যোগানদারদের মুখেও শুনি নি।

ভয়ে ভয়ে শুধালুম, ‘কি বললেন, শ্রর!’

এবার যেন নাভিকুণ্ডলি থেকে কৈয়াজখানি কণ্ঠে কি একটা বেকলো।

গুরু-মুর্শীদ, ওস্তাদ-মুরুব্বীদের আশীর্বাদ-দোওয়া আমার উপর নিশ্চয়ই ছিল; হঠাৎ অর্ধটা মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেঝে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপন অজান্তে এক গাল হেসে বলে ফেলেছি, ‘চেষ্টা তো দিয়েছি, শ্রর, দু বছর ধরে প্রায় প্রতি শনির রাত্রে—মাফ করবেন শ্রর—বলা উচিত রবির ভোরে। তা ওরা ধরতে না পারলে আমি কি করবো? বললে পেতায় যাবেন না, শ্রর—’

ইতিমধ্যে বুড়ো হঠাৎ ঠাঠা করে হেসে উঠেছেন। যেমন তাঁর গাম্ভীর্য তেমন তাঁর হাসি। বিশেষ করে তাঁর বিরাট গোঁপ জোড়ার একটা দিক নেমে যায় নিচে, তো অল্পটা উঠে যায় উপরের দিকে। সে হাসি আর ধামে না। ইতিমধ্যে ছোকরা কেরানীরাও হাসির রগড় দেখে তাঁর চতুর্দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে থেমে বললেন, ‘ধরা দেবার চেষ্টা করলে, আর ওরা ধরতে পারলো না, এটা কি রকম কথা?’

আমি বললুম, ‘যে-পুলিশ আরেকটু হ’লে ধরতে পারতো, তাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করতে পারি। যে, আমি চেষ্টার ক্রটি করি নি, এই জেলে যাবার সাটিকিকেট যোগাড় করার।’

সংক্ষেপে বললেন, ‘খুলে কও।’

আমি সেই প্রকৃতির লোক যারা নার্ভাস ব্রেকডাউনের ভাঙন থেকে পড়ি-পড়ি করতে করতে বেঁচে গিয়ে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে হয়ে যায় অহেতুক বাচাল—সেও আরেক রকমের নার্ভাসনেস্! গড় গড় করে বলে গেলুম, পুলিশের সেই জাল পাতার কাহিনী—বিশেষ করে আমার উপকারার্থে—‘পাব’-এর ভিতরকার ব্যান-

ও সর্বশেষে সেই পুলিশম্যানের সঙ্গে পথিমধ্যে আমার যম-নচিকেতা কথোপকথন। বক্তৃতা শেষ করলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ‘এর পর এই পরীক্ষার পড়া নিয়ে বজ্র ব্যস্ত ছিলুম বলে সলিড কিছু করে উঠতে পারি নি, স্তর। শুধু ঐ যে, দিন পনেরো আগে হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল লর্ড মেয়ারের বিরাট দফতরের উচ্চতম টাওয়ারে একটা ছেঁড়া ছাতা বাঁধা, বাতাসে পংপং করছে, কাছার ব্রিগেড পর্যন্ত নামাতে পারে নি, ঐ উপলক্ষে অধীন কিঞ্চিং, অতি যৎকিঞ্চিং সাহায্য করতে—’

একজন ছোকরা কেরানী আঁতকে উঠে বললে, ‘সর্বনাশ! ওটার তালান্ধী যে এখনো শেষ হয় নি!’

বুড়ো বললেন, ‘আমরা তো কিছু শুনছি না।’

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে গেলে তিনি কাউন্টারের ক্ল্যাপটা তুলে আমার সঙ্গে দোর পর্যন্ত এলেন—পরে শুনলুম, এ-রকম বিবরণ সম্মান ইতিপূর্বে নাকি মাত্র দু’একজন বিদেশীই পেয়েছেন। আমি কিছু শুধাবার পূর্বেই তিনি যেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথাটি আমার কানের কাছে নিচু করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ডগা বুকে ঠুকে ঠুকে ফিস ফিস করে বললেন, ‘আমি তিনবার, আমি তিনবার।’ তারপর অত্যন্ত সিরিয়াসলি শুধোলেন, ‘বছর তিনেক পূর্বে এক ডাচ স্টুডেন্ট বললে—বুঝতেই পারছো, এ রসিকতাটা আমি শুধু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গেই করে থাকি, হুদু মাত্র জানবার জন্ত, তারা কতখানি সত্যকার জর্মন ঐতিহ্যের যুনি ছাত্র হতে পেরেছে—স্টুডেন্টরা নাকি ক্রমেই হারছে।’ কণ্ঠে রীতিমত আশঙ্কার উৎপীড়ন।

আমি তাঁর প্রসারিত হাত ধরে হাওশেক করতে করতে বললুম, ‘তিন বছর পূর্বে, ইয়া। কিন্তু তারপর জানেন তো, আমি আর আপনার মত মুকব্বীকে কি বলবো, ক্রমশঃ মেষেরও রূপালী সীমন্তরেখা থাকে—এল জর্মনিতে অভূতপূর্ব বিরাট বেকার সমস্যা, যেটা এখনও চলছে। ফলে ছেলেরা ম্যাট্রিক পাস করে এদিক ওদিক কাজে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢুকছে যুনিতে, আগে যেখানে ঢুকতো একজন, এখন ঢোকে দশজন। ওদিকে সরকারের পয়সার অভাবে পুলিশের গুষ্টি না বেড়ে বরঞ্চ কমতির দিকে। আমরা এখন দলে ভার। বস্তুতঃ আমরা এখন নিশাচরবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দিবাভাগেই তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারি—করি না, শুধু শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য ভঞ্জন হবে বলে।’ তারপর একটু খেমে গম্ভীরতর কণ্ঠে বললুম, ‘আর যদি কখনো সে দুদিনের চিহ্ন দেখি, তবে সেই হুদুর ভারত থেকে ফিরে আসবো—আ মি। সামনের পরীক্ষায়

পাস করি আর কেলই মারি, সেই পরাজয় প্রতিরোধ করার জন্য যুঁজিতে ঢুকে
ছাত্র হব আবার—আ মি ।’

‘আমো ।’ ॥

রাসপুতিন

এক একটা দুঃখ মানুষ আমৃত্যু বয়ে চলে। আমার নিজের কথা যদি বলার
অনুমতি দেন, তবে নিবেদন করি, অধ্যাপক বগদানকের আমাকে বলা তাঁর
নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমি যে কেন তখনই লিখে রাখি নি সেই
নিম্নে আমার শোক, এবং এ-শোক আমার কখনো যাবে না। তারই একটি
১৯১৭-র কম্যুনিষ্ট বিপ্লব। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটি
বর্ণন করতে তাঁর লেগেছিল পুরো ন’টি ঘণ্টা। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ইস্কুলের
শোবার ঘণ্টা পড়ে রাত ন’টার সময়; আমি কলেজে পড়তুম বলে অধ্যাপকের
ঘরে ঐ সময়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। পর পর তিন রাত্রি ধরে রাত
বারোটা-একটা অবধি তিনি আমাকে সে ইতিহাস বলে যান। অবশ্য অনেকেই
বলতে পারেন, ঐ যুগপরিবর্তনকারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর প্রামাণিক পুস্তক
লেখা হয়ে গিয়েছে এবং অধ্যাপক বগদানকের পাঠটা খোয়া গিয়ে থাকলে এমন
‘কাই বা ক্ষতি। হয়তো সেটা সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি যে কটি সামান্য বই
পড়েছি তার সব কটাই বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক। বগদানক তাঁর কাহিনী
বলেছিলেন একটি ঘোল বছরের ছোকরাকে—ঘটনার মাত্র চার-পাঁচ বৎসর পরে
এবং সেটি তিনি তাই করেছিলেন সেই অস্থায়ী রসময়, অর্থাৎ সাহিত্যরসে
পরিপূর্ণ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, অধ্যাপকের বর্ণনভঙ্গিটি ছিল
অসাধারণ, তাই পরবর্তী যুগে তাঁর ইরান ও আফগানিস্থান (এ দুটি দেশে তিনি
দীর্ঘকাল বাস করেন) সম্বন্ধে লিখিত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি পণ্ডিত-
মণ্ডলীতে সাহিত্যিক খ্যাতিও পায়। মাতৃভাষা রাশানে তিনি লিখেছেন কমই—
তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রকাশ-যুগে রাশাতে এ ধরনের গবেষণার কোনোই মূল্য ছিল না বলে
সেগুলো সেখানে ছাপানোই ছিল অসম্ভব। তিনি প্রধানত লেখেন ক্রাসৌ ইংরাজী
ও ফার্সীর মাধ্যমে। এবং সব চেয়ে বেশী সম্মান পান ফার্সী পণ্ডিতজন মধ্যে।’

১ এঁর উল্লেখ ক্রীড়িত প্রস্তাব মূখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্র-জীবনীতে’ করেছেন।
আমিও ‘দেশ-বিদেশে’ বইয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি

তিনি যে দ্বিতীয় কাহিনী বলেন, সেটি রাসপুতিন সত্যকে। প্রথমটির তুলনায় এটি অনেক দৃশ্য। রাসপুতিনকে নিহত করা হয়, পুরনো ক্যালেন্ডার অল্পবয়সী ১৬ই ডিসেম্বর, নতুন ক্যালেন্ডার অল্পবয়সী ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। এর প্রায় দু'টি বৎসর পর রাসপুতিনকে নিয়ে আমেরিকায় একটি ফিল্ম তৈরী হয় (এবং আমার যতদূর মনে পড়ে লায়োনেল বেরিমোর রাসপুতিনের অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন) এবং ঐ সময় রাসপুতিন-হস্তা রাশার শেষ জারের নিকটাত্মীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউরুপফ (আরবা হীক্রেতে ইউরুফ, ইংরাজীতে জোসেফ) ইয়োরোপে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের মধ্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেই সব ভাগ্যবানদের দুজনা, যাঁরা প্রাণ নিয়ে রাশা থেকে পালাতে সক্ষম হন। তিনি লণ্ডন আদালতে মোকদ্দমা করেন ফিল্ম নির্মাতাদের (বোধ হয় M G M) বিরুদ্ধে যে, তাঁরা যে ফিল্মে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসপুতিন তাঁর অর্থাৎ ইউরুপফের স্ত্রীকে পঞ্চম তাঁর কামানলের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোকদ্দমাটি হেরে যান বটে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটি তখন এমনই *cause celebre* কল্প সেন্সে রূপে—যেমন আমাদের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা—প্রখ্যাতি লাভ করে যে তার অল্প দু'এক বৎসর পর ঐ মোকদ্দমায় প্রধান অংশগ্রহণকারী একজন উকিল মোকদ্দমাটি সত্যকে একটি প্রামাণিক—এবং আমি বলবো—সাহিত্যিক উচ্চপরিষাদের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি যদিও ইউরুপফের বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল ছিলেন, তবু আদালতে ইউরুপফ দম্পতির খানদানী সৌম্য আচরণের অরূপণ প্রশংসা করেন। তারপর হয়তো আরো অনেক কিছু ঘটেছিল কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় নি। হঠাৎ গত মাসের ‘আনন্দবাজার’র এক ইস্যুতে দেখি, ইউরুপফ ফের মোকদ্দমা করেছেন—এবার কিন্তু আমেরিকায়, কলাম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাসপুতিন ও তাঁর জীবন নিয়ে নাট্যপ্রচার করার জগ্য—এবং আবার মোকদ্দমা হেরেছেন। সেই স্ববাদে আমার মনটা চলে গেল ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে, যখন অধ্যাপক বগদানফ রাসপুতিন-কাহিনী আমাকে ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনান।

পরবর্তী যুগে ফিল্ম বেকলো, তার পর লণ্ডনের উকিল তাঁর বক্তব্য বললেন, এবং ‘আনন্দবাজার’ বিদেশ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। এদের ভিতর পরস্পর বিরোধ তো রয়েছেই, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ-স্বলে আসল বক্তব্য এই যে, বগদানফ বলেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক অনেকখানি ভিন্ন কাহিনী। আমি আদৌ বলতে চাই নে, তাঁর বিবরণী, জবানী বা ভাষন—যাই বলুন—সেইটেই নির্ভুল আশ্ববাক্য; বস্তুত তিনি নিজেই আমাকে বার বার

বলেছিলেন, ‘মাই বয়! সেন্ট পেটেরসবুর্গে তখন এত হাজারো রকমের গুজোঁহ নিত্য নিত্য ডিউক সম্প্রদায় থেকে আস্তাবলের ছোকরাটা পর্যন্ত গরমাগরম এ-মুখ থেকে ও-মুখ হয়ে রাশার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে আমারটাই যে অভ্যস্ত নেই বা বলি কোন্ সাহসে? তবে এটা সত্য আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ “টেকস্ট-ক্রিটিসিজম্”—তখনো ছিল, এখনো আছে—অর্থাৎ কোনো পুস্তকের পেলুম তিনখানি পাণ্ডুলিপি, তাতে একাধিক জায়গায় লেখক বলেছেন পরস্পরবিরোধী তিনরকম কথা। আমার কাজ, যাচাই করে সত্য নিরূপণ করা, কিংবা সত্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেওয়া। অতএব, বুঝতেই পারছো, রাসপুতিন সম্বন্ধে গুজোবগুলো আমি সরলচিত্তে গোত্রাসে গিল নি, আমার বুদ্ধিবৈবেচনা প্রয়োগ করে যেটা সর্বাপেক্ষা সত্যের নিকটতম সেইটেই বলছি।’

অধ্যাপক রাসপুতিনের প্রথম জীবনাংশ সংক্ষেপে সারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই চাষী পরিবারের ছেলে রাসপুতিনের জন্ম সাইবেরিয়াতে। ‘রাসপুতিন’ তাঁর আসল নাম নয়—সেটা পরে অন্য লোকে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করে কামাদি ব্যাপারে, জানতে পেয়ে তাঁর উপর চাপায়। লেখাপড়ার চেষ্টা তিনি ছেলেবেলায় কিছুটা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদিকে ছিলেন, ক্রাসের মামুলী চাষার ছেলেরও অনেক নিকৃষ্ট। এর পর তিনি তাঁর সমাজের ভ্রমঘরেই বিয়ে করেন—আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই তথাৎ তাঁর ঝোঁক গেল ‘ধর্মের’ দিকে, কিন্তু প্রচলিতার্থে আমরা ধর্মীচরণ বলতে যা বুঝি সেদিকে নয়। হিন্দু ধর্মে যে-রকম একাধিক মতবাদ, শাখা-প্রশাখা—২শের প্রচলিত (অর্থডক্স) সনাতন খৃষ্টধর্মেও তাই। তারই একটার দিকে আকৃষ্ট হলেন গ্রেগরি (রাসপুতিন)। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি, অধ্যাপক বগদানফ ছিলেন অতিশয় ‘গোঁড়া’—আমি সজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করছি—রাশার সরকারী ধর্ম ‘গ্রীক অর্থডক্স’ চার্চে বিশ্বাসী এবং আচারনিষ্ঠ খৃষ্টান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কামরায় (তখনকার দিনের অতিগিলাশা, এখন বোধ হয় ‘দর্শন-ভবন’) দেয়ালে ছিল ইকন এবং তার নিচে অষ্টপ্রহর জলতো মঙ্গলপ্রদীপ এবং তারই নিচে তিনি অহরহ দাড়িয়ে স্বদেহে আবুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করতে করতে—ঠিক আমাদের বুড়িদের মত—বিড়বিড় করে দ্রুতগতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বলা বাহুল্য রাসপুতিন যে খলিস্তি (khlisti) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলেন সেটাকে অধ্যাপক অপছন্দ করতেন। এ সম্প্রদায় উন্নত নৃত্য, সংগীত (এবং লোকে বলে যোনাভিচার) ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাখ্যাকে মানবাত্মায় অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং পরমাখ্যায় পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা

করে। এ মার্গ বিশ্বসংসারে কিছু আজগুবি নূতন চীজ নয়। তবে এঁরা বলতে কষ্ট করতেন না যে, খ্রী পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন, অর্থাৎ এ বাবদে কে কি করে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাসপুতিন এটাকে নিয়ে গেলেন তার চরমে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, ‘পাপ না করলে ভগবানের ক্ষমা পাবে কি করে? অতএব পাপ করো!’ এ ছাড়া তাঁর আরেকটি বক্তব্য ছিল, তিনি পরমাত্মার অংশাবতার, এবং তাঁর সঙ্গে দেহে মনে আত্মায় আত্মায় যে কেউ সম্মিলিত হবে তারই চরম মোক্ষ তদুৎপত্তি। তাঁর শিষ্যাগণের সঙ্গে তাঁর সেই সম্মিলিত হওয়াটা কোন পদ্ধতিতে হতো সেটা বলতে শ্রীলতায় বাধে, এবং একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাগণকে নিয়ে একই কামরায় যে সব ‘সম্মেলন’ ঘটাতেন সেটা শুধু তিনি নিজেতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না, শিষ্য-শিষ্যাগণ নিজেদের মধ্যেও সম্মিলিত হতেন। ইংরিজীতে একেই ‘অর্জি’ ‘সেটারনেলিয়া’ ইত্যাদি বলে থাকে।

এটা সত্য, রাসপুতিনের কথা আমিই উত্থাপন করেছিলাম এবং অধ্যাপকও রাসপুতিন সম্বন্ধে তাঁর যা জানা ছিল সেটি সবিস্তর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাসপুতিনের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পূর্ণ বক্তব্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করেন ঐ সম্প্রদায় নিয়ে, এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে কোথায় কোথায় এ-প্রকারের ‘অর্জি’ স্বীকৃত এবং কাঁধে পরিণত হয়েছে তাই নিয়ে। এ বাবদে তাঁর শেষ বক্তব্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে : ধর্মের নামে এ ধরনের অনাচার কেন যুগে যুগে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিংবা গোপনে গোপনে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখে, এ তত্ত্বটি সাতিশয় গুরুত্ব দারণ করে এবং এর অধ্যয়ন প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করে হয় না, এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন নৃতত্ত্ব এবং পরে সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন (এর পূর্বে Anthropology ও Sociology এ দুটো শব্দ আমি কখনো শুনিই নি)।

আমি তখন বুঝতে পারি নি, পরে পারি যে আর পাঁচজনের মত তিনিও রাসপুতিনের রগরগে কাহিনী কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ওরই মাধ্যমে—ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখানোর মত—আমাকে সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পাঠ্যবস্তুর গণ্ডি থেকে বের করে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এসব আমার সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কথা হলে আমি এগুলো উল্লেখ করতুম না, আমার অন্ততম উদ্দেশ্য, এই সুবাদে তখনকার দিনের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-চালিত বিশ্বভারতীর (স্কুল ও কলেজ—যথাক্রমে ‘পূর্ব’ ও ‘উত্তর বিভাগ’) অধ্যাপকগণ

কি প্রকৃতি ধারণ করতেন তারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন।

অধ্যাপক বলেছিলেন, এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অবাধে করা যাচ্ছে এবং ততুপরি সেটা ধর্ম নামে প্রচারিত হচ্ছে, এটা যে জনপ্রিয় হবে—অন্তত জনগণের অংশবিশেষে—সেটা তো অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে এক অজানা-অচেনা অর্ধলুপ্ত খলিস্তি সম্প্রদায় হঠাৎ নবজীবন লাভ করে খুল জ্বারের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এটা তো আর একটা আকস্মিক অকারণ-কর্তাবিহীন কর্ম নয়। এরকম একটা নবআন্দোলন আনয়নকারী পুরুষের কোনো-না-কোনো অসাধারণ গুণ, আকর্ষণ বা সম্মোহনশক্তি থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক ছিলেন কটুর 'অর্থডক্স গ্রীক চার্চ'-এর অঙ্ক ভক্ত। কিন্তু এস্থলে এসে তিনিও স্বীকার করলেন, বাসপুতিন একাধিক অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি যে কঠিন কঠিন ছুরারোগ্য রোগ, কোনো প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ না করে প্রশম করতে পারতেন সেটারও উল্লেখ করলেন। কি প্রকারে? কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে জ্বর-প্রাসাদের উপর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বালক যুবরাজ আহত হন। তাঁর রক্তক্ষরণ আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ভিয়েনা বার্লিন থেকে বড় বড় চিকিৎসক এসেছেন। আমি অধ্যাপককে শুদিয়েছিলুম, 'চিকিৎসা শাস্ত্রে কি বাণী তখনো এতই পশ্চাৎপদ?' তিনি বলেছিলেন, 'বলা শক্ত। তবে সাহিত্যেও বেলা চেফ্‌ফ্‌ যা বলেছেন এস্থলেও হয়তো সেটা প্রযোজ্য: তোমার প্রিয় লেখক চেফ্‌ফ্‌ বলেছেন, "হ্যাঁ, আলবৎ আমরা রুশ সাহিত্য পড়ি। কিন্তু সেটা ঐ যেরকম আমরা 'কুটির শিল্প'কে মেহেরবানী করে সাহায্য করি। আসল মালের জুগ্‌ যাঁই ফরাসী সাহিত্যে।" হয়তো চিকিৎসার বেলাও তখন তাই ছিল।'

দাসী না ডাঃস্—সমাজের দুই প্রান্তের হুজনা—কে প্রথম বাসপুতিনকে নিয়ে গেল জ্বারের রাজপ্রাসাদে?

সে কি? যুবরাজ মৃত্যুশয্যায়, আপনি 'কটেজ ইনডাস্ট্রি'র রাশান ডাক্তাররা তো হার মেনেছেনই, ভিয়েনা-বার্লিনের রাজ-বৈজ্ঞানিক, বাবা কি না কাইজারের, এমপেরার ফ্রান্স্‌স্‌ বোজ্‌জের প্রাসাদের গণ্যমান্যদের চিকিৎসা করে করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত রাশা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কারণ রুশ যুবরাজের যে রোগ হয়েছে সেটার নাম হ্যামোফিলিয়া—আমরা গরীবদের, না জানি কোন্‌ পুণ্যের ফলে, আমাদের হয় না—ব্যামোটা শব্দার্থেই রাজসিক, শুধু রাজা-

রাজাদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে ছিল এই বিশ্বাস; পরে দেখা গেল, গরীবদেরও হয়। আমরা বললুম, 'সেই কথাই কও। ভগবান যে হঠাৎ ধামোখা এহেন দুঃস্বপ্ন ব্যাধি শুধু বড়লোকদের জন্তই রিজার্ভ করে রেখে দেবেন, এটা তো অকল্পনীয়। ব্যামোঙুলো তো আমাদের মতন গরীবদের জন্তই তৈরি হয়েছে। ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম অব্ দি হেভন্ বা স্বর্গরাজ্যে যার বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাঁদেরই, যাদের কিংডম অব্ দি আর্থ বা পৃথ্বরাজ্য আছে।^২ তাই যদি হয়, তবে স্বর্গরাজ্যই হোক, আর কুস্বর্গই হোক, ভিয়েনা-বালিনের অধিনীকুমারদ্বয় যেখানে কগীকে হরি নামের গুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে, সেখানে দাসী 'কার্সী পড়বে' ? হয়তো ঠিক সেইখানেই, কিন্তু অন্য কারণও আছে।

আমরা এ-দেশে যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হই না কেন, একাধিক বাবদে অন্তত সে যুগে, অর্থাৎ ঐ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জারের রাশা আমাদের অনায়াসে হার মানাতে পারতো। সে রাশার গ্রীক অর্থডক্স চার্চ ছিল শব্দার্থেই অর্থডক্স গোড়া, কট্টর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর চাষাভূষীদের তো কথাই নেই। তন্নম্ন, জড়িবাড়ি, মাদুলী-কবচ থেকে আরম্ভ করে নিরপরাধ 'প্রভু যীশুর হত্যাকারী' ইহুদিদের স্ত্রযোগ পেলেই বেধড়ক মার, এবং সেখানেই শেষ নয়—আপন রক্তের, আপন ধর্মের জাতভাই যারা এসব কুসংস্কার থেকে একটুখানি মুক্ত হয়ে, অসুষ্ঠ পরিমাণ স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর বাণী জীবন দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করতো যেমন 'দুখবর', 'স্তানিস্ত' সম্প্রদায়—তাদের উপর কী বীভৎস অত্যাচার।^৩ এবং চাষাভূষীদের এই অত্যাচার-ইচ্ছনে কাষ্ঠ সরবরাহ করতেন জার-সম্প্রদায় এবং তাঁদের অহুগ্রহে লালিত-পালিত বিলাস-বাসনে গোপন পাপাচারে আকর্ষণ-নিমগ্ন অর্থডক্স চার্চ তার আপন 'পোপ'—হোলি সিনড্কে নিয়ে। যে ইউক্লিপস এর

২ স্বয়ং স্বামীজী নাকি বলেছেন, 'যে ভগবান আমাকে এ-দুনিয়ায় এক মুঠো ভাত দেয় না, সে নাকি মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবে—why, even an imbecile would not believe it; much less I!' তবে এটা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবু এ-কথা অতিশয় সত্য, তিনি এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। বক্সিম নাকি বলতেন, মানুষকে ভগবান হতে হবে, আর তিনি নাকি বলতেন, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

৩ সে অত্যাচার-সংবাদে কাতর হয়ে তলস্তয় 'রেসারেকশন' বই লিখে, টাকা তুলে এদের অনেককে কানাডা পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বৎসর পর রাসপুতিনের ভবলীলা সাক্ষ করেন, তিনি বা তাঁর ভাই, আয়োক গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রকাশ 'ডুমা' বা মন্ত্রণাসভায় প্রস্তাব করেন এবং বহু বিনিময় যামিনী স্থাপন করে স্বহস্তে নির্মিত পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেন, ইহুদিদের সবংশে বিনাশ করার জন্য কি প্রকারে, স্তরে স্তরে, শল্য প্রয়োগদ্বারা তাদের পুরুষদের সম্ভ্রান প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা যায়? বগদানক সাহেব বলেছিলেন, 'মাই বয়, হি সাবমিটেড্ ইট ইন্ অন্স সিরিয়াসনেস্।' অবশ্য তৎসঙ্গেও মার্জিত কচিসম্পন্ন তদ্রসম্ভ্রান অধ্যাপক বগদানক ইহুদিদের ঘৃণা করতেন—হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, ঐ জাতীয় আর পাঁচটা বর্বর ক্রশের মত। বিশ্বভারতীতে তখন একটি হুন্দরী, বিদেশিনী, ইহুদি অধ্যাপিকা ছিলেন; কি প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠতে বগদানক তিক্ত অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আই উড্ নট্ টাচ হার উইথ এ পেয়ার অব টংস!'—গাড়াশি দিয়েও তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে রাজী হবেন না।

এ কথা সবাই বলেছেন, রাজধানী সেন্ট পেটের্সবুর্গে (তখন অবশ্য রাশা জার্মানীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত বলে তাদের সভ্যতায় জার্মানদের যে শতকরা আশী ভাগ অবদান, মায় তাদের ভাষায় প্রবেশপ্রাপ্ত জার্মান শব্দ, যেমন সেন্ট পেটের্সবুর্গের জার্মান অংশ 'বুর্গ'—'প্রাসাদ', 'কাসল্'—সমূলে উৎপাটিত করে নামকরণ করেছে 'পেত্রোগ্রাদ'। সর্বশেষে এর নামকরণ হয় 'লেনিনগ্রাদ', কিন্তু ততদিনে রাজধানী চলে গেছে মস্কোতে। জারের 'উইংটার পেলেস' প্রাসাদে বিরাজ করতো কেমন যেন এক অদ্ভুত বহুশ্রম্য (প্রধানত ধার্মিক—mysticism) বাতাবরণ। সম্রাজ্ঞী—জারিনা—ছিলেন অতিশয় ক্রসংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-অনুষ্ঠানে সদালিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে পুত্রের পুনর্বীর রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে উদয়ান্ত সশঙ্কিত; বিশেষ করে যখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি এই কঠিন পীড়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন যে তিনি পাগলিনীর মত রাজ্যের যত প্রকারের টোটকামোটকা, তাবিজমাতুলার সন্ধানে লেগে যাবেন সেটা অবাস্তব হলেও অবোধ্য নয়—এমন কি কটর বৈজ্ঞানিকও সেখানে সহায়ত্বভিত্তি দেখাবে। একেই তো শীত-প্রাসাদে বিরাজ করতো রহস্যময় বাতাবরণ, যেন সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো প্রকারের অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, ততুপরি নানাতন্ত্রের কুটিল ভাগ্যান্বেষী সেই প্রাসাদে কোনো প্রকারের চতুরতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গমনাগমন করছে, সেখানে যদি নিত্যসজ্জিনী দাসীটিও যদি বলে যে, সে একজন 'হোলিমান', 'সাদুতপস্বী'কে চেনে যার হৃদয়ে প্রভু যীশুর সামান্যংশ প্রবেশ করার ফলে ('সেই শ্রাশত সন্তার একটি কণা আমাতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছে')—রাসপুতিনের

আপন ভাষায়) তিনি প্রভুরই মত বহু ছুরারোগ্য ব্যাধি, কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে অবলীলাক্রমে আরোগ্য করতে পারেন, তবে মহারানী যে নিমজ্জমানার গ্রাফ সেই তৃণখণ্ডকেও দৃঢ়হস্তে ধারণ করবেন সেটা তো তেমন-কিছু অসম্ভব আচরণ নয়।

অগ্রগণ্য বলেন, দাসী নয় ডিউক।

রাসপুতিন দিগ্বিজয় করতে করতে পেত্রোগ্রাদ—সম্ভব হলে রাজপ্রাসাদ—জয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এদিকে সেখানকার যাজক সম্প্রদায়ের কেউ বা তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ শুনে, কেউ বা তাঁর ধর্মের নবজাগরণ প্রচেষ্টার খ্যাতি শুনে, কেউ বা তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতার জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সেটা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্ত, এক কথায় অনেকেই অনেক কারণে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করতে উদগ্রীব। রাসপুতিন সশিষ্য শিষ্যা পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করে—সে প্রবেশ প্রায় ঝুটের পূতপাবিত্র জেরজালেমের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করার সমতুল—সাড়থরে প্রতিষ্ঠিত হলেন এক প্রভাবশালী শিষ্যের গৃহে। শীঘ্রই যোগসূত্র স্থাপিত হল পেত্রোগ্রাদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষাশালার সুপাণ্ডিত অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি আবার মহারানীর আপন ব্যক্তিগত পুরোহিত—অর্থাৎ এরই সামনে মহারানী প্রতি সপ্তাহে একবার ‘কনফেশ’ করেন, ঐ সপ্তাহে তিনি যে সব পাপচিন্তা করেছেন, কমে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সেগুলি স্বীকার করে শাস্তাদেশ অমুযায়ী প্রায়শ্চিত্তাদেশ গ্রহণ করেন—প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ উপবাস ও মালাজপের গাঁওতেই আবদ্ধ থাকে।^৪ এই কনফেশন গ্রহণ করে যে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্তাদেশ প্রদান করেন তাঁর পদটি স্বভাবতই সাতিশয় গান্ধার্য ও গুরুত্ব ধারণ করে। তিনি সম্রাজ্ঞী-

৪ এই কনফেশন বা পদস্থলন স্বীকারোক্তি একাধিক ধর্মে প্রচলিত আছে। এদেশে জৈনদের ভিতর সেটি নিষ্ঠা সহকারে মানা হয়, এবং এরই নাম ‘পর্যুষণ’। তবে আমাদের যতদূর জানা, পর্যুষণ বৎসরে মাত্র একবার হয় এবং সম্প্রদায়েয় সকলেই সেটা একই সময়ে করেন বলে বর্ষার শেষে সেটা পর্বদিবস রূপে সাড়থরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ভ্রমণরাও বর্ষাকালে পর্যটন নিষিদ্ধ বলে কোনো সংঘে আশ্রয় নিয়ে বর্ষাযাপন-শেষে পাপ স্বীকারোক্তি করে পুনরায় পর্যটনে নেমে পড়েন। মুসলমানরা হজের সময় করে থাকেন, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে ‘তওবা’ করেন। ‘তওবা’ শব্দার্থে ‘প্রত্যাবর্তন’। অর্থাৎ তওবাকারী আপন পাপ সহজে অনুশোচনা করে ধর্মমার্গে প্রত্যাবর্তন করলো।

হৃদয়-কন্দরের অন্তরতম রহস্য জানেন বলেন—এমন কি স্বীকারোক্তির সময় তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও ধরেন—তাকে থাকতে হয় অতি সাবধানে।

তঁার প্রধান কৌতূহল রাসপুতিন কোন্ কোন্ কারণে কি ভাবে হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তিত করে ‘নবজন্ম’ পেলেন। গ্রীক অর্থডক্স চার্চ, ক্যাথলিক তথা অগ্ন্যাগ্ন সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই ‘নব-জীবন’ লাভ, গৃহী খৃষ্টানের সম্রাস-গ্রহণের জন্ম এই কনভার্সনেব উপ-ইতিহাস এক বিরাট অংশগ্রহণ করে আছে। খৃষ্ট সাধু মাত্রই এটি মনোযোগ সহকারে বারংবার পাঠ করে তার থেকে প্রতি দিন নবীন উৎসাহ, তেজস্বী অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। মহারানীর আপন যাজক বর্ম-একাদমির অব্যক্ষকপে এই উপ-ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, সেই পুস্তক তঁার শিষ্যমণ্ডলার সংগ্রহে সটীক প্রতিদিন পড়িয়ে শোনাতেন এবং সভাবতই সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন সাধুসন্তদের নিয়ে গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনো গাণ্ডায়া কি ভাবে অকস্মাৎ দৈবাদেশ পেয়ে সবস্ব ভাগ কবে দমসকে প্রবেশ করে, কিংবা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, অথবা পাণ্ডিত্য থাকলে সে সে প্রবেশ ক’বে নির্জনে নিভৃত বাইবেল বা অথ কোনো দমসকের এক নবীন টীকা নিম্নাণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় এ সম্বন্ধে তঁার কোন পার্শ্বগত অবদানিত্ত ঘটিতজ্ঞতা ছিল না, এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ একম একটা আদর্শিক ‘কনভার্সন’ের নায়ক যদি তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে ঐহিক প্রসঙ্গোচ্চন করে তখন প্রত্যক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন। পূর্বেই বলেছি, রাসপুতিনের পিতৃপিতৃ যেন এমন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি সাধারণ কেন, অসাধারণ জনকেও মন্থনুৎসবং মোহাচ্ছন্ন করতে পারতেন। খৃষ্ট দমসকে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিল অতিশয় সামিত, কিন্তু প্রভু যীশুর যে কটি মঙ্গল উপদেশ তিনি বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন সেগুলি তিনি অতিশয় দৃঢ়-বিশ্বাসের বীধশীল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। সঙ্ক্ষে সঙ্ক্ষে এ সত্যটিও নিবেদন করা উচিত যে, রাশায় ধর্মশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে যে পণ্ডিতকুলমান্য সর্বোত্তম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন তিনি এই অশিক্ষিত হলদরসম্প্রদায়ের কাছে আসবেন না শাস্ত্রের টীকাটিক্সন অবগাথে। তিনি আসবেন অথ উদ্দেশ্য নিয়ে। এ স্থলেও প্রভু যীশুর সঙ্গে রাসপুতিনের সাদৃশ্য আছে। ইসরায়েলের স্মার্তপণ্ডিতরা যখন প্রভু যীশুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত তখন তিনি যেন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, আমি শাস্ত্রকে কার্যে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাবো।

এসব কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। যা বাস্তবে ঘটে সেটা সর্ব তর্কের

অবসান এনে দেয়। পণ্ডিতের পণ্ডিত রাসপুতিনকে দেখে, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর প্রতি শিষ্ট-শিষ্টাদের সহজ ভক্তি ও হৃদয় বিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুগ্ধ হলেন যখন রাসপুতিনের কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলে যেতে লাগলেন, কি ভাবে এক দৈবজ্যোতি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল আর তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে স্বর্গীয় প্রভুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ প্রকারের আকস্মিক পরিবর্তন ইতিহাস শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যক্ষ পড়েছেন, পড়িয়েছেন প্রচুর কিন্তু এ-জাতীয় পরিবর্তনের একটি সরল সজীব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা সে যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে-কোনো অব্যাপক, যে-কোন শিক্ষক এ প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দেন, কারণ পরের দিন থেকেই ছাত্রমণ্ডলীতে বেষ্টিতাবস্থায় তিনি অর্ধবিশ্বাসী তর্কবাগীশদের উদ্দেশে সবল, আত্মপ্রত্যয়জাত হৃদয় কণ্ঠ বলতে পারেন, ‘পবিত্র রুশ দেশের পবিত্রতর সম্ভদের যে অলৌকিক পরিবর্তনের কথা তোমরা পড়ছো, সেগুলো কাহিনী নয়, ইতিহাস, এবং শুধু পত্রে লিখিত জীর্ণ ইতিহাস নয়, নিত্যদিনের বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য; সে জিনিস ভাগ্যবান চক্ষুদ্বারা দেখতে পায়!’ অস্বদেশীয় প্রচলিত নীতিবাক্য আছে :

“অছাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।

মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।”

এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এই সাধুপুরুষকে তিনি রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উদ্ভাস্ত সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন করবেন। সর্ব ধর্মের সব ইতিহাস বলে, সাধুজনের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। সম্রাজ্ঞীকে এই সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে এনে দেবেন সান্ত্বনা, আত্মপ্রত্যয় এবং ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করবেন দৃঢ়তর ভূমিতে।

অতি সহজেই তিনি রাসপুতিনের গুণমুগ্ধ রাজপরিবারের একাধিক নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ার সহানুভূতি ও সহযোগ পেলেন। রাসপুতিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আকস্মিক যোগাযোগ। অধিকতর বিশ্বাসীরা বলেন, ‘না, যুবরাজের কঠিনতম সঙ্কটময় অবস্থান, যখন রাজবৈয়োগ তাঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশাস, তখন রাসপুতিন তাঁকে অহুরোধ করার পূর্বেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে শিষ্টগণকে প্রত্যয় দেন, তিনি যুবরাজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারবেন।

এ তো কোনো হাশুকের আশুপ্রত্যয় নয়। অভিজ্ঞতম প্রবীণ চিকিৎসকও বার বার মস্তকান্দোলন করে স্বীকার করেন, কত অগ্নিগিত রোগী যমদূতের দক্ষিণহস্ত ধরে যখন পরপারে যাত্রার জন্ত প্রথম পদক্ষেপ করেছে, ক্লান্ত সরল ভাষায় ঐ সব রোগীদের সম্বন্ধে যখন বহু পূর্বেই সব বিশেষজ্ঞ একই বাক্যে আপন দৃঢ় নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ অকারণে, চিকিৎসকের কোন প্রকারের সাহায্য না নিয়ে সেই জীবন্ত ব্যক্তি শ্মশান-সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

*

*

সম্রাট এবং মহিষী উভয়েই নাকি সাধুর প্রথম দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে রাজমহিষী।

অধ্যাপক বগদানফের মতে, অর্থাৎ তিনি যে জনরব সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই অলুয়ায়ী রাসপুতিন নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারানীকে আশ্বাস দেন, যুবরাজ বোগমুক্ত হবেন, এবং তিনিই তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। রাজমহিষী স্বয়ং তাঁকে নিয়ে কগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। যে-ব্যক্তিকে সম্রাজ্ঞী নিয়ে যাচ্ছেন সে-ব্যক্তি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, সে-কথা সে-ই একাধিকবার স্পীকার করেছে, এমতাবস্থায় যখন তাঁরা আশা করছেন যে, যে-কোন মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর জায় যুবরাজও প্রকৃতিদত্ত শক্তিবলে—যে শক্তি সর্বজনের অলক্ষিতে জীবদেহে বেঁচে থাকার জন্ত সর্বব্যাপির বিকল্পে নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা আপন কর্তব্য করে যায়—হয়তো নিরাময় হয়ে যেতে পারেন সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই নবাগত হয়তো আপন অজ্ঞতাবশত সেই শক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

তৎসত্ত্বেও মহারানী রাসপুতিনকে রোগীর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

চিকিৎসকরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন। রাসপুতিন বললেন, তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে চিকিৎসা করবেন না। তৃতীয় বলতে সম্রাজ্ঞীকেও বোঝায়, তিনি নিঃশরুচিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে দেহলীপ্রাপ্ত উত্তীর্ণ হলেন।

অতি অল্পকণ পরেই রাসপুতিন দোর খুলে রানীর দিকে সহাস্ত ইঙ্গিত করলেন। রানীমা কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত। যেন কত যুগ পরে তিনি দেখলেন রাসপুতিনের দেওয়া কি যেন একটা জিনিস হাতে নিয়ে যে কোনো হৃদয় বালকের মত যুবরাজ খেলা করছেন।

রাসপুতিন প্রকৃতই যুবরাজকে তাঁর রক্তমোক্ষণ রোগ থেকে নিরাময়

করেছিলেন কি না সে-বিষয়ে মতানৈক্য আছে—তবে এটাও স্মরণে আনা কর্তব্য বিবেচনা করি যে, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, সত্যাহুসন্ধান বললেই বোঝাতো—অবিশ্বাস। এই মূলমন্ত্র ঐ সময়ে এমনই হৃদয়প্রসারী হয় যে, তৎকালীন লিপিত পুস্তক, এনসাইক্লোপিডিয়াতে একাধিক যশস্বী লেখক স্বয়ং বুদ্ধ, মহাবীর, এমন কি তাঁদের আপন খৃষ্টের অতিদূর পর্যন্ত সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় (দু’ হাজার, আড়াই হাজার বৎসরের পরের একতরফা বা ‘এক্সপার্টে’ তদন্তে !) তাঁদের জীবনী এবং বাণীকে কাল্পনিক কিংবদন্তী আখ্যা দিয়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের অতিদূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছেন। অতএব সে যুগের পুস্তক যে রাসপুতিনের মত চিকিৎসানিষ্ঠজন যুবরাজকে রোগমুক্ত করেছেন সে কথা হয় অস্বাকার করে, কিংবা নীরব থাকে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন, রাসপুতিনের প্রামাদ গমনাগমনের পর থেকেই যুবরাজের স্বাস্থ্যোন্নতি দিনে দিনে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

আর সে যুগের সম্রাজ্ঞীদের ভিতর ধনে-ঐশ্বর্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য না হলেও যাকে ইয়োৰোপের রাজবংশবর্গ রাজপরিবার সবাঃপক্ষা সম্মুখের চক্ষে দেখতেন সেই জারিনা ? তিনি তো কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ রাসপুতিনের পদপ্রান্তে কী যে রাখবেন তার সন্ধানই পাচ্ছন না, কারণ সাধারণজনের মত ভবন-যানবাহন রজতকাঞ্চনে তাঁর লোভ ছিল না—তাঁর আসক্তি কিসে তার পুনরুজ্জ্বল মিশ্রয়োজন—ওদিকে জারিনা আবার জাতিমণ্ডিক, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মী তিনি বিশ্বাস করেন এবং যাদের এসব মিরাকল দেখাবার শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে তিনি তাঁর দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী সাধুসজ্জনদেরই না কত প্রকারের কুৎসারটে—দু’ হাজার বৎসর হয়ে গেল এখনো খৃষ্টবৈরীরা বলে, তিনি মাকি অসকরিত্ব। যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল ঈষৎ মাত্রাধিক—সে-স্থলে রাসপুতিন! যিনি কিনা, তাঁর কামানল নির্বাণিত করার চেষ্টা তো করেনই না, তদুপর ঐ বিশেষ রিপূর চরিতাখতাকে তুলে ধরেছেন সর্বোচ্চ ধর্মের পর্যায়ে এবং ফলে শিষ্টাশিষ্টাঙ্গসহ বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত হন—এসব ‘অর্জি’ ‘সেটারনেলিয়া’র উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তাঁর পূর্ববর্তী মক্ষ্মল-জীবনের তুলনায় রাজধানীতে তাঁর বর্তমান কেলেকারির বিবরণ তথা পল্লবিত জনরব চতুর্দিকে যে অধিকতর ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর কী সন্দেহ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্ষমতর মারাত্মক কলঙ্কাহীনী রটতে আরম্ভ করলো চতুর্দিকে ; এসব

দলবদ্ধভাবে রূত দুর্কর্মের ‘অর্জি’ এখন নাকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে— এবং সেখানে তো সব-কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—পর্ষস্ত ছড়িয়ে পড়েছে! সম্ভ্রান্ততম ডিউক ডাচেস, অর্থাৎ সম্রাটের নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়স্বারাও নাকি এই সব অনাচারে অংশ নিচ্ছেন। এবং সর্বশেষে যে কলঙ্কাহিনী পেত্রোগ্রাদে জন্মলাভ করে সর্ব ক্রমের সর্ব সমাজের উচ্চতম থেকে অধস্তন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে দিল রূঢ়তম পদাবাত সেটি আর কিছু নয়, স্বয়ং জারিনা তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন রাসপুতিনকে। অগ্ন্যাগ্ন সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই।

গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসপফের ছাঁটি যোকদ্মাই ছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই সব কলঙ্কাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে প্রথমে ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, পরে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁর মতে, তাঁর সতীসাহবী স্ত্রী পূর্বোল্লিখিত পাপাশুষ্ঠানের সঙ্গে মোটেই বিজড়িত ছিলেন না। সে কথা পরে হবে।

আমি এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে রুশ রাজনীতি এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন থেকে আর সেটা সম্ভবপর হবে না, কারণ, এই সময়েই কুটরাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলধর-সন্তান রাসপুতিন হিন্দু নিতে আবস্ত করেছেন দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কঠিন সংকটসমগ্রায়। ইতিমধ্যে যে সব সরল ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে বিশ্বততম স্ত্রে তাঁর ‘কৌতিকলাপের’ সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বয়ং জারিনা এবং রাশার ‘পোপ’ হোলি সিন্ড যতক্ষণ তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতায় অর্ধচেতন ততক্ষণ তাঁকে তো মুহূর্তেক তরে দুঃশিস্তা করতে হবে না। পাঠক, স্মরণ করুন সেই সুপ্রাচীন আরবী প্রবাদ : ‘কুকুরগুলো খেউ খেউ করে, কিন্তু কাকোলা (ক্যারাভান) চলে এগিয়ে।’ রাসপুতিন এই কুকুরগুলোর খেউ খেউকে খোড়াই পরোয়া করেন।

কিন্তু রাসপুতিন কি করে এরকম নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করলেন রুশ দেশের জনগণের রাজনৈতিক নবজাগরণকে! জার দ্বিতীয় নিকলাস যত না রক্ষণশীল, সম্রাটের সার্বভৌমিকত্ব স্বপক্ষে সচেতন ছিলেন, তাঁর চেয়ে শতগুণ স্ববির জড়ভরত ছিলেন তাঁর আমির-ওমরাহ। ওদিকে রুশ-সিংহ যখন সদন্তে মুখিক জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে নির্মমরূপে পরাজিত হল, তখন আর ‘হোলি’ রাশার অন্তঃসারশূন্যতা গোপন রাখা সম্ভব হল না। জনমত নির্ভরকণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। ১৯০৪

খৃষ্টাব্দে যে বৎসর রাসপুতিন সম্রাট গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই বৎসরেই জার প্রথম ‘বিধানসভা’ (এরই নাম পূর্বোল্লিখিত ‘ডুমা’) নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সে এক সত্যকার সাক্ষাস—নইলে তার কোন সম্মানিত সদস্য সেখানে অজ্ঞোপচার দ্বারা ইহদিকূলকে শিখণ্ডীকরণে পরিণত করবার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ গাষ্ঠীর্থমণ্ডিত পদ্ধতিতে পেশ করতে পারেন ?

কিন্তু ‘ডুমা’ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে রইল কি না রইল সে তত্ত্ব রাসপুতিন-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি যতদিন না রাজপ্রাসাদচক্রের দু-একজন খুরস্কর অতিশয় রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনস্তির করলেন যে, রাসপুতিনকে দিয়ে তাঁরা এমন সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়ে নেবেন, যারা ডুমার প্রতি পদক্ষেপের পথে লোহপ্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হয়ে থাকবে। কূটনীতিতে আনাড়ি রাসপুতিনের হাত দিয়ে তামাক খাওয়াটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হল না, কিন্তু এসব অপদার্থ নিয়োগের পশ্চাতে কে, সে তথ্যটিও গোপন রইল না। বস্তুত স্বয়ং রাসপুতিন প্রত্যেক পার্টিতে জালা জালা মদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্মিট কেকখণ্ড (তাঁর জন্ম বিশেষ করে কেকে তিন ডবল চিনি দেওয়া হত—এ বাবদে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল) চাষাড়ে পদ্ধতিতে প্রচুর শব্দ আর বিরাট আশুবাদানসহ চিবুতে চিবুতে দস্ত করতেন, ‘এই যে দেখছো স্কাফথানা, এটি আপন হাতে বুনেছেন স্বয়ং জারিনা, (কিংবা হয়তো তাঁর আদরের ডাকনাম সোহাগভরে উল্লেখ করতেন—আমার যেন মনে পড়ছে, তাই), কিংবা ‘জানো হে, ভরনাভাকে পাঠালুম তবল্দের বিশপ করে।’ প্রভু রাসপুতিনের অন্ধভক্ত, অত্যধিক মত্তপানবশত অধর্মমত্ত শিয়েরাও নাকি দ্বিতীয় সংবাদটি শুনে অট্টেতন্ত হবার উপক্রম ! কারণ প্রভুর নিত্যসঙ্গী ঐ ভরনাভা যে একেবারে আকাট নিরক্ষর ! সে হবে বিশপ !

মরীয়া হয়ে অগতম প্রধান পাত্রী নিযুক্ত করলেন গুপ্তঘাতক। রাসপুতিন শুধু যে অনায়াসে সংকট অতিক্রম করলেন তাই নয়, এ ‘স্ববাদে’ রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রভাব এমনই নিরক্ষর হয়ে গেল যে, স্বয়ং জার পর্যন্ত আর এখন উচ্চবাচ্য করেন না। অবশ্য সমস্ত ইয়োরোপই বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, জার অতিশয় দুর্বল চরিত্রের ‘যাক্গে, যেতে দাও না’—ধরনের নির্বীণ ‘শাসক’। কার্যত তাঁকে শাসন করেন জারিনা। এবং তাঁর সম্মুখে রাসপুতিনের বিকক্ষে টুঁ শব্দটি করার মত সাহস তখন কারো ছিল না।

রাসপুতিনকে হত্যা করার চেষ্টা নিফল হওয়ার পরই তিনি জারিনাকে সর্বজনসমক্ষে গস্ত্রীয় প্যাকবরীকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন (বা শাসন), ‘আমার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে গোষ্ঠীহৃদ্ধ রমানক্ষ পরিবার (অর্থাৎ সপরিবারে

তখনকার জার) নিহত হবে।' নিহত তাঁরা হয়েছিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই, কিন্তু সেটা ঠিক এক বৎসরের ভিতরই কিনা, বলতে পারবো না, দু' বৎসরও হতে পারে।

কিন্তু জারিনা? তাঁর শোচনীয় অবস্থা তখন দেখে কে? কুসংস্কারচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসী এই মূঢ় রমণীর যত দোষই থাক, একটা কথা অতিশয় সত্য, তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে বৃকে চেপে ধরে রেখেছিলেন পাগলিনী-পারা। উদযান্ত তাঁর আর্ত সশব্দ দৃষ্ট, না জানি কোন্ অজানা অন্ধকার অন্তরাল থেকে কোন্ অজানা এক নূতন সংকট অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, তাঁর কোনো একটি বৎসকে ছিনিয়ে নেবার জ্ঞা।

অতএব প্রাণপণ প্রহরা দাও রাসপুতিনের চতুর্দিকে। তিনিই একমাত্র মুশ্কিল-আসান। এই 'হোলিমান' আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সর্বলোকে সর্বনাশ।

কিন্তু বিশ্বসংসারের সকলেই রাসপুতিনের সাবধানবাণী বা শাসানোতে বিশ্বাস করেন নি এবং ভয়ও পান নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চস্তরের রাজরক্তধারী একাধিক ব্যক্তি। এঁরা ক্রমাগত জার-জারিনাকে রাসপুতিন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন, এবং ফলে তাঁদের প্রতি বর্ষিত অপমানসূচক কটুবাক্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। রাজপ্রাসাদে এঁরা হচ্ছেন অপমানিত—অথচ রাসপুতিনের 'শুভাগমনে'র পূর্বে এঁরাই ছিলেন সেখানে প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এখন তাঁদের এমনই অবস্থা যে, বাইরের সমাজে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারেন না। তাঁদের পদমর্যাদা, অভিজাত রক্ত প্রকাশ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে বাইরে, ক্ষুট-অক্ষুট নিত্যদিনের এ অপমান আব কাঁহাতক সহ্য করা যায়! ওদিকে 'হোলি রাশা' যে কোন্ জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কে জানে।

অপমানিত সর্বোচ্চ অভিজাতবংশজাত তিনজন বসলেন মন্ত্রণাসভায়।

স্থির হল, ইউরুপকেই হত্যা করবেন রাসপুতিনকে। তাই আজও লোকে বলে, 'তোমার স্ত্রীকে রাসপুতিন ধর্ষণ করেছিল বলেই তো তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, নইলে রাশাতে কি আর অগ্র লোক ছিল না?' ইউরুপক এটা অস্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রধানদের আদেশানুযায়ীই তিনি ঐ কর্মে লিপ্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজেকে ভলন্টিয়ার করেন যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্ষিতা হন নি। এ সম্বন্ধে ইউরুপকের আপন জবানী পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন; আমি শুধু বগ্‌দানক

সাহেবের জবানীটি পেশ করছি। না হয় সেটা ভ্রান্তই হল, তাতেই বা কি? তত্পরি আমার স্বত্বশক্তি আমার কলম নিয়ে কি যে খেলা খেলছে, জানবো কি করে?

এবং আশ্চর্য! হত্যা করবেন আপন বাড়িতেই তাঁকে সম্মান নিমন্ত্রণ করে! পুলিশকে ভয় করতেন এঁরা খোড়াই। কিন্তু জারিনা? তিনি যে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী কে, সে খবরটা প্রায় নিশ্চয়ই জেনে যাবেন, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে, না পারে, সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ ছাড়া গতান্তর নেই—নাশ পছা বিঘতে।

ইউসুফ পক্ষ যে রাসপুতিনের শত্রু তিনি এটা জেনেশুনেও ইউসুফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এলেন কেন? কেউ বলে, ইউসুফের সুন্দরী স্ত্রী ইরেনে তাঁকে ‘বিশেষ’ প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেন, কেউ বলে, রাসপুতিন সত্যিই আশা করেছিলেন, যুগোমুখি আলাপ-আলোচনার ফলে হয়তো প্রাসাদের এই শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে, কেউ বলে, রাসপুতিন প্রাসাদ জয় করেছিলেন বটে কিন্তু ইউসুফের মত অভিজাতবংশের কেউ কখনো তাঁকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। ইউসুফ জয় অর্থই পেত্রোগ্রাদ-অভিজাতকূল জয়। তার অর্থ, নূতন শিখা, নূতন ...একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাণ্ডার!

প্রায় সবাই বলেছেন, মদে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পটাসিয়াম সাইনেইড, কিন্তু অধ্যাপক বলেছিলেন, মধুভরা বিরাট কেকের সঙ্গে মিশিয়ে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পছাতেই আততায়ীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। মহামাণ্ড অতিথি রাসপুতিনকে অবজ্ঞা দিতে হত বংশানুক্রমে সমস্তে রক্ষিত অত্যাংকষ্ট খানদানী মন্ড; এবং ভদ্রতা রক্ষার জ্ঞাত অতিথি-সেবককেও নিতে হত সেই বোতল থেকেই। এইটেই সাধারণ রীতি। কিন্তু পার্টিতে সবাই তো আর কেক খায় না—তাও আবার তিন-ডবল মধুভর্তি স্পেশাল ‘রাসপুতিন কেক’—তত্পরি, বিরাট কেকের দু-আধা দুই পদ্ধতিতে নির্মাণ করে জোড়া দেওয়া অতি সহজ।

তা সে কেকই হোক আর খানদানী মদই হোক—রাসপুতিন তাঁর বীভৎস অভ্যাসমত সে-বস্তু খেয়ে গেলেন প্রচুরতম পরিমাণে, এবং তাজ্জব কী বাৎ! তাঁর কিছুই হল না। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়লো না। আমার স্পষ্ট মনে আছে এস্থলে অধ্যাপকও আপন বিষ্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘মাই বয়! দেয়ার উয়োজ ইনাক পয়জন টু নক অফ্ সিক্স বুল্জ।’ অর্থাৎ ঐ বিষে ছ’টা আন্ত বলদ ঘায়েল হয়! কিন্তু রাসপুতিন নির্বিকার! ইউসুফেরা

জানতেন না, রাসপুতিনকে ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ম্যাজিশিয়ানরা যে রকম ব্লেন্ড খায়, রাসপুতিন ঠিক সেই রকম হরেক জাতের বিষ খেতে তো পারতেনই, হজমও করতেন অক্লেশে।

ঘড়যন্ত্রকারীরা পড়লেন মহা ধন্দে। তাঁদের সব প্ল্যান ভঙল।

তখন ইউগ্রপক অগাধ ঘড়যন্ত্রকারীদের ফিস ফিস করে বললেন, ‘এ রকম স্বযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারবো।’

পিছন থেকে ঠিক বাড়ির উপর, অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায়, একেবারে কাছে এসে ইউগ্রপক গুলি ছুঁড়লেন। রাসপুতিন বক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে তো হল। কিন্তু ঘড়যন্ত্রকারীরা এখন সম্মুখীন হলেন এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্তার। জখমহীন মৃতদেহ যত সহজে হস্তান্তর করা যায়, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কর্মটা তো অত সহজ নয়। এখন কি করা কর্তব্য সেটা স্থির করার জ্ঞান দলের আর বারা সন্দেহ না জাগাবার জ্ঞান পাটিতে যোগ না দিয়ে উপরের তলায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে ইউগ্রপকাদি যোগ দিলেন। তার পূর্বে তিনি লাশটা টেনে টেনে সেলারে (মাটির নিচে কয়লা এবং আর-পাচটা বাজে জিনিস রাখার গুদোম) রেখে এলেন। পাছে হঠাৎ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকে লাশটা আবিষ্কার করে ফেলে।

, স্থির হল, রাসপুতিনের লাশ ইউগ্রপকের বাড়ির কাছে নেভা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সেটা ডিসেম্বর মাস।^৫ নেভার উপরকার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেইটে ভেঙে লাশ ভিতরে ঢুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া কঠিন কর্ম নয়।

এইবার সবাই হলেন—যাকে বলে বজ্রাহত! এবং ভুলবেন না, এঁদের অধিকাংশই ফৌজের আধিসার। এঁদের কাউকে হক্চকাতে হলে রীতিমত কলঙ্ক করতে হয়, আর মৃত্যুভয়? ছো:!^৬

৫ রাসপুতিনের মৃত্যুদিনস ১৫১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ বলা হয়, আবার ৩০ ডিসেম্বরও বলা হয়। তার কারণ অর্থডক্স রুশ ক্যালেন্ডার ও কন্টিনেন্টের প্রাচীন ক্যালেন্ডারে ১৩১৪ দিনের পার্থক্য।

৬ অধ্যাপক আমাকে গল্পছিলে একদা বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশান অফিসারদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা (প্যান্টাইম) ছিল প্রচুর মত্তপানের পর লটারিযোগে দুজন অফিসারের নাম স্থির করা। তারপর একজন একটা ঘরে

তা নয়! সবাই সেলারে ঢুকে দেখেন, রাসপুতিনের লাশ উধাও! ঘাড়ের সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায় গুলি খেয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়ে ‘মরলো’, সে যে শুধু আবার বেঁচে উঠলো তাই নয়, আপন পায়ে হেঁটে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, ইউসুফ সেলারের দরজা বাইরের থেকে তালাবদ্ধ করেন নি, এবং খামোকা বেশী লোক ঘাতে না জানতে পারে তাই সে রাত্রে অধিকাংশ চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে রেখেছিলেন।

রাসপুতিন যদি এখন কোনো গতিকে জারিনার কাছে পৌঁছে সব বর্ণনা দেন—এবং নিশ্চয়ই তিনি করবেন তবে ইউসুফের অবস্থাটা হবে কি?

কিন্তু তিনি অতশত ভাবেন নি—অগ্ন্যাগ্নদের জবানী তাই। তাঁরা বলেন, তিনি পাগলের মত পিস্তল হাতে নির্জন রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখেন, চতুর্দিকের সেই শুভ্র শুভ্রতাময় বরফের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে রাসপুতিন এগিয়ে যাচ্ছেন। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে ইউসুফ আর কোনো চান্স নিলেন না। পিস্তলে যে কটা গুলি ছিল সব কটা ছুঁড়লেন তাঁর ঘাড়ের উপর। তারপর সবাই মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে, নেভা নদীর উপরকার জমে-যাওয়া বরফ ভেঙে লাশটা ঢুকিয়ে ঠেলে দিলেন ভাটির দিকে।

কিন্তু জারিনা সে-দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চার্চেরই মত একটি বিশেষ উপাসনাগারসহ নির্মিত চেপলে তাঁর দেহ সমস্ত গোর দেওয়া হল একটি রমণীয় পার্কের ভিতর। মহারাণী প্রীতি রাত্রে যেতেন সেই গোরের পাশে, নীরবে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করার জন্য, রাসপুতিনের আত্মার সদৃশ কামনা করে ॥

২২।১।৬৬ ॥

ঢুকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থান বেছে নিয়ে ঘরের সব আলো নিবিয়ে দেবে; সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবে অগ্ন অফিসার, হাতে সবচেয়ে ছোট সাইজের পিস্তল নিয়ে। প্রথম অফিসার আশ্রয়স্থল থেকে কোকিলের মত ডাক ছাড়বে, “হু”; অল্পজন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে শুদ্ধমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে পিস্তল মারবে। তখন সেই অন্ধকারে ‘শিকার’ জায়গা বদলাবে, কিন্তু “হু” ডাক না ছাড়া পর্যন্ত পিস্তল মারা বারণ। কতক্ষণ পরে দু’জনের পার্ট বদলায়, আমার মনে নেই।

বিষ্ণুশর্মা

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যে রকম ভারতের শজ্জাচূর্ণ এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার ‘পঞ্চতন্ত্র’ ও ‘বুদ্ধজীবনী’ বিক্রি করে। কিন্তু সে ‘বুদ্ধজীবনী’ কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অগ্ন নামে পরিচিত। আরবীতে বলে ‘কলীলা ওয়াদ্ দিম্না’। এ দুটি—কলীলা ও দিম্না—দুই শৃঙ্গালের নাম। সংস্কৃতে করটক ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় স্লেসতে চায়। বাইবেলের ‘প্রাচীন নিয়মে’ (ওল্ড টেস্টামেন্ট) হয়তো এই কারণই ‘পেন্টাটয়েশ’=‘পঞ্চগ্রন্থ’ আছে। এমনিং আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহলেভি (সংস্কৃতে পহলভী) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্নের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানীরা গ্রীসের উপর বিরক্ত হয়ে (ফেড্ অপ্) পূর্বের দিকে মুখ

১ এই শজ্জাচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা ‘কেলেকারি’ হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্ব বাঙলা থেকে এসে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শজ্জার। শজ্জা প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অগ্নান্ন খরিদার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরীব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল (মোজাহাজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই) আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশী দাম দিতে রাজী ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শজ্জা বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

২ কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই ‘ওয়া’=‘ম্যাও’=এবং থেকে বাঙলা ‘ও’ এসেছে।

ফেরালে। কলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অমুশিরওয়ানের^৩ আমলে পহ্লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্থ ভাষায় লিখিত পুস্তক আর্থের ভাষায় অনূদিত হল,^৪ কারণ সিরিয়াক ভাষা হীক্ল, আরাময়িক ও আরবীয় মত সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখতো বলে পহ্লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পায়—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্লভীতে যিনি এ পুস্তক অমুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজ-বৈজ্ঞ, অতএব হুপগিত্ত। সিরিয়াকে যিনি তত্ত্বামুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ গ্রন্থ অমুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শন ও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অমুবাদ করেছিলেন।

পহ্লভী অমুবাদটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াক অমুবাদটি (“কলিলগ্ ও দমনগ্”) এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় হুঁশ বৎসর পর—মোটিমুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড় শ' বৎসর পর—জৈনিক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবীতে অমুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অমুবাদ করার সময় অমুবাদক আবুল্লা ইবন্ অল্-মুকাফ্ফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের

৩ এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

৪ তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতীয় সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাকেলা [ক্যারাতান] ও চট্টির কথকদের [স্টরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ ভ্রমণরা খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এমন কি প্রাচীনতম মোনজোদড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয় সেও এ আলোচনার বাইরে।

শলী বৌ স্টাইল শেখানো—বিশেষ করে যারা ‘ব্যাল-ল্যাংগু’ বা রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।^৫ পহ্লভী সিরিয়াক হয়ে আরবীতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অল্পসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদবা বীদপা বীদপাই (আরবীতে ‘প’ অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অঙ্ক দুই অক্ষর দিয়ে ‘প’ ও ‘চ’ বোঝাবার চেষ্টা করা হয়)। আরবী অল্পবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীক্স অল্পবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জর্নেক ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্ম এটি লাতিনে ‘ডিরেক্টরিয়ুম ভিটো হুমাক্তে’ (অর্থাৎ মোটামুটি ‘মানব-জীবনের জন্ম হিতোপদেশ’—‘পঞ্চতন্ত্র’ ও ‘হিতোপদেশ’ যে সংশ্লিষ্ট সে কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অল্পবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে ‘বীদপাই-এর নীতিগল্প’ বা ‘কলীলা ও দিম্না’ রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

‘জাতক’, ‘পঞ্চতন্ত্র’ ‘হিতোপদেশ’র বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন স্বর্গত ঈশান বোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অল্পবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, ‘পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অল্প বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্বদেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং যুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি অমুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে এক সূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।’ এ অল্পচ্ছেদ ঈশান

৫ অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর বোল পূর্বে ‘পঞ্চতন্ত্র’ সিরিজ ‘দেশ’ পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অঙ্ককরণ করার মত দস্ত আমায় কখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cultural Relations-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা একথানা আরবী ত্রৈমাসিক (‘সকাফং-উল-হিন্দ’, ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’) প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অল্পরোধ আসে যে, যেহেতু অঙ্ককার ‘কলীলা ওয়া দিম্না’ ও ‘পঞ্চতন্ত্রে’ প্রচুর তফাৎ, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অল্পবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে কাজ সানন্দে প্রাণ্ডুক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

বোষ শেষ করেছেন, এই বলে—‘হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।’^৬

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে ‘কলীলা ওয়া দিম্না’ বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কণ্ট খুষ্টানরা (এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করেন) কিছুদিন পূর্বে আরবীতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কণ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবী নাম ‘সুত্‌রহ বার্বাম ওয়া যুআসফ’। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দু’জন খৃষ্টধর্মে সেপ্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও যুআসফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন ২৬ আগস্ট (সেপ্টেম্বর)।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, ‘যুআসফ’ নাম এসেছে ‘বোধিসত্ত্ব’ থেকে ও ‘বার্বাম’ এসেছে ‘বুদ্ধ ভগবান’-এর ‘ভগবান’ থেকে।

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক ॥

২।৪।৬৬

৬ ঈশান ঘোষের বাঙলা জাতক কী জার্মান, কী ইংরিজি, কী হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঞ্জে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপাণ্ডিত্যে আরেক ধুব্বর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। সুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমি স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি (বিধুশেখরের আলোচনা সহ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গোড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বার্লাম ও যোসাফট

ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় বাটটি ভাষায় অনূদিত 'বার্লাম ও যোসাফট' ইয়োরোপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খৃষ্টান মঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি স্বমধুর সরল গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি—এমন কি, খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম প্রধান বাহক গ্রীক, লাতিন এবং হীক্রেতেও না। তাই দেখতে পাই, ইংলণ্ডে ছাপাখানা নির্মিত হওয়ার পর উইলিয়াম ক্যাকস্টন যে-সব পুস্তক ছাপান, তার মধ্যে এই পুস্তকটিও ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদে আছে। অবতরণিকারূপে এখানে এ-পুস্তক সম্বন্ধে আরো বহু বিস্তর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান তথ্য তথ্য নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমাদের ধারণা, পুস্তকের উপাখ্যানটি এস্থলে অতিশয়তম সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিলেই সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হবে—পাঠক নিজের থেকেই অনেক-কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী নরপতি পুত্রহীন অবস্থায় অতিশয় মনোকেটে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করার পর এক অভূতপূর্ব সর্বহুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহাসমারোহে তাঁর নামকরণ করা হল যোসাফট (গ্রীক অনুবাদে Josaphat) এবং রাজ্য সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম শ্রালভীয় (Chaldaean) জ্যোতিষীদের নিয়ন্ত্রণ করে রাজপুত্রের জন্মকুণ্ডলী নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে রাজাকে জানালেন, নবজাত কুমারের ভবিষ্যৎ সর্ব গৌরব ধারণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি হবেন বিরলতম মহাত্মাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু তিনি পিতৃ-পিতামহের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে সত্যধর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন। বলা বাহুল্য, নৃপতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং এই মর্মস্কল ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয়, তার জগ্নু মন্থণা গ্রহণ করে আদেশ দিলেন, রাজপুত্রকে যেন পরম রমণীয় এক রাজপ্রাসাদের ভিতর চিত্তাকর্ষণীয় সদানন্দময় পরিবেশে রাখা হয়। প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই জরামৃত্যুর (ইংরেজী অনুবাদ আছে misery and death, জর্মনে আছে ঐ একই—Elend und Tod, খুব সম্ভব জরার প্রকৃত প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় কোনো ভাষাতেই নেই বলে তৎপরিবর্তে 'মিজরি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে) সংস্পর্শে না আসতে পারেন; রাজ্য অহুমান করে নিয়েছিলেন, সদাশ্রমীজন যে

পরিবেশে আনন্দ লাভ করেছে, সেটা পরিবর্তন করে সে অন্ত পরিবেশের সন্ধানে যাবে ‘কোন হুঃখে’ ?

কাহিনীর এই অংশটুকু শোনাযাত্রই যে-কোনো ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বত-চীন-জাপান-শ্রামবাসীর মনে উদয় হবে, এ-যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকছে, এ কি যুবরাজ সিদ্ধার্থের জীবনী নয় ? তাই যদি হয়, তবে সে-কাহিনী সর্বধর্মের সর্ব-সম্মানকে উৎসাহ এবং আনন্দ দান করলেও সেটি খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত হবে কি প্রকারে ? কাহিনীর পরের অংশটুকু শুনেই সেটা আন্তে আন্তে পরিষ্কার হবে। কিছুটা আগেও বলা হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে করেই আগে বলি নি, কারণ, তা হলে সিদ্ধার্থকে চিনতে পাঠকের অসুবিধা হত।

কাহিনীতে আছে, রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল (এটা অবশ্যই সত্য নয়, এবং এরকম আরো পরিবর্তন পরিবর্তন পাঠক পাবেন ; কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো করা হয়েছিল, পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন)। কিন্তু যুবরাজের পিতা সে ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং রাজ্যে তার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজ্যদেশে প্রচারিত করেন যে প্রজাসাধারণ, পাত্র-অমাত্য যে কেউ এই নবীন ধর্ম গ্রহণ প্রচার প্রসার করবে, সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজারই এক অন্তরঙ্গ সখা এবং মন্ত্রী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার জন্য মরুভূমিতে চলে যান (মিশরের খৃষ্টান সাধুরা দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায়শ লীবিয়া-মরুভূমিতে অন্তর্ধান করতেন)। রাজ্যদেশে তাঁকে খুঁজে মরুভূমি থেকে কিরিয়ে আনাতে পর তিনি রাজসভায় তাঁর আচরণ বোঝাতে চেষ্টা করেন ও ক্ষমাভিক্ষাও করেন। রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন।

এদিকে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পণ করে আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে

১ ধর্মের ইতিহাসে এটা কিছু নতুন নয়। কাঠয়াওয়াড়ের হিন্দু লোহানা রাজপুত্রদের ইসমাজিলীয়া (ইসলামেরই এক) সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনী নির্মিত হয় যে, হিন্দুদের যে কঙ্কি অবতারের আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে মক্কা নগরে হজরৎ আলীরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। সত্যপীরও তুলনীয়।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে কন হকমান্‌স্টালের কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা হয় তিনিও এই গ্রন্থের গল্প মূলস্ফূর্তরূপে নিয়ে তাঁর স্বজনীশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাম ‘ইয়েভেরমান’ = ‘এভরিবডি’।

চাইলেন না ; তাঁর ইচ্ছা, তিনি বাইরের বিশাল জগতে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সেই মর্মে পিতার অল্পমতি ভিক্ষা করলেন। অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি সম্মত হলেন। কলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে এক এক জন করে অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও সর্বশেষে একটা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ব্যাথাভূর হয়ে এর কারণ সম্বন্ধে কাতর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং উত্তরে শুনতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব মাছুষমাত্রেয়ই ললাটে লেখা আছে। অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হয়ে তিনি অল্পসঙ্কানের কলে আরো জানতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার পন্থা জানেন শুধু এক শ্রেণীর সাধুসম্মত— তাঁরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা হল, এঁদেরই মুখ থেকে তিনি তত্ত্বকথা শুনবেন, কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব, কারণ তাবং সাধুসম্মতকে রাজাদেশে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এক অতিশয় পুতপবিত্র তথা ধর্মজ্ঞ সাধু মণিকারের চন্দ্ৰবেশ পরে রাজসভায় আবিভূত হলেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। সে সময় তিনি নানা গল্প, নানা কাহিনী কীর্তন করে সংসারের অসারতা ও প্রকৃতধর্ম কি, সে-সব সপ্রমাণ করেন।

(এই গল্পগুলো গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশ গ্রহণ করে আছে। এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে সে নিয়ে ইউরোপে প্রচুর গবেষণা করা হয় তবু সবগুলোর মূল তখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি নিঃসন্দেহে জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে [আশ্চর্য ! স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে-সব গল্প জাতকে বলে গেলেন, যোসাফটরূপে তাঁকে আবার সেগুলোই উপদেশ-রূপে শুনতে হল।] এবং কিছু মহাভারত থেকেও। এদেশে কোথায় কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে সেকথা বলা কঠিন—এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। এ কর্ম করার সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রাধিকার ছিল স্বর্গত ঈশান ঘোষের। তিনি তাঁর জাতক-অল্পবাদের উপক্রমণিকায় এ পুস্তক নিয়ে কিঞ্চৎ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে স্থান সংকোপ এবং এর গল্পগুলো ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বড়ই ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি জাপানী ‘শক ত্রিংশ-রত্ন’ও যে এ-আলোচনার স্থান পায় সে তত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্বে জর্মন গবেষক-গোষ্ঠী উল্লেখ করে গেছেন এবং এ দেশে বসে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব না

হলেও হুকঠিন।)

যে-মণিকার রাজপুত্রকে উপদেশ দিলেন তিনিই এ গ্রন্থের বার্লাম। রাজপুত্র মনস্থির করলেন, তিনি বার্লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ সংবাদ শুনে রাজা কোভে ক্রোধে উন্নতপ্রায়। সর্ব প্রথমই তিনি বার্লামকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে নগর ত্যাগ করেছেন। রাজা যখন দেখলেন পুত্র কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করবেন না তখন তিনি ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করলেন। নাকোর নামক এক অচেনা জনকে তিনি নিযুক্ত করলেন, সে এসে সভাস্থলে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে দুর্বল, ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করে তর্কযুদ্ধে সভাপণ্ডিতদের কাছে হেরে যাবে; এই করে খৃষ্টধর্ম সর্বজনসমক্ষে লাজ্জিত হলে যুবরাজ নিশ্চয়ই বার্লামের অহুসরণ করার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু রাজপুত্র সংবাদ পেয়ে গোপনে নাকোরকে এমনই তিরস্কার করলেন যে, সে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় বাগিতাসহ অব্যর্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল। এর পর নাকোরও খৃষ্ট সাধুরূপে নির্জন ভূমিতে অন্তর্ধান করে। রাজা তখন জাহ্নবীরে শরণাপন্ন হলেন। সে তখন পাণ্ডিচ ভোগ-বিলাসের মায়াজাল বিস্তার করে যুবরাজকে প্রলোভিত করার চেষ্টা দিয়ে নিফল তো হলই পক্ষান্তরে যুবরাজ তাঁকে একটি কাহিনী বলে স্বধর্ম দীক্ষিত করলেন। এর সঙ্গে মার-এর মিল দেখা যাচ্ছে, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে সে ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে প্রচুর মারণাস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখায়।

সর্বশেষে রাজপুত্র বোধিসত্ত্ব বা যোসাফটরূপে রাজপুরী ত্যাগ করে বার্লামকে খুঁজে পেলেন। তাঁকে সখা ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে উভয়ে ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হলেন।

*

*

এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম জুড়ে দিয়ে সে ধর্মের যে জয়জয়কার করা হল তার প্রণেতা কে জানবার উপায় নেই। পঞ্চতন্ত্রের মত এ-গ্রন্থও রাজা খুসরোর আমলে পহ্লবীতে অনূদিত হয় এবং ওরই মত, তারপর, সীরিয়াকে। তার থেকে হয় গ্রীক অমুবাদ এবং উপক্রমণিকায় বলা হয় ‘একটি উপকারী কাহিনী...আবিসিনিয়ার প্রত্যস্ত প্রদেশ—যার নাম ভারতবর্ষ (!)—সেখান থেকে এটি আনয়ন করেন সাধু জন।’ ওদিকে আরবী অমুবাদও হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক অমুবাদের চেয়েও স্পষ্টতররূপে ধরা পড়ে যে এর মূল ভারতে ও বৌদ্ধধর্মে। এর পর লাতিন অমুবাদ এবং তার থেকে ইয়োরোপীয় সর্বভাষায়।

‘বিষ্ণুশর্মা’ প্রসঙ্গে নিবেদন করছি যোসাকট এসেছে ‘বোধিসত্ত্ব’ থেকে (আরবীতে আগুস্থলে ‘ব’ ও ‘য়’-তে মাত্র একটি বিন্দুর পার্থক্য আছে বলে হয়ে যায় যোসাকট) এবং বার্লীম (বুদ্ধ) ‘ভগবান’ থেকে ।

অতএব এক বুদ্ধদেব যদি ছুই মূর্তি ধারণ করে খৃষ্টধর্মে সেন্ট বা সন্তরূপে পূজা পান তবে নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা ॥

৯।৪।৬৬

রবি-মোহন-এন্ড্রুজ

কয়েক দিন পূর্বে একখানা চটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও এন্ড্রুজ সম্বন্ধে একটি বিবরণীতে দেখি, আর সবই আছে, নেই শুধু একটি কথা :—এন্ড্রুজের পরলোকগমনের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হলেন কে, এবং সেই মহৎ চিন্তা মূন্ময়রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কে, এবং এন্ড্রুজ ফাণ্ডের আজো সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে—যদি আদৌ থাকে—তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো কাকে ?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় যে সময়, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে। শুনেছি, সে-সময় তিনি নাকি সে-আন্দোলনের প্রশংসাই করেছিলেন। ফেরার সময় বোম্বায়ে নেমে তাঁর মত পরিবর্তন হয়, এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক প্রবন্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেন (দ্বিজেন্দ্রনাথ কিস্তি বরাবরই গান্ধীকে উৎসাহ-হিম্মৎ যুগিয়ে যান)। এন্ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর

১ ‘গুরুচণ্ডালী’ নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি। চলতি ভাষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এটাকে অমার্জনীয় অপরাধের অনুরূপস্বরূপে সম্মান করা হত—যদিও যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরূপে সম্রাট সম্মান জানাতেন, তিনি স্বয়ং সে অনুরূপস্বরূপে তাঁর কঠিনতম সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ বাংলা দর্শনগ্রন্থে পদে পদে লজ্জিত করতেন, এবং সকলকেই সে উপদেশ দিতেন। চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোকগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন ‘গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় (‘বাংলা-অলঙ্কারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেওয়া হল’—ধরনের অভিব্যক্তি)। অবীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বালাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যত্নপি সে সদাই ‘লড়াই শুরু হল’ এবং ‘যুদ্ধ আরম্ভ হল’ তথা ‘মোকদ্দমা শুরু হল’ এবং ‘তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল’ এ’দ্বয়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।

উভয়েরই অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—(এবং স্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রকা সন্থকর্মা বিধুশেখর বা ক্ষিত্তিমোহনের মতো ত্তো ছিল বটেই, বেলী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না)—তাই অনেকই তাঁকে ‘শান্তিনিকেতন-সাবরমতী-সেতু’ নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

এন্ড্রুজের ধর্ম ছিল দীননারায়ণের সেবা। ধর্মসম্বন্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন-বিবর্তন সর্বদাই দীনের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়; তাই সাক্ষাৎ রাজনীতি এড়িয়ে চললেও এন্ড্রুজ গান্ধী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই এই মহান আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দুই মনীষীর মধ্যে মতানৈক্য যে সর্ব-প্রকারের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন; তিনি মন স্থির করলেন, পত্র-পত্রিকার মারফৎ উভয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হয়, উভয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন। বলা বাহুল্য গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য জন্মায়, যখন গান্ধী এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আমন্ত্রণে আফ্রিকা ত্যাগ করে সদলবলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে সেখানে ছয় মাস থাকেন (তখনো কলেজ-বিভাগ বা বিশ্বভারতীর জন্ম হয় নি)।

এ-আলোচনা হয় কলকাতায়, এবং এক এন্ড্রুজ ছাড়া সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন না।

কিন্তু কবির মত চিত্রকরও শুধু যে নব নব সৃজন কর্মে লিপ্ত থাকেন তাই নয়, নব নব গোপন তত্ত্ব, সৌন্দর্য আবিষ্কার করে রসিকজনের সম্মুখে রাখতে চান। কবি রবির ভ্রাতুষ্পুত্র ‘ছবি-রবি’ অবন ঠাকুর তাই মনে মনে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মত মনীষী এ দেশে নিত্য নিত্য জন্মায় না; নিতুতে এ দৌহার মিলনের অন্তত সামান্য কিছুটাও যদি না দেখতে পেলুম, তবে এ-জীবনে দেখলুমটা কি? কথাটা ঠিক; হিমালয় আল্পসে মিলন হয় না,—কিন্তু এ-মিলন তো তারো বড়ো।

উপযুক্ত তাবৎ কাহিনী আমি অগ্ন্যত্র সবিস্তর দিয়েছি বলে এস্থলে সংক্ষেপে সারি, কারণ অগ্ণকার কীর্তন ভিন্ন। ‘অবন-ঠাকুর’ চুপসে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে এক লহমার তরে স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিলেন ভিতরকার ‘ছবিটি’। সেইটেই তিনি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে—যেখানে ঐ তিনজনের ছুজন, অর্থাৎ কবি ও এন্ড্রুজ স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কিন্তু মূল কথায় ফিরে যাই—এটুকু শুদ্ধমাত্র এ-তিন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা বোঝাবার জন্য পটভূমি নির্মাণ।

*

*

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে (খুব সম্ভব) গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ মহাত্মাজী অবতীর্ণ হলেন বোম্বাইয়ের জুহুবাঁচে। যুদ্ধ এবং জনরবে ভারতবর্ষ তথা তাবৎ পৃথিবী তখন গমগম করছে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ জয় করার পর হিটলার তখন সদর্পে ককেশাসের তেল পানে ধাওয়া করবেন বা করেছেন—এমন সময় টলটলায়মান ইংরেজের চরম ছরবছার স্বযোগ নিয়ে ডমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ-এর অগ্রতম ভারতবর্ষ আরেকটা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে কি? এই ছিল তখন দেশবিদেশে সর্বমুখে একমাত্র প্রশ্ন।

এমন সময় গান্ধী নামলেন জুহুবাঁচে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়জনক ব্যাপার; —যে গান্ধীকে আপাতদৃষ্টিতে সরল, ভালোমাহুয বলে মনে হয়, তিনি যে সাংবাদিকদের এড়াবার জন্য কত ছদ্ম-হেঁকমৎ রপ্ত করে বসে আছেন, সে তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বিলক্ষণ জানে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা—সেই গান্ধীই ডেকে পাঠিয়েছেন, নিজে যেচে, প্রেস-কনফারেন্স। তিনি নাকি সর্বপ্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এদিকে তিনি জুহুবাঁচে নেমেই ধবর পাঠিয়েছেন বোম্বায়ের আশ্রমিক সঙ্ঘকে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবেন।

বোম্বায়ে বিস্তর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে—তাদের প্রায় সবাই গুরুদেবের দু'দশটা গান গাইতে পারে, আর মহারাষ্ট্রবাসী হলে তো কথাই নেই, তারা গুরুদেবের কালোয়াতী গান পর্যন্ত গাইতে পারে, দু'একজন নিধুবাবু চণ্ডে গুরুদেবের টঙ্কা তক দখল করে বসে আছে। কিন্তু সব সময় সবাই তো আর বোম্বায়ে থাকে না। তবু ছিলেন সর্বাধিকারী স্বর্গত বচুভাই গুল্ল; ইনি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত—অর্থাৎ সেখানে 'দৈনন্দিন এবং পালপর্ব গীত—সব কটার এবং আরো প্রচুর অচলিত সুর আপন বিরাট দিল্লুবাতে বাজাতে পারতেন। তারপর ছিলেন পিনাকিন ত্রিবেদী, গোবর্ধন মপারা, সুলীলা আসর ইত্যাদি। আমিও ছিলাম বচুভাইয়ের অতিথিরূপে। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ আমার মত 'বেতালকে' কাবু করতে পারেন এমন বেতাল-সিদ্ধ এখনো জন্মান নি!

আশ্রমিক সঙ্ঘ, এবং অধিনায়করূপে বচুভাই পড়লেন হুশিয়ার। গান্ধীজী কোন্ কোন্ গান শুনতে চাইবেন, বা কেউ গাইলে শুনতে ভালোবাসবেন সে

সম্বন্ধে কারোরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আপন ধারণা নেই—বস্তুত শান্তিনিকেতনে বাসকালীন এবং বিশেষ করে সে-স্থল ছাড়ার এত যুগ পরেও যে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অল্পরাগ রয়েছে সে-তত্ত্ব প্রাক্তন ছাত্রদের প্রায় কেউই জানতো না। অবশ্য অনেকেই জানতো ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়—’ গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় (এবং সেই কারণেই নিউমেনের ‘লীড কাইনড্‌লি লাইট এমিড্‌স্ট দি এন্সার্ক্সিং ধুম’) ।

আমি বললুম, ‘এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাঁধীজী যে-সময়টা আশ্রমে কাটান, ঠিক সেই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পাবে পয়লা নম্বর—বা ফার্স্ট প্রেফারেন্স তারপর নিশ্চয়ই স্বদেশী গান (এখন যাকে গাল-ভরা নামে ডাকা হয় ‘দেশীয়গুলক সঙ্গীত’), তার পর মন্দিরে উপাসনার সময় যে কটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। এর পরও আছে—কিন্তু অদূর আমার এলেম যায় না, যেমন মনে করো গুরুদেব তাঁর আপন পছন্দের যে-সব গান বাছাই করে তাঁকে শুনিয়েছেন তাঁর হৃদীস পাবো কোথায়!’ সবাই এক বাক্যে আমার বক্তব্য স্বীকার করে বললে, ‘এই তিন দফেতে যে-সব গান পড়ে তারই সব কটা এত অল্প সময়ে কোরাসে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এই নিয়েই উপস্থিত সম্ভট থাকা যাক।’ আমি তখন স্কেল টি-স্কোয়ার সেট-স্কোয়ারসহ—কথার কথা কইছি—লেগে গেলুম জরিপ করতে, মহাত্মাজী যে-সময়টায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন (এস্থলে একটি ফরিয়াদ জানিয়ে রাখি : ধারাই গুরুদেব নিয়ে কোনো কাজ করতে চান, তাঁরাই চান, গুরুদেবের কবিতা যে রকম কালানুক্রমিক পাওয়া যায়, গানের বেলাও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত, বরঞ্চ বেশী উচিত। আমার এক মিত্র ‘রবীন্দ্রনাথের ধর্ম’ নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এরই অভাবে দিশেহারা হয়ে এগুতে পারছেন না। তাঁর মূল প্রশ্ন, একটা বিশেষ সময়ের পর—মোটামুটি ১৯১৮—রবীন্দ্রনাথ কি একেবারেই আর কোন ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নি? করে থাকলে কটি?) অবশেষে কষ্টেত্রেষ্টে মোটামুটি একটি ফিরিস্তি তৈরি হল। বেশীর ভাগ গায়কই গুজরাভী; তাদের পছন্দের ধর্মসঙ্গীত—যেগুলো কারো না কারো ভালো করে জানা ছিল—সেগুলোও কোরাসে শিখে নেওয়া হল। সঙ্কলেরই এক ভরসা—গাঁধীজীর স্বরজ্ঞান খুব একটা টনটনে নয়, মহারাষ্ট্রের মত গাঁধীর জন্মভূমি কাঠিওয়াড়-গুজরাতে গান-বাজনার প্রাচীন সর্বব্যাপী কোনো ঐতিহ্য নেই।

“শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর” শেষটায় এল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি সঙ্কে যাব। আমার এক কথা ‘ক্ষেপেছ! আমি না পারি গাইতে, না জানি

বাজাতে। আমাদের কোনোপ্রকারের শোভাবর্ধনই হবে না—“শোভা” জিনিসটাই গান্ধীজী আদৌ পছন্দ করেন না।’

*

*

মহাত্মাজী বললেন, ‘গাও।’

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, ‘কি গান...?’

‘তোমাদের যা জানা আছে।’

এসব আমার শোনা কথা। তার উপর ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। সঠিক মনে নেই, প্রাক্তনদল সঙ্কলের পয়লাই রঙের টেকা, অর্থাৎ ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়—’ মেরেছিল, না সেটাকে তাঁর আদেশের জ্ঞান জীয়ে রেখেছিল। কিন্তু মোদা, তারা এক একটা গান শেষ হলে যখন থামে, তখন তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, এবং আরো গাইবার ইঙ্গিত করেন। তারা দু’একবার চেষ্টা দিয়েছিল গান্ধীজীর আপন পছন্দ জানাবার জ্ঞান—ফলোদয় হয় নি।

সর্বশেষে মহাত্মাজী দু’একটি প্রশ্ন শুধোন। কেউ উত্তর দিতে পারে নি। মারাঠী মপারা বাড়ি ফিরে তো আমাকে এই মারে কি তেঁই মারে। আমি থাকলে নাকি চটপট উত্তর দিয়ে দিতুম। আমি বললুম, ‘এগুলোর উত্তর তো বচুভাইও জানে, তদুপরি সে ওয়াডওয়ান অর্থাৎ গান্ধীজীর মতই কাঠিওয়াড়ের লোক—গুজরাতি—না, খাস কাঠিওয়াড়িতেই উত্তর দিয়ে তাঁর জান ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো!’ সে নাকি নার্তাস হয়ে গিয়েছিল। ‘আমি হতুম না, কি করে জানলে! ঐ সিংগির সামনে!’

কিন্তু এত বাহ!

আসলে পূর্বোল্লিখিত প্রেস-কন্ফারেন্স গান্ধীজী ডাকিয়েছিলেন ঐ দিনই, ঐ সময়ই, ঐ স্থলেই।

এখন আমি যা নিবেদন করবো, সেটা ঐ সময়কার খবরের কাগজ নিয়ে চেক্ অফ করে সন্দেশ-পিচেশ তথা গবেষক-পাঠক ধরে ফেলতে পারবেন, আমি কা “দাকুণ” “গুল্মগীর”। আলঙ্কারিকার্থে কিন্তু আমি “যত্ন” পতি বা “রাখাল” রাজা হওয়ার মত তাদের লক্ষ্যংশের একাংশ শক্তি ধরি নে বলে আমি নাচার; বেচারার পক্ষে গুল্ম মারাই একমাত্র চারাহ্!

যতদূর মনে পড়ে সেই এণ্ডেমণ্ডে বিজড়িত ভারতের সর্বজাতের সাংবাদিক-গণই সোদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

গান শেষ হলে মহাত্মাজী ওঁদের বললেন, ‘তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে,

শ্রুতোও !' আর যায় কোথায় ! ছুনিয়ার যত রকম প্রশ্ন; আবার নতুন করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে কি, এই কি তার জ্ঞাত উৎকৃষ্টতম মোকানয়—মিষ্টপক্ষ চতুর্দিকে বেধড়ক মার খাচ্ছে, আরম্ভ হলে কি প্রকারে হবে, ট্যাক্স বন্ধ করে না নয়া কোনো টেকনীকে, ১৯২০-এর মত ছাত্রদের ডাকা হবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি ?

গান্ধীজী তাঁর চিরাচরিত বৈষম্য উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—যद्यপি আমার মনের উপর তখনকার, অর্থাৎ পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার পর যে দাগ পড়েছিল সেটা বোধ হয় এই যে, মোক্ষম প্রশ্নগুলো মহাত্মাজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে ভবিষ্যতের তাৎপ্য প্রান ফাঁস করে দেওয়া যে সম্বুদ্ধির কর্ম হত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ মহাত্মাজী ছু হাত তুলে প্রশ্নকারী নিরুদ্ধ করে বললেন, 'আমি বেনে। বেনে কাউকে কোনো জিনিস মুফতে দেয় না। আমিও খয়রাৎ করার জ্ঞাতোমাদের ডাকি নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো শুনলে। এয়ার আমার কথা শোনো। পোয়েট গত হওয়ার পূর্বে (তখনো বোধ হয় এক বছর পূর্ণ হয় নি) আমাকে আদেশ করেন, আমাদের উভয়ের বন্ধু এন্ড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে যা কর্তব্য তা যেন আমি আপন কাঁধে তুলে নি। এখন দেখতে পারছি, আসন্ন ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। তাই আজই আমি "এন্ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ড"-এর জ্ঞাত অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করলুম। দাও।'

মপারা রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমায় বলেছিল, 'গান্ধীজী অনেকক্ষণ ধরে এন্ড্রুজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, in a very touching manner। আর তার পর মহাত্মাজীর সামনে পড়তে লাগল, টাকা, পুরো মনিব্যাগ, গয়না, রিস্টওয়াচ, আংটি, কত কী ! যেন বানের জলে ভেসে আসছে ছুনিয়ার কুলে মূল্যবান জিনিস। অনেকে এমনই যথাসর্বস্ব দিয়ে কেলেছিল যে, বোম্বায়ে ফেরার জ্ঞাত টিকিট কাটার পয়সা পর্যন্ত তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জানেন তো, রেলও এখন আর পুরোপুরি ইংরেজের নয়। ভিলেপার্লে থেকে চার্চ গেট স্টেশন—সবাই জানে, কেন এদের টিকিট নেই।'

ফাণ্ডের টাকা যখন জমে উঠছে, তখন কে একজন বললে, 'মহাত্মাজী, এখন এসব কেন ? স্বরাজ পাওয়ার পর এসব কাজ তো রাতারাতি হয়ে যাবে।'

আজ সত্যই আমার হাসিকান্নায় মেশানো চোখের জল নেমে আসে—এই ব্যক্তিটির ঐ মন্তব্যটির স্মরণে। তারই মত আমরা সবাই তখন ভাবতুম,

ইংরেজই সর্ব নষ্টের মূল। বিহারে ভূমিকম্প হলে ইংরেজই দায়ী, মেদিনীপুরে সাগর জাগলে ওটা ঐ ইংরেজেরই দৃষ্কর্ম। ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্রই—

When we shall have attained liberty, all those will be mere trifles !

গান্ধীজী সন্ধে সন্ধে মোক্ষম গরম, কড়া গলায় জবাব দেন, 'But Tagore did not wait to be born till India has attained her liberty !'

পরাদীন ভারতে যদি কবি জন্ম নেন, তবে তাঁর সখার স্মৃতিরক্ষার ভার পরাদীন ভারতের স্বন্ধেই !

তাই বলছিলুম, হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'দ্ব্যাকার' মত)-ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাচ আঙুল ঘিয়ে' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন !'

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন, (উদ্ধৃতিতে হুল থাকলে ক্ষমা চাইছি) 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো !'

*

*

কিন্তু কোথায় গেল সেই 'এন্ড্রুজ ফাগু' যার মোটা টাকাটা তুলেছিলেন গান্ধীজী ?

তা সেটা যেখানে থাক, থাক ! দুঃখ এই, সেই চটি বইয়ে এবং অগ্ন্যত্র 'এন্ড্রুজ ফাগু'র কথা উঠলে কেউ আর গান্ধীকে স্মরণ করে না, তিনি যে সেই স্বদূর বোম্বায়ে রবীন্দ্র-সদ্রাস্ত শুনিয়ে ফাগুের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেটা সবাই ভুলে গেছে !!

‘ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে’

—বাইবেল

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এদিকে এসো। অসাধারণ পণ্ডিত লোক। আমি তাঁকে বড্ডই শ্রদ্ধা করি, বলতে কি, ভালোবাসি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। সত্যকার পণ্ডিত কখনোই মুর্থকে অবহেলা করে না।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু তিনি ফিসফিস করে বললেন, ‘তোমরা কাল বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলে না?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘তা তোমার আটকাছিল কোথায়?’

‘আজ্ঞে, আমি শুধাচ্ছিলুম, আল্লা যদি না-ই থাকবেন তবে এই দুনিয়াটা পয়দা করলে কে? আপনারাও তো—’

বাধা দিয়ে বললেন, ‘আমাদের কথা বাদ দাও—তোমার মুশ্কিলটা কোথায় সেইটে খুঁজে কও।’

‘শরণকরসাধু’ হীনযানগন্থী বৌদ্ধ : সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছিলেন, সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই। অতএব সৃষ্টিকর্তারও প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, যদি তর্কস্থলে ধরেও নেওয়া হয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবুও তো শেষ-সমস্তার সমাধান হয় না। প্রশ্ন উঠবে, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করলেন কে? শুধুন আজগুবী কথা! তারপর তিনি তাঁর গেকরয়া আলখাল্লার ভিতর থেকে নোটবুক বের করে আঁকলেন একটা চক্র—সার্কল। বললেন এই সার্কলের যেমন কোনো জায়গায় আরম্ভও নেই, শেষও নেই, সৃষ্টিও হুবহু তেমনি। তারপর আপনি ঘরে ঢুকলেন। পাছে আপনাকে ডিসটার্ব করা হয় তাই আমরা আরো ধানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলার পর উনি চলে গেলেন।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যায়তন। তারই একটা কামরায় আমরা তিনজনা কাজ করি। একজনের বিষয়বস্তু ইরানী ফাইয়্যাস-পার্সেলিন—বিশ্বকলাসৃষ্টিতে তার স্থান। অগ্রজন বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের হীক্স পাঠের নয়া সম্পাদনা করছেন। আর আমি—তা সে যাক্গে। দু’জনাই বছর দশেক পূর্বে সর্বোত্তম শ্রেণীর ডক্টরেট নিয়েছেন; একজন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শুধোলেন, ‘চক্রর এঁকে সাধু বললেন সৃষ্টি এরই মত আদিঅন্তহীন। তা, এতে আবার দুর্বোধ্য কি আছে? তবে হ্যাঁ, আরো সোজা করে বলা যেতে

পারতো। আচ্ছা, স্বচন্দ্রে বিশেষত্ব কি—অন্তত তাদের কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের লোক হাসিঠাট্টা করে ?’

এক গাল হেসে বললুম, ‘সে আর বলতে ! কিপ্টেমী !’

‘বিলক্ষণ ! সেই গল্পটা জান তো—লণ্ডনের এক ইংরেজ কোম্পানি স্কটল্যান্ডের এবার্ডীন শহরে খুললে ট্রামওয়ায়ে। হাড়কিপ্টে স্বচরা ট্রাম চড়বে না, কিছূতেই। কোম্পানি লাটে ওঠার উপক্রম। তখন লণ্ডন থেকে পাঠানো হল মেশালিস্ট—তাকে বের করতে হবে দাওয়াই, স্বচকে কি প্রকারে ট্রামে ঢোকানো যায়। তিনি এবার্ডীনে এসেই ট্রাম ভাড়া থ্রাপেন্স থেকে এক ঝটকায় এক পেনি কমিয়ে করে দিলেন টাপেন্স। পরের দিন তাঁর আপিসের সামনে মহাপ্রলয়ের ভিড়। তিনি তো ড্যাম্ গ্রাড্—নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্বাদ জানাতে এসেছে, ভাড়া কমিয়ে দেবার জন্ত। ইয়ান্না, তওবা, তওবা ! এরা যে তাঁরই জানলা তাগ করে পচা ডিম হাজা টমাটো ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে, “কোথেকে এসেছে এই নচ্ছার ! আগে আমরা পায়ে হেঁটে, ট্রাম ভাড়ার তিন পেনি বাঁচাতে পারতুম, এখন কুলে হু’পেনি ! নিকালো রাঙ্কেলকো এবার্ডীনেসে।” আচ্ছা, হলো। এবার বলো তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কি ? পারলে না ? আমিই বলছি, হুবহু একই গাধার এ-কান ও-কান। কিপ্টেমীতে।’

ইহুদিদের কিপ্টেমী সম্বন্ধে আমি কোনো গল্পই জানি নে, অতখানি বে-খবর বের্সিক আমি নই, কিন্তু বিশেষ কারণে আমি চুপ করে রইলুম। সে-কারণ একটু পরে পাঠক নিজের থেকেই বুঝে যাবেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, ‘একবার এক ইহুদি আর স্বচে ঝগড়া লেগেছে, কে কতক্ষণ ধরে ডুবদাতার দিতে পারে—হু’জনা দুই স্নইমিং পুলে কাজ করতো আর দুই পুলের মধ্যে ছিল উৎকট রেয়ারেবি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরা হল এক শিলিঙ। বাজে লোকের কৌতুহল এড়াবার জন্ত তারা নদীর এক নিভৃত জায়গায় দিল ডুব।’

তিনি চুপ মারলেন। আমি ভাবলুম, ওস্তাদ কথকের মত তিনি পজ্ দিয়েছেন আমার মনের উপর গল্পটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইটে দেখবার জন্ত। কিন্তু কই ? তা তো নয়। তিনি দেখি, পকেট থেকে ছুরি বের করে আপন মনে দিব্য পেনসিল কাটিতে আরম্ভ করেছেন। তখন থাকতে না পেরে আমি শুভালুম, ‘তারপর ?’

উদাস স্বরে বললেন, ‘কি করে বলবো ভাই কও। হু’জন্যর কেউই তো উঠলো না জলের তলা থেকে।’ তারপর হস্তদস্ত হয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, বলতে ভুলে

গিয়েছিলুম, ভাগিাস, তারা বাজিটা পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের এক উকীল বন্ধুর কাছে কাগজ-কলমে লিখিয়ে নিয়ে—অবশ্য সবকুছ মুক্তমে—তারই জিম্মায় রেখে এসেছিল ; নইলে শহরের লোক কশ্মিনকালেও জানতে পেতো না, এ ছোটো শাস্ত, অজ্ঞাতশত্রু লোক হঠাৎ ইহসংসার থেকে কি করে কল্পুর হয়ে গেল। হঁ! এক শিলিঙ—বাপরে! চাট্টিখানি কথা!’

‘কিন্তু—’

‘এর মধ্যে “কিন্তু” “but” “mais” “aber” কিছুই নেই, ভাই। কিন্তু সেই যে, অস্তহীন চিরচক্রের দৃষ্টান্ত দিলেন সিংহলের মহাস্ববির, বলছিলুম কিনা, সেটা আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। তাই তোমাকে পয়লা বাজিয়ে নিলুম, তুমি ইহদি স্বচ সহজে চালু গরুগুলোর খবর রাখো কিনা। সবাই বলে, ওরিয়েন্টালা—এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা—নাকি সর্বকণ মুখ গুমড়ো করে, নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন, রসকষের বালাই নেই। যতো সব! হ্যাঁ, অস্তহীন চিরচক্র সহজ করে বোঝাতে হলে বলতে হয়—স্বচ বিল শোধ করবে না আর পাওনাদার ইহদিও তাকে ছাড়বে না। সে ধাওয়া করেছে স্বচের পিছনে। শহরটাও ছোট। তখন কি হয়? অস্তহীন চিরচক্র। এখনো যদি না বুঝে থাকো তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ইহদির দোকানে এপ্রেন্টিস করগে।’

আমি বললুম, ‘একটি কথা শুধোতে পারি—অপরাধ যদি না নেন, ব্যক্তিগত কথা।’

তিনি বললেন, ‘মাই লাইক ইজ এন ওপ্‌ন বুক। যা-খুশি শুধোতে পারো।’

‘আচ্ছা, আপনি তো, বোধ হয় ইজুরায়েলাইট—’

বাধা দিয়ে মূহু হাসি হেসে বললেন, ‘অত ভদ্রতা করে, অগ্র লোক হলে বলতুম ভণ্ডামি করে, ইজুরায়েলাইট না বলে যুডে (Jude = ইহদি) বলতে পারো, তার চেয়েও অবজ্ঞাসূচক Jut বলতে পারো, এমন কি পাঁচজন জর্ধন আড়ালে যে “কীজার য়োট” (মোটামুটি, “স্বপ্ন ইহদির বাচ্চা”) ব্যবহার করে সেও করতে পারো। আমি নির্বিকার।’

আমি জিভ কেটে বললুম, ‘ছি ছি, কি যে বলেন—’

কের বাধা দিয়ে বললেন,, ‘শোনো, ভদ্র! তুমি কি বললে, কি না বললে কিছুটা এসে যায় না। এই দেখ আমার নাকটা—কি রকম বঁকে গিয়েছে কের মত বুলে আছে, তারপর আমার কান দু’খানা—মাথার সঙ্গে লেপটে না গিয়ে একটা ডান দিকে আরেকটা বাঁ দিকে যেন উড়ে যাবার পণ করেছে, দাঁড়াও,

তোমাদের দেশের হাজার বোধ হয় এরকম কান হয়, তারপর আমার চুল—
কানের কাছে কি রকম যেন কৌকড়া কৌকড়া, নিগ্রোদের মত, আমাদের মিশর-
বাসের সামান্য অবশিষ্ট—’

‘থাক না। প্রীজ।’

একটু হাসলেন, তাতে কোনো তিক্ততা ছিল না। বললেন, ‘এক ফার্স
দূরের থেকে লোক চিনতে পারে, ঐ আরেক ব্যাটা ইহুদি আসছে। তুমি
ইজরায়েলাইট বললে, না যুডে বললে তাতে কি যায় আসে? তা সে যাক্ গে।
‘তুমি কি যেন শুধোচ্ছিলে?’

‘আপনি তো ইহুদি—’

‘বলে ইহুদি! রীতিমত ধানধানী মনিষি আমি। কেন, নাম থেকে বুঝতে
পারছেন না? তোমাদের কুরান শরীফেও যে প্রসিদ্ধ ইয়াকুবের (জেকব্)
উল্লেখ আছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম লেভি। কিংবা বাইবেলের প্রথম অধ্যায়,
জেনেসিসেও পাবে এ-গোষ্ঠীর খবর। কিন্তু থাক্, প্রপিতামহের শুকনো হাড়
চিবিয়ে বৈচ থাক্ যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমাদের পরিবারের বংশাশ্রমে
ইহুদি ধর্ম ও হীক্সসাহিত্যের চর্চা আছে।’

‘তা হলে আপনি ইহুদিদের কঙ্কসী নিয়ে, আপন চেহারার ইহুদিলক্ষণ নিয়ে
অত ঠাট্টা-মস্করা করেন কি করে?’

মিটমিট করে হেসে বললেন, ‘কেন, শোন নি, স্বচদের সম্বন্ধে যে-সব নতুন
নতুন গল্প বেরোয় তার অধিকাংশের জন্মস্থল এবারডান, জনক স্বচরা স্বয়ং?
তব্বটার সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু ইহুদির কঙ্কসী, সে নোংরা—স্নান করে না,
যে-দেশে বাস করে সেটাকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করে না, আরো কত কা—
এসব নিয়ে যে-সব গল্প আছে তার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে আমার কাছে।
পেরেছি উত্তরাধিকারসূত্রে ঠাকুরদার কাছ থেকে এবং এর অধিকাংশই ইহুদিদের
তৈরি—কোনো সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। বাবার এসবতে শব্দ নেই। তিনি
পড়ে আছেন হীক্সসাহিত্য নিয়ে, আর অবসর সময়ে ঐ একই অভিনিবেশ সহকারে,
জর্মন সাহিত্যচর্চা। কারো সঙ্গে মেশেন না বড় একটা, কিন্তু তোমাকে যতটুকু
চিনতে পেরেছি তার থেকে মনে হয়, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি খুশী
হবেন। প্রাণ ভরে তাঁর কাছ থেকে জর্মন সাহিত্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে
বের করতে পারবে। আসবে একদিন ডিনারে? বেশ! মাকে শুধিয়ে দিন
ঠিক করে তোমাকে বলবো।’

‘আচ্ছা, বলুন তো, এদেশে নাকি একটা পোলিটিকাল পার্টি দিন দিন শক্তি

সঞ্চয় করে চলেছে, আর তারা নাকি নির্বিচারে সব ইহুদিদের এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—যাত্রা পাঁচ শ’ সাত শ’ বছর ধরে জর্মানিতে আছে তাদেরও, যারা এক বর্ণ হীক্স জ্ঞানে না, সিনাগগে যায় না, নাস্তিক্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছে তাদেরও। দোষটা কি ওদের?’

এই তার মুখ একটুখানি গম্ভীর হল। সেটা যেন মুছে ফেলে মুচকি হেসে বললেন, ‘এ তো কিছু নতুন নয়। বাইবেলের “এস্টার” পুস্তিকা পড়েছ?’

আমি অভিমানের স্বরে বললুম, ‘আমি অগা। কিন্তু এস্টার পড়ি নি, এ-সন্দেহ কেন করছেন? তবে হ্যাঁ, ওল্ড-টেস্টামেন্ট পড়া উচিত, তারই নির্মাতা কোনো ইহুদি রাক্ষির কাছ থেকে। আমি পড়েছি খুষ্টান—তাও লুথেরীয় অর্থাৎ কি না প্রটেস্টান্ট—পাত্রির কাছে। ওনরা তো এস্টারের ঐতিহাসিকতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।’

‘সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত অস্তিত্ব এটুকু যেনে নিতে পারো, সেখানে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকখানি খাটি সত্য—তা সে যার মুখ দিয়েই বলানো হয়ে থাক না কেন এবং ইরানের রাজা গ্রীস-মিশর-বিজয়ী Xerxes ইহুদি-বালা এস্টারকে বিয়ে করে থাকুন, আর না-ই করে থাকুন। সেখানে Xerxes (বাইবেলের ‘অহস্‌ভেরুস’)-এর মন্ত্রী তাঁকে একদিন বললেন, “মহারাজের বিশাল সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই পাওয়া যায় (ইহুদি) যাদের আইনকানুন অগ্নি সব জাতদের থেকে ভিন্ন, এমন কি রাজ্যদেশও তারা মানে না; অতএব এক বিশেষ দিনে এদের সবংশে নির্বংশ করা হোক।”... তখনও প্রভু যীশুর জন্ম হয় নি, খৃষ্টধর্মের সঙ্গে বৈরীভাবের প্রসঙ্গ ওঠে না, আর, ঐ যে নয়া পলিটিকাল পার্টির কথা বলছিলে, যারা জাতে অ্যারিয়ান—তাদের ভিতর আবার নীল চোখ, ব্লু চুল-ওলা সর্বশ্রেষ্ঠ নর্ডিক জাত সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা পিঠপিঠ বলে ইহুদিরা মাত্রই পৃথিবীর নিম্নে (untermensch = under-man) সে পার্টি তো পশু-দিনের—নিতান্ত শিশু। তা সে যাক্ গে—এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস জেনে তোমার যে কি লাভ হবে জানি নে। তোমাদের দেশে—’

‘হালে আমাদের দেশে ইহুদিরা এসেছে ইয়োরোপ থেকে। তার বহু শতাব্দী পূর্বে ঝড়ের মারে একখানা নৌকায় করে সাতজন পুরুষ আর সাতজন স্ত্রীলোক এসে পৌঁছয় বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত চেমুল বন্দরের কাছে।’

১ মারাঠিতে ‘চ’ অক্ষরের উচ্চারণ ‘ৎস’-এর মত। তাই টলেমি এ বন্দরকে তিমুলা, সিমুলা দুই উচ্চারণেই লিখেছেন। চিংপাবন ব্রাহ্মণদের (টিলক,

শাস্ত্রাদি সব লোপ পায় বলে লোকে এদের ইহুদি পরিচয় পায় নি ; শুধু শনিবারে 'এরা বিশ্রাম নিত বলে (ইহুদির সাক্ষ্য) এবং তেলীর ব্যবসা করতো বলে (বোধ হয় মধ্য-প্রাচ্যের অলিভ তেল তৈরির কায়দা এরা তিল-সর্বের উপর চালায়) 'এদের নাম হয়েছিল "শনিবার-তেলী" । একশ' বছরও বোধ হয় হয় নি, তর্কাতীত সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরা জাত-ইহুদি । কিন্তু এদের পিছনে তো কেউ কখনো লাগে নি—এস্টার কেতাবের পাইকিরি কচু কাটার নৃশংস প্রস্তাব কহাঁসে কঁহা !'

‘জানি, তাই বলছিলুম, তোমার কি লাভ ? আর এদেশের আর্থেরা বলেন, ইহুদি লাভ, টাকা, সোনারূপো ভিন্ন অল্প চিন্তা অল্প বস্তু বোঝে না । রূপোর কথাই যদি উঠলো তবে একটি ইহুদি কথিকা—কঞ্জুসীবাবদ—ঠিক পপুলার গল্প নয়, হাকশাস্ত্র বাক্যের মত বলি,—শ্রবণ করো, এবং তারপর—’

ইঙ্গিত বুঝে বললুম, ‘ঘাচ্ছি আপন টেবিলে হীক্স ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করতে ।’

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘একলা জটনৈক অর্থ-পিচেশ মজ্জা-কিপটে কোটিপতি—কখনো কানা কড়িটি দান করেছে এ-কথা তার কোনো হাতই জানে না—এসেছে এক রাবির কাছে । জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে রাবি তাকে বললেন, “বাইরের দিকে তাকিয়ে আমায় বলো, কি দেখতে পাচ্ছে ।”

ধনী বললে, “লোকজন—বিস্তর মাহুষ ।”

রাবি বললেন, “উত্তম প্রস্তাব ।” তারপর একটা আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে শুধোলেন, “এবারে কি দেখছ ?”

“আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি—” বললে কিপটে ।

গোথলে ও যদি বেয়াদপি মাক করেন তবে উল্লেখ করি, অধীনের অধুনা প্রকাশিত ‘হু-হারা’ পুস্তকের চরিত্র কাণে) অনেকেরই নীল চোখ, কটা চুল ; এদের ভিতরেও কিংবদন্তী, এঁরাও ঝড়ের মারে কৌকল অঞ্চলে পৌঁছন ।

বরদার সমাজীরাও যেরকম রমেশ, অরবিন্দ, আশ্বেডকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, ঠিক তেমনি এই সাত স্ত্রীপুরুষের বংশধর পণ্ডিত কাহিমকরকে বোম্বাই থেকে ধরে এনে বরদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন । ভারতবর্ষের এঁরা প্রাচীনতম ইহুদি । এঁরা ইয়োরোপীয় বহু ইহুদির গায় ‘ইহুদি’ শব্দটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং নিজেদের ‘বেনে-ইজরায়েল’ [বেনে—আরবী বিন—ইবন=পুত্র ; ইবন বংতুতা তুলনীয়] = ‘ইজরায়েল-সন্তান’ রূপে পরিচয় দেন । আমার পরম সৌভাগ্য বরদাবাসকালীন এই বিভ্রাসাগরের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয় । এই

“ততোধিক উত্তম প্রস্তুত”—বললেন রাবি, “এইবারে শোনো, বংস, কান পেতে মন দিয়ে। জানলার শার্সি কাঁচের তৈরি, আয়নাও কাঁচের তৈরি—তফাৎ কি? আয়নার পিছনে রয়েছে অতিশয়, হাঙ্কার চেয়েও হাঙ্কা সা মা স্ত্র একটু রূপোর প্রলেপ—ধর্ত্যব্যোর মধ্যেই নয়। কিন্তু বংস, যেই না এল সামান্যতম রূপো, অগ্নি তুমি আর অন্ত মাহুযকে দেখতে পাও না, দেখতে পাও শুধু নি জে কে ॥২”

২৩৪।৬৬

মাটির মাহুযটির যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বরে প্রকাশিত বেনে-ইজরায়েল পুস্তিকা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতসমাজে, বিশেষ করে রাব্বিদের ভিতর যেন টর্পেডোর মত পড়ে। বস্তুত তারপর যে যা লিখেছেন বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায়—তার বেশীর ভাগ জুজ কাহিম্করের কাছ থেকে নেওয়া। সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা সহ। বরদার দ্বিতীয় ইহুদি ছিলেন জর্মন। এ-লেখনের ডঃ লেভির মত, ডঃ কোন্-ভীনার (‘কোন্-ভীনারের মা’ পশু—পঞ্চতন্ত্র, ১ম)।—ইয়োরোপীয় ইহুদি ও কাহিম্করের কৌকণী ইহুদিদের পাল-পরবন্ধ ক্যালেন্ডার ভিন্ন ভিন্ন—আল্লাকে বে-শুমার শোকরিয়া। আমি কখনো বা জুজ সাহেবকে নিয়ে কোন্-ভীনারের গৃহে, কখনো বা কোন্-ভীনারকে নিয়ে জজের বাড়িতে বহু বিচিত্র বহুর ভক্ষণ করে—একই পরব হু-হুবার যথা গোস্থামী মতে ইত্যাদি পালন করে, ধর্ম রক্ষা করতুম। বেনে-ইজরায়েলদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞানগম্য সেটুকু সমুচহ জজের খয়রাৎ।

২ এ লেখনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গ পাঠকদের না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে ২৬ মার্চ (১৯৬৬) সন্ধ্যাবেলা প্যারিস বেতার থেকে ইন্দিরাজীর ফরাসীতে প্রদত্ত মঁসিয়ে ছ গলের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরের রেকর্ডিং। অনবদ্য রিসেপশনে—কলকাতা ‘ধ’-এর চেয়ে কোটিগুণে শ্রেয়। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ অতি সুন্দর, পরিষ্কার। অনভ্যাসবশত মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চারণে বিদেশী আড় প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুদ্ধের সময় আমি চার্চিলের ফরাসী ভাষণ বেতাবে শুনেছি। ইংরাজীর জোরালো একসেন্ট দ্বারা আট্টপৃষ্ঠে বাঁধা ফরাসী উচ্চারণ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, বেতার-যন্ত্রে কান সঁটে না শুনলে মনে হবে, গাঁক-গাঁক করে ইংরেজ সাবলটর্ন কুচকাওয়াজের ‘হুকুমদার’ ঝাড়েছে। ফরাসীতে অহুনাসিকের ছয়লাপ। ইংরেজের কাছে সে বহু গোমাংস। অতএব বাংলার ‘চাঁদ’ যেন ইংরেজের মুখে ‘চ্যান্ড’ হয়ে বেরুচ্ছিল। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ চার্চিলের চেয়ে ইনফিনিটি পার্সেন্ট শ্রেয়।

এমেচার ভার্গল স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুহুর্তে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়স্কট বা ধর্মঘটে ধারা কালো কাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তথ্য আমাদের কাছে নতুন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লিতে যে ‘হাঙার স্ট্রাইক’র জন্ত প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্ত শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিষ্পানি—তদভাবে জিন্ (যদি তিনি মঞ্চপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিনই সহজলভ্য কড়া ড্রিকের তিতর জলের রঙ ধরে, আহারাঙ্গি, হ্যাঁ, আহারাঙ্গিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভৌতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিল্লী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি ‘এমেচার’।

এসব তো মস্তুরার কথা—যদিও দুটোই ভাষা ‘ইমানসে’ সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি ‘সদাচার কলাচারের’ উৎপাতে এদানিং বড়ই উৎপীড়িত (‘তংগ্ আ গয়ে’); তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে ‘হাঙার স্ট্রাইক’ করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে, কিংবা ‘হাঙার-এর’ হাঙরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশনন্ড্ হয়ে গিয়েছে, ‘অর্থাৎ হাঙার স্ট্রাইক’, ‘ফাস্ট্ আন্ টু ডেথ্’ এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং! আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এ-সব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যান্ডের কে যেন ম্যাকহুইনি না কি যেন নাম সে নাকি বাষট্টি বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহ্য দ্বিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যিই ‘শরম্কা—’ থুড়ি ‘লজ্জাকী, ঔর আকসোস—’ থুড়ি ‘পশ্চাত্তাপকী বাৎ’।

তৎসঙ্গেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রাণ্ড রাস্লেয়ার মত নিরহকার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন। স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে

১ এ বাবদে তাঁর বিদ্যুতে রায় : সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তথ্য এক বাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ক্ষপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন্ দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ তুমি এমেচার ঠোট দুটি সেলাই করে বসে

বড্ডই হুখ পেতেন। আমি তামা-তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার করে কাটতে রাজী আছি, তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর হোমেওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষ গুণে দ্বাধনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে নয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে! অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেষজ্ঞরা—একশ' বার মানি—কিন্তু যে বাড়লা ভাষায় লিখেছেন সেটা, ঐ যে করাসীতে বলে, 'ইল্জ এক্টিভ ফ্রাঁসে কম্ লে ভাশ্ এস্পানিয়োল'—তেনারা করাসী লেখেন স্প্যানিশ গাইয়ের মত।^২ রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাড়লাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু-পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্তু তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দায়ে মজে যান। বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় হুনৌতিবাবু এবং/কিংবা গোসাইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাড়লা ভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ হৃন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্ হুস্ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেন্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মত পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ভ্রম করে সম্মিতে ফিরে

থাকো। এমন কি কেউ যদি বলে, Fine Weather—eh? তুমি হাঁ না বলতে পারবে না। তুমি ওয়েদারের জানো কি? প্রথম গ্রীনিজকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তারা যদি বলে 'কাউল' তবে কাউল—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছে! সেখানে থাক না মলয় পবন আর স্বর্ষাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ! এন্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয়, তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিলির তাহুড়ী বলতেন অ (ঘর-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ বারট্রাও রাস্লে'র অলুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল-টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরব্ধা' নাম রাখতে হবে।

২ আমার টায়-টায় মনে নেই তবে রাজশেখর লেখেন, 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরনীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভজ্ঞনোচিত গলাখাকরি অহুমান করে নেবেন! ধন্যবাদ!) কোনো একটা বেহেড্

আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেনে ঘন ঘন করতালির মধ্যস্থানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন। কি বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দভাষিক নন—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort)ও বটে, দুর্বলতাও—যদি অপরাধ না নেন—বটে কিন্তু এস্থলে তিনি যে তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসসত্ত্বেও হার মানায়। তিনি বলছেন, ‘কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, (যেমন সেকানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোঁকাটির হাত আজামুলম্বিত না বলে আগুলক-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসঙ্গেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে ‘রসোত্তীর্ণ’ বলা হয়।) ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দু-পাঁচটা ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবস্বন্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ (খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়।) এবং খাঁটি বাঙলা অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটাই আমরা অন্ত্যান্ত সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দভাষিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের মত নয়। সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যন্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈয়াকরণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসীতার অব স্টোলে প্রপাটি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্তার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো

বেলেগ্লাপনা। উহঁ, আপনার পাপ মন, পাঠক, আপনার পাপ মতি। ওয় অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায়-টায় মনে নেই—The reaction of chlorine (ক্লোরিন) on acetylene (অসিটলিন) where nitrogen (নেজেন) is present.

বৈয়াকরণিক, কোনো শব্দভাষিকের সাহায্য পায় না। তাই প্রাচীন লেখক—যখন নতুন শব্দভাণ্ডার নতুন বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানি সার্বিক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দভাষিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অল্প কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেরি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে জলজল করে ফুটে উঠলো, মুসলমানদের সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন'ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিম ধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় (মিনিট অব ডিসেন্ট) প্রকাশ করলে সেটিও সমস্ত পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠলো, 'নগরে জুম্মা নমাজ অবশ্য পালনীয়; কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করবো কি না? ইমাম সাহেব বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে "নগর" বলে কাকে, আর "গ্রাম" বলে কাকে?' জর্নেক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন করে জনসাধারণের জন্য অনুশাসন প্রচার করি (অর্থাৎ আমরা theologians); থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'।

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয়তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরুস্থান পেয়ে হাজার লোকের কাফেলা (ক্যারাভান) কয়েক দিন বিশ্রাম করলো। সেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিকাল অর্থে কোন্টা গ্রাম, আর কোন্টা

শব্দ, তার সংজ্ঞা (definition-এর) সঙ্গ কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে ।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোনটা crime, আর কোনটাই বা tort ; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে । সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে, নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে ।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলা দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি ।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে । সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে । আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে । তাঁরা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষা-তাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে ॥

মিজোর হেপাজতী

নেফা অঞ্চল বাদ দিলে আসামে যে কটি পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার ভিতর পড়ে খাসিয়া, গারো নাগা ও লুসাই । এর সঙ্গে ত্রিপুরার কুকি অঞ্চলেরও নাম করতে হয়, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার কুকিরা এযাবৎ কোনো সমস্তার সৃষ্টি করে নি—এবং যেহেতু ত্রিপুরা আসামের অংশরূপে গণ্য হয় নি, তাই সে-দেশ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয় । কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে এস্থলে কিছু না বললে তাদের ও গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাঙালী ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবিচার করা হয় ।

আসামের অস্ত্রাশ্রু পার্বত্য জাতির মত মণিপুর অচলিত নয় । মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মণিপুর ও বর্তমান মণিপুর একই কিনা সে নিয়ে তর্কাতর্কি করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই—এবং যেহেতু মণিপুর অধীনের জন্মভূমির প্রত্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত, সে তার প্রতিবেশীকে অহেতুক ক্ষুব্ধ করতে চায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, যতপি সাধারণ মণিপুরীদের চেহারার ছাপ মঙ্গোলীয়, ওদের ভিতর হঠাৎ বিশুদ্ধ আর্য টাইপও পাওয়া যায়—এবং যেহেতু পার্শ্ববর্তী আর্য বাংলা-ভাষাভাষী সিলেট কাছাড়ে এ টাইপ দ্রুত, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, কান্ধকুজ অঞ্চলের এই আর্য টাইপ হঠাৎ মণিপুরে আবির্ভূত হল কি প্রকারে ? পশ্চিম-

বাংলার সঙ্গে মণিপুরের সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী আজ মণিপুরী নৃত্যের কথা ও সে নৃত্য যে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, সে-কথা জানে—বস্তুত ভারতবর্ষে অধুনা যে চার রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি স্বীকৃত হয়, এ নৃত্য তারই অন্যতম—কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রচার ও প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অতএব এ নৃত্যকে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল প্রশ্ন এই : ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যদেশে মণিপুর যে বৈষ্ণবধর্ম ‘রাষ্ট্রধর্ম’-রূপে গ্রহণ করল সেটা সম্ভব হল কি প্রকারে? আসামের আর পাঁচটা পার্বত্য জাতি যে রকম আর্থ জনপদ থেকে দূরে হাজার হাজার বৎসর ধরে আপন আপন প্যাটার্ন অব্ কালচার বুনো যাচ্ছিল মণিপুরও করছিল তাই। তাদের মাঝখানে একমাত্র মণিপুরই বা বৈষ্ণব হয়ে গেল কেন? এ কথা সত্য যে শিলচর থেকে মণিপুর পৌঁছানো সহজতর। কিন্তু মৈমনসিং থেকে গারো পাহাড় যাওয়াও তো কঠিনতর নয়, গারোরা অতিশয় শাস্তিপ্রিয় এবং দু-একটি গারো মুসলমানের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। পক্ষান্তরে নেফার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা কঠিনতর; অথচ লোকমুখে শোনা, সেখানকার কোনো কোনো উপজাতি সর্বস্বাবদে অ-হিন্দু হয়েও মাথার এক দিকের ষানিকটা চুল কামায় ও চিরুস্বরূপ দেখিয়ে বলে স্বয়ং ত্রীকৃষ্ণ নাকি তাদের অর্ধ-হিন্দুরূপে পরিণত করে বলেন যে, তিনি আবার এসে তাদের পূর্ব-হিন্দু করে দেবেন—তারা এখনো সেই প্রতীক্ষায় আছে। তা সে যা-ই হোক, মহাপ্রভু ত্রীচৈতন্তের বাঙালী শিষ্যরাই যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মণিপুরী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয়; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে খৃষ্টান মিশনারিরা পার্বত্যবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর তাদের

১ দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নিয়ে যতখানি গবেষণা এই উত্তর ভারতেই হয়েছে, এই উত্তর ভারতের বনিষ্ঠতর মণিপুরী নৃত্য নিয়ে তার এক-দশমাংশও হয় নি। এ নৃত্য সত্যই রহস্যময়। মূল নৃত্য শাস্ত্র ও লাস্ত্রসাপ্রসিদ্ধ কিন্তু প্রারম্ভিক অবতরণ নৃত্য (এর টেকনিকাল নামটি আমি ভুলে গিয়েছি) অত্যন্ত প্রাণবন্ত, তুর্দাস্ত—তাণ্ডব নৃত্যের কাছাকাছি এবং পার্শ্ববর্তী অল্পমাত্র অঞ্চলের সংগ্রাম-নৃত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে। হয় তো বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পরও মণিপুরীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত পার্বত্য নৃত্য ত্যাগ করতে চায় নি বলে ‘অর ছ ভ্র’ রূপে—প্রস্তাবনারূপে—সেটিকে রক্ষা করেছে।

ভাষা রোমান বা অঙ্কার দিনের ইংরিজী অক্ষরে লেখেন।*

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, মণিপুরবাসী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে (এবং পরবর্তী যুগে কাছাড়-আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু মণিপুরী ইসলাম গ্রহণ করিতে) কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাঙালী মিশনারিরা মণিপুরের সিংহাসনে কোনো বাঙালীকে বসাতে চান নি। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মণিপুরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কাছাড়বাসীর মধ্যে অব্যাবিনিময়ের ফলে উভয়েই উপরুত হন। এই অর্থনৈতিক দিকটা পাঠক বিশেষভাবে মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, নাগা এবং মিজোদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা কেউ সবিশেষ চিন্তা করে দেখেন নি।

আমার বালাকালে সিলেট জেলার একাধিক জায়গায় নিয়ত বর্ষিষ্ণু খৃষ্টান মিশন ছিল এবং সে যুগে ভারতের তাবৎ প্রটেষ্ট্যান্ট মিশনারিদের ভিতর দক্ষিণ-শ্রীহট্টে কর্মরত ওয়েলশ্ মিশনের (এখনো মিজোদের ভিতর এই মিশনই সর্বপ্রধান এবং যে ক'জন মিশনারির খবর অধুনা পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁরা খুব সম্ভব এই মিশনেরই।) রেভারেন্ড পিংগোয়র্ন জোন্স, তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা—বাংলা, ইংরেজী, ওয়েলশ্, তিন ভাষাতেই—চরিত্রবল ও ধর্মামুরাগের জগ্নু বিখ্যাত ছিলেন। আমি পাঠশালা যাবার সময় থেকেই তাঁর গির্জা ও সানডে স্কুলের রীতিমত অমুরাগী অংশগ্রহণকারী ছিলাম বলে প্রায়ই টিলার উপরে অবস্থিত তাঁর ছিমছাম বাংলোতেও যেতুম। মিশনে বাস করতো আরো বিস্তর ছেলেমেয়ে—প্রধানত চা-বাগিচার সাহেব ও দিল্লী রমণীর মিলনজাত পুত্রকন্যা এবং কিছু কিছু থাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই (মিজো) খৃষ্টান। থাস বাঙালী প্রায় চোখেই পড়ে নি। আমি বিশেষ করে এই পার্বত্য খৃষ্টানদের সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলাম এবং হাইস্কুলে ঢোকার সময় একটি লুসাই ছেলের সঙ্গে হৃদয়তা হয়। সে সময় লুসাই ভাষা

২ এ যুগে মণিপুরে যে রকম হঠাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়, সে রকম উদাহরণ কাঁ অদূর অতীত কাঁ বর্তমানে আমি অগুজ কোথাও পাই নি। মালকানা রাজপুতদের অল্পসংখ্যক লোকই বিংশ শতাব্দীতে ‘আর্থ-সমাজে’ দীক্ষা নেয়। শিলঙ শহর প্রায় শত বৎসর ধরে হিন্দুপ্রধান। সেখানে ব্রাহ্ম ও ইসলাম মিশন স্থাপিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান মিশনারিরাই সব চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন। এখনও আসামের সর্ব পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিই অগ্রগামী—এবং কোনো কোনো লাগোয়া সমতল ভূমিতেও।

লিখতে গিয়ে—বাড়িও লেখা হয় নি—আবিষ্কার করি যে, অন্তত লুসাই ভাষাতে বাংলার বহু বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই (পরে জানতে পারি, অলিখিত ভাষা মাত্রেরই সাধারণত এই হাল)।

জোনস্ সায়েব থাকতেন ছিমছাম বাংলায়, জানলায় পর্দা টানানো। সায়েব-যেম খানা খেতেন ছুরি-কাঁটা দিয়ে, ধবধবে সাদা টেবিলরূখে ঢাকা খানা-টেবিলের পাশে। আমার বয়স তখন তেরো। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, ধর্মযাজকের এতখানি বিলাস ভালো না—বিশেষ করে তিনি যখন মিশনের আর সবাইকে তাঁর মত ‘বিলাসে’ রাখতে পারেন না। (পরবর্তী যুগে ইংলণ্ড এবং কন্টিনেন্ট ঘুরে বুর্তে পারলুম, জোনস্ সায়েব তাঁর দেশের পাত্রী-ভাইদের তুলনায় কতখানি আত্মত্যাগ করে ওই বিদেশ-বিভূঁইয়ে কতখানি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন ; তাঁর আত্মাকে স্মরণ করে আজ ক্ষমা ভিক্ষা কর)।

আমার এবং আমার হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মনে পাত্রী সায়েবের ছিমছাম বাড়ি, আসবাবপত্র কোনো প্রলোভনের উদ্রেক করতো না। আমরা যেন কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে মনে মনে যুক্তি করতুম, ‘খুঁটান হলে এ সব পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা তো ধর্ম বেচতে চাই নে।’ তাই বোধ হয় ‘জোনস্ সায়েব তাঁর জোরদার বাগ্মিতা-শক্তি ধারাও কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে খুঁটধর্মে দোষিত করতে পারেন নি—করে থাকলেও অত্যন্ত দুঃস্থ দূর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে। আমরা কখনো তার খবর পাই নি।

আমার কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো, মিশনের এই খাসি লুসাইরা কি জোনস্ সায়েবের মত ফিটকাট বাড়িতে থাকতে চায় না ?

মণিপুরে যে সব বৈষ্ণব ‘মিশনারিরা’ গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে কোনো উচ্চতর মানের জীবনযাপন করেন নি। বস্তুত আজও মণিপুরের গ্রামবাসী সূর্য্য উপত্যকার চাষার চেয়ে অনেক সচ্ছল। কাজেই এ নিয়ে কোনো জব্দ সেখানে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু নাগা-লুসাইদের মধ্যে কি হল ?

যারা লেখাপড়ায় সামান্য ভালো—এ কথা মানতেই হবে, খুঁটান মিশনারিরা তাঁদের সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় ততখানি অর্থ শিক্ষার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং একদা সেখানে সাক্ষরের সংখ্যা বাংলার তুলনায় ছিল বেশী—তারা কোহিমা আইজলে পড়তে এল, পরে শিলঙে এবং কেউ কেউ কলকাতা পর্যন্ত। এবং যারা আপন গ্রাম থেকে বেরুলো না, তারা অন্তত পাত্রী সায়েবের বাড়ি, তাঁর তৈজসপত্র দেখেছে। শিলঙে যে দু-চারজন চাকরি

নিয়ে থেকে গেল তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা বাড়ির চানে গাঁয়ে কিরে গেল, এবং যারা গাঁয়েই ছিল এদের অনেকেই কি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতত্ত্ব করে পাত্রী সায়েবের মানের কাছে আসতে চাইলো না ?

এ তো আমাদের চোখের সামনে নিত্য নিত্য ঘটছে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে শহরে এসে আর গ্রামে কিরে গিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে চায় না। বস্তুত ক্রান্ত, কর্মনি সর্বত্রই ক্রন্দনরব উঠেছে, গ্রামের বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে যাত্রই আর গ্রামে কিরে যেতে চায় না। পড়ে থাকে নিষ্কর্মাগুলো। দি ভিলেজ্‌স আর বীইং ডেনড্‌ অব দেয়ার ব্রেনস—শহর বেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিভাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে একতরফা ভাটা, এরই ফলে যে গ্রামোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এ সম্বন্ধে ‘উনেকো’ বহুকাল ধরে সচেতন, বিস্তর গবেষণা করেছেন, দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হয় না, কারণ, যে গ্রামের ছেলে শহরে থাকতে চায় তার জন্ম আশেপাশে বিস্তর ছোট-বড় শহর আছে—বোলপুর, শিউড়ি, বর্ধমান, শেঘটায় যদি তাতেও প্রাণ না ভরে, তবে কলকাতা। রেলের চাকরি করে ভাগলপুর, পাটনা হয়ে কত কী !

কিন্তু মিজো-লুসাইবাসী যাবে কোথায় ? আইজল, লুঙলে তাদের কি দিতে পারে ? তারপর শতাধিক মাইলের ধাক্কা পেঙ্গিয়ে শিলচর—সে আমাদের সিউড়ি-বর্ধমানের তুলনায় কসমপলিটান শহর বটে—কিন্তু তারই বা মরদ কতটুকু ? তার নিজেরই হুঃখের অবধি নেই। আসাম সরকার তাকে—যাক, আবার না আরেকটা বাঙ্গাল খাদ্যদানো আরম্ভ হয়ে যায় (ভালো তো কারো করতেই পারি নে, মন্দটা না-ই বা করলুম !), আর কেন্দ্রীয় সরকার ? কতবার বুঝিয়েছি, এই শিলচরে বেতারের কেন্দ্র বানিয়ে নাগা-লুসাইদের কন্ট্রোল করো—কে বা শোনে কার কথা (এস্থলে বলে রাখা ভালো আমার জন্মভূমি কাছাড় নয়)। থাক সে কথা। মিজো যদি বা শিলচর পেরুতে চায় তবে সামনে যে খাঁড়া পাঁচিল—হিল্‌সেকশন—তারপর সেই হ্রদ্র গোঁহাটি। এখানে খাসিয়াদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে, একে তাদের চাষের পদ্ধতি উন্নত, শিলঙ গোঁহাটির ভায়া তারা মোটামুটি জানে, জিনিসপত্র সেখানে বেচতে পারে, চাকরিনোকরি মিস্ত্রিগিরি করে পয়সা কামাতে পারে। আর শিক্ষিত সম্পদশালী বহু খাসিয়া শিলঙ শহরের পাত্রীর বাড়লোর চেয়েও ফিটকাট বাড়লোয় বাস করেন। তাই স্বভাবতই খাসিয়ারা অনেকখানি সম্ভষ্ট এবং তাই শান্ত।

কিন্তু মিজো যায় কোথায় ?

১৯১০।১৯১১ থেকে তাদের ভিতর আরম্ভ হয় খৃষ্টীয় প্রচার এবং ১৯৩১ নাগাদ অর্ধেক লুসাইবাসী হয়ে গেছে খৃষ্টান। তারপর কি হয়েছে জানি নে। নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ মিশনারিদের কাজ বন্ধ হয় নি। আদমশুমারীর হিসাব দেখে লাভ নেই। ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়, পরের সেনসাসে কার স্বার্থ অনুযায়ী কি দেখাতে হবে তাই নিয়ে ছিনিমিনি, ইংরিজীতে যাকে বলে ‘হুকিং’।

পার্বত্যাঞ্চলবাসী অনেক সময় আমাদের হিসেবে নিষ্ঠুর কিন্তু তারা সরল। সরল বিশ্বাসে তারা মনে আশা পোষণ করেছিল, যারা তাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরই জাতভাই ইংরেজ সরকার একদিন তাদের বাসনা-কামনা পূর্ণ করে দেবে। ‘জুম’ খেত করে যে তার পয়সায় পাত্রীর বাঙলো বানানো যায় না সেটা তারা বোঝে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ-রাজ থাকলেও আজ না হোক কাল বা পরন্তু মিজোরদের রুদ্ধ আক্রোশ ইংরেজকেই আক্রমণ করতো। তবে ইংরেজ ধাক্ষা মারতে ওস্তাদ—বাঙালীর মত চালাক জাতকেও কতবারই না একটা কুমীরছানাকে বারোটা করে দেখিয়েছে! কবিগুরু মত বিচক্ষণ জন এবং তাঁর চেয়ে দুই বহু পলিটিশিয়ান ‘ব্রিটিশ জুটিসে’ বহুকাল ধরে বিশ্বাস রেখে আশা করতেন, সময় এলে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে জুটিস—সুবিচার পাবো।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করি—যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছে মাক চাইছি যে, দেশ-শাসন ব্যাপারে ইংরেজের অনেকগুলো সদগুণ আছে এবং সেই অনুপাতেই আসাম সরকার,—থাক, আবার কেন? তবে আসাম সরকার না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরদের ভার নিলেই যে মুশকিল আসান হয়ে যেত সেটা আমি বিশ্বাস করি নে। যাই বলুন, যাই কন, আসাম সরকার বাস করেন শিলঙে—খাসিয়ারদের মধ্যখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে নেফা অঞ্চলেও রয়েছে আরো গণ্ডায় গণ্ডায় উপজাতি। তাদের অনেকেই প্রতি হাটবারে নেমে আসে সমতলে, ক্ষেতের জিনিস, এটা-সেটা (তখনকার দিনে চামর, মৃগনাভি, হাতীর এবং ‘গণ্ডারের দাঁত—ভয়ঙ্কর মূল্যবান জিনিস, মধ্যপ্রাচ্যে ‘হারেম’ পোষণের জন্ত মৃতসঞ্জীবনীর হায়ে নিত্যকাম্য এক্সডিসিয়ায়ক ইত্যাদি) বিক্রি করে প্রধানত ছুন, কেরোসিন^৩ (সর্বনাশ। আমাদেরই যা হাল, ওদের হচ্ছে

৩ এক সিলেটা মুসলমান ডাক্তার বহু বৎসর আইজল-লুঙলেতে কাটিয়ে এসে আমায় বলেন, মিজোরা দু-দিন তিন-দিনের পাহাড়ের চড়াই-ওংরাই পথ পেরিয়ে লুঙলে আসতো কেরোসিন কিনতে। সে কেরোসিন আসতো শিলচর থেকে, বেলীর ভাগ পথ মাহুঘের কাঁধে, বাঁকে করে। একবার একজন বাহকের কলো

কি ? তবে হ্যাঁ, ডিগবন্দীদের অভি কাছে) কিসে নিয়ে যাবার জন্ত । ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী আসামীদের অনেকেই তাদের চেনেন । কাছাড়বাসী ক'জন সন্দেহ আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন সঠিক জানি নে ; যে কজন আছেন একমাত্র তাঁরাই ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসীদের তুলনায় নাগা-মিজোদের বিলক্ষণ চেনেন, সহুগদেহ দিতে পারবেন, অবশ্য শর্ত, যদি কেউ চায় । এঁদের তুলনায় নাগা-মিজোদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এ বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন নাগাদের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় আপন মাতৃভূমি নাগা পাহাড়েই এস ডি ও শ্রীযুত কে ডি চুসা, ট্রেনে শেনালদা থেকে সিলেটের কুলাউড়া পর্যন্ত দিল্লি থেকে মুককচও ফেরার পথে । স্বযোগ পেলে সে কাহিনী আরেক দিন হবে । শ্রীচুসা অর্থনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করেন ।

মিজোরা সরল বিশ্বাসে ভাবছে, আমরা—তা সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, আর আসাম সরকারই হোক—বিধর্মী (নাগারাও কড়া হুঁসে বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে না তারা আমাদের ঘৃণা করে ।' সেটা না হয় করা গেল, কিন্তু খেতেও হবে তাদের সঙ্গে এবং স্বর্গস্থ প্রভু জানেন, একমাত্র চারপাই ছাড়া সর্ব চতুষ্পদই তারা খায় । সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে শুকনো লাউয়ের পাখে ভর্তি ভাত পচিয়ে তৈরী লিটার লিটার বিয়ার । কোহিমার ছোকরা ইংরেজ শাসনকর্তা এ-তিনটির প্রথমটি করে পুণ্যসঞ্চয় করতেন, কাকি দুই বাবদেও তেনারা সমগোত্রীয়, এমন কি প্রয়োজন হলে village belle-কেও তাঁরা নিরাশ করতেন না—কারণ ব্যাচেলার ভিন্ন অল্প কাউকে সেখানে সচরাচর পাঠানো হত না) এবং যেহেতু আমরা বিধর্মী তাই আমরা তাদের জ্বাঘ্য পাওনা দিচ্ছি না । আমরা সরে গেলেই তাদের সর্ব বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে । মোস্ট প্রিমিটিভ জুম চাষ করে যে এবসার্ড জীবনমান উচ্চ পর্ষায়ে তোলা যায় না সেটা বোঝাবে কে ?

হয় নির্জন পথিমধ্যে । বাঁশের স্ট্রেচার বানিয়ে অল্প চারজন বেহারা রোগীকে নিয়ে লুঙলে পানে ব্রহ্মানা দেয়—দশ টিন কেরোসিন পায়ে চলার 'পথের' উপর রেখে দিয়ে । গভায় গভায় কেরোসিনকামী খুঁটান অখুঁটান চলেছে লুঙলের দিকে, কিন্তু তাদের ধর্মবোধ এমনই প্রবল যে তারা কেরোসিনের দিকে ফিরেও তাকালো না । বেহারারা লুঙলে থেকে ফিরে এসে সমুচা সব কটা টিন যথাস্থানে পায়—তারাও জানতো, লোপাট হবে না, তাই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনও বোধ কর্তে নি । সেই মিজোরাই এখন লুঙলেতে লুটতরাজ করলো ।

অবশ্য মিজোদের অসন্তোষের অগ্রান্ত কারণও আছে। আমি শুধু একটা কারণ দেখালুম—অন্তত মার্কসিস্টরা খুলী হবেন—তাদের অনেকেরই মতে এইটাই একমাত্র কারণ। একমাত্র কারণই হোক আর প্রধানতম কারণই হোক, অর্থনৈতিক কারণটার সন্ধান নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। লেনিনের সম-সাময়িক ভিয়েনার অর্থডক্স অর্থনীতি পণ্ডিত গুমপেটার এবং তাঁরই মত কটর বার্গিনের জমবার্ট কেউই এই দৃষ্টিবিন্দুটি অবহেলা করেন নি।

স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার এ বিশ্লেষণ ভুল হতে পারে, কিন্তু তথ্যগুলো সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে।^৪

৪ (ক) মিজো প্রবন্ধটি লিখে ‘দেশ’ দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার পর দুটি তাৎপৰ্য-পূর্ণ খবর বেরিয়েছে। প্রথমটিতে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী বলেছেন—‘যাতে করে মাল চলাচল জাম্ না হয়ে যায় (“transport bottle-neck”), মিজো, নাগা এবং অগ্রান্ত পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে রেল-লাইন বসানো উচিত।’ তিনি General council meeting of the All-India Railwaymen’s Federation-এতে এ বিবৃতিটি দেন ও ২৭-৩-১৯৬৩ কাগজে এটি বেরোয়। মিজো নাগারা যে রেলের অভাবে বাদবাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-কথা আমি প্রবন্ধে নিবেদন করেছি।

(খ) পার্বত্য-অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যাপক রিপোর্ট দেবার জন্ত যে পাটস্‌কর্ কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ ৩১ মার্চ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পড়ে কিছু বলার উপায় নেই, কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তার থেকে মনে হল ‘আধুনিক ঘটনার আলোকে’ রিপোর্টটি আউট অব ডেট—তামাদি না হলেও বর্তমানের প্রবণতা সহজে পারবে না।

গাড়োলন্ড গাড়োল

আমরের ডাক-নাম য়প্প্ বা ইয়প্প্—সারা দেশটা জুড়ে! তোলা-নাম হার ডক্টর ইয়োল্ডেপ (য়প্প্) গ্যোবলস্, রাষ্ট্রের প্রমাণাগাণ্ড-মন্ত্রী, রাজধানী বার্গিনের গাণ্ড-লাইটার (অফিসাধিকারী) এবং ফুরার অ্যাডল্ফ্ হিটলারের শেষ জুয়ো-খেলার পাশা যখন ব্লাকো মেরে মেরে যাচ্ছে, তখন সর্বাঙ্গিক, চৌটোল ওয়ারের জন্ত কুলে ভাগৎ 'ইকট্টে' করার জন্ত সর্বাধিকারী। পার্টির ব্রেন-বাক্সো। শত্রু-মিত্র সবাই এক সুরে বলেছেন, 'হাঁ, প্রমাণাগাণ্ড কারে কয়, সে-বস্তু দেখিয়ে গেছে ঐ ব্রেন-বাক্সোটা।' বাক্সোটির এক দিক দিয়ে ঢুকতো সাদামাটা তথ্য, হাক-তথ্য, ভাংহা মিথ্যে, যুতলবণতৈলতগুলবস্তুইক্কন বেরিয়ে আসতো অল্প দিক দিয়ে। এক-একখানা চাঁছাছোলা, নিটোল, অত্রণ, অনিন্দনীয় কলাসৃষ্টি। গাড়োল, এই 'কলা-সৃষ্টি' রহস্তটা একটু শুছিয়ে বলতে হয়—কারণ, এ-বাবদ তাবৎ টেকনিক্যাল টার্ম একমাত্র ফরাসীর মারফতে প্রকাশ করা সম্ভবে। তত্পরি গ্যোবলস্ সায়েবের গিলের লোত্ত থেকে জান-এর দুশমন তক স্বীকার করেছেন, ভোঁতা হোঁৎকা টিউটন নাংসী পাঠানের ভিতর ঐ গ্যোবলস্ই ছিলেন একমাত্র জিনিয়াস, যার স্বক্কে বিরাজ করতো সৃষ্টিাতিসৃষ্টি মস্তিষ্ককুণ্ডলী পরিপূর্ণ লাতিন মাথা—তাই তাঁর লিখন-কখন উভয়েতেই ছিল, ফরাসীস্থলভ স্ফটিক স্বচ্ছতা।^১ এ-কলাসৃষ্টিকে অ্যাক্‌দা'র বলা যেতে পারে, মাস্টার পীস অব আর্ট বললে ঠিক ঠিক মানেটা ওয়ারায় 'না। অব্‌জেক্ট দা'র শব্দসমষ্টি আমি শুনেছি; এটা বোধ হয় morale-এর মত ইংরিজিতে চালু ভেজাল ফরাসী মাল (আমরা যেরকম কলকাত্তাই উর্হুতে 'একঠো' 'দুঠো'র ভেজাল বরাকর ব্যবহার করে আসছি!) অর্থ, যে-কলাসৃষ্টি

১ অক্সফোর্ডের ইতিহাস-অধ্যাপক ট্রেভর-রোপারের মত জর্মনির জাতশত্রু শতকে গোটেক; তত্পরি তিনি একটি আন্তঃশব্দ প্রব। তিনি বলেন, 'and it was the Latin lucidity of his (Goebbels') mind, the un-German suppleness of his argument which made him so much more successful as a preacher than the frothblowing nationalists of the South.'

অবশ্য অধ্যাপককে বোঝা ভার। তিনি শতাব্দিক বার বলেছেন, জর্মনরা অতিশয় অগা জাত। উত্তরে বলি, অগারা পরিষ্কার যুক্তি বোঝে না; রহস্তের সন্ধানে কোটে মাথা। তাই জর্মন দার্শনিকদের ভিতর লাতিন ধরনের স্বচ্ছ লেখক শোপেনহাওয়ার ভোঁতা লেখক হেগেল-এর তুলনায় অবহেলিত।

কোনো কাজে লাগে না, যেমন ‘পাপিয়ে মাশে’তে তৈরী কাম্বীরী ফুলদানি-পারা খট্টছাড়া বস্ত্র, যেটাতে ফুল রাখা যায় না বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। গ্যোবলস্ সায়েবের বেতার বক্তৃতা বা সম্প্রদায়িক প্রবন্ধ বিলকুল বেকার নয়—টাই-টাই কাজে লাগতো। সৈনিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি টলস্টয়কে নিশ্চয়ই পরম আপ্যায়িত করতে পারতেন; পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, টলস্টয় তাঁর কলা দ্বারা নির্মাণ করতেন স্বর্গারোহণের সোপান, য়প্প্ নির্মাণ করতেন রসাতলের খাউস সবগে নিপতিত হওয়ার তরে অত্যাশ্রয় পিচ্ছল সাহুপ্রদেশ। আর ইহুদিকুলের কল্যাণার্থে গ্যাস-চেয়ার।

হিটলারের বক্তৃতা-গর্জনও ক্ষত্রের তাণ্ডব নৃত্যতুল্য প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু সেটাকে অত সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেটাও কলাখটি এবং সেটি য়প্প্-মার্কান চেয়ে লক্ষণগুণে কার্যকরী। কড়া পাক।

হুজনার মুখে একই জিগির : ইহুদিকুল সর্বনেশে। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।*

কিন্তু হুজনের মনের ভিতর দু’প্রকারের যুক্তি। য়প্পের বিশ্বাস, ইহুদিরা সর্ব ব্যাপারেই সাতিশয় ধুরন্ধর। এদের সঙ্গে ‘নর্ডিক আর্থরা’ অর্থাৎ জার্মানর কিছুতেই পাল্লা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে হিটলার এটা মানতে পারেন না—জান কবুল। তাঁর মতে, এই বহুজরায় যে-কটা ডাঙর ডাঙর জাত, গোষ্ঠী, বংশ—যা খুশি বলুন, ইংরেজীতে Race, জার্মানে Rasse—তার মধ্যে ‘আর্থ’-রেস সর্বোত্তম। এবং সেই আর্থ রেসের ভিতর সর্বোত্তমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মানর নর্ডিক, নীল চোখ, ব্লন্ড (সোনালী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপালীও—যেটাকে বলা হয় প্লাটিনাম ব্লন্ড) চুলধারী ‘আর্থ’ রেস। ইহুদিশ্বের সর্ববাবদে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিমান যুবর শরীরেও যেমন ক্যানসার দেখা দিতে পারে, ঠিক তেমনি জার্মান সমাজে এসে ঢুকেছে ইহুদি গোষ্ঠী। এরা

২ হ্যারনবেরগের মোকদ্দমায় যখন আসামী নাৎসিদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তাঁদের ফ্যারার গুরুই ইহুদিদের ausrotten = ‘সবংশে নির্বংশ’ করবেন বলে একাধিকবার সর্বজনসমক্ষে পণ করেছিলেন, তখন আসামী পক্ষ বলে, ‘ওসব কথার কথা। কেউ যখন বলে, “তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো” (বাঙলায় বলতে গেলে এই অজুবানই জুংসই) তখন অজু পক্ষ সেটা সিরিয়াসলি শব্দার্থে নিয়ে বিশ্বের ভাবৎ ডুগডুগি বানাবার যজ্ঞপাতি বিনষ্ট করতে মাথায় গামছা বাধে না।’

ছারপোকাকার মত ভাবিন। ছারপোকা বেশী বুদ্ধিমান না মাছের বেশী বুদ্ধি ধরে, এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান-মাছের তুলবে না—বুদ্ধিমান বা মুর্থ ছারপোকা তুলবে কি না, সেটা হিটলার বলেন নি।

য়প্প্ বললেন, ‘এটা হল তুলনা। তুলনা যুক্তি নয়।’

ফ্যারার বললেন, ‘তুলনা মাত্রই তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায়। টায়-টায় যুক্তির স্থান নিতে পারে না সত্য, কিন্তু আপন বক্তব্য জোরদার ও প্রাঞ্জল করার জন্য তুলনার ব্যবহার করেছেন সর্বগুণীজ্ঞানীই।’

য়প্প্ বললেন, ‘তর্কস্থলে যেনে নিলুম।’ গ্যোবল্‌স্ বড়ই প্রভুভক্ত ছিলেন। নইলে প্রভুর আত্মহত্যার চকিৎ ঘণ্টার ভিতর তাঁর ছ’টি শিশুপুত্রকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে খুন করিয়ে সতীক আত্মহত্যা করবেন কেন ? বললেন, ‘তাই সই। কিন্তু আমি আপনাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেব, ইচ্ছাদিরা অস্তুত ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে।’

‘কোনো ক্ষেত্রেই না।’

‘বাজী ধকন।’

‘বিলক্ষণ। কত ?’

‘এক লাখ।’

‘গেমাথট—পাক্তী বাৎ।’

দুজনাতে ছদ্মবেশে বেরলেন। তার জন্ম বেশী বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ‘টোটকাটা বার্গিন-কক্‌নিরা বলতো ফ্যারারের চুল নেবে পড়ে কপাল ঢাকে নি—এটা অকল্পনীয়; আর গ্যোবল্‌স্ এক লহমার তরে বকর বকর বন্ধ করেছে—এটা ততোধিক অবিদ্বান। হিটলার তাই চ্যাটচেটে পমেটম দিয়ে যেন প্রায় ঠৈরবচণ্ডীর মত চূড়া-খোঁপা বাঁধলেন—এবারে আর চুল ধসে পড়ে, কপাল ছাপিয়ে চোখ এস্তেক ঢেকে দেবে না। বাস্, এতেই হয়ে গেল ছদ্মবেশ। আর য়প্প্ ? তিনি বললেন, তিনি প্রতি দশ মিনিটে একটি মাত্র সেনটেনস বললেন। এরকম বিকট চূপচাপ লোককে কে চিনবে য়প্প্ বলে !

য়প্পেরই প্রস্তাবমত দুজনাতে ঢুকলেন এক পাচমিশিলি খাটি আধ লোকানে। চাইলেন একটা টী সেট। দোকানী একটি রমণীয় ট্রের উপর সব কিছু সাজিয়ে সামনে ধরলো। গ্যোবল্‌স্ ভো তাঁর মুণ্ডটি ডান থেকে বাঁয়ে,

৩ সবিস্তর কাহিনী পাঠক পাবেন, অধীনের ‘ছ-হারা’ পুস্তকে, ‘হিটলারের শেষ দশ দিন’ প্রবন্ধে।

কের বা থেকে ডাইনে নাড়িয়ে নির্বাক প্রশস্তি শুনিতে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো ঐরকম ভাবখানা করে বললেন, ‘কিন্তু আমার বে-দোস্তকে আমি এই জন্মদিনের সওগাৎটা দেব তিনি তো জ্ঞাটা; আপনাদের কাছে কি লেকট-হ্যাণ্ডারদের জন্তে কোনো-টা সেট আছে?’ হিটলার বললেন, ‘হঁ।’ তখন আর্সসন্তান আমাদের দোকানী তো বেবাক বে-বাক—অবাক। ‘লেকটহ্যাণ্ডারস টা সেট?’ সে আবার কি গববযন্তণা রে বাপু। বাপের জন্মে নাম এত্নেক শোনে নি। অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকে, বিস্তর আদেশা করে আপসাপসি করে সবিনয় জানালে, তার কাছে নেই।

হিটলার দিলদরাজ আদমী। এক গাল হেসে বললেন, ‘মাথ্‌ট্‌, নিক্‌স্‌, মাথ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। তাতে এসে যায় না। আমরা অল্প দিন দুসরা জিনিসের জন্ত আসবো’খন—খাসা দোকানটি কিন্তু। কি বলো হার ডক্—থুড়ি। ঠেক বীভার জেএন! গুটে নাথ্‌ট্‌। আসি তবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।’

এবারে যপ্প্‌ প্রভুকে নিয়ে ঢোকালেন এক ইহুদির দোকানে।

দোকানী ছিল না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে ছুটে এসে অদৃশ্য শ্রাম্পুতে (কথাটা আজকাল বডুই ‘কেশিনিবিল’ হয়েছে; আশো ব্যাভার করতে চাই) হাত কচলাতে কচলাতে একবারের জায়গায় তিন-তিনবার বলে বসলো, ‘মুটন ময়েন, মুটন ময়েন, মুটন ময়েন। গুটন্‌ মর্গেনের অর্ধশিক্ষিত উচ্চারণ), মাইনে হেরেন্‌।’

উত্তরে হিটলার বিড়বিড় করে কি একটা বললেন, ঠিক ঠাইর করা গেল না। দক্ষিণের কোনো কোনো ব্রাক্ষণ নাকি একদা রাস্তায় (‘সড়ক’ ‘সরকে’ বা ‘সরগিতে’—ওঃ! কী স্টর্ম ইন এ টা ‘সেট’!) বেরলে চিংকার করতেন, অল্পশ্রু যেন সরে যায়, তার ছায়া যেন গুঁর গায়ে না পড়ে—তবে এদের পক্ষাশ বা বাট লক্ষকে বামুন গ্যাস চেম্বারে^৪ খুন করে পুড়িয়েছে একথা কখনো শুনি নি। অতএব হিটলার যে ইহুদি ছোকরাকে হেল-ফেলো-উয়েল-মেট (hail-fellow-well-met) করেন নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইহুদি

৪ এর অল্পতম বড়কর্তা হ্যোস হ্যারনবের্গ মোকদ্দমায় সাক্ষী দেন, এবং পয়ে ঐর কীসি হয়। দু’জন হাড়ে-পাকা মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন চিকিৎসক এঁকে আগা-পাশতলা পুন লুন পরীক্ষা করেও ঐর ভিতর কোনো কিছু অ্যাব নরমাল পান নি। ইনি বলেন, ‘হাজার খানেক মাহুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমার ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এদের পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা—

ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, ‘আমার বলে দেওয়া উচিত, সরকারের হুকুম, কোনো “আর্থ” যদি ইহুদির দোকানে ঢোকেন তবে দোকানদার বেন তাঁকে সতর্ক করে দেয়, এটা ইহুদির দোকান, এখানে কেনাকাটা করলে আর্থই দায়ী। সাইনবোর্ডেও স্পষ্ট করে লেখা আছে, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন নি।’

হিটলার বিড়বিড় করলেন, ‘শোন্ গুট শোন্ গুট’—অনেকটা যেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, মেলা বকো না।

টী সেট চাওয়া হল। এল। গ্যোবলস্ স্ট্রাটার সেট চাইলেন।

ছোকরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সম্মিতি করে এক গাল হেসে বললে, ‘এখুনি নিয়ে আসছি, স্তার!’ বলে যে সেট ট্রে’র উপর সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছিল সেইটে ভুলে নিয়ে গুলোমঘরে অদৃশ্য হলো। দু-মিনিট পরেই আরেকটা আরো বাড়িয়া ট্রে’র উপর সাজিয়ে নিয়ে এল স্ট্রাটার সেট।

তালেবর ছোকরা করেছে কি, এবারে ঐ আগেকার সেটই উন্টো করে সাজিয়েছে, অর্থাৎ টী-কাপগুলোর আঙটাগুলো রয়েছে খন্দেরের বাঁ দিকে; তার মানে, খন্দের বাঁ-হাত বাড়ালে আঙুল ঠিক আঙটার যথাস্থানে পড়বে।

গ্যোবলস্ বাক্যব্যয়ে না করে যথামূল্যে সেট কিনে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, ‘দেখলেন ইহুদিটার চালাকিটা?’

হিটলার অতিশয় সরল দরদী কণ্ঠে বললেন, ‘চালাকিটা আবার কোথায়? ‘বেচারী আর্থের স্ট্রাটা সেট ছিল না স্টকে, তো সে আর করবে কি?’

*

*

এবারে সিরিয়স কথা:—ব্যাটারা বলে, তারা নাকি আর্থোত্তম। আরে মোলো, আর্থোত্তম যদি হবিই, তবে সর্ব-আর্থের—তা সে গ্রীকই হোক, লাতিনই হোক কিংবা তাদের বহু পূর্বের মিটানির হিটাইটই হোক—সর্বপ্রাচীন সংহিতা চতুর্বেদ আছে ভারতীয় আর্থের ঋতিতে ভিন্ন অস্ত্র কোন্ ‘আর্থ’ গোমাইয়ের পট্টাক প্রত্যঙ্গে?

দিনের পর দিন নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লিগুলো চালু রেখেও কাজ খতম হত না। গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো থেকে, চুল্লি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে তাতে লাল পুড়িয়ে ছাই করে জ্বলে ভাসানো পর্যন্ত সব কাজ করতো কোনো কোনো স্থলে ইহুদিরাই। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এই প্রলোভনেঃ পরে অবশ্য তাদেরও ঘাড়ে গুলি করে মারা হত, পিছন থেকে, অতর্কিতে।

কিন্তু, আমরা তো দিয়েছি অশ্রু—প্রথম ইহুদিরা যখন জীবনহৃতাবহাৎ নিমজ্জমান তরলীতে করে বোঝাই উপকূলে পৌঁছয়। গ্যাস-চেম্বারের কথা এই দু বা আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের মাথায়ই খেলল না! তবে, ইয়, এধানির কেউ কেউ বলেন, আমরা যে অশ্রুদেশে ইজরায়েল প্রেসিডেন্টের শুভা-গমনোপলক্ষে উদ্বাহ হয়ে ‘লুত’ করি নি সেটা গ্যাস-চেম্বারে পোরার চেয়েও সখৎ গুনাহ! তোবা! তোবা!!

ভাষা

হাট-বাজার, শাক-সবজি,^১ দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, তাই বেরাদর, দেশ-মুজুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়্যা-মহব্বৎ, জন্ত-জানোয়ার, সীমা-সরহদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এম্বলে লক্ষ্য করার প্রথম তব্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশী ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীক্ৰ গয়রহ্), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থমুচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ ‘কুকর্মের’ কি প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অম্ববাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই তবে ইংরিজী অম্ববাদটি দি পরে। অর্থাৎ বাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে, কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসন-কর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, ‘ধর্মাবতার, হুজুর!—দেশ—’ বলেই ধমকে দাঁড়ালো। ভাবলে ‘হুজুর কি “দেশ” শব্দটা জানেন! হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না’—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা

১ কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়, শাকার, শাক-মাছ অম্ব সমস্তার অম্ব। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

করার কলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে) তাই ‘দেশ’ বলে থমকে গিয়ে বললে ‘মুন্সু’—ওটা হজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, ‘দেশ-মুন্সু’ ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা (আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক ‘বাদশা’ বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের (গরীব আরবী) দুখ-দরদ (দরদ, দর্দ কার্সী) কে বুঝবে ? আমাদের মান-ইজ্জৎ (ইজ্জৎ আরবী) ধন-দৌলত (দৌলত যাবনিক) সব গেল। মেয়ে-ছেলের লজ্জা-শরম (শর্ম যাবনিক)ও আর বাঁচে না। রাত্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী (খুশী কার্সী) নেই। হজুর অলুমতি দেন—তাই-বেরাদর (বেরাদর কার্সী) নিয়ে মগের মুন্সুকে চলে যাই।’

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হজুর সত্যাকার হজুর ছিলেন। হজুর দিবে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিনীকে আনন্দে ভগমগ হয়ে বললে, ‘বুঝলে গিন্নী, হজুর যা আমায় খাতির—’ (বলেই থমকে দাঁড়ালো; হজুরের দরবারে ‘খাতির’ কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই হুম্ব করে সেটা ব্যবহার করে ছুচিস্তায় পড়লো, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি—তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে) ‘যত্ন—হজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো। আবার দোকান (ফের মুশকিল—দোকান কার্সী শব্দ, তাই বললে ‘হাট’ [হট্ট] হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ !’

এ যুগে আবার ফিরে আসবো। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, ‘স্তার। আমি উকিল—’ (বলেই থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যত্নপি আসলে আরবী শব্দ, এদানির ইটি খাঁটি বাঙলা, স্তার কি বুঝবেন?—তাই হস্তদস্ত হয়ে বললুম) ব্যারিস্টার (উকিল-ব্যারিস্টার) লাগিয়েছিলুম। ষটি-ঐ ষ্ যা! স্তার বুঝবেন কি?) গেলাস (glass—এবার স্তার বুঝবেন!)—ষটি-গেলাস বন্ধক দিয়েছি—তেনাদের জন্ত এরেক (ফের ইংরাজি ‘ব্রাণ্ডি’) ব্রাণ্ডি, বিড়ি-সিগারেট (বিতীয়টা ইয়োরোপীয়) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই! ’

এই সব বলে-করে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম। প্রথমেই ঠাকুরমাকে পেলাম। বললুম, ‘ঠাকুমা, পরে সব শুছিয়ে বলবো, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোট ভাইটি নিয়েছেন ক্যাট (আবার সেই হাকামা—ঠাকুমা ততো ‘ক্যাট’ বুঝবে না, অতএব বললুম), ক্যাট-বাড়ি। আমাদের কাউকে না

ডনিরে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী স্বন্দর। একেবারে ডল (doll—সর্বনাশ, ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে ‘পুতুল’ বলি) -পুতুলের মত। কিন্তু হলে কি হয়। গুরু আছেন, ধন্মা আছেন। ব্যাস। এল ভেড়ে টাইফয়েড-জ্বর (টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব ‘জ্বর’টা বলতে হল); তুমি ভাবছো আমরা কিছুই করি নি। ডাক্তার (আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হল) বত্তি (ডাক্তার-বত্তি) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।’

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবি ব্যাপার নয়। ইংলেণ্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশী ছজুরের কাছে গিয়ে করিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলতো, ‘He is very meek and humble (meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ), Sir, but it is odd and strange (odd ইংরিজী, strange নরমান), that although we thought it meet & proper (meet ইংরিজী, proper নরমান) that we should search every nook and corner (nook ইংরিজী, corner নরমান), our sorrow and grief (sorrow ইংরিজী, grief নরমান) know no bound that we did not find him’

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দিলী ও বিদেশী শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange; আমরা বাঙালীরা ‘and’ ‘এবং’ বসাই নি; আমরা বলেছি, হাসি-খুশী, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মূলুক।

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এ রকম।

জল-পানি, বাজার-উটকে, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মস্তব-মাদ্রাসা, ইষ্টুল-কলেজ অশ্রু ধরনের সমাস ॥

কবিশুভ্র ও নন্দলাল

রসার্চাৰ্ঘ্য নন্দলাল বহুর জীবন এমনই বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিয়েছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, প্রমসাদ্য ও সময়সাপেক্ষ।- তত্বপূর্ণি যিনি সে পরিচয় দিতে যাবেন তাঁকে সর্বরসসংষ্টিতে অপৰ্বাণ্ড কোঁতুল ও সে রস আবাদন করার মত অপ্রচুৰ

স্পর্শকাতরতা থাকার একান্ত, অত্যন্ত প্রয়োজন। মানবসমাজে নন্দলাল ছিলেন স্বল্পভাবী তথা আত্মগোপনপ্রয়াসী—তঁার নীরবতার বর্ম ভেদ করে তাঁকে সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করার মত ক্রমতা, সে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শৈলী ও ভাষার উপর অধিকার এ-যুগে অত্যন্ত আলাকারিকেরই আছে। আমাদের নেই; আমরা সে দুঃসাহস করি নে।

আমরা তাঁকে চিনেছি, গুরু রূপে, রসস্থষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যত রত স্রষ্টা রূপে এবং কবিগুরুর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মী রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, কিত্তিমোহন, অ্যানড্রুজ, কলিন্স, স্ট্রামের রাজগুরু, উইনটারনিংস, লেভি, গোস্বামী নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ইত্যাদিকে। এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না, এমন কি যে দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে অসাধারণ সৃজনশক্তি ধরতেন তিনি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সৃজনশক্তির দ্বার রুদ্ধ করে সর্বক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে। একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অগ্রমস্ত চিত্তে আপন সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

রবি নন্দ সম্মেলন যেন মণিকাক্ষন সংযোগ। এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে রস কি, চিত্রে, প্রাচীরগাত্রে তথা দৃশ্যমান কলার অগ্রাঙ্গ মাধ্যমে তাকে কি প্রকারে মূরয় করা যায় এ-সম্বন্ধে নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তাই নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আগমন করার পূর্বেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন ও পশ্চিমের বহু সদাজাগ্রত রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর নিত্যলাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চিরমুগ্ধবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হতে লাগলো ও রবীন্দ্রাহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তিনি এমন সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি হলেন যেগুলো সচরাচর সাধারণ আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করে না। একটি মাত্র উদাহরণ নিবেদন করি : স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বারা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় তথা অগ্রাঙ্গ জ্ঞানচক্রে শতাধিকবার আলোচনা করেছেন, তর্কবিতর্ক উত্থাপন করেছেন। ১২১ থেকে পূর্ণ কুড়িটি বৎসর এসব সম্মেলনে নন্দলাল উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো (১৯২১-২৬) এ সবতে অংশগ্রহণ করতে দেখি নি।

অথচ ১৯৩৬-৩৭-এ বরোদার মহারাজা যখন তাঁকে সেখানকার কীর্তিমন্দিরে দেয়ালছবি (ম্যুরাল) আঁকতে অহুরোধ করলেন তখন তিনি চার দেয়ালে এঁকে

দিলেন ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ : ১। ‘গঙ্গাবতরণ’ (গঙ্গা বিনা যে ভারতে আর্ষসভ্যতার পত্তন ও বিকাশ হত না সে কথা বলাই বাহ্যল্য), ২। ‘কুরুক্ষেত্র’, ৩। ‘নটির পূজা’, ৪। ‘মীরাবাই’ (‘সন্তন সজ বৈষ্ঠ বৈষ্ঠ লোক লাজ খোঁজ’—চিত্রে)। আর্ষ, হিন্দু, বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ভক্তি এই চার দৃষ্টিবিন্দু থেকে নন্দলাল দেখেছেন ভারতের সমগ্র ইতিহাস।

কিন্তু এহ বাহ। আসলে যতপি চিত্রের মাধ্যমে রসসৃষ্টি সম্বন্ধে নন্দলাল পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা গুরু অবনৌজনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে রস কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কি ভাবে প্রকাশ পায় সেটি তিনি দেখতে পেলেন দিনের পর দিন, বহু বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনে। রসের প্রকাশে কোন কলার অধিকার কতখানি নন্দলাল সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আলঙ্কারিকের (নন্দনতত্ত্বজ্ঞের) হ্যায় রস নিয়ে আলোচনা করার সময় নিজেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা নাট্যরঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। স্বনামধন্য স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন রস নিয়ে যে আলোচনা (হোয়াট ইজ আর্ট ?) করেন তাতে টলস্টয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রও বাদ পড়তো না এবং তিনি বেটৌকনের ‘ক্রয়েংসার সনাতা’-র বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন সেটিও উভয়ের মধ্যে আলোচিত হত। এসব আলোচনা সাধারণত হত বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায়—এবং নন্দলাল সে-স্থলে নিত্য-নীরব শ্রোতা। সে-সময় নন্দলালের চিন্তাকুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নৃত্য যতখানি গতিশীল (ডাইনামিক) চিত্র ততখানি হতে পারে না। পক্ষান্তরে নটনটী রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাঙ্গমতী থেকে যায় শুধু বৃত্তিতে—বাস্তবে সে অবলুপ্ত। কিন্তু চিত্র চোখের সামনে থাকে যুগ যুগ ধরে—এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে আনন্দ পাই তাই নয়, প্রতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার করি, নিত্য নিত্য নবীন রসের সন্ধান পাই। তাই কোনো নৃত্য-দৃশ্য যদি চিত্রে পার্থক্যরূপে পরিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-চিত্রের চিত্রতরে অবলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় অজর অমর। কিন্তু ‘চিত্রে পার্থক্যরূপে পরিচ্ছিন্ন’ করার অর্থ, সে যেন কটোগ্রাফ না হয়—তা হলে মনে হবে, নর্তক-নর্তকী নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ যেন মুহূর্তেক ভয়ে পাশা-

পুস্তলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। ঝারাই নন্দলালের ‘নটীর পূজা’ চিত্রটি প্রাচীরগাত্রে দেখেছেন, তাঁরাই আমার সামান্য বস্তুব্যাটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। সে চিত্র তো স্টাটিক নয়, ‘স্তুস্তিত’ নয়—বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি নটী আরেকখানি অলঙ্কার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে, আপনারই দিকে অবহেলে উৎক্ষেপ করবে, এই বুঝি মৃদঙ্গে ভিন্ন তাল ভিন্ন লয়ের ইঙ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটী তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে, লাস্ত্র-নৃত্য তাড়বে পরিণত হবে, মন্দমহুর ‘নমো হে নমো’ অকস্মাৎ অতিশয় দ্রুত ‘পদযুগ ধিরে’ ‘চন্দ্রভানু’র মদমত্ত নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে।

বস্তুত আপন মনে তখন প্রবল জাগবে, নন্দলাল মঞ্চে বিভাসিত যে-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সে-নৃত্য কি সত্যই এতখানি প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত—শাস্ত্র থেকে মন্থর, মন্থর থেকে উন্নত—প্রাবল বেগে ধাবিত ছিল, না তিনি অন্ধন করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পলোকের মৃদয় নৃত্যের আদর্শ প্রকাশ।

*

*

স্বন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবি-গুরুর কাছ থেকে। এবং তার সর্বোচ্চ বিকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত মহীক্লহ।

এবং একমাত্র নন্দলালই তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সকলেই জানেন, পরিপূর্ণ বুদ্ধ বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রের মাধ্যমে আপন স্বজনী-শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি। ॥

খেলেন দই রমাকান্ত

ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের সুপুত্র শ্রীযুত লেভির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে থানা খেতে যাচ্ছি। তাঁর আছে গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাঁরই একটা ছাড়লেন :

“জারের আমলে রববার দিন গির্জের গেছে গ্রামের সবাই। রুশ জাতটা একদা ছিল বড়ই ধর্মামুরাগী। কুলোকে বলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূতপ্রেত-তাবিজ-কবচে-বিশ্বাসী উজবুকের ভায়রাভাই। এবং সাতিশয় পাষাণেরা বলে, সেই প্রাচীন কুসংস্কারই আজ তাদের টেনে নিয়ে যায় লেনিনের দর্গায় শির্শা চড়াতো।

তা সে যাক্ গে—মোদ্দা কথা : তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের গায়ের পাজি সায়েব যা বলেন তাই আপ্তবাক্য। যত্বপি এসব পাজিদের অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না—”

আমি শুধালুম, “নিরক্ষর জন গির্জায় ধর্মোপদেশ দেয় কি প্রকারে ?”

বললেন, “আশ্চর্য ! রাসপুতিন যে কী মাথার ঘাম পায়ে কেলে কুলে আড়াই আউন্স বাইবেল গলাধঃকরণ করতে পেরেছিলেন সে না হয় পড়ো নি, তাই জানো না। নিচ্ছেভো—অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেহী। সেই আড়াই আউন্স বাইবেল ডাইলুট করে তিনি মহারানী জারিনা মায় জার প্রাসাদ জয় করলেন। তাঁকেও নাম সই করতে হলে যেমে নেয়ে কাঁই হতে হত।

আর এরই উল্টো দিক—অর্থাৎ ভালোর দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খৃঃজতে হলে অন্তত তোমাকে তো আর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অবধি মাকু মারতে হবে না। তোমার নবী পয়গম্বর তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ! তা সে যাক্ গে !

সে রববারে পাজি সায়েবের সারমন বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইহুদিরা কী অত্যাচারে প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর খুন করলো। এ বিষয়ে বক্তৃতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পাজিই দেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শিক্ষিত পাজি জানেন, প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বক্তৃতা দেবার সময় সত্যত সত্যক থাকেন, অস্ত্র খুঁটানগণ যেন উত্তেজিত হয়ে ইহুদি নির্ধাতন আরম্ভ না করে। কিন্তু ঐ যে রুশ পাজির কথা বলছিলুম, তিনি সেদিন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন, কি প্রকারে মৃত জনতাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্ত অত্যধিক বাগ্মিতাশক্তির কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ রুশ দেশে আবহমান কাল থেকে ইহুদিবিরতা বংশানুক্রমে চলে আসছে। কাজেই সারমন শেষেই বিক্ষুব্ধ চাবীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করলো মাঠের অগ্ন প্রান্তের খাস ইহুদি গ্রামটার দিকে। দূর থেকে তাদের চিৎকার হুঙ্কার শুনে ইহুদিরা ব্যাপার কি জানবার জন্ত গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিৎকারে তখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—‘খুন করবো, ব্যাটারদের খুন করে রক্ত দিয়ে রক্তের দান নেব !’

সবাই একে অগ্নকে চেনে। তাই ইহুদি গাঁওবুড়ারা করজোড়ে শুধালে, ‘আমরা কি অপরাধ করেছি যে আমাদের খুন করবে, এতকাল ধরে পাশাপাশি গ্রামে বাস করছি—’

উত্তেজিত জনতা বললে, ‘চালাকি রাখো। তোমরা আমাদের প্রভুকে খুন করেছ, তার দান আমরা নেবই নেব।’

যেন পর দিনের ঘটনা! লেভি গল্প বলা কান্ড দিলেন। কারণ হঠাৎ পিটির পিটির করে বুষ্টি নামলো। এই পোড়ার দেশে মনহন নেই বলে বারো মাসের যে কোনো দিন আচম্কা বুষ্টি নামে। আমি বললাম, “চলুন, হ্যার ডক্টর, ট্রাম শেড্-এ আশ্রয় নি।”

বললেন, “ছোঃ! কিস্থ জানো না। ইহুদিরা ছাতা কেনে না কেন, তার খবর রাখো? খুঁটানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা এমনই দুর্দান্ত চালাক যে, বুষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিব্যি চলাফেরা করতে পারে। তারপর কি বলছিলুম?—সেই রুশ ইহুদিদের কথা। তারা ছিল সত্যাই চালাক। চট করে ভেবে নিশ্চয় দেখলে, ঐ সব জড়ভরত কেরেস্তান রুশদের বোঝানো হবে অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটেছে দু’ হাজার বছর পূর্বে, রুশ দেশে নয়—বহু দূর-দূরান্তরের প্যালেস্টাইনে—যারা মেরেছিল, তারা সেই দেশ ছেড়ে কবে কোন্ আত্মিযুগে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিয়ে করেছে জাভেবেজাভে—এখন যাদের ঠাণ্ডাতে যাচ্ছে—”

আমি বললুম, “বুঝছি। খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবন্দন।”

লেভি বললেন, “লাখ কথার এক কথা।”

অতএব ইহুদি ডাক্তারিয়ারা হস্তদস্ত হয়ে বললে, ‘ইহুদিরা প্রভু যীশুকে না হত খুন করেছিল। এ তো অতিশয় সত্য কথা—বিশ্ব-সংসার জানে। কিন্তু তাই, তোমরা করেছ ভুল। আমরা, এ গাঁয়ের লোক, ঠুকে মারি নি—তা কখনো পারি! মেরে ছ—’ বলে আঙুল দিয়ে দেখালে পাশের গাঁ। বলল, ‘মেরেছে ঐ ও—ই গাঁয়ের ইহুদি রাস্কেলরা!’ বুঝলে তো ভায়া?” বলে লেভি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, “যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু গল্পটা তো সে রকম ঝাঁঝালো না—আপনার সেদিনকার রাকি, জানলার শাসি আর আয়নাতে তফাৎ নিয়ে গল্পটার মত?”

লেভি বললেন, “ক্যারেকটারিস্টিক গল্পের কান্‌কশন হচ্ছে কোনো বিশেষ জাত বা শ্রেণী বা যা-ই হোক না কেন, তার ক্যারেকটার, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। ভেড়ার বাচ্চা আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে তর্কাতর্কি নিয়ে যে গল্প ঈসপ লিখেছেন, সেটাতে ঝাঁঝ কোথায়? কিন্তু গল্পটা সাতিশয় ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ ভেড়া আর নেকড়ের ক্যারেকটার ওতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—নইলে গল্পটা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো কি করে, আর এত যুগ ধরে বেঁচে আছেই বা কি করে? আমি রুশ ইহুদিদের সম্বন্ধে যে গল্পটা বললুম—গল্প না হয়ে সত্য ঘটনাও হতে পারে—সেটা কিন্তু সর্ব-ইহুদিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিপদকালে তারা

এক হতে তো জানেই না, বরঞ্চ নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার জাতভাই 'অজ্ঞ' ইহুদিকে বিসর্জন দিতেও তার বাধে না।”

আমি বললুম, “উহু।”

“মানে?”

আমি বললুম, “আমার দেশ বাঙলার উত্তর প্রান্তে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, স্বার্থ থাক আর নাই থাক, তাঁরা একে অগ্নের সাহায্য-কম্বিনকালেও করেন না। একটা নদী পেরুবার সময় নাকি পর পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ একটা পাথরে ঠোকর খান, কিন্তু কেউই পরের জনকে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষটার একজন যখন ‘বাপ রে’ বলে অগ্নদের সাবধান করে দিলে, তখন তাঁরা সবাই সম্মুখে চিংকার করে বললেন, ‘ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়।’ তখন ধরা পড়লো, সত্যি, সে অগ্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বর্ণচোরা। আঁবের মত এঁদের সঙ্গে মিশে এঁদেরই একজন হতে চেয়েছিল। গল্পটা আপনারাই সংজ্ঞা অহুযায়ী খুবই ক্যারেকটারিস্টিক বটে, কিন্তু আমার মনে এ বাবদে একটা ঘোঁকা রয়ে গেছে।”

লেভি বললেন, “তুমি দেখি হেরোডকেও হেরোডস শেখাতে চললে—অর্থাৎ যাকে বলে গুরুমারা বিঘ্নেতে ওস্তাদ হয়ে উঠছে। বুঝিয়ে বলো।”

আমি বললাম, “যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গল্পটি আপনাকে বললাম, তাঁরা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং বুদ্ধিমান জীব মাজেই ঐক্যে বিশ্বাস করে। তাই আমি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, এঁরা একে অগ্নকে খুবই সাহায্য করে থাকেন—যে রকম ক্রীমেসনরা একে অগ্নের প্রতি বড়ই সদয়—কিন্তু সে সাহায্যটি করেন অতিশয় সঙ্গোপনে। এবং অগ্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যাতে করে এ-তথ্যটি আবিষ্কার না করতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই বাজারে একাধিক কামুফ্লাজ গল্প ছেড়েছেন এই মর্মে যে, তাঁদের ভিত্তর মারাত্মক ঐক্যাতাব। তাই আমার মনে হয়, আপনি যে গল্প দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, ইহুদিরা সজ্জবদ্ধ হয় না, সেটা স্বয়ং ইহুদিরাই তৈরি করেছেন, খুটানদের সন্দেহ না জাগানোর জন্য।”

ইহুদি আর স্বচক্ষে মেনে একটা মহৎ গুণ—তাঁদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে সেটা তারা উপভোগ করতে পারে। লেভি আমার সত্য-সিদ্ধান্ত শুনে হেসে বললেন, “এটা আজ খানা-টেবিলে আমি পেশ করবো। দেখি, ঠাকুন্দা-বাবা কি বলেন। কিন্তু জানো, এর থেকে একটা গুরুতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যায়। তুমিই সেদিন প্রশ্ন করেছিলে, ইহুদিরা যে প্যাালেস্টাইনে ‘হোম’ বানাতে

চায়, সেটা ভালো না মন্দ? আমি বলেছিলুম, সময় এলে আলোচনা করা যাবে। তাই এখানে প্রথম শুধানো যায়, পৃথিবীর সব ইচ্ছা এই হোম চায় কি না? এই দাবির পিছনে কি তারা ঐক্যবদ্ধ? তোমার প্যারা কবি হাইনে একদা এই আন্দোলনের সঙ্গে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঐ আন্দোলনের আলোচনা-চক্রের সঙ্গে—সংযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি সে-চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। তার থেকে অবশ্য এ'টা বলা চলে না, প্যালেস্টাইনে ইচ্ছা হোম নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর কোনো ঐশ্বর্য ছিল না। আসলে ব্যাপারটা অল্প ধরনের; সংখ্যালঘুদের ভিতর এক রকম লোক থাকে, যারা আপন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না—তারা ভাবে, বাড়িতে বাপ-তাই তো সে-গণ্ডি বানিয়ে রেখেছেনই, বাইরে গিয়েও তাঁদেরই জাতভাইদের সঙ্গে মিশে কি লাভ? আমার মনে হয়, হাইনের বেলা হয়েছিল তাই।” তারপর হঠাৎ রাস্তার উপরই ধমকে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমার দেশে তুমিও তো লঘু সম্প্রদায়ের লোক। তুমি দেশে কাদের সঙ্গে মেলামেশা করো?” উত্তর দেবার পূর্বেই তিনি বললেন, “এ-বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলতে পারে, অতএব এটা এখন মূলত্ববী থাক, কারণ, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।”

বাউমশুল আলের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা ছিমছাম তেতলা বাড়ি।

ল্যাচ কী দিয়ে দরজা খুলে বললেন, “স্বাগত জানাই তোমাকে। মজল হোক, জয় হোক তোমার। তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়।”

চতুঃপদ

রবি-পুরাণ

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রচুর বক্তৃতা প্রচুরতর প্রবন্ধ এবং অন্ন-বিস্তর বেতার কার্যকলাপের ব্যবস্থা এদেশের গুণী-জ্ঞানীরা করে থাকেন। সেই অবসরে কেউ কেউ আমাকেও স্মরণ করেন। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এঁরা আমার কল্যাণ কামনা করেন; সরল জনের পক্ষে অহুমান করা অসম্ভব নয় যে এই করে হয়তো দেশে আমার নামটা কিঞ্চিৎ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আসলে ঈঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমার প্রাণের বৈরী। এঁরা আমাকে সর্বজন-সমক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতে চান, ‘দেখো, এ লোকটা কত বড় গণ্ডমূৰ্খ; কবি-গুরু সংস্পর্শে এসেও এর কিছু হল না। সাধে কি আর তুলসীদাস রামচরিত-মানসে বলেছেন,

“মূৰ্খ হৃদয় ন চেৎ, যদিপি মিলয়ে

গুরু বিরুদ্ধি শত”

“শত ব্রহ্মা গুরুপদ নিলেও মূৰ্খের

হৃদয়ে চেতনা হয় না”

আমি মূৰ্খ হতে পারি কিন্তু অতখানি মূৰ্খ নই যে তাঁদের দুইবুদ্ধিজাত নষ্টামির চিন্তা ধরতে পারবো না।

তাই ঐ সময়টায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। নিতান্ত কারো সঙ্গে দেখা হলে বলি, এন্জাইনা ধুম্বোসিস হয়েছে। এন্জাইনা পিক্টরিস কিংবা করোনারি ধুম্বোসিস-এর যে কোনো একটার নাম শুনেলেই স্বস্থ মাতৃষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে ঘাবার উপক্রম করে—আমার ঐ দ্বন্দ্ব সমাস শুনে আমাকে তখন আর কেউ বড় একটা ধ্যাটায় না।

অথচ রবীন্দ্রনাথ সঙ্ক্ষে দু’একটি কথা বলবার সাধ যে আমার হয় না, তাও নয়। অবশ্য তাঁর কাব্য, নাট্য কিংবা জীবনদর্শন সঙ্ক্ষে নয়। অতখানি কাণ্ড-জ্ঞান বা কমনসেন্স আমার আছে। আমার বলতে ইচ্ছে করে সেই জিনিস, ইংরিজিতে থাকে বলে লাইটার সাইড। এই যেমন মনে করুন, তিনি গল্পগুজোব করতে ভালোবাসতেন কি না, প্রিয়জনের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতেন কি না, ডাইনিঙ-রমে বসে চেয়ার টেবিলে ছুরিকাটা দিয়ে ছিমছাম ভাবে সান্ন্যেবী কায়দায় খেতেন, না রান্নাঘরের বারান্দার হাপুস-হপুস শব্দে মাত্রাজী স্টাইলে পাড়া সচকিত করে পর্বটি সমাধান করে সর্বশেষে কাবুলী কায়দায় ধোঁং ধোঁং করে টেবুল তুলতে তুলতে বাঙালী কায়দায় চটি কটকটিয়ে খড়কের সন্ধানে বেরতেন ?

কেউ তাঁকে প্রেমপত্র লিখলে তিনি কি করতেন? কিম্বা ডিহি শ্রীরামপুর ছই নদর বাই লেন তাদের কল্ল-বিতরণী সভায় তাঁকে প্রধান অতিথি করার জন্য ঝুলোবুলি লাগালে তিনি সেটা এড়াবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করতেন? কিম্বা কেউ টাকা ধার চাইলে?

ভালোই হল টাকা ধারের কথা মনে পড়ল।

‘দেহলী’র উপরে থাকতেন তিনি, নিচের তলায় তাঁর নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওরফে দিহুবাবু।

তাঁরই বারান্দায় বসে আশ-কথা-পাশ-কথা নানা কথা হচ্ছে। হতে হতে টাকা ধার নেওয়ার কথা উঠলো। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘বুঝলি, দিহু, আমার কাছ থেকে একবার একজন লোক দশ টাকা ধার নিয়ে গলগল কর্তে বললে, “আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম।” সভায় খার্সা ছিলেন তাঁরা পম্পেটটা ঠিক কি বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। আক্টার অল, গুরুদেবের পক্ষেও কালে-কন্মিনে কাঁচা রসিকতা করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

ধানিকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস কেলে গুরুদেব বললেন, ‘লোকটার শতদোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী। কথা ঠিক রেখেছিল। চিরঋণী হয়েই রইল।’

শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদি মুরব্বীরা অট্টহাস্ত করেছিলেন। আমরা, অর্থাৎ চ্যাংড়ারা, থামের আড়ালে ফিক্‌ফিক্‌ করেছিলাম।

এ গল্পটি আমি একাধিক লোকের মারফৎ পরেও শুনেছি। হয়তো তিনি গল্পটি একাধিক সভা-মজলিসে বলেছেন। এবং গল্পটি আর্দ্রো তাঁর নিজের বানানো না অন্তের কাছ থেকে ধার নেওয়া সে-কথাও হলফ করে বলতে পারবো না। কারণ কাব্যানুশাসনের টীকা লিখতে গিয়ে আলঙ্কারিক হেমচন্দ্র বলেছেন, ‘নাস্ত্য চোরঃ কবিজনঃ নাস্ত্য চোরো বণিক্‌জনঃ’—অর্থাৎ ‘বড় বিত্তা’টি বিলক্ষণ রপ্ত আছে শ্রাকরার এবং কবি মাত্রেই।

তা হক্‌। মহাকবি হাইনরিখ্‌ হাইনে তাতে কণামাত্র আপত্তি না তুলে বলেছেন, ‘যারা কবির রচনাতে “নির্ভেজাল” অরিজিনালিটি খোঁজে তারা চিবাক মাকড়ের জাল, কারণ একমাত্র মাকড়ই তার জালটি তৈরি করে আপন পেটের মাল দিয়ে, বোল আনা অরিজিনাল; আমি কিন্তু খেতে ভালোবাসি মধু, যদিও বেশ ভালো ভাবেই জানি মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটা ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।’

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পের ভিতর আমার সব চেয়ে ভালো লাগে

‘গুরুদেব-ভাণ্ডারে’ কাহিনী। অবশ্য আমার মনে হয়, গল্পটির নাম ‘ভাণ্ডারে-গুরুদেব’ কাহিনী দিলে ভালো হয়, কারণ কাহিনীটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ভাণ্ডারের একটি সংকর্মের উপর। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগজ্জন সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন কালো আদমির কেরানী বরণান্ত না করতে পেরে ইংরেজ আবিষ্কারটার নামকরণ করলে ‘আইন-স্টাইন-বোস থিয়রি’। স্বয়ং আইনস্টাইন তখন নাকি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, ওটার নাম হয় হবে শুধুমাত্র ‘বোস থিয়রি’ নয় ‘বোস-আইনস্টাইন থিয়রি’। এ-সব অবশ্য আমাদের শোনা কথা। ভুল হলে পুজোর বাজারের বিলাস বলে ধরে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইংরেজ পছন্দ করতো না বলে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে নষ্ট করার জন্য ইংরেজ একটি হুম্ম গুজোব বাজারে ছড়ায়—শান্তিনিকেতনের ইন্সুল আসলে রিকরমেটরি। অন্তত এই আমার বিশ্বাস।

খুব সম্ভব তারই কলে আশ্রমে মারাঠী ছেলে ভাণ্ডারের উদয়।

ইন্সুলের মধ্য বিভাগে বীথিকা-ঘরে ভাণ্ডারে সীট পেল। এ ঘরটি এখন আর নেই তবে ভিতটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তারই সম্মুখ দিয়ে গেছে শালবীথি। তারই এক প্রান্তে লাইব্রেরি, অন্য প্রান্তে দেহলী। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলীতে।

দেহলী থেকে বেরিয়ে, শালবীথি হয়ে গুরুদেব চলেছেন লাইব্রেরীর দিকে। পরনে লম্বা জোকা, মাথায় কালো টুপি। ভাণ্ডারে দেখামাত্রই ছুটলো তাঁর দিকে। আর সব ছেলেরা অবাক। ছোকরা আশ্রমে এসেছে দশ মিনিট হয় কি না হয়। এরই মধ্যে কাউকে কিছু ভালো-মন্দ না শুধিয়ে ছুটলো গুরুদেবের দিকে।

আড়াল থেকে সবাই দেখলে ভাণ্ডারে ‘গুরুদেবকে কি যেন একটা বললে। গুরুদেব মূহু হাস্ত করলেন। মনে হল যেন অল্প অল্প আপত্তি জানাচ্ছেন। ভাণ্ডারে চাপ দিচ্ছে। শেষটায় ভাণ্ডারে গুরুদেবের হাতে কি একটা গুঁজে দিলে। গুরুদেব আবার মূহু হাস্ত করে জোকার নিচে হাত চালিয়ে ভিতরের জেবে সেটি ঝেঁবে দিলেন। ভাণ্ডারে এক গাল হেসে ডরমিটরিতে ফিরে এল। প্রণাম না, নমস্কার পর্যন্ত না।

সবাই শুধালে, ‘গুরুদেবকে কি দিলি?’

ভাণ্ডারে ভার মারাঠী-হিন্দীতে বললে, ‘গুরুদেব কোন্? ওহ্ তো দরবেশ হৈ।’

‘বলিস কি রে, ও তো গুরুদেব হায়।’

‘ক্যা “গুরুদেব” “গুরুদেব” করতা হৈ। হম্ উসকো এক অঠন্নী দিয়া।’

বলে কি ? মাথা ধারাপ না বন্ধ পাগল ? গুরুদেবকে আধুলি দিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, দেশ ছাড়ার সময় ভাণ্ডারের ঠাকুরমা তাকে নাকি উপদেশ দিয়েছেন, সম্মাসী দরবেশকে দানদক্ষিণা করতে। ভাণ্ডারে তাঁরই কথামত দরবেশকে একটি আধুলি দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, দরবেশ বাবাজী প্রথমটায় একটু আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু ভাণ্ডারে চালাক ছোকরা, সহজে দমে না, চালাকি নয়, বাবা, একটি পুরী অঠন্নী।

চল্লিশ বছরের আগের কথা। অঠন্নী সামান্য পয়সা, এ-কথা কেউ বলে নি। কিন্তু ভাণ্ডারেকে এটা কিছুতেই বোঝানো গেল না যে তার দানের পাত্র দরবেশ নয়, স্বয়ং গুরুদেব।

ভাণ্ডারের ভুল ভাঙতে কতদিন লেগেছিল আশ্রম পুরাণ এ-বিষয়ে নীরব। কিন্তু সেটা এ-স্থলে অবাস্তব।

ইতিমধ্যে ভাণ্ডারে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। ছেলেরা অস্থির, মাস্টাররা জ্বালাতন, চতুর্দিকে পরিত্রাহি আর্তরব।

হেড মাস্টার জগদানন্দবাবু এককালে রবীন্দ্রনাথের জমিদারী-সেৱেস্তায় কাজ করেছিলেন। লেঠেল ঠ্যাঙানো ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। তিনি পর্যন্ত এই দুঁদে ছেলের সামনে হার মেনে গুরুদেবকে জানালেন।

আশ্রম-স্বৃতি বলেন, গুরুদেব ভাণ্ডারেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ রে, ভাণ্ডারে, এ কি কথা শুনি ?’

ভাণ্ডারে চুপ।

গুরুদেব নাকি কাতর নয়নে বললেন, ‘হ্যাঁ রে ভাণ্ডারে, শেষ পর্যন্ত তুই এসব আরম্ভ করলি ? তোর মত ভালো ছেলে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। আর তুই এখন আরম্ভ করলি এমন সব জিনিস যার জন্য সঙ্কলের সামনে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। মনে আছে, তুই যখন প্রথম এলি তখন কি রকম ভালো ছেলে ছিলি ? মনে নেই, তুই দান-খয়রাত পর্যন্ত করতিস ? আমাকে পর্যন্ত তুই একটি পুরো আধুলি দিয়েছিলি ? আজ পর্যন্ত কত ছাত্র এল গেল কেউ আমাকে একটি পয়সা পর্যন্ত দেয় নি। সেই আধুলিটি আমি কত বয়ে তুলে রেখেছি। দেখবি ?’

*

*

তার দু’এক বৎসরের পর আমি শান্তিনিকেতনে আসি। মারাঠী সদ্ধীভক্ত

স্বর্গীয় ভীমরাও শাস্ত্রী তখন সকালবেলায় বৈতালিক লীড করতেন। তার কিছুদিন পর ত্রিমুখ অনাদি দস্তিদার। তারপর ভাণ্ডারে।

চল্লিশ বছর হয়ে গিয়েছে। এখনো যেন দেখতে পাই ছোকরা ভাণ্ডারে ঐবৈতালিকে গাইছে,

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো

“থুলে দিল দ্বার।

আজি প্রাতে নূর্য ওঠা

সকল হল কার ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো সভ্য জাতির বিস্তারালী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কিংবা অন্য কোনো বোধ্য ভাষাতে যদি ধর্মচর্চা না থাকে তবে সে সম্প্রদায় ক্রিয়া-কর্ম ও পাল-পার্বণ নিয়েই মত্ত থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ, তারা স্বভাবতঃ এবং ঐতিহ্যবশতঃ ধর্মাহুরাগী। তার কোনো বোধ্য ভাষাতে সত্যধর্মের মূলস্বরূপ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ না থাকলে সে তখন সব কিছু হারাবার ভয়ে ধর্মের বহিরাচরণ অর্থাৎ তার খোলস ক্রিয়াকর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।^১

কলকাতা অর্বাচীন শহর। যে সব হিন্দু এ শহরের গোড়াপত্তনকালে ইংরেজের সাহায্য করে বিস্তারালী হন, তাঁদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোনো চর্চা ছিল না। বাঙলা গল্প তখনো জন্মলাভ করে নি। কাজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যে তাঁরা সত্যধর্মের সন্ধান পাবেন তারও কোনো উপায় ছিল না। ওদিকে আবার বাঙালী ধর্মপ্রাণ। তাই সে তখন কলকাতা শহরে পাল-পার্বণে যা সমারোহ করলো তা দেখে অধিকতর বিস্তারালী শাসক ইংরেজ-সম্প্রদায় পর্যন্ত স্তম্ভিত হল। এর শেষ-রেশ ‘হুতোমে’ পাওয়া যায়।

জাতির উত্থান-পতনেও এ অবস্থা বার বার ঘটে থাকে। এবং সমগ্রভাবে

১ বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ আছে, শাক্য মূনির আবির্ভাবের ঠিক পূর্বেই এই পরিস্থিতি হয়েছিল। বৈদিক ভাষা তখন প্রায় অবোধ্য হয়ে ঝাঁড়িয়েছিল বলেই ক্রিয়াকর্ম-যাগযজ্ঞ-পণ্ডিতত্যা তখন সত্য-ধর্মের স্থান অধিকার করে বসেছিল। বুদ্ধদেব তখন এরই বিরুদ্ধে সত্যধর্ম প্রচার করেন ও সবজন-বোধ্য লোকায়ত্ত প্রাকৃত (পরে পালি নামে পরিচিত) ভাষার শরণ নেন।

বিচার করতে গেলে তাতে করে জাতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। গরীব-দুঃখীর তথা সমগ্র সমাজের ক্ষতি এর একটা অর্থনৈতিক মূল্য তো আছে বটেই, তদুপরি এক যুগের অত্যধিক পালপার্বণের মোহকে পরবর্তী যুগের ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণা অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

কিন্তু বিপদ বটে, যখন ঐ ক্রিয়াকর্মের যুগে হঠাৎ এক বিদেশী ধর্ম এসে উপস্থিত হয়, তার চিন্তাধারা তার সত্যপথ সন্ধানের আলোচন-আলোড়ন নিয়ে। এবং এই ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে যদি অগ্রাগ্রহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (কৈং, মিল ইত্যাদি) প্রশ্নের যুক্তিতর্কমূলক আলোচনা-গবেষণা বিজড়িত থাকে তবে ক্রিয়াকর্মাসক্ত সমাজের পক্ষে তখন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। বাঙালী সমাজের অগ্রগীর্ণ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অনেকখানি ইংরেজী শিখে ফেলেছেন এবং খৃষ্টবর্ষের মূলতত্ত্ব, তার মহান আদর্শবাদ, সেই ধর্মে অল্পপ্রাণিত মহাজনগণের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা তাঁদের মনকে বার বার বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে—তাঁদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমাদের ধর্মে আছে কি, আছে তো শুধু দেখতে পাই অন্তঃসারশূন্য পূজা-পার্বণ, আর ওদের ধর্মে দেখি, স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়হারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে পেলে এই অর্থহীন জীবন আপন চরম মূল্য লাভ করে, দুঃখ-দৈন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এক পরম পরিসমাপ্তিতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

হিন্দুশাস্ত্রের অতি সামান্য অংশও যারা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই জানেন, এ সব কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। বস্তুতঃ জীবনসমস্যা ও ধর্মে তার সমাধান এই অবলম্বন করেই আমাদের সর্বশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন প্রলোভন, অন্য দিকে সত্যনিষ্ঠার প্রতি ধর্মের কঠোর কঠিন আদেশ—এ দুয়ের মাঝখানে মানুষ কি প্রকারে সার্থক গৃহী হতে পারে, সেই পন্থাই তো আমাদের শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এ সব তত্ত্ব যারা জানতেন তাঁরা থাকতেন গ্রামে, তাঁরা পড়তেন পড়তেন টোল'চতুষ্পাঠীতে এবং তাঁরা ইংরেজের সংস্পর্শে আসেন নি বলে ওদের ধর্ম যে নাগরিক হিন্দুকে নানা প্রপঞ্চে বিচলিত করে তুলেছে সে সংবাদও তাঁদের কানে এসে পৌঁছয় নি।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, এই সব 'টোলো' 'বিটলে বামুন'রা যে শুধু পাত্রী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আপন ধর্মের মর্যাদা মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতো তা নয়, তারা যে কান্ট-হেগেলের চেলাদের সঙ্গে বিস্তৃত দর্শনের ক্ষেত্রেও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল—এ তথ্যটিও নাগরিক হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

‘ঘরের কাছে নিই নে খবর, খুঁজতে গেলাম দিল্লি শহর’ লালন কাকিয়ের অর্থহীন দীত নয়।^১ এঁরা সত্যই জানতেন না, আমাদের টোলে শুধু মার্ত নন, নৈরায়িকও ছিলেন, এবং মার্তরাও যে শুধু তৈলবট নিয়ে বিধান দিতেন তাই নয়, তাঁরা সে বিধানের সামাজিক মূল্যও যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারতেন।

কলকাতায় চিন্তাশীল গুণীজন তখন এই পরিস্থিতি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হল। তাঁর ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে বাঙালী জাতির কি পরিমাণ উপকার করেছে, এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্তিমান পুরুষসিংহ রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যকে যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যশালী ও বহুমুখী করে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ এখনো শেষ হয় নি। বাঙালী সাধক, বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠক সকলেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—

এদানির ব্রাহ্মধর্ম যায় ছড়াছড়ি

তাহারেও বার বার নমস্কার করি ॥

‘ছড়াছড়ি’ শব্দে তখনকার দিনে প্রচলিত একটু ক্ষুদ্র তাজিল্য লুকানো রয়েছে। পরমহংসদেব সেটিকেও ‘নমস্কার’ করেছেন।

রাজা রামমোহন খৃষ্টধর্মে মহাপণ্ডিত ছিলেন, মুসলমান ধর্মের ‘জবরদস্ত মোলবী’ ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে যুগে প্রতিটা লাভ করতে হলে যে বস্তু সম্পূর্ণ অবাস্তব এমন কি অসুপ্রায়, সেই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

রাজা জানতেন, সে যুগের হিন্দুকে তর্ক-বিতর্ক করতে হবে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে। অর্থাৎ খৃষ্টান মিশনারীর সামনে ‘ক’ অক্ষরে ‘কৃষ্ণনাম’ শ্রবণে ‘একঘটি’^৩ চোখের জল ফেললেই আপন ধর্মের মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—থুব বেশী হলে, ভক্ত মিশনারী হয়ত তাকে ভক্ত বলে স্বীকার করবে মাত্র। তাই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার হিন্দুর ক্রিয়াকর্মের পিছনে রয়েছে, হিন্দুর বড়দর্শন, বুদ্ধ এবং মহাবীরের বিশ্বপ্রেম এবং সর্বপশ্চাতে রয়েছে অহরহ জাজ্জল্যমান বেদ-

২ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাওয়া গান এরই কাছাকাছি:

আপনাতে আপনি থেকে মন যেও নাকো কার ঘরে

যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃঃ।

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় কথার আড়।

বেদান্তের অর্থও দিব্যদৃষ্টি।

দেশের আপামর জনসাধারণের ভিতর হিন্দু ধর্মের নব উদ্বোধনা আনতে হলে রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের কোন্ কোন্ সম্পদ গ্রহণ এবং প্রচার করতেন সে কথা বলা শক্ত; কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে যুগের কলিকাতাবাসী সুসভ্য অথচ আপন শাস্ত্রে অজ্ঞ হিন্দুর সামনে তিনি সর্বশাস্ত্র মন্বন করে উপনিষদগুলিই তুলে ধরে প্রকৃত ঋষির গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। উপনিষদ থেকেই শঙ্কর-দর্শনের সূত্রপাত এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতিশয় অক্লেশে, পরম অবহেলায় খৃষ্টানের ট্রিনিটিকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করতে পারে। উপনিষদের গুণকীর্তন এ ক্ষুদ্র এবং অক্ষম রচনার উদ্দেশ্য নহে,— অমুসন্ধিৎসু পাঠক তুর্কা পণ্ডিত অলবীক্লণী, মোগল সূফী দারানীকুহ (ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)^৪ এবং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের রচনাতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাবেন।

ধর্মের যে সব বাহ্যিকস্থান সত্যধর্ম থেকে অতি দূরে চলে গিয়ে অধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাজা সংগ্রাম আরম্ভ করলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সে সংগ্রামের জন্ত তিনি অশ্লিশস্ত্র সঞ্চয় করলেন হিন্দু স্মৃতি থেকেই। এ-স্থলে রাজা বিশ্বজনীন যুক্তিতর্ক ব্যবহার না করে প্রধানত ব্যবহার করলেন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত গ্রন্থ এবং উদাহরণ। রাজা প্রমাণ করলেন যে তিনি দর্শনে যে রকম বিদগ্ধ, ক্রিয়াকর্মের ভূমিতেও অমুরূপ স্মার্ত মল্লবীর।

শাস্ত্রালোচনায় ঈশ্বর অবাস্তব হলেও এস্থলে বাঙলা সাহিত্যামুরাগীর দৃষ্টি তার অতি প্রিয় একটি বস্তুর দিকে আকর্ষণ করি। রাজাকে তাঁর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল কলকাতার বাঙালীদের ভিতর। এঁরা সংস্কৃত জানেন না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছিল বাঙলা ভাষাতে। পণ্ড এ সব যুক্তি-তর্কের সম্পূর্ণ অল্পপযুক্ত বাহন। তাই তাঁকে বাঙলা গদ্য নির্মাণ করে তার-ই মাধ্যমে আপন বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়েছিল। রাজার পূর্বে যে বাঙলা গদ্য লেখা হয় নি

৪ দারা তাঁর অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এই বলে : “হে প্রভু, তুমি তোমার হৃদয় মুখ কুফর (অবিদ্যা) কিছা ইমান (বিদ্যা) ছ’পাশের কোনো অলকগুচ্ছ জুলফ (দিয়ে ঢেকে রাখে নি। ” এই শ্লোক ঈশোপনিষদের ‘অঙ্কং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্ধামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্ধান্নাং রত্নাঃ ৥’-রই অমুরূপ।

এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই ভূমূল আন্দোলন আকর্ষণ মঞ্চের কলে যে অমৃত বেরুল তারই নাম বাঙলা গম্বু। পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা বহুবার ঘটেছে; তথাগতের কৃপায় পালি, মহাবীরের কৃপায় অধ-মাগধী। হজরৎ মুহম্মদের কৃপায় আরবী গম্বু, লুথারের কৃপায় জার্মান গম্বুের সৃষ্টি। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গণবোধ্য মাতৃভাষাতে শাস্ত্রালোচনা না থাকলে ক্রিয়াকর্মের আত্যন্তিক প্রসার পায়; তার বিরুদ্ধে নবধর্ম পত্তন কিম্বা সনাতন ধর্মের সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়;^৫ এবং সে আন্দোলনকে বাধ্য হয়েই গণভাষার আশ্রয় নিতে হয়।

রাজার প্রচলিত সংস্কার উপনিষদে আপনার দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করার কলে কতকগুলি জিনিস সে অস্বীকার করল। তার প্রথম, সাকার উপাসনা। দ্বিতীয় বৈষ্ণবধর্মের তদানীন্তন প্রচলিত রূপ; এবং ক্রমে ক্রমে গণ-ধর্মের (Folk religion) প্রতি ব্রাহ্মদের অবজ্ঞা স্পষ্টতর হতে লাগল।^৬ প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি, তখনকার দিনে কেন আজও যদি কেউ ব্রাহ্ম-মন্দিরের বহুতা দিনের পর দিন শোনে তবু সে উপনিষদের পরবর্তী যুগের ধর্মসাধনার অল্প ইঙ্গিতই শুনেতে পাবে। তার মনে হবে, উপনিষদ-আশ্রিত ধর্মদর্শনের শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত হিন্দুরা আর কোনো প্রকারের উন্নতি করতে পারেন নি। এমন কি গীতার উল্লেখও আমি অল্পই শুনেছি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কথা প্রায় কখনোই শুনি নি। বুদ্ধাবনের রসরাজ-রসমতীর অভূতপূর্ব অলৌকিক প্রেমের কাহিনী থেকে কোনো ব্রাহ্ম কখনো কোনো দৃষ্টান্ত আহরণ করেন নি।

ধর্ম জানেন, আমি ব্রাহ্মদের নিকট অক্লান্ত নই। পাছে তাঁরা ভুল বোঝেন

৫ বস্তুতঃ, সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ কখনোই আরম্ভ করেন নি। বুদ্ধদেব বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু বুদ্ধ জন্ম নিয়েছেন, মহাবীর জৈনদের সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বা জিন। খ্রীষ্ট বলেন, তিনি বিধির বিধান ভাঙতে আসেন নি—তিনি এসেছেন তাকে পূর্ণরূপ দান করতে। হজরৎ মুহম্মদ বলতেন, তাঁর পূর্বে বহু সহস্র পয়গম্বর আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ এঁদের কেউ বলেন নি, আমি প্রথম। প্রায় সকলেই বরঞ্চ বলেছেন, আমিই শেষ।

৬ একটা অবিদ্বান্ড গল্প শুনেছি, কোনো ব্রাহ্ম ভক্ত নাকি কদম্বতরুকে ‘অন্নীল বৃক্ষ’ নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এর থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায়, হিন্দুরা ব্রাহ্মদের ‘গৌড়ামি’ সম্বন্ধে তখনকার দিনে কি ধারণা পোষণ করতেন।

তাই বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত কথা তুললুম এবং করজোড়ে নিবেদন করছি, আমি মুসলমান, আমার কাছে হিন্দু যা ব্রাহ্মণ তা, আমি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় পন্থার (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পন্থা ভিন্ন নয়) সাধু-সন্তদের বার বার নমস্কার করি।

ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। এ যুগেও তার উদাহরণ পাই নি। ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত আমি বহু ব্রাহ্ম পরিবারের আতিথ্য লাভ করেছি, ফলে গভীর দৃষ্টিতে হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম পরিবারে হিন্দু চাকর-বাকরকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা দেখি নি। মুসলমান-খ্রীষ্টানরা সর্বদাই করে থাকেন বলেই এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়, ব্রহ্মমন্ত্র সর্বজনীন কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে কোনো কারণেই হোক সর্বজনকে আহ্বান জানাতে পারেন নি। মুসলমানের নমাজে মুটে-মজুর চাকর-বাকরের সংখ্যাই বেশী, হিন্দুর সংকীর্ণনে ভাবোন্মাদে নৃত্য করে ‘নিয়ন্ত্রণী’র প্রচুর হিন্দু, আর মন্দিরে আরতির সময় শিক্ষিত হিন্দুকে তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না। অথচ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সম্মেলনে ব্রাহ্ম চাকর-নকর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তার জন্ত আমি ব্রহ্মবাদীদের আদৌ ক্রটি ধরছি না। এঁরা অক্ষম ছিলেন, একথা আমি কখনো স্বীকার করবো না। আমার মনে হয়, এঁরা প্রধানতঃ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়েই আপন আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে যে আমাদের মত বহু হিন্দু-মুসলমান প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দু-ধর্মের গণরূপ তখন একেবারেই অভিব্যক্তহীন হয়ে পড়ল। তার জন্ত ব্রাহ্মদের দোষ দিলে অত্যন্ত অগ্রাঘ হবে; দোষ হিন্দুদের। তাঁদের নেতৃস্থানীয়েরা তখন হয় দীক্ষা নিয়েছেন, কিংবা ব্রাহ্মদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপন গরীব জাত-ভাই কি ধর্মকর্ম করছে এবং তার কল্যাণে সত্যধর্মের সন্ধান পাচ্ছে কি না এ বিষয়ে তাঁরা তখন উদাসীন। যেন গণধর্ম ধর্মই নয়, যেন ধর্মে একমাত্র শিক্ষিত জনেরই শাস্ত্রাধিকার।

অভিলষ মায়াবন্ধ পরিহ্রিত। দেশের দেশের তা হলে সর্বনাশ হয়। শিক্ষিত-

জনকেও শেষ পর্যন্ত তার তিক্ত কল আত্মদ করিতে হয়।^৭

ঠিক এই সময়ে করুণাময়ের কুপায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব।

পরমহংসদেবকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা আমাদের মতো অতি সাধারণ প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, আমরা সব কিছুই গ্রহণ করি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে—যুক্তিতর্কের ছাঁচে কেলে। অথচ কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সাধু-সন্তদের ধারণা করিতে গেলে আমরা পাই বরকের সেই অতি অল্প অংশটুকুর খবর, যেটি জলের উপর ভাসছে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ বস্তুটি যে যথেষ্ট তৃতীয় চক্ষু দিয়ে দেখিতে হয় সেটি আমাদের নেই। তৎসঙ্গেও যারা তার বিচার করে তাদের নিয়ে মূহু হাস্য করে বাউল গেয়েছেন

ফুলের বনে কে চুকেছে সোনার জহরী

নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি আ মরি।

যার যেমন মাপকাঠি। শ্রাকরার ক্রাইটেরিয়ন তার নিকষ পাথর। সে তাই দিয়ে পদ্মফুলের গুণ বিচার করিতে যায়। কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং পরমহংসদেব—একাধিক বার। জ্বনের পুতুল সমুদ্রে নেমে-ছিল তার গভীরতা মাপবে বলে। তিন পা যেতে না যেতেই সে গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল।^৮

তাই নিয়ে কিন্তু কিছুমাত্র শোক করার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন, তোমার এক ঘটি জলের দরকার। পুকুরে কত জল তা জেনে তোমার কি হবে?^৯

তাই মা ভৈঃ। যারা বলে আমাদের মত পাপীতাপীর অধিকার নেই পরমহংসের মত মহাপুরুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার—তারা ভুল বলে।

৭ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধানের জন্য আমরা যে কি কর্মকল ভোগ করেছি, সে তথ্যের উত্থাপন এ-স্থলে অবাস্তব।

৮ আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা, তাই যেন হয়। বাউল গেয়েছেন, ‘যে জন ডুবলো, সখী, তার কি আছে আর বাকি গো?’ ঠাকুরও প্রায়ই গাইতেন ‘ভোব ভোব, ভোব।’

৯ এক চীনা সাধক এরই কাছাকাছি এসে বলেছেন, ‘মাই কাপ্ ইজ ফল; বাট আই ড্রিক অকনার।’

অধিকার আমাদেরই—এক মহাপুরুষ অথবা মহাপুরুষের জীবনী লিখতে যাবেন কেন? সে অধিকার গ্রহণ করতে গিয়ে তুল-ত্রুটি হলে মহাত্মাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হীন প্রাণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

পরমহংসদেবের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে, লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোকা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমন পরিষ্কার। মেদিনীপুর অঞ্চলে যাকে বলে ‘নিধিরকিচ’—চাঁচা-ছোলা। যেন এইমাত্র তৈরী হয়েছে কাঁসার ঘটটি—কোন জায়গায় টোল পড়ে নি।

এঁর মত সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলে নি। এঁর ভাষার সঙ্গে সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গী। আমাদের দেশের এক আলাদারিক বলেছেন, ‘উপমা কালিদাস’। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন, এর অর্থ উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু হৃন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, ‘তার জাঁতায় যাই কেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।’ পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল। সময়মত ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি, যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু-কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্রেপে সেগুলো বলে যেতেন। ভগবানকে পেতে হলে কি ধরনের ‘বেগে’র প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর তুলনাটির উল্লেখ এখানে না-ই বা করলুম।

ঠিক এইখানেই আমরা একটি মূল স্মৃতি পাব। তিনি জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন) আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বন্ধপরিষ্কার হয়েছিলেন বলেই জনগণের ভাষা, ‘বাচনভঙ্গী সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অগ্রায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। কিন্তু যেখানে স্নেহমাত্র রুচির প্রশ্ন সেখানে তিনি ‘ধোপহরন্ত’ ‘কিটকাট’ হবার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। ভাষাতে সেদিনকার ‘ছুঁৎবাই’ রোগ আমরা পেয়েছিলুম ভিত্তৌরীয় পুরিটানিজম থেকে—তখন কে জানতো পঞ্চাশ বছর যেতে-না-যেতেই লরেন্স জয়েস এসে আমাদের ছুঁৎবাইয়ের ‘ভগামি’ লণ্ডভণ্ড করে

দেবেন। ১০

পরমহংসদেব গণধর্ম স্বীকার করে তার চরম মূল্য দিলেন। সাকার উপাসনা গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সেই সাকারের পূজা করে প্রধানতঃ কালীরূপে। কালীমূর্তি দেখলে অ-হিন্দু রীতিমত ভয় পায়। পরমহংসদেব সেই কালীকে স্বীকার করলেন।

অথচ ‘দূরের কথা’ বিচার করলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে, পরমহংসদেব আসলে বেদান্তবাদী। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এ-তিন মার্গ তিনি অবস্থান্তরে একে ওকে বরণ করতে বলেছেন। কিন্তু সব কিছু বলার পর তিনি সর্বদাই বলেছেন, ‘কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছু মিথ্যা বলে অহুভব করতে পারো নি ততক্ষণ পর্যন্ত সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারবে না।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ বড় কঠিন পথ। জগৎ মিথ্যা হলে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলেছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।

‘কি রকম জানো, যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে। শেষ বিচারের পর সমাধি হয়। তখন “আমি”, “তুমি”, “জগৎ”, এ সবার ধ্বংস থাকে না।’

অথচ গণধর্মে নেমে এসে বলেছেন, ‘যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী’। যখন নিজস্ব, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে তুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী ‘সাকার আকার নিরাকার’। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। ১১ আর একটি কথা—তোমার

১০ বিজ্ঞানগির মহাশয় এ স্বপ্নের সমাধান না করতে পেরে দু’রকম ভাষাই ব্যবহার করতেন। ‘সীতার বনবাসে’র ভাষা সকলেই চেনেন, কিন্তু যেখানে তিনি রামা-শ্রামাকে বিধবা বিবাহের শত্রুদের বিপক্ষে ক্ষেপাতে চেয়েছেন, সেখানে ‘কন্তুচিং ভাইপোন্তু’ এই বেনামীতে, ‘ফাজিল-চালাক’, ‘দিলদরিয়া তুখোড় ইয়ার’, ‘তার একটি বেগড়া মন্ত্রী আছে—এটি তারই ত্যাদডামি’, ‘লোকটা লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুদের আনাড়ির চূড়ামণি বে-অহুঙ্কার শিরোমণি’। ইত্যাদি ‘গ্রাম্য’ বাক্য পরমানন্দে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সব আদিরসাত্মক গল্প ছাপায় (।) প্রকাশ করেছেন সেগুলো সমাজে বললে এখনও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

১১ শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপে কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।

নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো কিন্তু মৃত্যুর (dogmatism) বুদ্ধি করো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলা না যে, তিনি এই হতে পারেন, আর এই হতে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।^{১২}

“মৃত্যুরূপা মাতা

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে স্বর্ণবাসু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়িয়ে চলে পথে ।
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে চেউ গিড়িচুড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় । ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাথা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রস্থাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিষ্কপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে ।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্তা চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে ।”

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তর্বাদ)

ইংরেজীতে এর প্রথম ছত্র “The Stars are blotted out !”—আশ্চর্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও অতি বাল্যবয়সে (১৪ ?) কালী সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন ।

১২ ভগমাটিজম্ না করে মনকে খোলা এবং জানা-অজানার মাঝখানেই যে সত্য পদ্মা এর উৎকৃষ্ট প্রকাশ কেনোপনিষদে :—

“নাহং যত্তে স্ববেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।

যো নন্তবেদ তবেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥”

‘আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি ; অর্থাৎ ‘জানি না’ ইহাও মনে করি না, এবং ‘জানি’ ইহাও মনে করি না । ‘জানি না

জনগণপূজা শক্তির সাকার সাধনা (‘পৌত্তলিকতা’ শব্দটা সর্বথা বর্জনীয়—
এটোতে ভাঙ্ছিল্য এবং ব্যক্তের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে) স্বীকার করে পরমহংসদেব
তৎকালীন ধর্মজগতের ভারসাম্য আনয়ন করলেন বটে কিন্তু প্রথম জড়সাধনার
অন্ধকার দিকটা কি তিনি লক্ষ্য করলেন না ?

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব এবং মহত্ব। এই সাকার-সাধনার পশ্চাতে যে
জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় ব্রহ্মের বিরাট মূর্তি অহরহ বিরাজমান, পরমহংসদেব বার বার
সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ভারসাম্যই ব্রহ্মজ্ঞানী কেশব সেন,
বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁদের শিষ্যদের আকর্ষণ করতে পেরেছিল। তিনি যদি ‘মতুয়া’
কালীপূজক হতেন তবে তিনি পরমহংস হতেন না।

বস্তুতঃ একটি চরম সত্য আমাদের বার বার স্বীকার করা উচিত : যেখানেই
যে কোনো মানুষ যে কোনো পন্থায় ভগবানের সন্ধান করেছে তাকেই সম্মান
জানাতে হয়। এমন কি ক্ষুদ্র শিশু যখন সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে তাঁর সাহায্য
কামনা করে (হায়, কলকাতায় সরস্বতী পূজার বাহু আড়ম্বর দেখে অনেক সময়
মনে হয়, এরাই বুঝি এ যুগে দেবীর একমাত্র সাধক) তাকেও মানতে হয়,—
গাছের পাতা, জলের ফোঁটা যখন মানুষ মাথায় ঠেকায় তারও বিলক্ষণ মূল্য
আছে। গীতাতে এ সত্যটি অতি সরল ভাষায় বলা হয়েছে। .

কিন্তু সাকার-নিরাকার নিয়ে আজ আর তর্ক করে লাভ কি ? বাঙলা দেশে
আজ আর ক’জন লোক নিরাকার পূজা করেন তার খবর বলা শব্দ—কারণ সে
পূজা হয় গৃহকোণে, নির্জনে। আর কলকাতায় বারোয়ারী সাকার পূজার যা
আড়ম্বর তা দেখে বাঙলার কত গুণীজ্ঞানী যে বিমুগ্ধ হন তার প্রকাশ খবরের
কাগজে প্রতি বৎসর দেখি। এইমাত্র নিবেদন করেছি, এরও মূল্য আছে—তাই
আমার এক জ্ঞানী বন্ধু বড় চুখে বলেছিলেন, ‘কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্টেটন করে এগুলো
সে সত্যটি স্বীকার করি’।

সাকার নিরাকারের আধ্যাত্মিক মূল্য যা আছে, তা আছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব
সমাধানের সামাজিক মূল্য কি ?

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেই বাঙালী সমাজে সমান অংশীদার।
এঁদের ধর্মচরণ যা-ই হোক না কেন, সমাজে তাঁরা মেলোমেশা করেছেন অবাদে।

যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে’—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির
মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন।’—গঙ্গীরানন্দ

চতুর্থ পাদটীকা পুনরায় প্রবেশ্য।

একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এই সহজ মেলামেশা না থাকলে খ্রীষ্টান মাইকেল, মুসলমান মশররফ হুসেন, নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীন বাঙলা কাব্যে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। সমঝদার ও রসিক জনের গুণগ্রাহিতা ও উৎসাহ লাভ না করে কম কবিই এ সংসারে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং এঁদের সকলেরই উৎসাহী পাঠক এবং গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন প্রধানতঃ হিন্দুরাই।^{১৩}

আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো মতবৈষম্যের ফলে যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একই সমাজের ভিতর অন্তরঙ্গ ভাব বর্জন করেন তবে সেই অঞ্চল, সমগ্র সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি—‘মহতী বিনষ্ট’ হয়; এই তথ্যটি সন্দেহে সে যুগে কয়জন গুণী সচেতন ছিলেন? মুসলমান সাকার মানে না, কিন্তু তাই বলে তো সে যুগে বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষুণ্ণ হয় নি? তবে কেন ঐ কারণেই ব্রাহ্মে হিন্দুতে সামাজিক অন্তরঙ্গ গতিবিধি বন্ধ হবে?

পরমহংসদেব এই বিরোধ নির্মল করতে চেয়েছিলেন বলেই সাকার-নিরাকারের অর্থহীন, অপ্রিয় আলোচনা বর্জন করেন নি। তাই বার বার দেখি; তিনি আপন হিন্দু ভক্তবৃন্দ নিয়েই সন্তুষ্ট নন। বার বার দেখি, তিনি উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, বিজয় কোথায়, শিবনাথ যে বলেছিল আসবে, বলছেন কেশব আমার বড় প্রিয়। অথচ তিনি তো ব্রাহ্ম ভক্তদের ‘কালী-কার্ণাট কনভার্ট’ করার জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র নন। তিনি সর্বাস্তঃকরণে কামনা করেছিলেন, এদের বিরোধ যেন লোপ পায়।^{১৪}

আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, এই দ্বন্দ্ব অপসারণে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব পরমহংসদেবের।

১৩ পূর্ববর্তী যুগে পরাগুল, ছুটি খাঁর মত মুসলমান গুণগ্রাহী ছিলেন বলেই হিন্দুরা মহাভারত অঙ্গবাদ করেছিলেন; পরবর্তী যুগে হিন্দু সমঝদার ছিলেন বলেই সৈয়দ মরতুজা প্রমুখ বহুতর মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১৪ এ বিষয়ে পরমহংসদেব কতখানি ‘নাছোড়বান্দা’ ছিলেন তার সব চেয়ে ভালো উদাহরণ অনুসন্ধিস্থ পাঠক পাবেন, অনিল গুপ্ত সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ ভাগে। পাঠক তখন ‘নাছোড়বান্দা’র সত্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

সামাজিক দৃষ্টি সৰ্ব্বদে এতখানি সচেতন পুরুষ যে তাঁর অর্থনৈতিক সমস্যা সৰ্বদে অচেতন থাকবেন এ কখনই হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আবার অল্প সত্যও সৰ্বজনবিদিত—কামিনী-কাঞ্চনে পরমহংসের তীব্র বৈরাগ্য। তাঁর থেকেই ধরে নিতে পারি, অর্থ-সমস্যা আপন সত্যায় (per se) তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নি। যারা মুখ্যতঃ অর্থ কামনা করে, রামকৃষ্ণদেব তো তাঁদের উপদেষ্টা নন। যারা মুখ্যতঃ ধর্মজিজ্ঞাসু অথচ অর্থসমস্যায় কাতর তিনি তাঁদের সে দৃষ্টি সৰ্বদে সচেতন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে তিনি সমাজের অর্থনৈতিক প্রব্লেমও সমাধান দিয়েছেন। যে যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছে ততখানি উপকার পেয়েছে।

রামকৃষ্ণদেব বহুবার বলেছেন, ‘কলিকালে মানবের অন্নগত প্রাণ’। এর অর্থ আর কিছুই নয়—এর সরল অর্থ, ইংরেজের শোষণনীতির শোচনীয় পরিণাম বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। অন্নভাবে সে তখন এমনই কাতর যে অন্ন কোন চিন্তার স্থান আর তাঁর মস্তকে নাই। তবু যারা ধর্মে অহুরক্ত তাঁরা বার বার পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করেছেন, ‘উপায় কি’?

পূর্বেই বলেছি তিনি ছিলেন বেদান্তবাদী। তা হলে তাঁর কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করতে পারি যে জগৎ মায়া মিথ্যা অহুমিত হলেই অর্থের প্রয়োজন আপনার থেকেই ঘুচে যাবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, পাখীর মতো দাসীর মতো সংসারের কাজ করে যাবে, কিন্তু মন পড়ে রইবে ভগবানের পায়ে তলায়। অর্থাৎ কলিযুগে সমাজের সে সচ্ছলতা নেই যে তোমাকে অন্ন জোটাতে আর তুমি নিশ্চিন্তমনে জ্ঞানমার্গে আপন মুক্তির সন্ধান পাবে। কলির মাহুঘের কর্ম থেকে মুক্তি নেই।

ওদিকে যে সব ব্রাহ্ম ভক্তের অর্থাভাব ছিল না,—যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানের তপস্বী তাঁদের বার বার বলেছেন, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। কলিযুগে ভক্তি ভিন্ন গতি নেই।

আর সকলকেই এ কথা বলেছেন, এই জন্মেই যারা সাধনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছতে চান—রাখাল, নরেন্দ্রের মত যারা জন্মাবধি জীবমুক্ত তাদের ক’জন বাদ দিলে আর ক’টি প্রাণী সে স্তরে পৌঁছতে পারবে সে বিষয়ে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—তাঁদের হতে হবে নিরঙ্কুশ জ্ঞানমার্গের সাধক। শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ক্লয়কর্ম করতে হবে, ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্যবস্তু কিছুই নেই।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার নেই। এ-কথা স্বীকার করেও যদি পশ্চাত্তরে কিছু বলি,

তবে বলবো, যে সাধক গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান এবং তত্ত্বের সমন্বয় করতে পেরেছেন তিনি সমগ্র পুরুষ—পরম পুরুষ। কোনো মহাপুরুষকে যদি দৃষ্টান্তের বাচাই করতে চাই, তবে এই তিনটির সমন্বয়েই সন্ধান করবো। তার কারণ গীতাতে এই তিন পন্থা উল্লিখিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত অত্র কোন চতুর্থ পন্থা আবিস্কৃত হয় নি। এ তিন পন্থার সমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের সহচর। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

*

*

যে পাঠক ধৈর্য সহকারে আমার প্রগল্ভতা এতক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি কোতূহলবশতঃ স্বতঃই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, ‘এ তো হল মানুষের সংসর্গে আগত সমাজে সমুজ্জ্বল রামকৃষ্ণদেব। কিন্তু যেখানে তিনি একা—তাঁর সাধনার লোকে তিনি কতখানি উঠতে পেরেছিলেন? সোজা বাড়লার, ‘তিনি কি ভগবানকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়েছিলেন?’

এর উত্তরে বলবো, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার অধিকার আমাদের কারোরই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। রামকৃষ্ণের সমকক্ষ জনই এর উত্তর দিতে পারেন।

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ‘সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পরও কোনো কোনো মানুষ লোকহিতার্থে এ সংসারে কিরে আসেন। যেমন নারদ শূকদেবাদি’। এ কথা ভুললে চলবে না।

স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, এ-কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল। লোকহিতার্থে তিনি যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণ করে যান, এরকম সজ্জবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রভু তথাগতের পর এযাবৎ কেউ নির্মাণ করেন নি।

*

*

এইবারে শেষ প্রশ্ন দিয়ে প্রথম প্রশ্নে কিরে যাই।

পরমহংসদেব গীতার তিন মার্গের সমন্বয় করেছিলেন। প্রকৃত হিন্দু সেই চেষ্টাই করবে। কিন্তু তিনি যে ধুতিখানাকে নুঙ্গীর মত পরে আল্লা-আল্লাও করেছিলেন এবং আপন ঘরে টাঙানো খ্রীষ্টের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে কথাও তো জানি। এসবের প্রতি তাঁর অমুরাগ এল কোথা থেকে? বিশেষতঃ যখন একাধিকবার বলা হয়েছে, অ-হিন্দু মার্গে চলবার সময় পরমহংসদেব কান্নমনোবাক্যে সে-ই মার্গকেই বিশ্বাস করতেন।

অনেকের বিশ্বাস চতুর্বেদে বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস অর্থাৎ পলিথেইজমের বর্ণনা আছে। কিন্তু ম্যাক্সমুলার দেখিয়েছেন ঋগ্বেদের ঋষি যখন ইন্দ্রস্তুতি করেন তখন তিনি বলেন,—‘হে ইন্দ্র, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই

প্রজাপতি, তুমিই সব।’

আবার যখন বরুণমন্ত্র শুনি, তখন সেটিতেও তাই,—‘হে বরুণ, তুমিই বরুণ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সব।’ অর্থাৎ ঋষি যখন যে দেবতাকে অরণ করেছেন তখন তিনিই তাঁর কাছে পরমেশ্বররূপে দেখা দিয়েছেন। এ সাধনা বহু-ঈশ্বরবাদের নয়। এর সন্ধান অগ্র দেশে পাওয়া যায় না বলে ম্যাক্সমুলার এর নূতন নাম করেছিলেন, ‘হেনোথেস্মিজম’।

পরমহংসদেব বেদোক্ত এই পন্থাই বরণ করেছিলেন অর্থাৎ সনাতন আয়িধর্মের প্রাচীনতম শ্রুতিসম্মত পন্থা বরণ করেছিলেন। তিনি যখন বেদান্তবাদী তখন বেদান্তই সব কিছু, আবার যখন আত্মা আত্মা করছেন তখন আত্মাই পরমাত্মা।

এই করেই তিনি সর্বধর্মের রসাস্বাদন করে সর্বধর্ম সমন্বয় করতে পেরেছিলেন।

কোনো বিশেষ শাস্ত্রকে সর্বশেষ, অভ্রান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র বলে স্বীকার করে তিনি অগ্র সব কিছুর অবহেলা করেন নি।

অনেকের বিশ্বাস, হিন্দু আপন ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট, অগ্র ধর্মের সন্ধান সে করে না।

বহু শতাব্দীর বিজয়-অভিযান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এ যুগের হিন্দু সম্বন্ধে এ কথা হয়ত খাটে। তাই পরমহংসদেব আপন জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সনাতন আয়িধর্ম এ পন্থা কখনো গ্রাহ্য করে নি।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান, ঋগ্বেদের এই বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণে তারই প্রতিধ্বনি। সর্বত্র এর অনুসন্ধান সচেতন থাকলে বাঙালী পরমহংসদেবের অনুকরণ অনুসরণ করে ধন্য হবে। বাকিটুকু দয়াময়ের হাতে।

পুষ্পধনু

রস কি ?

অর্থাৎ যখন কোনো উত্তম ছবি দেখি, কিম্বা সরস সঙ্গীত শুনি, অথবা ভালো কবিতা পড়ি, কিম্বা নটরাজের মূর্তি দেখি, তখন যে রসানুভূতি হয় সে রস কি, এবং সৃষ্ট হয় কি প্রকারে ?

এ রসের কাছাকাছি একাধিক রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে, ধাঁধার উত্তর বের করে, মনোরম নৃসৌন্দর্য দেখে, প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে যে সব রসের সৃষ্ট হয় তার সঙ্গে যে পূর্বোন্নিখিত রসের কোনোই মিল নেই সে কথা জোর করে বলা চলে না। এমন কি,—শোনা কথা—বার্ট্রাণ্ড রাস্‌ল্ নাকি বলেছেন,

গণিতের কঠিন সমস্যা সমাধান করে তিনি যে আনন্দ অহুভব করেন সেটি নাকি ভবছ কলারসের মতই। কিন্তু এ-সব রসে এবং অন্তঃস্থ রসে পার্থক্য কিসে আলোচনার এবেলা মেতে উঠলে ওপারে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমার জ্ঞানও অভিশয় সীমাবদ্ধ, প্রকাশশক্তি ততোধিক সীমাবদ্ধ। (তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, আমি আলৌ লিখতে যাচ্ছি কেন ? উত্তরে সবিনয় নিবেদন, বহুদিন সাহিত্য রচনা করার ফলে আমার একটি নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী জন্মিয়ে হয়েছে ; এঁদের কেউই পণ্ডিত নন—আমিও নই—অথচ মাঝে-মধ্যে এঁরা কঠিন বস্তুও সহজে বুঝে নিতে চান এবং সেকর্ম আমার মত বে-পেশাদারী—নন-প্রফেশনালই—করতে পারে ভালো। রচনার গোড়াতেই এতখানি ব্যক্তিগত সাক্ষ্যই হয়তো ঠিক মানানসই হল না, তবু পণ্ডিতজন পাছে আমার উপর অহমিকা দোষ আরোপণ করেন তাই সভয়ে এ ক’টি কথা কইতে হল)।

রস কি, সে আলোচনা অল্প লোকেই করে থাকেন। আলঙ্কারিকের অভাব প্রায় সর্বত্রই। কারণ রসের প্রধান কার্যকরণ আলোচনা করতে হলে অস্তুত দুটি জিনিসের প্রয়োজন। একদিক দিয়ে রসবোধ, অগ্ৰদিক দিয়ে বসকসহীন বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা। তাই এর ভিতর একটি দ্বন্দ্ব লুকনো রয়েছে। যারা রসগ্রহণে তৎপর তারা তর্কের কিচিরমিচির পছন্দ করে না, আর যারা সর্বক্ষণ তর্ক করতে ভালোবাসে তারা যে ‘শুদ্ধ কাঠং তিষ্ঠতি অগ্রে’ হয়ে রসিকজনের ভীতির সঞ্চার করে সে তো জানা কথা।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে কিন্তু কখনো আলঙ্কারিকের অনটন হয় নি। ভরত থেকে আরম্ভ করে, দণ্ডিন ময়ূট ভামহ হেমচন্দ্র অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি অস্তুহীন নির্মল বিশ্বজনের প্রচুর ঈর্ষার সৃষ্টি করেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, তাঁকে যখন রাসূল প্রশ্ন শোধান, রস কি, হোয়াট ইজ আট, তখন তিনি এঁদের স্মরণে রাসূলকে প্রচুর নূতন তত্ত্ব শোনান। অগ্ৰ লোকের মুখে শুনেছি, রাসূল রীতিমত হকচকিয়ে যান।

বিদেশী আলঙ্কারিকদের ভিতর জার্মান কবি হাইনরিখ হাইনের নাম কেউ বড় একটা করে না। কারণ তিনি অমিশ্র অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করেন নি। জার্মান কবিদের নিয়ে আলোচনা করার সময় মাঝে মাঝে রস কি তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন, এবং রস কি তার সংজ্ঞা না দিয়ে তুলনার মারফৎ, গল্পচ্ছলে সব কিছু অতি মনোরম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে রকম কোনো কিছু বলতে গেলে সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ফাটাকাটি না করে গল্প বলে জিনিসটা সরল করে দিতেন অনেকটা সেইরকম !

বাগদাদেৰ শাহইন-শাহ, দীনছনিয়াৰ মালিক খলীফা হাক্কন-অব্-রশীদেৰ হায়েমেৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠা সুলতানী, খলীফাৰ জিগয়েৰ টুকৰো, চোখেৰে বোহনী ৰাজকুমারীটি ছিলেন 'স্বপনচাৰিনী', অৰ্থাৎ ঘূমেৰ ঘোৰে এদিক ওদিক ঘূৰে বেড়াতেন।

গভীৰ নিশীথে একদা তিনি নিজাৰ আবেশে মৃদু পদসঞ্চাৰণে চলে গিয়েছেন প্ৰাসাদ-উজানে। সখীরা গেছেন পিছনে পিছনে। ৰাজকুমারী নিজাৰ ঘোৰে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সম্পূৰ্ণ মোহাবস্বাস ফুল আৰ লতাপাতা কুড়োতে আৱন্ত কৰলেন আৰ মোহাবস্বাসই সেগুলো অপূৰ্ব সমাবেশে সাজিয়ে বানালেন একটি তোড়া। আৰ সে সামঞ্জস্তে প্ৰকাশিত হয়ে গেল একটি নবীন বাণী, নূতন ভাষা। মোহাবস্বাসই ৰাজকুমারী তোড়াটি পালকেৰে সিথানে রেখে অঘোৰে ঘূমিয়ে পড়লেন।

ঘূম ভাঙতে ৰাজকুমারী দেখেন একটি তোড়া যেন তাঁৰ দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সখীরা বললেন, ইটি তাঁৰই হাতে তৈৰী। কিছুতেই তাঁৰ বিশ্বাস হয় না। এমন কি ফুলপাতাৰ সামঞ্জস্তে যে ভাষা যে বাণী প্ৰকাশ পেয়েছে সেটিও তিনি সম্পূৰ্ণ বৃত্তে পাৰছেন না—আবছা আবছা ঠেকছে।

কিন্তু অপূৰ্ব সেই পুষ্পস্তবক। এটি তাহলে কাকে দেওয়া যায় ? যাঁকে তিনি প্ৰাণ দিয়ে ভালবাসেন। খলীফা হাক্কন-অব্-রশীদ। খোজাকে ডেকে বললেন, 'বৎস, এটি তুমি আৰ্যপুত্ৰকে (খলীফাকে) দিয়ে এসো।'

খোজা তোড়াটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, 'ও হো হো, কী অপূৰ্ব কুসুমগুচ্ছ ! কী সুলভ গন্ধ, কী সুলভ ৰঙ ! হয় না, হয় না, এ ৰকম সঞ্চয়ন সমাবেশ আৰ কোনো হাতে হতে পাৰে না।'

কিন্তু সে সামঞ্জস্তে যে বাণী প্ৰকাশিত হয়েছিল সে সেটি বৃত্তে পাৰলো না। সখীরাও বৃত্তে পাৰেন নি।

খলীফা কিন্তু দেখা মাজই বাণীটি বৃক্ষে গেলেন। তাঁৰ চোখ বন্ধ হয়ে গেল। দেহ শিহৱিত হল। সৰ্বাত্ৰ ৰোমাঞ্চিত হল। অকৃতপূৰ্ব পুলকে দীৰ্ঘ দাড়ি বয়ে দৱদৱ ধাৰে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগলো।

এতখানি গল্প বলার পর কবি হাইনৰিষ হাইনে বলছেন, 'হায় আমি বাগদাদেৰ খলীফা নই, আমি মহাপুৰুষ মুহম্মদেৰ বংশধৰ নই, আমার হাতে ৰাজ্য সলমেনেৰ আঙটি নেই, যেটি আঙুলে থাকলে সৰ্বভাষা, এমন কি গুপ্তপক্ষীৰ কথাও বোকা যায়, আমার লম্বা দাড়িও নেই, কিন্তু পেরেছি, পেরেছি, আমিও সে ভাষা সে বাণী বৃত্তে পেরেছি।'

এস্থলে গল্পটির দীর্ঘ টীকার প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি সে শক্তি আমার নেই। তাই টাপেটোপে ঠারেঠোরে কই।

রাজকুমারী=কবি; ফুলের তোড়া=কবিতা; ফুলের রঙ পাতার বাহার=তুলনা অহুগ্রাস; খোজা=প্রকাশক-সম্পাদক-ফিলিম-ডিষ্ট্রিবিউটর (তাঁরা হুগন্ধ স্বর্ণের রসাস্বাদ করতে পারেন, কিন্তু 'বাণীটি' বোঝেন না); এবং খলীফা=সহায় পাঠক।

মরহুম মোলানা

মরহুম (স্বর্গত) মোলানা আবুল-কালাম মহী-উদ্দীন আহমদ অল্, আজাদ্ সজ্জান্ত বংশের যোগ্য সন্তান। এ বংশের পরিচয় এবং বিবরণ বাদশা আকবরের আমল থেকে পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এঁর পিতা জড়িয়ে পড়েন। দিল্লীর উপর ইংরাজের বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হলে পর তিনি তাঁর অগ্ন্যতম ভক্ত-রামপুরের নবাবের সাহায্যে মকাশরীফে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এক আরব কুমারীকে বিবাহ করেন। আবুল কালাম এই বিবাহের সার্থক সন্তান।

তাঁর মাতৃভাষা আরবী, পিতৃভাষা উর্দু। পরবর্তী যুগে তিনি ফার্সী এবং তুর্কীতেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করেন। ইংরিজি থেকেও তিনি সে সঞ্চয়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে এদেশে ফেরার পর তিনি উর্দু সাহিত্যের এমনি একনিষ্ঠ সাধক ও প্রেমিক হয়ে যান যে শেষের দিকে আরবী বা ফার্সীতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কথাবার্তা বলতেন না।

তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর পিতা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। এই কলকাতা শহরেই তাঁর প্রচুর অমুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এখানে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। পুত্র আবুল কালাম এখানেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর বেতারে যে একাধিকবার বলা হয়, তিনি মিশরের অল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন সে সংবাদ ভুল। উপরন্তু মোলানা সাহেব নিজেকে সব সময়ই কলকাতার অধিবাসী ও বাঙালী বলেই পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলা তিনি বলতেন না, কিন্তু বাঙলা কথোপকথনের মাঝখানে তিনি উর্দুতে প্রয়োগ করতেন এবং কিছুকণ পর কারোরই খেয়াল থাকতো না যে তিনি অন্য ভাষায় কথা বলতেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি লিসান উল্-সিদ্দিক্ (সত্য-বচন) নামক কাগজের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর ‘অল্ হিলাল’ (অর্ধচন্দ্র) পত্রিকা ইংরেজের মনে ভীতির সঞ্চার করতে আরম্ভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর কাগজ ইংরেজের শত্রু তুর্কী এবং মুসলিম বিশ্ব-আন্দোলনের অকুণ্ঠ প্রাণশাসী করার কলে তাঁকে অন্তরীণ হতে হয়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সে আন্দোলনের সঙ্গে সাদ্ জগলুল পাশার মিনারের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গাজী মুক্তাফা কামাল পাশার তুর্কীর নবজাগরণের সঙ্গে সেতু নির্মাণ করেন।

এর পরের ইতিহাস ভারতীয় মাত্রই জানেন।

শ্বেত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিশ্ব-মুসলিম প্রেম মৌলানা আজাদের পরিবারে অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে গণ্য করা হত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মক্কা—যেখানে হজ্জ উপলক্ষে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম প্রতি বৎসর সম্মিলিত হয়ে প্রাচ্য ভূমি থেকে কি কবে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেত-শ্বেতাচার দূরীভূত করা যায় তার পরিকল্পনা করতো এবং ভারত, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশকে আপন আপন কর্তব্য ও জিহাদারী ভাগ করে দেওয়া হত। এ-পরিকল্পনা কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে একে ক্রান্তনালিঙ্গম না বলে প্যান-ইসলামিজম্ (বিশ্ব-মুসলিম-সংহতি) নামে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই সুপরিচিত ছিল। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মৌলানা এ-মন্ত্রই অহরহ শুনেছিলেন।

কলকাতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৌলানার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এ-কথা সত্য যে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি তাঁর দরদ কখনো শুকিয়ে যায় নি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস হয়ে উঠল স্বদেশ-প্রেম। উর্দু ভারতবর্ষের ভাষা। তাঁর মাতৃভাষা আরবীকে তাঁর জীবনানন্দ এবং রাজনৈতিক সাধনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে তিনি সর্বাঙ্গ-করণে বরণ করে নিলেন উর্দুকে। এ বড় সহজ কুরবানী বা আত্মবিসর্জন নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেই শুধু নয়, আজও দেখতে পাই বহু লোক স্বার্থলাভের জন্য স্বদেশী ভাষা বর্জন করে বিদেশী ভাষার সাধনা করেন এবং আমাদের মত বাঙালী তাঁদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না বলে আমাদের প্রতি রুষ্ট হন।

এবং সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি, এই উর্দু গ্রহণের জন্য জীবনসাম্রাজ্যে মৌলানাকে আবার অকরণ কটুবাক্য শুনতে হলো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মণ্ডলীর কাছ থেকে। হিন্দী ভাষা কেন রাতারাতি ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার কর্তৃক

করে ‘জাতীয় ভাষা’ রূপে জগদ্বল প্রতিমার মত ভারতের মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাচ্ছেন না, অপেক্ষাকৃত অল্পত শিশু ভাষাগুলোকে কেন কচি কচি পাঠার মত তাঁর সামনে বলি দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ অল্পসন্ধান করে তাঁরা আপন ‘বুদ্ধি’তে আবিষ্কার করলেন ‘হিন্দী-বিষেবী’ ‘হিন্দীভাষাকা কটর দুশমন’ মোলানা আজাদকে। যেহেতু মোলানা উর্দুভাষী তাই তিনি শিকার্ময়ীরূপে হিন্দীর প্রচার এবং প্রসার কামনা করেন না’—এই হল তখন তাঁদের ‘যুক্তি’। হিন্দী যে দুর্বল, কমজোর ভাষা সে-কথা স্মরণ করবার অবস্বিকর প্রয়োজন কেউ বোধ করলেন না। পণ্ডিত নেহরুও যে উর্দুভাষী এ-কথা বলতে তাঁরা সাহস পেলেন না—এ-কথা বললে উভয়ের হৃদয়তা বেড়ে যাবে যে!

মাত্র একবার মোলানা লোকসভায় তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাঁরা সেদিন এই সভায় ছিলেন তাঁরা সবাই দেখেছিলেন মোলানার আবেগময়ী আন্তরিক বক্তৃতার ফলে প্রতিপক্ষ কি রকম লজ্জায় অপোষদন হয়েছিলেন—শত্রু-মিত্র কারো দিকেই মুখ তুলে তাকাবার সাহস পষন্ত সেদিন তাঁদের আর হয় নি।

জগন্নাথ পাশা, কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে মোলানার পত্র বিনিময় সব সময়ই ছিল, কিন্তু মোলানা ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। সে ইতিহাস লেখবার শক্তি আমার নেই; আমি শুধু এ-স্থলে স্মরণ করিয়ে দিতে দাই, মক্কা শরীফের প্যান-ইসলামী বালক যৌবনে পরিপূর্ণ জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল। মোলানার যে সব বিপক্ষ দল একদা মুসলিম জাহানের স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা পষন্ত আজ কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে বৃদ্ধিতে পেরেছেন, সে স্বপ্ন গেছে—এখন তাঁরা পুরো পাকিস্তানী হয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শই বরণ করেছেন। দুঃখ এই, তাঁরা এ আদর্শটি কয়েক বৎসর আগে বরণ করে নিলেই তাঁদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গল, সকলেরই মঙ্গল হত।

এস্থলে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত।

স্বরাজ্যভাঙের পর মোলানা তাঁর জাতীয়তাবাদ বিশ্ব-মানবের কল্যাণে নিয়োগ করেছিলেন। দেশ পষটন মোলানা অভ্যস্ত অপছন্দ করতেন, কিন্তু বিশ্বজনের সঙ্গে সক্রিয় যোগস্বাপনার জন্য তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তান ইরান হয়ে ইয়োরোপে যান—পূর্বে বহুবার বহু দেশে নিমন্ত্রিত হয়েও যান নি। এবং সব চেয়ে বড় কথা, জাতিসম্মেলন (ইউ. এন. ও.) এবং তার ভিন্ন ভিন্ন শাখার যে সব প্রতিনিধি ভারতে এসেছেন তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম সখারূপে চিনতে

শিখলেন মৌলানা আক্বাদকে। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে-মৌলানা ইংরেজের বিরুদ্ধে তিক্ততম লড়াই করেছেন আজীবন, তাঁর ভিতর সে তিক্ততা আর নেই। ইংরেজ হোক, মার্কিন হোক আর রুশই হোক, যে জন বিশ্বকল্যাণের জন্য সম্মুখীন হয়, তার বহু দোষ থাকলেও সে আজাদের বহুজন। এবং আরো আশ্চর্য! ইংরেজ দেখে, মৌলানা ইংরেজী না বলেও ইংরেজের মিত্র, রাশা দেখে, তার ভাষা না জেনেও অস্ত্রের তুলনায় মৌলানা রাশাকে চেয়ে অনেক বেশী। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন উর্দুতে, কিন্তু সে উর্দুতো উর্দু নয়, সে উর্দু বিশ্বপ্রেমের সর্বজনীন ভাষা, কিম্বা বলবো, বিশ্বপ্রেমের ভাষা উর্দুর মাধ্যমে স্বপ্রকাশ হল। একদা তিনি আরবী বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করেছিলেন; তখন তিনি উর্দু বর্জন করে অল্প এক ভাষা গ্রহণ করেছেন, যার নামকরণ এখনো হয় নি, কারণ সে ভাষাতে কথা বলতে আমরা এখনো শিখি নি।

অথচ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী চলতো তিনখানি ত্রৈমাসিক। প্রথমখানি আরবীতে—আরবভূমির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র স্থাপনা ও প্রাচীন যোগ দৃঢ়তর করার জন্য; দ্বিতীয়খানা ফার্সীতে—ইরান ও আফগানিস্তানের জন্য; তৃতীয়খানা ইংরিজিতে—বৌদ্ধভূমির সঙ্গে যোগস্থাপনা করার জন্য (বৌদ্ধভূমি এক ভাষায় আশ্রিত নয় বলে তিনি মাধ্যমরূপে ইংরিজি গ্রহণ করেছিলেন)। এই তিনটি পত্রিকা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয় এবং মৌলানা ছিলেন তার প্রধান। শুধু প্রধান বললেই যথেষ্ট বলা হয় না—কোন দেশে ক'খানি পত্রিকা যাবে সেটুকু পর্যন্ত তাঁর নির্দেশানুযায়ী হত। আজ ভাবি, এ-সব কটি পত্রিকার নীতি-নির্দেশ, মানরক্ষা, তাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন সর্বগুণ মেশানো আরেক পণ্ডিত পাওয়া যাবে কোথায়? ভারতবর্ষের ভিতরে, বাইরে?

বস্তুত আসলে এ-লোকটি হৃদয় এবং মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পণ্ডিত। স্বাধীন মর্যাদা ত্যাগ করে পরাধীন ভারতে না এলে তিনি যে রাজনীতির চতুঃ-সীমানায় যেতেন না, সে কথা আমি স্থিরনিশ্চয় জানি। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি জ্ঞানমার্গেই ফিরে যেতেন কিন্তু দেশে তখন (এবং এখনো) উপযুক্ত লোকের অভাব। মৌলানা কখনো কর্তব্য অবহেলা করতে চাইতেন না। এমন কি যখন তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ মুখর হয়ে উঠতেন, এবং আমরা ভাবতুম তিনি পদত্যাগ করলেই পারেন, তখনো তিনি কর্তব্যবোধের দ্বায়েই আপন কাজ করে যেতেন—লোক-নিন্দার তোয়াক্কা-পরোয় না করে। পূর্বেই বলেছি, মাত্র একবার তিনি হিন্দী-ওলাদের কর্কশ-কণ্ঠে ব্যথিত হয়ে, আপন কাহিনী নিবেদন করেছিলেন। এ

অবসরে আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। সেটা কিন্তু কিঞ্চিৎ হান্তরসে মেশানো।

বিকল্প দল শিক্ষা-দফতরের বিরুদ্ধে হুনিয়ার ভাবৎ অভিযোগ-করিয়াদ জটলা করে শেষটায় বললেন, ‘শিক্ষা-দফতরের দ্বারা কিছুই হবে না—তাদের মগজের বাজ্জিটি (ব্রেন-বক্সটি) একদম ফাঁপা।’

মৌলানা স্পর্শকাতর লোক—পণ্ডিতগণ সচরাচর তা হন। উম্মা প্রকাশ করে তিনি কিন্তু দাঁড়ালেন হাত্মমুখে। বার কয়েক ডান হাত দিয়ে মাথার ডান দিক চাপড়ে বললেন, ‘না জী, এখানে তো আছে’, তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে দীর্ঘ আঙুলকলষিত আঁচকানের ডান পকেটে ঝাবড়া মারতে মারতে বললেন, ‘এখানে নেই, এখানে কিছুই নেই।’ অর্থাৎ মগজে মাশ যথেষ্ট আছে, কিন্তু পকেটে কিছুই নেই। তার আরো সরল অর্থ, কেবিনেট শিক্ষাবিভাগকে যথেষ্ট পয়সা দেয় না।

পূর্বেই বলেছি, মৌলানা আসলে পণ্ডিত। কর্তব্যের তাড়নায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন রাজনৈতিক মল্লভূমিতে অতি অনিচ্ছায়। তাঁর সে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে আমার কুষ্ঠা বোধ হচ্ছে, কারণ তাঁর সে পাণ্ডিত্য-সায়ের সন্তরণ করার মত শক্তি আমার নেই।

আরবী এবং সংস্কৃত জ্ঞানচর্চায় বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তার প্রধান মিল, উভয় সাহিত্যের পণ্ডিতগণই অত্যন্ত বিনয়ী। কারো কোনো নূতন কিছু বলার হলে কোনো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে তাঁরা সেটি প্রকাশ করেন। লোকমাত্র টিলক গীতার ভাষ্য লিখে প্রমাণ করলেন, কর্মযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং এদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়নই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম; মহাত্মা গান্ধী তাঁর গীতাভাষ্য দিয়েই প্রমাণ করতে চাইলেন যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতাপাঠ লিখে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জ্ঞানযোগের দ্বারা চিত্তসংযম আত্মজয় করতে পারলেই স্বাধীনতা লাভ অনিবার্য। মৌলানা আজাদ তাঁর কুরান ভাষ্য দিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে মুক্ত করতে চাইলেন তার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধসংস্কার এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্কীর্ণ গাণ্ডী থেকে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে অতি কৌশলে তিনি তাকে তার কর্তব্য কৌন দিকে সেইটে সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এ ভাষ্য তিনি অনায়াসেই আরবীতে লিখতে পারতেন, এবং আরবী ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকসংখ্যা পেতেন উর্দুর তুলনায় অনেক, অনেক বেশী। দ্বিতীয়ত, কুরান আরবী ভাষায় লেখা, এবং তাবৎ বিশ্ব-মুসলিম আরবীতেই তার ভাষ্য লিখে আসছে (গীতার ভাষ্য যে রকম এক শতাব্দী পূর্বেও সংস্কৃতেরই রচিত হয়েছে)। তৃতীয়ত, মুসলিম-জাহানের কেন্দ্রভূমি মক্কার ভাষা আরবী, চতুর্থত, সে ভূমি

আজাদের জন্মস্থল—আপন জন্মস্থলে যশ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কোন্ পণ্ডিত ?

এ সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে মোলানা তাঁর তফসীল ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে। মকাত্তে জন্ম নিয়েছিল তাঁর দেহ, কিন্তু তাঁর চৈতন্য এবং হৃদয় গ্রহণ করেছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের ভূমি ভারতকে স্বদেশরূপে। তাই তিনি স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ভাষ্য লিখলেন উর্দুতে (টিলকও ইচ্ছা করলে তাঁর ভাষ্য সংস্কৃতে লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখেছিলেন মারাঠীতে)। পরবর্তী যুগে আজাদ-ভাষ্য আরবীতে অনূদিত হয়, এবং তখন আরবভূমিতে সে ভাষ্যের যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা শুনে ভারতীয় মাত্রই না কী গর্ব, কী প্রাণা অহুভব করেছিল। পাকিস্তানীরাও এই পুস্তক নিয়ে গর্ব অহুভব করেন। তাঁরা পাকিস্তান যাবার সময় তাজমহল ফেলে যাওয়ার মত কিন্তু এ ভাষ্য ভারতে ফেলে যান নি। ১৯৪৭-এর পরও আজাদ-ভাষ্য লাহোর শহরে লক্ষাধিক সংখ্যক ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে।

পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য সচরাচর একসঙ্গে যায় না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ হয়েছি মোলানার সাহিত্য-রসবোধে, সাহিত্যসৃষ্টি দেখে। মোলানার সঙ্গে লোকমাগ্ন টিলকের বহু সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু টিলকের চরিত্রে ছিল দাচ্য, মোলানার চরিত্রে ছিল মাধুৰ্য। টিলককে যদি বলা হয় কটর কঠিন শৈব, তবে মোলানাকে বলতে হয় মরমিয়া মধুর বৈষ্ণব। কারণ মোলানা ছিলেন সুকী অর্থাৎ ভক্ত, রহস্যবাদী (মিস্টিক)। তাঁর সাহিত্যের উৎস ছিল মাধুৰ্য, এবং কে না জানে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস।

তাই তাঁর চেহারাও ছিল লাবণ্য, কুরান-ভাষ্যের মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকে মাধুৰ্য, এবং তাঁর বক্তৃতায় অদ্বুত অবর্ণনীয় সরলতার সৌন্দৰ্য।

কিন্তু তাঁর সে সরল সৌন্দৰ্যবোধ তাঁর পরম প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রম্য রচনাতে। উর্দুতে এরকম রচনা তো নেইই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম সহদয় রসে ভরপুর লেখা খুঁজে পাই নে। তাঁর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বক্ষ্যমাণ অক্ষম লেখকের সাধ্যাতীত।

তবে এই শোকের দিনে একটি সান্ত্বনার বাণী জানাই। সাহিত্য আকাদেমি এ পুস্তকের বাঙলা অহুবাদকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটি সাবধান-বাণীও শুনিতে রাখি। সে অহুবাদে বাঙালী পাবে কান্দ্রী শালের উটো দিকটা। পাবে মূলের অসম্পূর্ণ পরিচয়, এবং হয়তো পাবে, অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই যদি হয়, তবে হয়তো কোনো কোনো বাঙালীর অনাদৃত উর্দু ভাষা শেখার ইচ্ছাও হতে পারে। আমাদের সে প্রচেষ্টা

হয়তো শোকদুঃখের অতীত অমর্ত্যলোকে মোলানা আবুল কালাম মহীউদ্দীন আহমদ অল-আজাদকে আনন্দ দান করবে।

নসরুদ্দীন খোজা (হোকা)

ইস্তাভুল থেকে রয়টারের খবরে প্রকাশ, রসিক এবং মূর্খচূড়ামণি নসরুদ্দীন খোজার সপ্তশত জন্মদিবস মহা-আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ইংরিজি বর্ণমালার কল্যাণে ‘খোজা’ কিন্তু বাঙলায় ‘হোকা’ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অধুনা তুর্কী ভাষা ইংরিজি (লাতিন) হরকে লেখা হয় বলে তার রূপ hoca ; কিন্তু তুর্কী ‘এচ’ অক্ষরের নিচে একটি অর্ধচন্দ্র বা উল্টো প্রথম বন্ধনী দেয় এবং তার উচ্চারণ অনেকটা স্বচ ‘লখ্’, জার্মান ‘বাখ্’ বা ফার্সী ‘খবরে’র মত, —কিন্তু ‘হ’ ভাগটা বেশী এবং ‘সি’ অক্ষরের উপরে একটি হুক দেয়—এবং তার উচ্চারণ হয় পরিষ্কার ‘জ’। ঠিক সেই রকম বাঙলা শব্দ (আসলে আরবী) ‘খারিজ’ তুর্কী ভাষায় haric লেখা হয়,—অবশ্য ‘হ’-এর নিচে পূর্বোল্লিখিত অর্ধচন্দ্র এবং ‘সি’-র উপরে হুক দেয়। ‘পররাষ্ট্রনীতি’ তাই তুর্কীতে ‘সিয়াসত খারিজ’।

রয়টারের টেলিগ্রামে এই অর্ধচন্দ্র ও হুক বাদ পড়াতে ‘খোজা’ ‘হোকা’ হয়ে গিয়েছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের ‘খাজা’ ও আগা খানের ‘খোজা’ (সম্মানিত) সম্প্রদায়ের নামেও একই শব্দ—এটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই ধরনি পরিবর্তনে আমাদের রাগত হওয়ার কারণ নেই। ক্রিকেটার মাকডের নাম যখন আমরা হামেশাই ‘মনকদ’, ‘মানকদ’ অনেক কিছুই লিখে থাকি, এবং ফড়কর্-কে ‘ফাদকর’, ‘ফদকর’ লিখি, এমন কি এই কলকাতা শহরেই গোথলে-কে ‘গোথেল’ লিখি এবং উচ্চারণ করি তখন রসিকবর খোজা যে হোকা হয়ে আমাদের ধোঁকা দেবেন তাতে আর আশঙ্ক কি ?

খোজার জন্মদিন যে-বাইশ তারিখে উদ্‌যাপিত হচ্ছিল সেইদিনই ইস্তাভুল থেকে রয়টার আরেকটি তার পাঠিয়েছেন ; তাতে খবর এসেছে যে ঐদিন পাঁচশ বছর পরে তুর্কীতে এক হুগু অগ্নিগিরি জেগে উঠে হা-হা করে হেসে উঠেছে।’

১ VOLCANIC ERUPTION AFTER FIVE CENTURIES

Istambul, July 22—Mount Soutlubiyen, in the Kars Province of Turkey has burst into what is believed to be

তা হলে বোকা গেল মা ধৰণীৰ পাকা হুঁশ বছৰ লেগেছে খোজাৰ রসিকতাৰ
মৰ্ম গ্রহণ করতে ; তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে তাঁর নাড়িভূঁড়ি এখন ভূগৰ্ভ
থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছে।

এদেশে আরবী এবং পার্সীৰ চৰ্চা একদা প্রচুর হয়েছিল। আকবর বাদশাহের
আমলে ইরানের এমনই দূরবস্থা যে সেখানকার পনেরো আনা কবি দিল্লী খাওয়া
করেছিলেন। আকবরের সভাকবি আব্দুর রহিম খানখানা নিজেকে গণ্ডা গণ্ডা
ইরানী কবি পুৰ্বেছিলেন, আর স্বয়ং আকবর যে কবি ‘আমি’ ‘তুমি’ মিল দিয়ে
‘কবিতা’ রচনা করতো তাকে পর্যন্ত নিরাশ করতে চাইতেন না।

ভারতবর্ষের পার্সী নাম হিন্দ বা হিন্দুস্তান। ‘হিন্দ’ শব্দের অর্থ কালো।
তাই এক কবি তাঁর দৈত্বেয় কালরাজি ইরানে ফেলে পূৰ্বাচল ভারতবর্ষ রওয়ানা
হওয়ার সময় লিখলেন,

হুৰ্ভাবনার কালিমা ত্যজিয়া

চলিহু হিন্দুস্তান

কালোর দেশেতে কালো আমি কেন

করিতে যাইব দান ?

তাই এক ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক ইরানের ঐ যুগকে শব্দার্থে ‘ইণ্ডিয়ান
সামার’ বলেছেন। কারণ এর পরই ইরানী সাহিত্যের পতন আরম্ভ হয়।

তুর্কী ভাষার কিছুটা চৰ্চাও এদেশে হয়েছিল, কারণ বাবুর, হুমায়ুন এঁদের
সকলেরই মাতৃভাষা তুর্কী। শেষ মোগল বাদশা-সালামৎ বাহাদুর শাহের হারেমেও
কথাবার্তা তুর্কী ভাষাতেই হত এবং তুর্কী সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট না হলেও অগ্রতম
অত্যুৎকৃষ্ট কেতাব বাবুর বাদশার আশ্রয়ভবনী। কিন্তু এ-তুর্কী ভাষা মুক্তফা
কামালের টাকির ওসমানলী তুর্কী নয়, বাবুরের ভাষা চুগতাই (বা জুগতাই)
তুর্কী। কোরমা, দোলমা এবং লড়াই-হাতিয়ারের কিছু শব্দ চুগতাই তুর্কী থেকে
বাঙলাতে এসেছে। ওদিকে মোগল দরবার পার্সীকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে

Turkey's first volcanic eruption since the 15th century. A
spokesman at the office of the Governor of Kars said the
eruption of rock and smoke had caused anxiety and excitement
among people living nearby, but there had been no serious
damage yet.

তাদের তুর্কী এদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করে নি। যদিও প্রাচীন বাঙলাতে ‘তুর্ক’ বলতে মুসলমান বোঝাতো এবং তামিল ভাষাতে মুসলমান বোঝাতে হলে এখনও ‘তুরকুম্’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাঙালী বেকার এখনো চাকরির সন্ধানে ‘তুর্কী নাচন’ নাচে।

আমরা ইংরিজী করাসী পড়ি, রাশান কথাসাহিত্যও আমাদের অজানা নয়, স্পেন পতুগাল দেনমার্কের লোক এদেশে এসেছিল এবং আরো অনেকেই,—কিন্তু আশ্চর্য ওসমানলি তুর্কী ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জ্ঞানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাইল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্ত একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সে-দেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর যুগুতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।^২

তুর্কীর বাইরে ইরান, আফগানিস্তান, উজবেক, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নসরুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বঙ্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সব চেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এনসাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে ইংরিজীর

২ ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি ‘সঞ্জীবনী’ সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, “আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি ‘সুপ্রভাতে’ প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কাৰ্য ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্যদান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অঙ্কগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্ত তথায় গমন করিয়াছেন, তাহাদের কাৰ্যের বিবরণ লিখিবেন।”

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

অর্বেক হওয়া সবেও সেটাতে তাঁর সংশ্কে করেক ছত্র আছে। আর একাধিক অমুবাধ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুটনীরসাপ্রিত লাগিনেই অমুবাধ করা যায়।

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত দু'আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব ক'টাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ' না সাত শ' বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্তারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয় নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আক্শেহিরে তাঁর মকবরহ বা সমাধিসৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম' (ইংরিজীতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অগ্ৰাণ্ত একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীক্ৰুপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি উদ্যোর শিরুনি বুধোর দর্গায় সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশেব পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইক্ল' খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুস্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বন্ধানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে সব নাম দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হস্তরসের উপাদান উত্তর থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা—সুখে-দুঃখে, উৎসবে-বাসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্পে, আচরণে, ইজিতের মাধ্যমে নিজকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হস্তময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বৃকের ভিতর জাকা। আজ যদি বেহুশ থেকে কিরিশ্তা (দেবদূত) ইস্তাযুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নসরুদীন খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেন নি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিন্তে সেই তসবীরই ধারণ

করবে, বিশেষীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক লহমার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে এবং যদি সেখানে একাধিক ভূর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন বিস্তার রবীন্দ্র-ভক্ত আছেন যারা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধ-স্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, লটারি লাভ—সব কিছুই খোজার কোনো না কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রসসৃষ্টি করে যান নি—তার মারকতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা ‘ভেন্টআনশাউউ’ পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অহুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকি করে অন্তরে বোকা বানাচ্ছেন, কিংবা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতি-পক্ষকে নিরস্ত করছেন তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এস্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গাড়লগ্ন কুংব্ মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করুন, খোজাকে অমাবস্তার রাতে শুধানো হল পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা একগাল হেসে উত্তর দিলেন, ‘তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাতে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’

খোজা বোকা বনতে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার গীতিরস বা লিরিকরস অসাধারণ ছিল। এই কবিত্বময় ব্যাখ্যাটি দিয়ে তিনি যে গীতিরস সৃষ্টি করতে চান নি, বা যে-সব কবি অসম্ভব অসম্ভব তুলনা দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করতে চান তাদের নিয়ে মজ্বরা করতে চান নি এ-কথা বলা কঠিন। কারণ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রেও আছে,—

‘প্রিয়ে, আকাশে চন্দের মুখ দেখে

মনে হল তোমার মুখ,

তাই আমি চাঁদের পিছনে পিছনে ছুটছি।’

এ ধরনের তুলনাকে ‘অসম্ভব তুলনা’ বলে আলঙ্কারিক দণ্ডিন্ কাব্যাদর্শে নিন্দা করেছেন। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এতে হান্তরসের অবতারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা লোক যদি চাঁদের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ খোয়াই-ভাঙা মাঠ-ময়দান ভেঙে ছুটতে আরম্ভ

করে আর বলতে থাকে, 'ঐ আমার প্রিয়া', 'ঐ আমার প্রিয়া' তাহলে পাড়ার ডন্ জোয়ানদেবও হেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

তবু না হয় যেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বনেছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি?

দোস্তের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নতুন ধরনের মিশরী কাবাব। অতি সযত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী কিংবা যাই বলুন। ততোধিক সযত্নে, ব-তরীবৎ সেটি রাখলেন জোকার ভিতরে গালাবিয়ার বুকপকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিল্লীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাখতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশং কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটে ছুটে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে কোরছ কি? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি? রেসিপিটা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্ম খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জয়ভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কাঙজানহীন পরোপকারী—আমাদের বিভাগসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এস্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্চরসহ উজ্জীর-ই-আলাকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্নসহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাখায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কান্দ্রী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্কাী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভুতে ইতি-উতি করে, পাশ-কথা পাশ-কথা কাড়ার

পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ-ইন-শাহ, আপনার যে পুত্র পবিত্র...' ইত্যাদি^৩ বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুমজারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তাবা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-হুনিয়ার মালিক বাদশাহ তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতাকর্ষ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ-টৈ টৈ-টৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুগী নেই তারা ফজরের আজানের পূর্বে ছুটেছে বাজারপানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে ডাঁই ডাঁই হুদো হুদো আগার ছয়লাপ! আগার নবীন ব্রহ্মাণ্ড!

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে-না-যেতে খোজা চাউস ভেতলা হাওয়া-মজিল হাঁকালেন। পক্ষাধিককাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান, গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা, রাজস্থানেব গোলাপী মার্বেলের কোয়ারা, সরণ-দীপের (স্বর্ণদীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, ব্যজনী!

বাদশাহ তো আজব তাজ্জব মানলেন।

কুলোকে বলে, হু'একজন অমিতবীৰ্য অসীম সাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায় নি দেখে তাদের (অথবা তার) জ্বী নাকি শুমিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তারপর আর দেখতে হয় নি।

ইরানের বাদশাহ খুলীতে তুর্কীর ধাস খলীকাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার মস্তকে বজ্রাঘাত। খোজা তিন মাসের ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন বলে। খোজা মারাত্মক একদারনিষ্ঠ। রাজা

৩ ইরানে বাদশাহর সামনে কোন মন্ত দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্চ।

আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন, অবশ্য, তিন মাস রিট্রেক করে দু'মাসের তরে। যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেবি করবেন না, আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজায় নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'মাসের কয়েক দিন পূর্বেই খোজা রাজসভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যলোকা বেগম-সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণ হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হ্যাঁ হজুর! তবে কি না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরো ভালো।'

তদুত্তরে সভাতক্কর হকুম হল। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতক বছর পরে বঁধুয়া আসিল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃত হুঁ হুঁ হয়ে কুহ কুহ করবেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে ঘেঁষে বললেন, 'দোস্ত! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে করে তখন দোস্তের জন্ত—' বাদশা গলা সাক্ষ করে বললেন, 'এই, ইয়ে, মানে, কোনো কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

বলে বাদশা গ্যাক গ্যাক করে বিত্ৰী রকমের হাসতে লাগলেন।

না-হক্ বেইজ্ঞ হলে মানুষ যে রকম বেদনাতুর কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে, খোজা সেইরকম বললেন, 'জহাঁপানা কুলে জুনিয়ার ইমান-ইনসাকের মালিক, এ সংসারে আজা-ভালার ছায়া (জিন্না)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এনেছি, আলবৎ এনেছি। দেশে পৌঁছে সকলের পয়লা হজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুকে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত।

উদ্ভীষ হয়ে রাজা শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে ভর সইছে? না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খোজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধে, কিন্তু সত্যি হজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্ত

এনেছি হুজুর ।’^৪

বাকারের জন্ত কার্শীটা শুধুন :

‘অগরু আন তুর্ক-ই-শিরাজী
বদন্ত্ আরদ্ দিল-ই মারা
ব্-খাল-ই হিন্দো ওশ বখ্শম্
সমরকন্দ্ ওয়া বুখারারা ।’

কথিত আছে এ দৌহা লিখে হাফিজকে তিমুর লেনের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারাস্তরে হবে।

তারপর খোজা উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই তুর্কীর রূপবর্ণনা আরম্ভ করলেন, একে-বারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ্ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণন। ‘ওহো হো হো,—একটি তব্বকী চিনার গাছ হেন! কী দোলন, কী চলন!’

৪ ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।

‘হে তুর্কী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এমনি হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি ।’

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজী অনুবাদ আছে,—

“If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand
“I’d give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand.”

কিশ্বা

“Sweet maid, if thou wouldst charm my sight ;
And bid these arms thy neck infold ;
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas vaunted gold.
Than all the gems of Samarkhand.”

বাদশা বললেন, ‘আন্তে।’

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি মৌজে। গলা চড়িয়ে বললেন, ‘চিকুর
কেশ তো নয়, যেন অমা-হামিনীর স্বপ্নজাল—আর্দ্র, নিষ্ক, মৃগনাভি সম।’

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের
সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোষা টেনে কাতর কণ্ঠে বললেন, ‘চপ, চপ,
আন্তে আন্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েরা রয়েছে।’

রূপ, করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নয় কণ্ঠে বললেন, ‘জুজুর, কাল সকাল
থেকে একটি কবে আঙা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।’

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি
অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে
গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা,
অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে ‘তাজা ব-তাজা, নো-ব-নো’^৫। দ্বিতীয়ত,
আঙার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠা ভগিনী লুৎফুন্নিহার কাছ থেকে।
আমার মত তাঁর পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশাওয়ার
কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি
ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অষ্টারোহী গাজা :
দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্শেহিরে। স্বভাবতই
আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য।
একাই বেরিয়ে পড়ুন, কিছুটা ভাবনা নেই, সবাই রাত্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোষাঙ্গ
লাগে তার কাছে কতেহ-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ-দরওয়াজ। একে-
বারে শিশু। তা না হয় হল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট
তিন মণ ওজনের তালা।

গোরস্থানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের
কলে যা কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের

৫ সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

কিছু নেই বলে। তিন মণী তাল দিচ্ছে খোজার দেহরক্ষা—অত্যাধিক—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মত ? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালটা বন্ধ দোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেজাচেজি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারা-ওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে, ‘কি হবে ঐ বিরাট তাল খুলে। ওটা কখনো খোলা হয় নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।’

মানে ?

একশ’ ফুট উচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উচুতে এক ফুট হয় কি না হয়।

মানে ?

খোজার আধেরী-শেষ-মস্করা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, ‘এ জীবনে আমার সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখি নে।’

*

*

আমি আক্শেহির যাই নি। কাজেই হলপ ধ্যেয়ে বলতে পারবো না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝবো খোজা আরো মোক্ষম রসিক। বিন খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আব বোকা বানাচ্ছেন।

নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-কাসৌর চর্চা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ববাংলার মত ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, কাজেই অতি সহজেই অহুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর-দরবেশদের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-কাসৌর বড় কেন্দ্র স্থাপনা করতে পারেন নি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইকুলে হুবোধ বালকের মত যে খুব বেশী আরবী-কাসৌ চর্চা করেছিলেন তাও মনে হয় না। ইকুলে তিনি আদৌ কাসৌ (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু

জানি নে। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারবেন।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কালে তিনি যে এ সব ভাবার খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। পন্টনের হাবিলদার যে জাক্স-জোকা পরে দেওয়ানা-দেওয়ানা ভাব ধরে হাকিজ-সাদীর কাব্য কিম্বা মৌলানা রুমীর মসনবী সামনে নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতে তাও তো মনে হয় না। এমন কি রঙীন সদরিয়ার উপর মলমলের বুটিকার অঙ্করখা পরে হাতে শিরাজীর পাত্র নিয়ে সাকীর কণ্ঠে ফার্সী গজল আর কসীদা-গীত শুনছেন, এও খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। কসম খেয়ে এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা শক্ত, তবে এটা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কাব্যে যতপি ‘খাকী’ এবং ‘সাকী’ চমৎকার মিল, তবু বাস্তব জীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।

তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভ্রমণের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন, দোয়া-দরুদ (যন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অল্পচ্ছেদ ‘আমপারা’ বাঙলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবি-জ্ঞানোচিত অস্বদৃষ্টি এবং আমপারার সঙ্গে তাঁর যে আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরুদ দিয়ে স্রষ্টাকর্তার বাণী (আল্লার ‘কালাম’) হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোক্কা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসান্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অনেক সংস্কৃত ব্যাকরণবাগীশদের চেয়ে কম সংস্কৃত জানতেন, কিন্তু তিনি গিরিকের রাজা মেঘদূতখানা জীবন এবং কাব্য দিয়ে যতখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ততখানি কি কোনো পণ্ডিত পেরেছেন? বহু লোকই বাঙলা দেশের মাটি নিখুঁতভাবে জরিপ করেছে, কিন্তু ঐ মাটির জন্তু প্রাণ তো তারা দেয় নি। কার্নাইলাল, ফুদিরাম ভালো জরিপ জানতেন এ কথাও তো কখনো শুনি নি।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাঙলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নকূক্ষকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাঙলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যান নি, স্বযোগ পেলেই যে যেতেন, সে কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না (তুনেছি, পণ্ডিত হয়েও মাক্লামুলার ভারতবর্ষকে ভ্রাম্যাসক্তেন এবং তাই বহুবাক স্বযোগ পেয়েও এদেশে আসতে রাজী হন নি।) কিন্তু ইরানের গুল্‌বুলুল,

শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে এমনই এক জানা অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিল যে গাইড-বুক, টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তাঁর সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন। গুলীরা বলেন, প্রত্যেক মাহুশেরই দুটি করে মাতৃভূমি—একটি তাঁর আপন জন্মভূমি ও দ্বিতীয়টি প্যারিস। কাজীর বেলা বাঙলা ও ইরান। কীটস বায়রনের বেলা যে রকম ইংল্যান্ড ও গ্রীস।

আরবভূমির সঙ্গে কাজী সায়েবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের ‘হারানো ইউসুফের’ যে করুণ কাহিনী বহু মুসলিম অমুসলিমের চোখে জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

তুখ করো না, হারানো যুসুফ

কাননে আবার আসিবে ফিবে।

দলিত গুহ এ-মরু পুনঃ

হয়ে গুলিস্তাঁ! হাসিবে ধীরে ॥

ইউসুফে গুমগশতে বা’জ্ আয়দ্ ব্ কিনান্

গম্ ম্ থুব।

কুল্‌বয়ে ইহজান্ শওদ্ রুজ্জি গুলিস্তান্

গম্ ম্ থুর ॥

কাজী সায়েবের প্রথম ঘোবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাঙলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। ‘মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়ে’ব অহুকরণে ‘শাতিল আরব শাতিল আরব’ ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী ‘বিদ্রোহী’ লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাবা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে কাজীব হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাঙলার জন্ম নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্ম। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়ই কবিকে ধারা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে তরুণী মুসলমানী বলে নয়, সে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম সহচরী বলে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কলনায়।

সে বিদ্রোহ কিসের বিরুদ্ধে?

এহলে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন।

ইরানী ও ভারতীয় একই আর্থগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইরানীরা যে রকম দিখিজয়ে বেরিয়ে একদিকে মিশর প্যালেস্টাইন, অগ্নদিকে গ্রীস পর্যন্ত হানা দিয়েছিল, ভারতীয়রা সে রকম করে নি। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অভিযানের ফলে ইরানভূমি যে রকম একাধিকবার সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত হয়েছে, ভারতবর্ষের ভাগো তা কখনো ঘটে নি। এ সব কারণেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক ইরানীরা সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই সে এক উগ্র স্বাক্ষাত্যভিমানের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ যেখানে শাস্ত্রভাবে বিদেশীর ভালো-মন্দ দেখে-চিনে নিজকে মেলাবার, পরকে আপন করার চেষ্টা করেছে, ইরান সেখানে আদৌ সে চেষ্টা করে নি এবং শেষটায় যখন বাধ্য হয়ে সব-কিছু নিতে হয়েছে তখন করেছে পরবর্তীকালে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

গ্রীস-রোমের কাছে পরাজিত হওয়া এক কথা, আর প্রতিবেশী ‘অল্পমত’, ‘অধঃপতন’ আরবদের কাছে পরাজিত হওয়া আরেক কথা। তদুপরি গ্রীক রোমানরা ইরানে যে সভ্যতা এনেছিল, তাতে গরীব-দুঃখীর জন্য নতুন কোনো আশার বাণী ছিল না। যে নবীন ধন-বন্টন পদ্ধতি দ্বারা হজরত মুহম্মদ আরব দেশের আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবৃত্তে গৃহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর বাণী এসে পৌঁছল ইরানে। ফলে মুহম্মদ সাহেবের পরবর্তীগণ যখন একদিন অগ্নাগ্ন জাতির মত দিখিজয়ে বেরোল তখন ইরানী শৌখিন সম্প্রদায় দেখে মর্মান্বিত ও স্তম্ভিত হল যে, ইরানের জনসাধারণ আরবের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হল না। তারপর আরবরা বিজিত দেশের ধর্মজগতে যে সাম্যবাদ ও অর্থের ক্ষেত্রে যে ধনবন্টন পদ্ধতি প্রচার করলো, তাতে আরুণ্ট হয়ে ইরানের জনসাধারণ মুসলমান হয়ে গেল। জ্ঞানাতিমানী ও ধর্মঘাতক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত ঐ ধর্ম গ্রহণ করল। তখনকার মত ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্রোহ লুপ্ত হল না।

সেটা দেখা দিল প্রায় চারশ’ বছর পরে ফিরদৌসীর মতাকাব্য ‘শাহনামা’তে। রাষ্ট্রভাষা আরবীকে উপেক্ষা করে ফিরদৌসী গাইলেন প্রাক-মুসলিম যুগের ইরানী বীরের কাহিনী, রাজার দিখিজয়, প্রেমিকের বিরহ-মিলন গাথা—নবীন অথচ সনাতন সেই ফার্সী ভাষায়। যে ফার্সী কাব্য-সাহিত্য পরবর্তী যুগে বিশ্বজনের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, তার প্রথম সার্থক কবি ফিরদৌসী।

এই নতুন ভাষাতে, নবীন প্রাণে উন্নত হয়ে যে সব কবি কাব্যের সর্ব বিষয়বস্তু নিয়ে নব নব কাব্যধারার প্রবর্তন করলেন তার কাছে পরবর্তী যুগের

ইউরোপীয় রেনেসাঁসও এতখানি সর্বমুখী ব'লে মনে হয় না। দু'শ বছর যেতে শা-ষেতেই বিশ্বের কাব্যজগতে ইরান তার অদ্বিতীয় আসন স্থাপ্ত করে নিল।

এঁদের মধ্যে সত্য বিদ্রোহী কবি ওমর খৈয়াম।

*

*

ইরানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্ন আন্দোলনের সৃষ্টি হল। তার প্রথম

(১) যারা মুসলিম শাস্ত্রের চর্চা করে যশস্বী হলেন। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, ইরানীরা আরবীর মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত করে সে শাস্ত্রে এতখানি ব্যুৎপত্তি অর্জন করলো কি করে? মুসলমানদের মহুর নাম ইমাম আবু হানীফা। পৃথিবীর শতকরা আশীজনেরও বেশী মুসলমান আজ নিজেকে হানফী অর্থাৎ আবু হানীফার মতবাদে বিশ্বাসকারী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার মত কীই বা আছে? খ্রীশ্রীশঙ্করাচাৰ্য তো শুনেছি ভারতবর্ষের দক্ষিণতম কোণের লোক, এবং তাঁর ধমনীতে যে অত্যধিক আর্ষরক্ত ছিল তাও তো মনে হয় না, অন্ততঃ একথা তো অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, আর্ষ উত্তর ভারতের তুলনায় মালাবাবে সংস্কৃত-চর্চা ছিল অনেক কম। তবু যে তিনি শুধু তাঁর মাতৃভূমি মালাবারে বৌদ্ধদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আর্ষ উত্তর ভারতেও তিনি তাঁর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানী আবু হানীফার মতবাদও একদা ইসলামের জন্মভূমি মক্কা-মদীনা তথা আরব দেশ জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বকম উদাহরণ পৃথিবীতে আরো আছে।

(২) যারা ক্রিয়াকাণ্ড, টাকা-টিল্লনী, মত্ততন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা না দিতে পেয়ে 'রহস্যবাদ' বা শূকীতত্ত্বের প্রচার এবং প্রসার করতে লাগলেন, এঁরা ভগবানের আরাধনা কবেন রপের মাধ্যমে এবং বাড়লার বৈষ্ণব তথা 'মবমিয়া'দের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যেতে পারে।

মরম না জানে ধরম বাধানে

এমন আছয়ে যারা

কাজ নাই, সখি, তাঁদের কথায়
বা হরে থাকেন তাঁরা।

*

*

ঐ চাহনিতে বিশ্ব মজেছে

পড়িয়াছে কত অশ্রুধার

পাগল করলি এ প্রমত্ত আঁখি

কুলমান রাখা হৈল ভার।

এ ধরনের কবিতা হুকী ও বৈষ্ণবদের ভিতর এতই প্রচলিত যে, কোনটি হুকী কোনটি বৈষ্ণব ধরে ওঠা অসম্ভব। যদি বলি,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে

রাধিকার মত ভ্রাস্ত কে ভব-ভবনে।

‘তবে চট করে কেউ আপত্তি করবেন না। অথচ আসলে আছে,

প্রেম নাই, প্রিয় লাভ আশা করি মনে

চাক্কেজের মত ভ্রাস্ত কে ভব-ভবনে।

(‘সদ্বাব-শতক’ কৃষ্ণচন্দ্র যজুমদারের অনুবাদ)

বৈষ্ণবদের সঙ্গে এঁদের আরো বহু মিল আছে। এঁদের হুকীবাদ পরবর্তী যুগে তথাকথিত ‘তুর্কী’র গ্রহণ করে। বাঙলা দেশে প্রথম যে মুসলমানরা আসেন তাঁদের আমরা ‘তুর্ক’, ‘তুর্কক’ নাম দি (প্রাচীন বাঙলার ‘মুসলমান’ শব্দের প্রতিশব্দ ‘তুর্ক’—তামিলে এখনো ‘তুরস্কম’) এবং তাঁদের চক্রাকারে নৃত্য করে আল্লার নাম জপ (‘জিকুর’—যার থেকে বাঙলা ‘জিগির’ শব্দ এসেছে) করা দেখে ‘তুর্কী-নাচন-নাচ’ প্রবাদটি এসেছে। বৈষ্ণবদের মত এঁরাও জপ করতে করতে ‘হাল’ (‘দশা’) প্রাপ্ত হন,—অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও মুখ দিয়ে তখন প্রচুর ফেনা বেরয়। পূর্ব ইয়োরোপে এই নাচ দেখে ইয়োরোপীয়রা এঁদের নাম দিয়েছিল “ডানসিং দরবেশ”। ইংরিজীতে কথাটা এখনো চালু আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্যধিক বাগাড়ম্বর নিম্নয়োজন, কারণ আউল-বাউল, ভাটিয়ালি-মুর্শাদীয়া গীত ধারাই শুনেছেন, তাঁরাই এই কাঙ্গী, হুকী ভক্তিবাদের কিঞ্চৎ গন্ধস্পর্শ পেয়েছেন।

(৩) দার্শনিক সম্প্রদায়। আযগোষ্ঠীর দুই সম্প্রদায়—ভারতীয় ও গ্রীকরাই প্রধানতঃ দর্শনের চর্চা করেছেন।

মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত ‘ভারতবর্ষ’ পুস্তকের (প্রাচীন তথা অর্ধাব্যাকীণ ভারতের বহুমুখী কার্যকলাপ, চিন্তা, অহুভুতির সঙ্গে ধারা পরিচিত হতে চান তাঁদের পক্ষে এ পুস্তক অপরিহার্য; বস্তুতঃ বর্তমান লেখক ব্যক্তিগত ভাবে এ পুস্তককে ‘মহাভারতের’ পরেই স্থান দেয়) লেখক পণ্ডিত অল-বীকনী মুস্তফা বলেছেন, ‘দর্শনের চর্চা করেছেন গ্রীক এবং ভারতীয়েরা—আমরা (অর্থাৎ আরবী লেখকেরা) যেটুকু দর্শন শিখেছি তা এঁদের কাছ থেকেই।’ কথাটা মোটামুটি সত্য, যদিও পণ্ডিতজনস্বলভ কিঞ্চৎ বিনয় প্রকাশ এতে রয়েছে, কারণ আরবরা গ্রীকদর্শনের আরবী অনুবাদ দিয়ে দর্শন-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে আভিচেরা (বু আলী সিনা), আভেরস (আবু কশ্দ্) ও গজ্জালী

(অল-গাভেল - এর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় অনুদিত হয়ে রাজশাহীতে প্রকাশিত হয়) বহু মৌলিক চিন্তা দ্বারা পৃথিবীর দর্শন জাগ্রত সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু স্মরণ রাখা ভালো, এঁদের দর্শন শব্দর দর্শনেরই দ্বারা ধর্মোপদেশ এবং যে-স্থলে কুরানের বাণীর সঙ্গে গ্রীক দর্শনের দ্বন্দ্ব-বোধে সেখানে তাঁরা আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে-দ্বন্দ্বের সমাধান করার এবং সময়ে সময়ে তখন তাঁরা নিও-প্লাতোনিজম অর্থাৎ ভারতের উপনিষদসম্মত অদ্বৈতত্বের উপর নির্ভর করেছেন । এঁদের বিশেষ নাম 'মুক্তকলিমুন' এবং পরবর্তী যুগে এদেশের রাজা রামমোহন তাঁর বিশ্বদর্শন (ভেন্টানশাউউউ) নির্মাণে এঁদের পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন ।

(৪) ঐতিহাসিক ও কবিগোষ্ঠী । ইতিহাস-চর্চায় আরবদের দক্ষতা সর্বজনমাত্ত, তবে ইরানীরাও এ-শাস্ত্র তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে এর অনেক উন্নতিসাধন করেন । কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি তখনো ইরানীদের কাছে ইতিহাস ও পুরাণের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয় নি । ফিরদৌসীর 'শাহনামা' (রাজবংশ) কাব্যে রাজা-মহারাজা, নায়ক-নায়িকার অধিকাংশই কবিজনমূলক কল্পনাপ্রসূত—অন্তত তাঁদের কীর্তিকলাপ তো বটেই । কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাক-ইসলামী এই সব অগ্নিউপাসক নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফিরদৌসীর কী গগনচুম্বী গরিমা, দস্ত এবং সময় সময় আশ্চর্য । এ যেন বিজয়ী আরবদের বার বার শুনিয়ে শুনিয়ে বলা, 'কালনেমির বিরূপাবর্তনে আজ আমাদের পতন ঘটেছে বটে, কিন্তু এই কাব্যে দেখ, আমরা একদিন সভ্যতার কত উচ্চ শিখরে উঠেছিলুম । সে-দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো । ওখানে তোমরা কখনো পৌছও নি, পৌছবেও না ।' এ স্বর কেমন যেন আমাদের চেনা-চেনা মনে হয় । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ইংরেজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বার বার এই গান গেয়েছে । ('অন্ত জাতি দিগ্‌দমন পরিত যখন । ভারতে ঋগ্বেদ পাঠ হইত তখন ।') । কিন্তু, আফসোস ! শাহনামার মত মহাকাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে নি । হেমচন্দ্র ও ইকবালকে ফিরদৌসীর আসনে বসানো কঠিন এবং অসম্ভব কবির যে 'নির্লজ্জতা' দেখালেন ('নির্লজ্জতা' শব্দটি ভেবেচিন্তেই কুটেশনের ভিতর ফেললুম, কারণ কাব্যে রসস্বরূপে প্রকাশ পেলে চরম নির্লজ্জতাও পাঠকের মনে বিজ্রোহ সঞ্চার করতে পারে না । আমাদের দুই মাইডিয়ায় হীরো পবনন্দন ভীমসেন ও হুম্মান যে সব দস্ত এবং আশ্চর্য করেছেন তা স্বকর্ণে শুনতে হলে 'রাম রাম' বলতে হত, কিন্তু কাব্যে পাঠ করে আনন্দাশ্রি বিগলিত

হয়, মনে হয়, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় এ বাক্য ছাড়া অন্য কিছুই এঁদের মুখে বানাতো না, বলতে ইচ্ছে করে, ‘ধস্ত ধস্ত যুগ্ম-কবি যারা দস্তকে বিনয়, লজ্জাকে লাজঘর পরিণত করতে পারেন।’) সেটা ঢাকবার প্রয়াস আজও ইরানে-তুরানে সহজেই চোখে পড়ে। সকলেই জানেন, মুসলমান ধর্মে মদ খাওয়া মানা আর সেই মদও যদি খাওয়া হয় তব্বী তরুণী সাকীর সঙ্গে—যার সঙ্গে ‘বে-খা’ হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও কবিরা বড় মারাত্মক স্বভিশক্তিহীন—তাও আবার স্বরণ তলায়, নির্জনে, গাঁবের কোঁকে, যখন কিনা ‘মগরিবের আইন ওকুতে’ নামাজ পড়ার কথা, আল্লা-রহুলের নাম স্বরণ করার আদেশ—এবং মনে মনে আওড়ানো,

“মত্ত, মাতাল ব্যাসনী আমি গো আমি কটাক্ষ বীর”

তা হলে অবস্থাটা কি রকমের হয় ?

কথা সত্য, মোল্লাবা সুবো-শাম ভালো ভালো কেতাবপুঁথি পড়েন, কিন্তু মাঝে-মাঝে, নিতান্ত কালে-কস্মিনে দু’একখানা কাব্যগ্রন্থের পাতাও তো তাঁরা ওলটান। কবি হাকিমজ অবশ্য বিস্তর চলাচলির পর ওকীবহাল হয়ে অভয়বাণী বলেছিলেন,

“মোল্লাব কাছে কোবো না কিন্তু মোর পিছে অল্পযোগ,

তারো আছে, জেনো, আমারি মতন, স্বরামন্ততা রোগ।”

তবু, এ-কথাও তো অজানা নয় যে, মোল্লারাই নীতিবাণীশ সাজে আর পাঁচজননের তুলনায় বেশী।

এবং কার্যতঃ দেখা গেল তারা এবং তাদের চেলাচামুণ্ডার দল কোপে-ঝাপে বসে আছে, শরাব-কবাব জ্বান-কী-সাকী স্তম্ভ কবিদের বমাল গ্রেফতার করার জন্ত।

কবিরা এবং বিশেষ কবে আমাদের মত তাঁদের গুণগ্রাহীবা, উচ্চকণ্ঠে তখন বললেন, এ-সব কবিতা রূপকে নিতে হয়। মগ্ন অর্থ ভগবদ প্রেম, সাকী অর্থ যিনি সে প্রেম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, অর্থান পীব, গুরু, মুরশীদ, পয়গম্বর। এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাকিমজ, আন্তার, এমন কি ওমর খৈয়ামের বহু কবিতার কোনো অর্থই করা যায় না, যদি সেগুলো রূপক দিয়ে অর্থ না করা হয়। কিন্তু বাদবাকিগুলো ?

আমাদের পদাবলীতেও তাই। এবং বিস্তর সব পদ আছে যাতে মর্ত্য আর অমর্ত্য প্রেম এমন ভাবে মিশে গিয়েছে যে, দুটোকে আদৌ আলাদা করা যায় না—সমস্ত হৃদয়-মন এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নবরসে আদ্ভুত হয়ে যায়। ।

তোষার চরণে

আষার পরাণে

লাগিল প্রেমের ফাঁসী

সব সমর্পিয়া

এক মন হৈয়া

নিশ্চয় হইলাম দাসী

মর্ত্য প্রেমই যদি হবে তো 'পরানে' 'পরানে' প্রেমের ফাঁসী লাগবে। 'পরানে' আর 'চরণে' প্রেমের বীধ বেঁধে দিয়ে কী এক অপূর্ব অতুলনীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে—যার অল্পকৃতি এ-জগতে আরম্ভ, আর পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেই অমর্ত্যালোকে, 'বার্ষ নাহি হোক এ-কামনা।'

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে বিধা জাগে, সর্বত্রই কি কপকের শরণাপন্ন হতে হবে? যথা :

অত্যাশ-শোক-নব পল্লব-রক্ত হস্তাং
মুক্তাকল প্রচয়চুড়িত-চুচুকাগ্রাম্।
অস্তঃশ্বিতেন্দুসিত পাণ্ডুর গণ্ডদেশাং,
তাং বহুভাং রহসি সংবলিতাং স্মরামি ॥

বিজ্ঞাপকে

অশোক-পল্লব নব সম পাণিতলে।
কুচাগ্র শোভিত হয়েছে মুক্তাকলে ॥
অস্তরে ঈষৎ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরতের চন্দ্র যেন ত্রিলোক-মোহিত ॥
নির্জনেতে বসি করি সদা সন্তাননা।
প্রাণাধিকা প্রেমসীকে নিত্যস্ত কামনা ॥
তথাপি বিজ্ঞার নাহি পাই দরশন।
বিজ্ঞা তন্ন মত্ত করি ত্যজিব জীবন ॥

দ্বিতীয়ার্থ কালীপক্ষে

কথির-খপূর হস্তে দিবানিশি যার।
রক্তবর্ণ কবতল হয়েছে স্ত্রীমার ॥
উচ্চ পয়োধবপরি বান্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী ॥
অস্তরে গভীর হান্ত ঈষৎকান্ত কালে।
কিরণে আছয়ে গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে ॥
অস্তর ভগতে দেখি আলোক বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে ॥

স্ববলিত সংলিঙ্গা বিধের কারিগরী ।

নিদানে গর্জনে শ্রুতি তারে গো তাক্সি ।

(চৌরশকাশং, ভারতচন্দ্র, বহুমতী সংস্করণ, পৃ: ৮)

পূর্বোক্তিতে এই সব তাবৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ওমরের বিরোধ ।

গিয়াসউদ্দীন আবুল কংহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহিম অল-খৈয়াম ইরানদেশের নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্মদিন কিংবা সন ঠিকমত জানা যায় নি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর সনও মোটামুটি ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে ।

খৈয়াম শব্দের অর্থ তাসু নির্মাতা । এ ওজনের শব্দ বাঙলায় আরো আছে । ‘কতাল’ থেকে বাঙলা কোতয়াল, এবং ‘খম্মার’ থেকে ‘খোয়্যারী’ (ভাঙা) শব্দ এসেছে । রাস্তাব মশলা-বিক্রেতা অর্থে বক্কাল শব্দও একলা বাঙলাতে প্রচলিত ছিল—আরবীতে শব্দটির অর্থ ‘মুদী’ বা ‘মশলা-বিক্রেতা’ । ত্রিবর্ষের মূল ধাতুতে—যথা ‘দ-খ-ল’ ‘দখল করা’ ‘ক-ত-ল’ ‘কোতল করা’ দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণকে স্থির করে তাতে দীর্ঘ ‘আ-কার যোগ করলে যে কর্তাব্যচক শব্দ উৎপন্ন হয় তার অর্থ ‘ঐ কর্ম সে পুনঃ পুনঃ করে থাকে ।’ তাই ‘খম্মার’ অর্থ ‘যে ঘন ঘন মদ খায়’ (বাঙলায় তাই সে সকালবেলা খম্মারী বা খোয়্যারী ভাঙে) অর্থাৎ ‘পাইকারী মাতাল’, ‘মদ খাওয়া তার ব্যবসা’ । ‘কতল’ কবা যার ব্যবসা সে কোতোয়াল (‘কতাল’), ‘জন্মাদ’ও ঐ অর্থে ব্যবহার হয় । ‘খয়য়াম’ অর্থ ‘যে পুনঃ পুনঃ তাসু নির্মাণ করে’—‘তাসু নির্মাণকারী’ । বাঙলায় ‘খইআম’, ‘খইয়াম’ বা ‘খৈয়াম’ লিখলে মোটামুটি মূল উচ্চারণ আসে । অবশ্য ‘খ’-র উচ্চারণ বাঙলা মহাপ্রাণ ‘খ’র মত নয়—আমরা বিরক্ত হলে যে রকম ‘আখ’-এর ‘খ’ অক্ষরটি উচ্চারণ করে থাকি অর্থাৎ ঘুটা কণ্ঠব্যঞ্জন । স্বচের ‘লখ’ ও জর্মনের ‘বাখ’-এর ‘খ’-এর মত । আসামীতে ‘অহমিয়া’র ‘হ’ অনেকটা সেই রকম ।

কিন্তু কবি ওমর তাঁবুর ব্যবসা করতেন না । ওটা তাঁর বংশের পদবী যাত্র । আজকের দিনেব কোনো সরকার যে রকম বাইটারজ বিল্ডিং টীক সেক্রেটারী (সরকার) নন কিংবা কোনো ঘটকপদবীধারী যে-রকম সমাজে কুলাচাৰ্যের কর্ম করেন না । ওমর কিন্তু তাঁর পরিবারের এই উপাধিটি নিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি—

জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বায়-দর্শন সেলাই করিয়া মেলা

খৈয়াম কত না তাসু গড়িল, এখন হয়েছে বেলা

নরকহুণ্ডে জলিবার তরে। বিধি-বিধানের কাঁচি
কেটেছে তাম্বু—ঠোকর খাষ, পথ-প্রান্তের ঢেলা।

(লেখকের এমেরারী অকম অহুবাদে রসিক পাঠক অপরাধ নেবেন না। অস্ত্র কারো অহুবাদ না পেয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের ‘অহুবাদ’ ব্যবহার করতে হয়েছে।)

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন রুবাঈ জাতীয় শ্লোকে প্রায়শ, প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রে মিল থাকে—তৃতীয় ছত্রান্ত স্বাধীন। ইরান আলঙ্কারিকবা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝাঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাঙ্গীর্ষ ও তীক্ষ্ণতা পায়। কথাটা ঠিক, কারণ আমবাও তেতাল বাজাবাব সময় তৃতীয়ে এদে খানিকটা কারচুপি করলে সম মনকে ধাক্কা দেয় আরো ভোরে। পাঠককে এই বেলাই বলে রাখি, তৃতীয় ছত্রে মিলহীন এই জাতীয় শ্লোক পড়ার অভ্যাস করে বাখা ভালো। নইলে নজরল ইসলামেব ওমর-অহুবাদ পড়ে পাঠক পরিপূর্ণ রসগ্রহণ করতে পাবেন না। কারণ কাজী আগা-গোড়া ক ক খ ক মিলে ওমরেব অহুবাদ করেছেন। কাস্তি ঘোষ কবেছেন বাঙলা স্রীতিতে, অর্থাৎ ক ক খ খ।

ভাগ্যক্রমে ওমরের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাকাপাকি শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিলেন এবং অবসর কাটাবাব জ্ঞান দৈববৈশিষ্ট্যে চতুঃপদী লিখতেন। তার নামে প্রচলিত গজল, মসনবী বা অন্ত কোনো শ্রেণীর দীর্ঘতব কবিতা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই-টুকু সংবাদ ছাড়া বাদবাকী কিংবদন্তী। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যাব জন্মেব তারিখ কেন, সন পর্যন্ত জানা নেই, যার পবলোক গমনের সন পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণাধীন, তাঁব সম্বন্ধে যে প্রচুর কিংবদন্তী প্রচলিত থাকবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবে তিনি যে উত্তম গুরুব কাছে শিক্ষালাভ কবেছিলেন সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত স্ববণ বাখা ভালো যে, ছাপাখানার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত অল্প লোকই গুরুর সাহায্য বিনা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

কাথত আছে, বিখ্যাত পাণ্ডিত ইমাম মুওয়াক্কফেব কাছে একই সময়ে তিনজন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এঁদের ভিতব খেলাচ্ছলে চুক্তি হয় যে, এঁদের কোনো একজন পববর্তী জীবনে প্রভাবশালী হতে পারলে তিনি অন্য দু জনকে সাহায্য করবেন। এঁদের একজন কালক্রমে প্রধান মন্ত্রী বা নিজাম-উল-মুল্ক-এব পদ প্রাপ্ত হন। থবব পেয়ে দ্বিতীয় বন্ধু হাসন বিন্ সর্ব্বাহ তাঁর

কাছে এসে তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উচ্চ রাজকর্ম চান। বন্ধুর রূপায় আশাভীত উরুপদ পেয়েও হাসন তাঁকে সরিয়ে নিজে প্রধান মন্ত্রী হবার জন্ত বড়বয় করতে লাগলেন। কিন্তু শেষটার ধবা পড়ে বাদশার হুকুমেই রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত হন। হাসন প্রতিশোধ নেবার জন্ত এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গোপন আততায়ী দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করিয়ে প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ক্রুসেডেব একাধিক গ্রীষ্টান নেতা এইসব গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এরা ভাঙ জাতীয় এক প্রকাব হশীশ্ সেবন কবতো বলে এদের নাম হয়েছিল ‘হশীশীযয়ন’ এবং ইংবিজি ‘এাসাসিন’—গুপ্তঘাতক—এই শব্দ থেকেই অর্বাচীন লাতিন তথা ফরাসীভাষা মাধ্যমে এসেছে। অনেকে বলেন, পববর্তীকালে নিজাম-উল্-মুহ য় গুপ্তঘাতকর হস্তে প্রাণ দেন, সেও হাসন সম্ভ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের সম্বন্ধে লেখকের ‘অবিজিন অব দি খোজা’ পুস্তক লেখকের বালা বচনা বলে দ্রষ্টব্যের মাধ্যা ধর্তব্য নয়।

ওমবকে যখন নিজাম-উল্ মুহ উরুপদ দিতে চাইলেন তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনে অনটনবিহীন জীবনযাপনের সুবিধাটুকু মাত্র চাইলেন এ তো জানা কথা। যে ব্যক্তি স্বর্গ-সুখ বলতে বোঝে,

সেই নিবালা পাতায় ঘেরা বনেব ধারে শীতল ছায়,

খান্জ কিছু, পেয়ালা তাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।

মোন ভাজি মোব পাশেতে গুঞ্জ তব মঞ্জ সুর—

সেই তো সখি স্বপ্ন আমাব, সেই বনানী স্বর্গপুর।

(কাস্তি ঘোষ)

কিংবা—

আমার সাথে আসবে যেথায়—দূর সে রেখে শহবগ্রাম

এক ধাবেতে মরু তাহাব, আর একদিকে শম্প গ্রাম।

বাদশা-নকর নাইকো সেথা—বাজ্য-নীতির চিন্তা-ভার ;

মামুদ শাহ ?—দূরে থেকেই করব তাঁকে নমস্কার।

(কাস্তি ঘোষ)

তার বাজপদ নিয়ে কি হবে ? নিজাম-উল্-মুহ বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন, ওমরের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রত্যাখ্যান মৌখিক বিনয় নয় এবং তাঁর জন্ত সচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। কবিও কখনো তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের মূল সুর ঐটিই।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ডাক পড়লো রাজদরবারে—পঞ্জিকা সংশোধন করে

দেবার অন্ত। ইরানীদের ‘নওরোজ’ বা নববর্ষ আসে বসন্ত ঋতুতে, কিন্তু বহু শতাব্দীর লীপ ইয়ার গোনা হয় নি বলে তখন আর নববর্ষ বসন্ত ঋতুতে আসছিল না। ওমর ঐ কর্মটি সূচাকল্পে সম্পন্ন করে দিলেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কবিরূপে যে ব্যক্তি বিশ্বজগতে বিখ্যাত তিনি আসলে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, ফিটলজেরান্ডের মাধ্যমে ইয়োরোপে প্রচারিত হবার পূর্বেই ওমরের বিজ্ঞানচর্চা ফ্রান্সে অনুদিত হয়ে সেখানে তাঁর খ্যাতি সূত্রাতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান লেখক এসব লেখা দেখবার সুযোগ পায় নি, তাই এনসাইক্লোপিডিয়ার ‘কোনিক সেকশন’ অহুচ্ছেদ থেকে ইয়োরোপে ওমরের বৈজ্ঞানিক যশ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

“Greek mathematics culminated in Apollonius. Little further advance was possible without new methods and higher points of view. Much later, Arabs and other Muslims absorbed the classical science greedily, it was the Persian poet Omar Khayyam, one of the most prominent mediaeval mathematicians, with his remarkable classification and systematic study of equations, which he emphasized, who blazed the way to the modern union of analysis and geometry. In his “Algebra” he considered the cubic as soluble only by the intersection of conics, and the biquadratic not at all.”

শেষ ছত্রটির বাঙলায় অম্ববাদ মূল ইংরিজি, এমন কি আধুনিক বাঙলা কবিতার চেয়েও শক্ত হয়ে যাবে বলে গোটা টুকরোটাই অতি অনিচ্ছায় ইংরিজিতেই রেখে দিতে বাধ্য হলাম। বৈজ্ঞানিক পাঠক বিনা অম্ববাদেই এটি বুঝতে পারবেন, প্রাজ্ঞ অম্ববাদেও আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের কোনো লাভ হবে না।

ইরানের অধিকাংশ গুলীই একমত যে, ওমর তাঁর জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চা এবং অতি অল্প সামান্য সময় ‘নষ্ট’ করেছেন কাব্যলক্ষীর আরাধনায়। তাই দার্ঘ্য কবিতা লেখবার ফুরসৎ তাঁর হয়ে ওঠে নি—এমন কি রুবাইগুলোও গীতিরস দিয়ে সরস করবার প্রয়োজন তিনি অম্বভব করেন নি।

গণিত এবং বিশেষ করে জ্যোতিষচর্চার কল ওমরের কাব্যে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ গ্রহ-নক্ষত্র যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মে চলে তার থেকেই তিনি দৃঢ় মীমাংসায় উপনীত হন যে, মানুষেরও কোনো প্রকারের স্বাধীনতা নেই, তার

কর্মপদ্ধতি যেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকারই সে পায় নি। তাই—

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মাস্তবের কায়
শেষ নবায় হবে যে ধাঞ্চে তারো বীজ আছে তায়।
হাটির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচার-কর্তা প্রলয় রাত্রি পাঠ যা করিবে তাই।

(সত্যেন দত্ত)

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃগেহে মনটা লীন—
সপ্ত-ঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রি দিন।
বিছাটা মোর উঠলো ফেঁপে কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মুড়াটা আর ভাগ্যালিখন—ওইখানে গোল রইল মোর।

(কান্তি ঘোষ)

কিন্তু এখানে আমি ওমর-কাব্যের মজিনাথ হবার ছুরাশা নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হই নি। ওমরের নামে প্রচলিত প্রায় ছ'শ'টি রুবাইয়াৎ ইরানী বটতলাতেও পাওয়া যায়—পার্টিশনের পূর্বে কলকাতার কার্সী বটতলা তালতলা অঞ্চলেও পাওয়া যেত। তার অতি অল্পই অনুবাদ করেছেন ফিটস্‌জেরাল্ড এবং সেই ছ'শ'র কটি কবিতা ওমরের নিজস্ব, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা এখনো শেষ হয় নি—আমার বিশ্বাস কখনো হবে না। সেই ছ'শ' চতুস্পদীর টাকা পড়ার উৎসাহ ও ধৈর্য বসিকজনের থাকাব কথা নয়—পণ্ডিতের থাকতে পারে। আমি বসিকের সেবা করি।

তাই আমিও ওমরের সামান্যতম ঐতিহাসিক পটভূমি নির্মাণ করার চেষ্টা করছি এবং তাও শুধু ওমরের বিদ্রোহী মনোভাব দেখাবার জন্ত—কারণ ঐখানেই নজরুল ইসলামের সঙ্গে তিনি সম্যকক্ষে আবদ্ধ হয়েছেন।

ওমরের প্রধান বিদ্রোহ ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে :—

খাঁজা। তোমার দরবারে মৌর একটি শুধু আজি এই
খামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো, কাপসা তোমার চক্ষুকেই।

(কাজী সাহেবের অনুবাদ)

O master ! grant us only this, we prithee ;
Preach not ! But mutely guide to bliss,
we prithee !

"We walk not straight"—Nay,

it is thou who squintest !

Go, heal thy sight, and leave us in peace,

we prithee !

(কার্ণেব অভিবাদ)

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক রাজা-রাজড়ার শৌর্যবীৰ্য নিয়ে যে সব কবি
কিরদোসীর ছান্ন আশ্ফালন করে বর্তমানের আনন্দকে অবহেলা করতেন তাঁদের
সম্বন্ধে বলছেন—

ভাগ্য-লিপি মিথ্যা সে নয়—ফুরোয় যা' তা ফুরিয়ে যাক্,

কৈকোবাদ আর কৈব্লস্কর ইতিহাসের নামটা থাক ।

রুস্তম আর হাতেম-তায়ের কল্পকথা—স্মৃতির ফাঁস—

সে-সব খেয়াল ঘুচিয়ে দিয়ে আজকে এস আমার পাশ ।

(কাস্তি ঘোষ)

দরবেশ-সুফীর। করতেন কুচ্ছসাধন এবং যোগচর্চা । পূর্বেই নিবেদন কবেছি,
তাঁরা নৃত্যের সঙ্গে চিংকার করতেন নাম-জপ, তাঁদের বিশ্বাস, ঐ করেই ভগবদ্-
প্রেম এবং চরম মোক্ষ পাওয়া যায় ।

দ্রাক্ষাশতাবর শিকড় সেটি তার না জানি কতই গুণ—

জড়িয়ে আছেন অস্থিতে মোর দরবেশী সাই সাই বলুন—

গগনভেদী চীংকারে তাঁর খুলবে নাকো মুক্তিদ্বার,

অস্থিতে এই মিলবে যে খোঁজ সেই ছায়ারের কুক্ষিকার ।

(কাস্তি ঘোষ)

কিন্তু সব চেয়ে বেশী চতুষ্পদী তিনি রচনা করেছেন দার্শনিক এবং পণ্ডিতদের
বিরুদ্ধে । সেখানে তিনি জ্যোতির্বিদ ওমরকেও বাদ দেন নি ।

অস্তি-নাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান

বীজগণিতের শূদ্র-রেখা ঘোঁবনে মোর ছিলই ধ্যান ,

বিত্তারসে যতই ডুবি, মনটা জানে মনে (মানে ?) স্থির—

দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া রসজ্ঞানে নেই গভীর ।

অর্থহীন, অর্থহীন, সমস্তই অর্থহীন । তাই ওমরের বার বার কাতর বোদন,
দরদী করিমাদ—

হেথায় আমার আসাতে প্রভু হন নি তো লাভবান

চলে যাবো যবে হবেন না তিনি কোনো মতে গরীয়ান ।

এ কর্ণে আমি শুনি নি তো কভু কোনো মানবের কাছে
এই আসা-যাওয়া কি এর অর্থ—বামথা পোড়েন টান।

(লেখক)

তাই ওমরের শেষ মীমাংসা—একবার মরে যাবার পর তুমি আর এখানে
ফিরে আসবে না। অতএব যতটুকু পাবো, যতক্ষণ পাবো দর্শন-বিজ্ঞান-সাই-
সুফীদের ভুলে গিয়ে সাকী সুবা নিয়ে নির্জন কোণে আনন্দ করো।

মৃত্যু আসিয়া মস্তকে মোব আঘাত কবার আগে
লে আও শবাব—লাও ঝটপট—বাঙানো গোলাপী রাগে।
হায়বে মূর্থ! সোনা দিয়ে মাজা তোব কি শবীর থানা—?
গোরা হয়ে গেলে ফের থু 'ড় নেবে—? ও ছাই কি কাজে লাগে।

(লেখক)

কিন্তু একটা জিনিস ভুল কবলে চলবে না। ওমর খাটি চার্বাকপন্থী এবং ঐ
জাতীয় লোকায়তীদেব মত নন। 'ঋণ ক'রে ঘি খাও, কাবণ দেহ তস্মী ভূত হলে
ঋণ তো আব শোধ করতে হবে না', অর্থাৎ ইহসংসারে কিংবা পরলোকে অল্প
কারো প্রতি তোমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব—মবাল বেসপনসিবিলিটি নেই—এ
তত্ত্বেও ওমর বিশ্বাস কবতেন না। তাই তাঁর একমাত্র উপদেশ—

কারুর প্রাণে দুখ্ দিও না, কবো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর-আশিস্ লাভের আশা রয় যদি, হে বকু মোর,
আপনি স'য়ে ব্যথা, মুছে পরের বুকেব ব্যথার ছাপ।

(নজরুল ইসলাম)

গুণীবা বলেন, 'কুবানই কুবানের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা।' তরুণদের আম প্রায়ই বলি,
'রবীন্দ্রনাথের রচনাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা—ঐ কাব্যই বাব বার অব্যয়ন করো,
অল্প টীকার প্রয়োজন নাই।' ওমরই ওমরের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লিনাথ এবং কাজীর
অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী।

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাছিনা)

বার্লিন শহরের উলাও স্ট্রিটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দুস্তান হোস' নামে
একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বা স্বভাব, রেস্তোরাঁর
সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—

বরিশালের খাজা বাঙালি মুসলমান—আর চেলারা গোসাঁই, মুখুয্যো, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ছাওটা শিয়্য গোসাঁই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কি রকম যেন দড়কচা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, ছাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুন? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ, ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ, আর তিমি মাছ—তা সে দেখি নি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাথরগজ ডিস্টিক্‌টাই তারই একটাব পিঠের উপর ভাসছে। ঐ খেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চব ভেবে তারই পিঠের উপর রঙই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সকলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে দুটি জর্মন্ চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্টোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রায়ার কালের দাপটে জর্মন্‌রা সচরাচর হিন্দুস্থান হোসে আসতো না। পাড়ার জর্মন্‌রা তো আমাদের লক্কা-ফোড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধে ডিসপোজেলের গ্যাস-মাস্ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইণ্ডিশ রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল ভাতের খশবাই জর্মন্‌রা হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতো ভাবে ওদের উপর একটা নজব বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনল্ ট্রায়েক্ল্!'

পাইকিরি বিয়ার থেকে। পুঁথি বায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েক্ল্ দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। ণু জ্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগে, সতেবো বছরেব চ্যাংড়া সদন্ত লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, ণু জ্রো কাবে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই কবে বলেছি করাসী শিখতে, তা শিখবি নি। ডি, ই ণু, টি, আর, ও, পি জ্রো—পি সাইলেন্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশী—One too many। এই মনে কর, তুই যদি তোর কিয়াসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে জুটে যাই, তবে আমি ণু জ্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাক্বর লজ্জায় ঘামতে

শাপলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিশ সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন বে বুড়বু? লজ্জা পাবেন রায়। ডাঙা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্ নি ডাঙাকে না হোঁবার জন্ত? তখন কি বলিস? 'ভায়ে-বোঁ দুয়ারে—কোণা কেটে ফালদি যা।' বরঞ্চ সুখি রায় যদি তাঁর ম্যাডামকে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিছু তুই ছ জো নস্। রাখা কেউর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবারে লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোসাই বললেন, 'চাচা, আপনি কিছু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-তিনো একটা-মেনীকু ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্টিস থাকলে।'

আড্ডা সমস্ববে বললে, 'প্র্যাক্টিস।'

চাচা বললেন, 'হ। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গঞ্জের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন, চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবাব দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া-চেকোস্লোভাকিয়া থেকে বোঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজাবের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্নেক কচু-কাটার পাল। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যাও অব মিল্ক এণ্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়াবটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ভাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বায়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অল্প ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেন্কেই চলে - বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাত্তে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনে-

ওলা নামলে-ওলা চিড়িয়াখুলার দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর কিরিয়ে আপন আপন হুচিস্তিত মস্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্ক উঠলেন। জার্মান ইহুদি বললে, ‘হাল্-উন্টহাল্-অর্থাৎ হাফাহাফি।’ ফরাসী বললে, ‘জঁ প্যাঁ আঁসিয়েন্—একটুখানি এনশেণ্ট।’ জার্মান আমাকে শুধালে, ‘ফ্রেঞ্চি কি বললে?’ আমি অস্থবদ কবলুম। জার্মান বললে, ‘চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আব এমন কি বয়স—নিষ্ট ভার—নয় কি?’ ফরাসী আমাকে শুধালে, ‘ক্যাস্ কিল দি—কি বললে ও?’ উত্তর শুনে বললে, ‘মঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবাব বয়স নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মোষাছেলে, ছোঃ!’

এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস কবে আপন উকতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে বকম দশটা বন্দুক এক বটকায় গুলি ছোঁড়ে। কি ব্যাপার? দেখতো না ত্যাং, সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী।

সে কী চেহারা! এ বকম বমণী দেখেই ভাবতচন্দ্রের মুণ্ডটি ঘুরে যায় আর মাহুঘে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বালছিলেন, ‘এ তো মোষ মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।’

ইটালিগ গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনাব উপর বসানো দুটি উজ্জল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণাব আবক্রেরখা মুখের সৌন্দর্যকে হু’ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগাছ গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন প্রথম বসন্তের মুহূ পবনের ক্ষীণ শিহরণ।’

চাচা বললেন, ‘তা সে যাক্ গে। আমাব বয়েস হয়েছে। তোদেব সামনে সব কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।’

দেখেই বোকা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অভূত সম্মেলন।

জার্মান এবং ফরাসী দুজনাই চূপ। আশ্রো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের হু’প্রাস্ত থেকে চুষকে টানা লোহাব মত তাব গায়ের হু’দিকে যেন স্টেটে গেল। স্পষ্ট বোকা গেল, এতক্ষণ ধরে হু’জনাই তাব পদধ্বনিব প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম হু’একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন মসিয়ো কোন্ মাদমোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্ হাব কোন্ ক্রাউ বা ফ্রালাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্ মিসিস কোন্ মিস্টারের সঙ্গে বাত তেবোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন।

এ তিনিটির বেলা কিন্তু সবাই বুকে গেল এটা ইটানীল ট্রায়কল। আমি অবশ্য গোসাইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্নলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রক্করস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনাই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে ?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্প্যানিয়ার্ড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একজন অগ্নিকে গম্ভীর ভাবে ষ্টিক বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগ্যভাগি করে নেয়।

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠার চালাকি করে ডবল পরয়া থর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাঙা করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুকে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই ছরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্মর ওয়ালটর রেলো যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোকা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দু'জন লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকাস্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে থানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো।

আমার পাশের ফরাসী বললে, 'ইডিয়ট!' জার্মান শুনে বললে, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্‌ল্‌!' 'বেট্‌!' 'বেট্‌!' 'পাঁচ শিলিং ?' 'পাঁচ শিলিং !'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, 'বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্‌ কী অদ্ভুত ফ্রাক্‌চ্যুট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জার্মানটা গুম্‌ হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসানট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি ? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দু'টো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর কবেছেন। বেনে মনের খেঁদে এগারো-টাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সকলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান্‌ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুলে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠালা। আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাবসের চৌবাচ্চায় ছরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্‌, সেদিন বেনের স্টক ঝাই হাই !

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড় টিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হরী ও মারাতা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষে নয় বলে হরীর অন্ত পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারার ভালো মানুষ নিগ্রো পাত্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলাবদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-চৌয়া লক্ষ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রব্র উঠলো, এ বেটিঙের শেষ কৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক-বিতণ্ডার পর স্থির হল, যেদিন হরী মারাতা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ কৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু করাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত গ্রায্য হকের কৈসালা। ঢলাটলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাতা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলুম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠেরো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মোহুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের খাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগব সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সৌ সিকুনেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাতা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটেব নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনেব মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরলো রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তার পরের দিন ডেক প্রায় সাক। নিতাস্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিকে আছি আর কি! খাবার সময় পেট যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌছবার আগেই কিরি কিরি করছে। হরী নিতাস্ত একা বলে করাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালে।

সে রাতে জাহাজ খেলো বড়ের মোক্ষমতম খাবড়া। করাসী গায়েব। হরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই ঘাই কি তেই ঘাই। তবু

ধরলুম গিয়ে তাকে। হরী কণকণ্ঠে বললে, “কেবিন।” আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলারমান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছেতেই বড়ের আরেক থাকায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কি আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালাম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু’জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্‌!”

চাচা ধামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আজ্ঞার সবাই একবাক্যে শুধালে, ‘তারপর?’

চাচা বললেন, ‘কচু, তারপর আর কি?’

তবু সবাই শুধায়, ‘তারপর?’

চাচা বললেন, ‘এ তো বড় গেরো। তোর কি ক্লাইমেক্স বুঝি নে? আচ্ছা, বলছি। ভোব হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধবে কেউ বলেকেলিসিতাসিয়ারো, মসিয়ো, কেউ বলে কনগ্রাচুলেশনস্‌, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—দুচ্ছাই, এ-সব কি? কিন্তু কেউ কিছুটা বুঝিয়ে বলে না।’

শেষটায় করাসী উকিলটা বললে, ‘আ মসিয়ো, কী কেরলানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজবাত দু’জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল। ভিভ্‌ল্য বাঁগাল। লং লিভ বেঙল।’

‘আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।

আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মাবার্টা কেউ জেতে নি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্টেক, বেপরোয়া, মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হুকু নেই। টাকাটা নাকি শুছকপ হয়ে যায়।’

খানিকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, ‘কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েক্স কোথায়।’

এমন সময় সেই দুই জর্মন ছোকবায় লেগে গেল মারামারি। সেটা ধামাতে গিয়ে আজ্ঞা সেদিন ভঙ্গ হল।

মাম্‌দোর পুনর্জন্ম

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অহুভূতি কিংবা বস্তুর কল্প নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অহুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সাহায্যে অদল বদল করে কিংবা পুরনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কল্পনাকালেও বিদেশী কোনো শব্দ গ্রহণ করে নি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হীক্ৰ, গ্রীক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবীও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরিজি ও বাঙলা আত্মনির্ভরশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মত এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতনরূপে দেখা দিল ব'লে আমরা আরবী ও ফার্সী থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ কবেছি। পরবর্তী যুগে ইংরিজি থেকে এবং ইংরিজির মারফতে অগ্নাগ্র ভাষা থেকে নিয়েছি এবং নিচ্ছি।

বিদেশী শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবাস্তব। নিয়েছি, এবং এখনো সম্ভ্রানে আপন হুণীতে নিচ্ছি এবং শিক্ষাব মাধ্যমরূপে ইংরিজিকে বর্জন করে বাঙল নেওয়াব পব যে আরো প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারো কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরো নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশী বস্তুব ছায়া আমাদের ভাষাতেও বিদেশী শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা কবাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দী উপস্থিত সেই চেষ্টাটা কবছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, হিন্দী থেকে আরবী, ফার্সী এবং ইংবিজী শব্দ তাড়িয়ে দেবাব ভক্ত। চেষ্টাটার ফল আর্ম হয়তো দেখে যেতে পাববো না। আমাব তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁবা না হয় চেষ্টা কবে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, ‘আক্ৰ দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বৃকের রক্ত দিয়ে।’ নজরুল ইসলাম ‘ইনকিলাব’,— ‘ইনক্লাব’ নয়—এবং ‘শহীদ’ শব্দ বাঙলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিভাসাগর ‘সাধু’ রচনায় বিদেশী শব্দ ব্যাবহার করতেন না, বেনামীতে লেখা ‘অসাধু’ রচনায় চুটিয়ে

আরবী-ফার্সী ব্যবহার করতেন। আর অভিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ৬হরপ্রসাদ আরবী-ফার্সী শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ‘আহাম্মদী’ বলে মনে করতেন। ‘আলাল’ ও ‘ছতোম’-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল ; সাধারণ বাঙলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না ব’লে তার উল্লেখ এখানে নিম্নপ্রয়োজন এবং হিন্দীর বন্ধিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দীতে বিস্তার আরবী-ফার্সী ব্যবহার করছেন।)

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শব্দরদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দব-ল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্টোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি ‘ছতোম’-ভাষা হয়ে যেতে বাধ্য। ‘বহুমতী’র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাঙ্গীধ, ‘বাকী চোখে’র ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

*

*

বাঙলায় যে সব বিদেশী শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবী, ফার্সী এবং ইংরিজীই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশী নয় এবং পত্নীগীজ, ফরাসিস, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাঙলা ভিন্ন অল্প যে-কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাঙলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল ব’লে বিস্তার সংস্কৃত শব্দ বাঙলায় ঢুকেছে, এখনো আছে ব’লে অল্পবিস্তার ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরো ঢুকবে ব’লে আশা করতে পারি। ইঙ্গুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাই নে তার অগ্রতম প্রধান কারণ বাঙলাতে এখনো আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অগ্রতম প্রধান খণ্ড থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরিজীর বেলাতেও তাই। বিশেষ ক’রে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞা, রসায়নবিজ্ঞা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানেরাও শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কি ক’রে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঙলাতে কোনো বই আছে ব’লে জানি নে, তাই এসব টেকনিকল শব্দের প্রয়োজন যে আরো কত বেশী সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা এখনো আমাদের মনের মধ্যে নেই। স্বতরাং ইংরিজী চর্চা বন্ধ করার সময় এখনো আসে নি।

একমাত্র আরবী-ফার্সী শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাঙলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাঙলাতে আরবী-ফার্সীর চর্চা যাবো-যাবো করছে, পূব বাঙলায়ও এ সব ভাষার প্রতি তরুণ

সম্রাটের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ ব'লে তার আয়ু দীর্ঘ হবে ব'লে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাঙলাকে প্রভাবান্বিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে সব আরবী-ফার্সী শব্দ বাঙলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরো বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশী শব্দের সন্ধান বর্জন ক'রে পুরনো বাঙলার—‘চণ্ডী’ থেকে আরম্ভ করে ‘হুতোম’ পর্যন্ত—অচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ ভুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেন্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরনো বাঙলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে ব'লে অচলিত অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

*

*

সংস্কৃত, গ্রীক, বাঙলা আৰ্য ভাষা ; আরবী, হীক্ৰ সেমিতি ভাষা। ফার্সী, উর্দু, কাশ্মীরী, সিদ্ধীও আৰ্য ভাষা, কিন্তু এদের উপর সেমিতি আরবী ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে প্রচুর। উত্তর ভারতের অগাধ ভাষাদের মধ্যে বাঙলা এবং গুজরাতিই আরবী ভাষার কাছে ঋণী, কিন্তু এই ঋণের ফলে বাঙলার মূল স্বর বদলায় মি। গুজরাতির বেলাও তাই।

হীক্ৰ এবং আরবী সাহিত্যের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। ঠিক সেই রকম প্রাচীন আৰ্য ভাষা ফার্সী তার ভগ্নী সংস্কৃতের ন্যায় গ্রীষ্মের জন্মের পূর্বেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আববরা যখন ইরান জয় করে তখন তারা ইরানীদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তারা সঙ্গে আনলো যে ধর্ম সেটি জরথুষ্ট্রী ধর্মের চেয়ে প্রগতিশীল, সর্বজনীন এবং দুঃখীর বেদনা উপশমকারী। ফলে তাবৎ ইরান মুইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো এবং আপন ভাষা ও সাহিত্য বর্জন করে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা ও সংস্কৃতির বাহনরূপে স্বীকার ক'রে নিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাই ইরানীদের দান অতুলনীয়।

চারশত বৎসর পরে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল। ইরানীদের আপন ভাষা তখন মাহমুদ বাদশার উৎসাহে নবজন্ম লাভ ক'রে নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির পথে এগিয়ে চললো। বাগ্মীকি যে রকম আদি এবং বিশ্বজগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি,

কিয়দোঁসীও এই নব ইরানী (ফার্সী) ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি । আরবী থেকে শব্দ এবং ভাবসম্পদ গ্রহণ করে ফার্সী সাহিত্য যে অতীতপূর্ব বিচিত্র রূপ ধারণ করলো তা আজও বিশ্বজনের কাছে বিশ্বস্তের বস্তু । রুমী, হাকিম, সাদী, শৈয়খ আমন আপন রশ্মিমাণ্ডলে সবিতাস্বরূপ । সেমিতি আরবী এবং আর্য ফার্সী ভাষার সংঘর্ষের ফলেই এই অনিবার্ণ হোমানলের সৃষ্টি হল ।

পরবর্তী যুগে এই ফার্সী সাহিত্যই উত্তর ভারতে ব্যাপকরূপে প্রভাব বিস্তার করলো । ভারতীয় মন্তব-মাত্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবী ভাষা পড়ানো হয়েছিল তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্থগণ ইরানী আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সীর সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশী । উর্দু সাহিত্যোৎসাহমূল হুর তাই ফার্সীর সঙ্গে বাঁধা—আরবীর সঙ্গে নয় । হিন্দী গানের উপবও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সী—আরবী নয় ।

একদা ইবানে যে বকম আর্য ইরানী ভাষা ও সেমিতি আরবী ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সী জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধী, উর্দু ও কাশ্মীরী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় । কিন্তু আববীর এই সংঘর্ষ ফার্সীর মাধ্যমে ঘটেছিল বলে কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সীর মত নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারলো না । উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নতুন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সীর অমূল্যবোধ থেকে ক্রিয়াক্রান্ত দিতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

*

*

বাঙলা আর্থভূমি, কিন্তু এ ভূমির আর্থগণ উত্তর ভারতের অগ্রাগ্র আর্থের মত নন । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এখানে নয় । তাই মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ।

(১) বাঙলা দেশকে যখনই বাইরের কোনো শক্তি শাসন করতে চেষ্টা করেছে তখনই বাঙালী বিদ্রোহ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে । পাঠান যুগে বাঙলা অতি অল্পকাল পরাধীন ছিল এবং মুগল যুগেও মোটামুটি মাত্র জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত বাঙলা দিল্লীর শাসন মেনেছে ।

(২) অগ্রাগ্র আর্থদের তুলনায় বাঙালী কিছুমাত্র কম সংস্কৃত চর্চা করে নি, কিন্তু সে-চর্চা সে করেছে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে । আদিশুর থেকে দেবেজ-নাথ ঠাকুর, সকলের বহু চেষ্টাতেও বাঙালী উত্তর ভারতের সঙ্গে স্ট্রিমলাইন্ড হয়ে সংস্কৃত পদ্ধতিতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ করে নি এবং বাঙলাতে সংস্কৃত শব্দ

উচ্চারণ করার সময় তো কথাই নেই।

(৩) বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাত্মার তের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কাহ্নরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাড়লের ভক্ত, মুল্লাদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিद्यমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ ‘গতানুগতিক পন্থা’ ‘প্রাচীন ঐতিহ্য’-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা,—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছ্বলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

*

*

পাঠান আমলে বাঙলা দেশে আরবী-ফার্সীর চর্চা ব্যাপকভাবে হয় নি। সে-যুগে বাঙলাতে লিখিত সরকারী দলিলপত্রে পর্যন্ত আরবী-ফার্সী টেকনিকাল শব্দ প্রায় নেই। মহাপ্রভু এবং তাঁর শিষ্যদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সে যুগের বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ অতি অল্প।

বাস পাঠান যুগে তো কথাই নেই, মোগল যুগের প্রারম্ভেও কবি আলাওল যে কাব্য রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যই লক্ষণীয়—

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল।

কিঞ্চিৎ ভুঝর-ভঞ্জে যৌবন রসাল ॥

আড় আঁখি বন্ধ-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।

ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন শিহরয় ॥

সখরয় গিম-হার, কটির বসন।

চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈর্য-গমন ॥

চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।

বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায় ॥

এ ধরনের কাব্য তখন মুসলমানদের ভিতর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল

তার বর্ণনা পাই অত্ৰ এক কবির কাছ থেকে । সৈয়দ হুস্ৰুলতান বলেন,

আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল ।

পরন্তব-সকল লৈয়া সব রহিল ॥

(দীন=ধর্ম ; পরন্তব=পরধর্ম কীর্তন । এর পূর্বেই মুসলমানরা পদাবলী কীর্তন রচনা আরম্ভ করেছেন এবং কাজী ফয়জউল্লাহ 'গোরক্ষবিজয়' মুসলমানদের ভিত্তর লোকপ্রিয় হয়ে গিয়েছে ।)

মুসলমানরা আপন ধর্মচর্চা না করে 'হিন্দুয়ানী' কাব্য নিয়ে মেতে আছে দেখে মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ তারস্বরে আপন প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং 'আরবী-ফার্সীতে ধর্মচর্চা করবার জন্য বার বার কড়া ফতোয়া জারী করেছেন ।

তখন সৈয়দ হুস্ৰুলতান বললেন, 'আমরা বাঙলা ছাড়বো না ; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রচর্চাও কববো । তাই বাঙলাতেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা হবে ।'

আরবী-ফার্সী ভাষে কিতাব বহত ।

আলিমাতে বুঝে, না বুঝে মুখস্থত ॥

যে সবে আপন বুলি না পাবে বুঝিতে ।

পাচালী রচিলাম করি আছয়ে দৃষ্টিতে ॥

আল্লায় বলিছে, 'মুই যে-দেশে যে-ভাষে,

সে-দেশে সে-ভাষে কইলুম রশূল প্রকাশ ॥'

(আলিমান=আলিমগণ=পণ্ডিতগণ ; রশূল=আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর ।)

অতি মোক্ষম ভাব । সৈয়দ হুস্ৰুলতান কুরানের বচন উদ্ধৃত ক'রে সপ্রমাণ করলেন, বাঙলাতেই বাঙালী মুসলমানের শাস্ত্রচর্চা করা ফরজ্—অবশ্য করণীয় ।

সৈয়দ হুস্ৰুলতান কিন্তু আটঘাট বেঁধে পয়গম্বরের সাহেবের বাণী বাঙলাতে প্রকাশ করেছেন । নিতান্ত যে কটি আরবী শব্দ ব্যবহার না করলেই নয়, তিনি মাত্র সেগুলোই ব্যবহার করেছেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মাধ্যমেই ইসলাম প্রকাশ করেছেন ।

তোমার সবার মুই জানো হিতকারী ।

ইমান-ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি ॥

যেক্ষেপে সৃজন হইল হুস্ৰুলহুস্ৰুলগণ ।

যেক্ষেপে সৃজন হইল এ তিন ভূবন ॥

যেক্ষেপে আদম ইবা সৃজন হইল ।

যেক্ষেপে যতক পয়গম্বরের উপজিল ॥

বজতে এসব কথা কেহ না জানিল।

নবী-বংশ পাঁচালীতে সকল শুনিল ॥

এস্থলে দ্রষ্টব্য, হিন্দু মুসলমান উভয়কে মুসলমান ধর্ম বোঝাতে গিয়ে কবি এমন সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন, যা মুসলমান ধর্মে নেই। ‘সুর’ ‘অসুর’ কল্পনা ইসলামে নেই। ‘তিন ভুবন’ ইসলামে নেই, আছে ‘দুই ভুবন’। তাঁর পুস্তকের নাম ‘নবাবংশ’ ও হিন্দু ‘হরিবংশের’ অমুকরণ—আববীতে এই ধরনের নাম নেই।

এমন কি তিনি পয়গম্বর হজরৎ মুহাম্মদকে ‘অবতার’ আখ্যা দিয়ে মোল্লাদের মতে পাপ করেছেন; কারণ মুসলিম শাস্ত্রমতে আল্লা মহুগদেহ গ্রহণ ক’রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি মাছুষদের একজনকে বেছে তাঁকে তাঁর মুখপাত্র করেন। সৈয়দ হুসতান কিন্তু বলছেন,

মুহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।

নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার ॥

আর সব চেয়ে বড় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সৈয়দ সাহেব, এই দুইটি ছত্রে—

যারে যেই ভাবে প্রভু করিল স্মৃজন।

সেই ভাষা তাহার, অমূল্য সেই ধন ॥

এই দু’টি ছত্রে যে কত বড় সত্য নিহিত আছে, সে তত্ত্ব কি আমরা আজও বুঝতে পেরেছি? এই সৈয়দ হুসতানকে তখনকার দিনের মোল্লা-মোলবীরা ‘ইসলামের ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে’, ‘আরবীর মর্যাদা লোপ পাবে’ এই সব ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ‘মুনাফিক’ অর্থাৎ ‘ভণ্ড’ অর্থাৎ ‘ধর্মধ্বংসকারী’ আখ্যা দিয়ে ‘ফতোয়া’ পর্যন্ত জারী করেছেন। সাহসী কবি কিন্তু অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর মাতৃভাষা বাঙলার জয়গান গেয়ে গেছেন। এ লোক যদি প্রকৃত বাঙালী না হয়, তবে বাঙালী কে?

সে শুভবুদ্ধি, সে সাহস কি আজও আমাদের হয়েছে? কেউ বলে ‘রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্ত হিন্দী গ্রহণ করো’, কেউ বলে ‘ইংরিজী বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব।’ হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।

যখন হিন্দু নেই, সংঘাত নেই, তখন মাতৃভাষার গৌরবগান গেয়ে লক্ষ-লক্ষ করে সবাই; কিন্তু যুগসঙ্কিশ্ণে, নানা প্রলোভন-বিভীষিকার সম্মুখে মাতৃভাষাকে নিজের জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলতে পারতেই প্রকৃত সাহস, প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির লক্ষণ। সৈয়দ হুসতানের দুইশত বৎসর পরে ইংরিজী ভাষা বাঙালীকে প্রলোভন দেখিয়েছিল আরেকবার। কিন্তু মুসলমান হুসতানের স্মার খুঁটান মাইকেল তখন

উচ্চকণ্ঠে বাঙলার জয়গান গেয়েছিলেন।

সৈয়দ হুলতানের অঙ্ককরণকারীরা .কিন্তু তাঁর মত বিচক্ষণ ভাষাবিদ ছিলেন না : কলে বাঙলাতে যে পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রবেশ করতে লাগল তাতে ভাবার বৈশিষ্ট্য বিপন্ন হতে লাগল। ইতিমধ্যে—মোগল যুগের শেষের দিকে—উর্দু ভাষাও বাঙলা দেশে প্রবেশ করেছে। তাই তখন যে বাঙলা পাচ্ছি তার উদাহরণ—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।

ছুনিয়ামে এসাতি আদমী রহে পাচা ॥

ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছ ॥...

রাতদিন যৈসা তৈসা স্তব্ধ হুঃখ হোয়ে ॥

জানা গেল বাত বাওয়া জানা গেল বাত।

কাপড়া লেও আওর আও মেরা সাথ ॥

যুক্তি নয়, অজুহাত হিসেবে বলা যেতে পারে, আকবরের আমল থেকে বহুল ফার্সী শিক্ষাদানের কলে বাঙলা দেশে তখন প্রচুর লোক বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এটা কিন্তু কোনো সংযুক্তি নয়। কারণ আজ আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি : তাই ব'লে সাহিত্যসৃষ্টির সময় বে-এক্কেয়ার হয়ে যত্র-তত্র ভূবি ভূরি ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করি নে।

কিন্তু সত্য কবি পথভ্রষ্ট হন না। তার প্রকৃত নিদর্শন আমরা পাই, চট্টগ্রামের মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহীমুনিসা'র (আশা করি 'শ্রীমতী' লেখাতে কেউ আপত্তি করবেন না, কারণ তিনি নিজেই তাঁর কাব্যে আপন পরিচয় দেবার সময় লিখেছেন—

“স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী।

রহিমুনিচা নাম জান আজে ছিরীমতী ॥”)

এই মহিলা কবির সঙ্গে হালে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমির প্রথম ডাইরেক্টর (বাঙলা-একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ: ৫৩)। তাঁর মতে ‘১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রহীমু-’ন-নিসা আবির্ভূত হয়েছিলেন।’ ইনিও সৈয়দ হুলতানের মত সৈয়দ বংশের মেয়ে এবং পরিবারে প্রচুর আরবী-ফার্সীর চর্চা থাকা সত্ত্বেও সুস্থ, সবল এবং মধুর বাঙলায় কবিতা রচনা ক’রে গিয়েছেন।

এঁর হাতের লেখা খুব সম্ভব হুন্দর ছিল। তাই বোধ করি তাঁর স্বামী তাঁকে কবি আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ নকল করতে আদেশ দেন :—

শুন গুণিগণ হই এক মন,
লেখিকার নিবেদন।
অক্ষর পড়িলে টুটা পদ হৈলে
শুধারিঅ সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট্র হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী।
আলাওল মনি, বুদ্ধি বলে গুণী,
বিরচিল এ ভারতী ॥
পদের উকতি বুঝি কি শক্তি,
মুই হীন তিরী জাতি।
স্বামীর আদেশ মানিয়া বিশেষ
সাহস করিল গাঁথি ॥

রহীমুন্সিসার স্বরচিত কাব্য অল্পই পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর একটি ‘বারমাস্তা’ বড়ই করুণ এবং মধুর। পূর্ববঙ্গের কবিরা সচরাচর প্রিয়বিরহে বারমাস্তা রচনা করেছেন—রহীমুন্সিও ভ্রাতৃশোকে তাঁর নব বারমাস্তা রচনা করেছেন।

আশ্বিনেতে থোয়াময় কান্দে তরুণতাচয়
ভাই বলি কান্দে উভরায়।
আমার কান্দি নি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিণী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥
(থোয়া = কুয়াশা)

অল্প এক স্থলে ‘কতাহারা জননী’র শোকাতুরার জন্মন প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় সরল বাঙলায়—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার
মোর জাহু গেল ফিরি না আসিল আর ॥

এঁর রচনায় সত্যই মধুর কবি-প্রতিভা ‘বারেবার’ ধরা পড়ে। পাঠকে মূল প্রবন্ধটি পড়তে অল্পরোধ জানাই।

*

*

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ ইংরিজীর সঙ্গে। এবং সেই দ্বন্দ্ব বিস্ত্রোহ-

রূপ ধারণ করলো পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা আবার জন্মী হল—কিন্তু এবারে তার জন্মমূল্য দিতে হল বৃক্কের রক্ত দিয়ে—কিন্তু আক্র, ইজ্জৎ, ইমান দিয়ে নয়। পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলার লোক বাঙলাতে আরেক দফে আরবী-ফার্সী শব্দ আমদানি করে ভাষাকে ‘পাক’ করতে প্রলোভিত হল না।

তাই এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি ‘মামদো’র পুনর্জন্ম। ‘মামদো’রই যখন কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তার পুনর্জন্ম হবে কি প্রকারে? পূর্ব বাঙলার লেখকদের ক্ষক্ষে আরবী-ফার্সী শব্দের মামদো ভর করবে, আর তারা বাহজ্ঞানশূন্য হয়ে আরবী-ফার্সীতে অর্থাৎ “যাবনী মেশালে” কিচিরমিচির করতে আরম্ভ করবে, বিজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবে—যার মাথামুণ্ড পশ্চিম বাঙলার লোক বুঝতে পারবে না, সে ভয় ‘স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম’।

দিল্লী স্থাপত্য

যারা এই শীতে প্রথম দিল্লী যাচ্ছেন কিংবা যারা পূর্বে গিয়েছেন কিন্তু পাঠান-মোগলের দালান-কোঠা, এমারত-দৌলত দেখবার সুযোগ ভালো করে পান নি, এ-লেখাটি তাঁদের জগ্ন। এবং বিশেষ করে তাঁদের জগ্ন যাদের স্থাপত্য দেখে অভ্যাস নেই বলে ঐ রস থেকে বঞ্চিত। লেখাটিতে কিঞ্চিৎ ‘মাস্টারি মাস্টারি’ ভাব থেকে যাবে বলে গুণীজনকে আগের থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এটি না পড়েন।

কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনে নি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনে উদ্বাহ হয়ে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অছায়া। বাঙলা দেশে এখানে-ওখানে ছিটেফোটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার রস বৃক্কতে সাহায্য করে তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উটকো একখানা ফার্সী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জগ্ন ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কিনা এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অত্যন্তম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলক-ধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী যাবার পথ পাবেন না,—আর ‘দিল্লী

দূর অস্ত' তো বটেই।

কবিতা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের মূল রস একই—ইংরিজীতে যাকে বলে ঈসথেটিক ডিলাইট। কিন্তু এক রসের চিন্নয়রূপ (যথা কাব্যের) যদি অল্প রসের মৃদয়রূপে (যথা ভাস্কর্য, স্থাপত্যে) টায়-টায় মিলছে না দেখেন তবে আশ্চর্য হবেন না। এদের প্রত্যেকেই মূল রস প্রকাশ করে আপন আপন 'ভাষায়', নিজস্ব শৈলীতে এবং আজিকে। একবার সেটি ধরতে পারলেই আর কোনো ভাবনা নেই। তার পর নিজের থেকেই আপনার গায়ে রসবোধের নূতন নূতন পাখা গজাতে থাকবে, আপনি উড়তে উড়তে হঠাৎ দেখবেন তাজমহলের গম্বুজটিও আপনাব সঙ্গ আকাশপানে ধাওয়া করেছে—নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যেন ক্রমেই পাতালের দিকে ডুবে যাচ্ছে।

স্থাপত্যের প্রধান রস—প্রধান কেন, একমাত্র বললেও ভুল বলা হয় না, অল্পগুলো থাকলে ভালো, না থাকলে আপত্তি নেই—তার কম্পজিশনে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন ধরুন, গম্বুজ, মিনার, আর্চ (দেউড়ি), ছত্রি (কিয়োস্ক, পেভিলিয়ন্), ভিত্তি এমনভাবে সাজানো যে দেখে আপনার মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, সঙ্গীতেও তাই। কয়েকটি স্বর—সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি এমনভাবে সাজানো হয় যে শোনামাত্রই আপনার মন এক অনির্বচনীয় রসে আপ্লুত হয়।

এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায় তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে আরকিটেক্টনিকাল্ মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউন্টে আছে এবং উয়ার অ্যাণ্ড পীসে আছে; জঁ্যা ক্রিস্তক উত্তম উপন্যাস কিন্তু এ-গুণটি সেখানে অহুপস্থিত। লিরিক বা গীতিকাব্যে যদিও কম্পজিশন থাকে—তা সে যতই কম হ'ক না কেন তাতে আরকিটেক্টনিকাল্ বৈশিষ্ট্য থাকে না।

স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তারপর গুণীরা বলেন, এবং সার্থক স্থাপত্যে স্থপতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর নিখুঁত সামঞ্জস্য করার পর সেগুলোকে অলঙ্কার সহযোগে সুন্দর করে তোলেন। অধম একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। কিন্তু এ গোলক-ধাঁধায়ও সে ঢুকতে নারাজ। দিল্লীর দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আমে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, তুগুলুক যুগের স্থাপত্যে অলঙ্কার প্রায় নেই—পাঠক দিল্লী

(১) 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে' গানটি সার্থক, এবং এই নীতির প্রকটতম উদাহরণ।

দেখার সময় এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন^২। অথচ দুইই সার্থক রসস্থিতি।

এই সামঞ্জস্য যদি খাড়াই চওড়াই—অর্থাৎ মাত্র দুই দিক—নিয়ে হয় তবে সেটা ছবি। শুধু সামনের দিক থেকে দেখা যায়। তিন দিক নিয়ে—তিন ডাইমেনশনাল—হলে সেটা ভাস্কর্য কিংবা স্থাপত্য। কিন্তু অনেক সময় মূর্তির পিছন দিকটা অবহেলা করা হয় বলে সেটাকে শুধু সামনের দিক থেকে দেখতে হয়। গড়ের মাঠের যে সব মূর্তি ঘোড়-সওয়ার নয় সেগুলো পিছন থেকে দেখতে রীতিমত ধারাপ লাগে (বস্তুত এই সমস্তা সমাধানের জন্যই অনেক নিরীহ লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে) এবং বাস্তুগুলো পিছন থেকে রীতিমত কদাকার বলে সেগুলোকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দেওয়া হয়—যাতে করে পিছন থেকে দেখাব কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি জলের কাছে রয়েছে বলেই ঐ সমস্তাটির সমাধান হয়েছে—জলে সাতরাতে সাতরাতে মূর্তির পিছন দিকে তাকাবে ক'জন লোকে?

কিন্তু স্থাপত্যের বেলা সেটি হবার জো নেই। স্থাপত্য এমন হবে যে সেটাকে যেন সব দিক থেকে এবং বিশেষ করে যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। কোনো জায়গা থেকে যদি, ধ্বন, মনে হয়, ছোটো মিনার এক হয়ে গিয়ে কেমন যেন দেউড়ীটাকে ঢেকে অশ্রিয়দর্শন করে তুলেছে তবে বুঝবেন স্থপতি আটের কোনো একটা সমস্তার ঠিক সমাধান করতে পারেন নি বলেই এস্থলে তাল কেটেছেন, অর্থাৎ রসভঙ্গ করেছেন।

মসজিদ মাত্রেই একটা খুঁত, ঠিক এই কারণে, থেকে যায়। শাস্ত্রের হুকুম মসজিদের পশ্চিম দিক যেন বন্ধ থাকে, যাতে করে নমাজীদের সামনে কোনো বস্তু তাব দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করতে পারে। ফলে বাধ্য হয়ে স্থপতিকে পশ্চিম দিকে দিতে হয় খাড়া পাঁচিল। এটার সঙ্গে আর বানবাকি তিন দিক কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না বলে, মসজিদ শুধু তিন দিক থেকে দেখা যায়। ধর্মতলার টিপ্পু স্থলতানের মসজিদ কিছু উত্তম রসস্থিতি নয়—দক্ষিণী ঢঙের গম্বুজগুলোই যা দেখবার মতো—কিন্তু পাঠক সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই সমস্তাটা বুঝে যাবেন। দিল্লীর পুরনো মসজিদে-মসজিদে পাঠক দেখবেন, স্থপতি কত রকম চেষ্টা করেছেন এই সমস্তা সমাধানের।

২ ‘তুলসীর মূলে যেন স্বর্ণ দেউটি উজ্জল দশ দিক—’ এবং ‘পিকবররব নব-পল্লব মাঝারে’ দুটিই সার্থক। প্রথমটিতে অলঙ্কার নেই। অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি হলে কাব্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মেঘদূতের তুলনায় যে রকম গীত-গোবিন্দ।

সমাধি, রাজপ্রাসাদ, বিজয়স্তম্ভ সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোনো বাধাবন্ধক নেই। তাই সেগুলোতে এ অপরিপূর্ণতা থাকা মারাত্মক। সচরাচর থাকেও না।

পূর্বেই নিবেদন করেছি সার্থক স্থাপত্য যে-কোনো জায়গাতে, যে-কোনো দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখা যায়। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, সব চেয়ে ভালো কোন্ জায়গা থেকে দেখা যায়? উক্ত মোগল স্থাপত্যমাত্রেরই স্থপতি এর নির্দেশ নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। স্থাপত্যে পৌছবার বেশ কিছুটা আগে যে প্রধান তোরণদ্বার (দেউড়ি—গেটওয়ে) থাকে—এরই উপর নহবংখানা—তার ঠিক নীচে দাঁড়ালেই স্থাপত্যের পবিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পাববেন। সাধারণত ছবি এ-জায়গা থেকেই ভালো ওঠে। আব যদি নিজের রসবোধ তার সঙ্গে সংযোজন করতে চান, তবে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেউড়ির আর্চবন্ধ ছবি তুললে তাতে ‘ঐসথেটিক ইফেক্ট’ আসবে—যদিও মূল স্থাপত্যের কিছুটা হয়ত তাতে করে কাটা পড়বে।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলাব আছে, কিন্তু আমাব মনে হয় স্থাপত্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত সে আলোচনা তোলাই সঙ্গত।

*

*

দিল্লীর স্থাপত্য তাব বাজবংশীয়রাই ভাগ কবা যায়।

॥ ১ ॥ দাস বংশ

কুতুব মিনার, কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ, ইলতুতমিশের সমাধি। (কুওওতুল ইসলাম মসজিদের আঙ্গিনায়—সেহ্ন—চন্দ্ররাজা নির্মিত একটি শতকবা নিরানব্বই ভাগেব লৌহস্তম্ভ আছে। এটি ও মসজিদের খামগুলো হিন্দুযুগেব।) —সব কটি কুতুবের গা ঘেঁষে।

॥ ২ ॥ খিলজী-বংশ

আলাউদ্দীন খিলজী নির্মিত ‘আলা-ই-দবওয়াজা’—কুতুবের গা ঘেঁষে। আলাউদ্দীন কিংবা তাঁব ছেলের (‘দেবল-দেবীব’ বন্ড) তৈরী মসজিদ—দিল্লী-মথুরা ট্রাক রোডেব উপর (নিউ দিল্লী থেকে মাইল খানেক) নিজামউদ্দীন আউলিয়া^৩ দবগাব ভিত্তব^৪।

॥ ৩ ॥ তুগলুক-বংশ

গিয়াসউদ্দীন তুগলুক^৫ নির্মিত আপন সমাধি—কুতুব থেকে মাইল তিনেক

৩, ৫ ‘দৃষ্টিপাতে’ উল্লিখিত ‘দিল্লী দূর অস্ত’ কাহিনীর নায়কদ্বয়। গিয়াসের ছেলে ‘পাগলা’ রাজা মহম্মদ তুগলুকের তৈরী ‘আদিলাবাদ’-এর ভগ্নাবশেষে বিশেষ

দূরে তাঁর-ই নির্মিত তুগলুকাবাদের সামনে। তুগলুকাবাদ।

কিরোজ তুগলুক নির্মিত হাউজ খাস—দিল্লী থেকে কুতুব যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে। কিরোজ নির্মিত কিরোজশাহ-কোটলা,—দিল্লী এবং নয়াদিল্লীর প্রায় মাঝখানে। (অত্যাশ্রয় ব্রহ্মবীর ভিতর এখানে আছে একটি অশোকস্তম্ভ; কিরোজ এটাকে দিল্লীতে আনিয়ে উচ্চ ইমারত বানিয়ে তার উপরে চড়ান।)

॥ ৪ ॥ সৈয়দ এবং লোদীবাংশ

লোদী গার্ডেনস্—নয়াদিল্লীর লোদী এস্টেটের গা ঘেঁষে—ভিতরে আছে, (ক) মুহম্মদ শাহ সৈয়দের কবর, (খ) সিকন্দর লোদীর তৈরী মসজিদ এবং মসজিদের প্রবেশগৃহ, (গ) অজানা কবর এবং (ঘ) সিকন্দর লোদীর কবর।

ইসা খানের কবর—হুমায়ূনব কবরবাবাইরে। যদিও পরবর্তী যুগে, তবু লোদীশৈলীতে তৈরী।

॥ ৫ ॥ মোগল-বাংশ

বাবুর কিছু তৈরী কবার সময় পান নি। কেউ কেউ বলেন, পালম গ্রার-পোটের সামনে যে দুর্গের মতো সরাই এটি তাঁর হুকুমে তৈরী। এতে ব্রহ্মবীর কিছুই নেই।

হুমায়ূনও এক পুরনো কিল্লা (আশনাল স্টেডিয়ামের পিছনে) ছাড়া কিছু করে যেতে পারেন নি। পুরনো কেল্লারও কতখানি তাঁর, কতখানি শের শাহ'র, বলা শক্ত। কেল্লা ভিতরে মসজিদটি কিন্তু শের শাহ'র তৈরী এবং এর শৈলী পাঠান মোগল থেকে ভিন্ন। সাসারামে শেরের কবর সৈয়দ-লোদী শৈলীতে।

হুমায়ূনের বিধবার—আকবরবাব মাতার—তৈরী হুমায়ূনের কবর। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ সামনে, দিল্লী-মথুরা রোডের ওপাশে।

আকবরের কীর্তি-কলা আশ্রিতে—সেকেন্দা ফতহ-পুর সিক্রী, আশ্রা দুর্গ। ঐ সময়ে তৈরী দিল্লীতে আছে আংকা খান, আজিজ কোকলতাশ, আব্দুর রহীম খান খানা ও আদহম খানের কবর।

শাহজাহান—দিল্লী দুর্গ বা লাল কিল্লা। তার-ই সামনে চাঁদনী চৌকের

কিছু দেখবার নেই। মুহম্মদ এবং নিজামউদ্দীনব মিশ্র কবি-সম্রাট আমির খুসরো (‘দেবল-দেবীর’ প্রেমের কাহিনী ইনিই প্রথম ফার্সীতে লেখেন) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর কবর নিজামউদ্দীনের দরগাহ ভিতর।

৪ ইলতুতমিশেব কব্রা সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার যে কবর দিল্লীতে আছে সেটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন।

কাছে জাম-ই মসজিদ।

ঔরঙ্গজেব—লাল কিলার ভিতর মোতী মসজিদ।

ঔরঙ্গজেবের ভগ্নী রৌশনারার নিজের তৈরী সমাধি—রৌশনারা-গার্ডেন্সের ভিতর।

ঐতিহাসিক মাঝেই জানেন, ঔরঙ্গজেবের পরের বাদশাদের অর্থ ও প্রভাব দুই-ই কম ছিল বলে এরা প্রায় কিছুই করে যেতে পারেন নি। যেটুকু আছে তাতে আলাহাবাদ সৌন্দর্য যথেষ্ট বটে, কিন্তু স্থাপত্যের লক্ষণ প্রায় নেই—স্থপতি সে-চেষ্ঠা করেনও নি। এর ভিতর উল্লেখযোগ্য জাহানারা, মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলা, এবং দ্বিতীয় আকবরের (ইনি রাজা রামমোহনকে ‘রাজা’ উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন) কবর। তিনটিই নিজামউদ্দীনের দরগার ভিতরে। মোগল স্থাপত্যের ‘শেষ নিশ্বাস’ সফদর-জঙ্গের সমাধি ও তৎসংলগ্ন মসজিদ—কুলোকে বলে এটার মার্বেল আদুর রহীম খান খানার কবর থেকে চুরি কবা। ইমারতটি যদিও অপেক্ষাকৃত বহু তবু তার সৌন্দর্য নিম্নশ্রেণীর, কচির বিলক্ষণ অধোগতি এত স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছবিতে হুমায়ূনের কবর, তাজমহল, এমন কি আংকা খানের ছোট কবরটির সঙ্গে তুলনা করলেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। আংকা খানের কবরটি আমার বড় প্রিয় স্থাপত্য। দিল্লীর লোক এ-কবরটির খবর রাখে না, কারণ এটি নিজামউদ্দীন দরগার এক নিভৃত কোণে পড়ে আছে।

দিল্লীতে তিনটি বড় দরগা আছে। প্রথমটি কুৎবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর। ইনি কুৎবউদ্দীন আইবকের গুরু ছিলেন। অনেকের ধারণা আইবক গুরুর স্মরণে কুতুব মিনার নির্মাণ করেছিলেন। দরগাটি কুতুব মিনারের কাছেই এবং ‘কুতুব-সাহেব’ নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়টি নিজামউদ্দীন আউলিয়ার এবং তৃতীয়টি নাসিরউদ্দীন ‘চিরাগ দিল্লী’র। দরগাটি দিল্লী থেকে মাইল তিনেক দূরে।

প্রথমটির পশ্চিম দাস আমলে, দ্বিতীয়টির খিলজি আমলে এবং তৃতীয়টির তুঘলুক আমলে। সেই যুগ থেকে শেষ-মোগল পর্যন্ত এসব দরগাতে বহু ভক্ত নানা ইমারত গড়েছেন বলে অল্পের ভিতর সব স্থাপত্যেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চোখ কিছুটা না বসা পর্যন্ত এসব জায়গায় গবেষণা করা বিপজ্জনক।

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই।

বহু স্থপতির বহু একসপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ কায়লা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কৃতুব প্রথম এবং শেষ একসপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়সুভক্ত পূর্বে কেউ করে নি ; কাজেই গুণীজনের বিশ্বাসের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে ? কানিংহাম, ফাণ্ডসন, কার স্টিফেন, স্তর সৈয়দ আহমদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এব কোনো উত্তর দিতে পারেন নি।

কৃতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে ‘বাশী’ ও ‘কোণে’র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাশী, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কি ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় কিরোজ তুগলুক (যিনি ‘অশোক স্তম্ভ’ দিল্লী আনেন ; ইনি যেমন নিজেকে সোৎসাহে ইমারত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্তর ইমারত মেরামত করে দিতেন— দিল্লীর অতি অল্প রাজ্যতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বেল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদীরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কি ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতুহলের অন্ত নেই।^৬ দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কি রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষবক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সেকল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্‌ দ্যালোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে ?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা ! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মাল-মশলা। গম্বুজ, খাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী ! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত ! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোট করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো ‘বাশী’, কখনো ‘কোণে’র নকশা কেটে।

৬ গেল শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কৃতুবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যালকনি (গ্যালারির) রেলিঙগুলো ছিল বলে তিনি সেখানে চারপাশের নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ অর্থাৎ মোমাইছির চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় ‘নিজস্ব’ কল্পনাপ্রসূত একটা মুকুট পরান। সেইটে দেখে দিল্লী-ওলারা সত্যাসে তারস্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বৎসর পরে লর্ড কার্জন সেই মুকুট কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন।

‘প্রদর্শনে’র এরকম চূড়ান্ত পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আব তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশী এবং কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারু-শিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভুল হয় নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, কোনো ইমারতে হিন্দু প্রাধান্য বেশী। আট শত বৎসর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্য) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমাবত গড়েছেন কিন্তু ‘কুতুবের চেয়েও ভালো মিনার গড়বো’ এ সাহস কেউ দেখান নি। যে ইংবেজ দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।^৭

আলাউদ্দীন খিলজীর মত দুঃসাহসী রাজা ভাবতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন, কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম্ সাইজ আছে—অর্থাৎ যার চেয়ে বড় হলে ইমারত খাবাপ দেখায়, ছোট হলেও খাবাপ দেখায় (সর্ব কলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অগতম মূলসূত্র) —কাজেই আলাউদ্দীনের চূড়া ডবল হহে ফল কি ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে-না-হতেই ওপাবের ডাক খিলজীর

৭ অন্তরলনি মন্ডুমেণ্টে কোনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুতুবের সঙ্গে তুলনা করা অগাধ—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালান কোঠার সঙ্গে কেউ তাকের তুলনা করে না।

কানে এসে পৌঁছল যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসেবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান মোগল বিস্তার মিনারেট গড়েছে, কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন স্তম্ভাভা করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে ‘নোয়াটুকু’র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ূনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লী-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে গুজরাতির রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনো মিল নেই এবং বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমদের—এঁরই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানী সিপ্রিয় মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপটকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুল্যতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পবে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অল্পপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অল্পম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

কুতুবের সঙ্গে সঙ্গে—আসল কুতুব তৈরী হয় প্রথম তলা থেকে নমাজের আজানের জঙ্ঘা—নির্মিত হয় কুওওতুল ইসলাম মসজিদ। এ মসজিদে এখন দর্শনীয় তার উন্নতদর্শন তোরণ (আর্চ) এবং স্তম্ভগুলি। ভাবতীয় কারিগর তখনো জোড়ের পাথর (কী-স্টোন) তৈরী করে তাব গায়ে গায়ে চোঁকো পাথর লাগিয়ে আর্চ বানাতে শেষে নি বলে^৮ আর্চের সঙ্গে জোড়া বাকি ইমারত ভেঙে

৮ ইঞ্জিনিয়ারিং স্থাপত্যের অংশ বটে কিন্তু বিভিন্ন স্থাপত্য-রস আধাদানের সময় তার স্থান অতি নীচে। আর্চ, ভোম বানাতে ‘কী-স্টোন’ সে (২য়)—২৫

পড়েছে; কিন্তু রসের বিচারে এ আর্চটি এখনো অতুলনীয়। এর শাস্ত গান্ধীর্ষ, আপন কোলীজ্জই সুপ্রতিষ্ঠিত ঋজু অবস্থিতি নিত্যন্ত অরসিক জনেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পরবর্তী যুগে বহু জার্মগায় বিস্তার আর্চ নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এর প্রসাদশুণ এখনো অতুলনীয়।

এবং এর গায়ে যে হিন্দু কারুকার্য তার সুনিপুণ দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং মন্দাক্রান্ত গতিচ্ছন্দ দেখে যেন স্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যেন অজস্র ইলোরার চিত্রকর শিলার দৃষ্টিতে মিলে প্রাণের আনন্দে এর প্রতিটি রেখা প্রতিটি বক্র প্রতিটি চক্র একে চলেছে। এদের নিশ্চয়ই বলা হয়েছিল যে মুসলমান স্থাপত্যে পশুপক্ষী আঁকা বারণ। সেইটে মেনে নিয়ে কী আশ্চর্য নৈপুণ্যে ‘শেষনাগ’ মতিফকে এরা সাপ না বানিয়েও সাপ একেছে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কলার সঙ্গে এরা কুরানের হরফও খোদাই করেছে সমান দক্ষতা নিয়ে। উভয়ের সংমিশ্রণ অপূর্ব, রসস্বষ্টী অসামান্য।

কুওতুল ইসলাম মসজিদের থামগুলো হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির থেকে নেওয়া। এদের গায়ে দর্শক বিস্তার পশুপক্ষী, বৃদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর নানা মূর্তি দেখতে পাবেন। মসজিদ গড়ার সময় এগুলোর গায়ে পলস্তরা লাগিয়ে মূর্তিগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পলস্তবা খসে যাওয়াতে এখন আবার দেখা যাচ্ছে।

এভাবে প্রতিটি ইমারত নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা হলে দশ-ভূমি কেতাব লিখতে হয়—এবং সেগুলো কেউ পড়বে না। আমার উদ্দেশ্য—বাকি ইমারতগুলো দর্শক যেন নিজে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

যেমন, কুওতুল ইসলামের গম্বুজ রসের ক্ষেত্রে নগণ্য—তার পরের ইমারত ইলতুংমিশের সমাধিতে সেটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—খিলজী যুগে সেটা সুন্দর হতে

ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়ারী ব্যাপার পাঠক চেষ্টার অভিধান দেখেই বুঝে নিতে পারবেন। এসব স্থাপত্যের পশ্চাতে কী অদ্ভুত ‘ইঞ্জিনিয়ারিঙ’ স্থিল আছে তার আলোচনা আমি আদর্শেই করি নি। যেমন, কুতুবের আসল কেরামতি যে এত অল্প গোড়া (বেল) নিয়ে এত উঁচু মিনার আর কোথাও হয় নি। অদ্ভুত ভারসাম্যই (ব্যালান্স) তার কারণ। এ যেন বাজিকর হাতের আজুলের ডগায় বিশগজী বাঁশ খাড়া করে রেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারী হিসেবে কণামাত্র ভুল থাকলে কুতুব জড়মুড়িয়ে পড়ে যেত।

আরম্ভ করেছে, তুগলক যুগে গম্বুজ রীতিমত রসস্বষ্টি করে কেলেছে, সৈয়দ-লোদী যুগে সে পৃথিবীর আর দশটা গম্বুজের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে, হুমায়ূনের গম্বুজকে তো কেউ কেউ তাজের চেয়েও ভালো বলেছেন, আর তাজের তদ্বৎ গম্বুজ, শুনি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখলে পরে তার ক্ষণ কটিকে নাকি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

কিংবা আর্চের উত্থান-পতন দেখুন। কিংবা দেখুন ছত্রির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ। হুমায়ূনের কবর ও তাজের ছাতের উপরকার ছত্রির মতো ছত্রি পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। স্থাপত্যে ছত্রির ব্যবহার মুসলমানেরা এদেশে এসে শিখল। তাই এদেশের স্থাপত্যের সাই-লাইন ইরান তুরানের স্থাপত্যকে এ-বাবদে অনায়াসে হার মানায়।

কিংবা দেখুন, ভিতবকার কারুকার্য, যার পরিসমাপ্তি তাজের ‘মর্মরস্বপ্নে’।

দাস-যুগের শেষের দিকে মুসলিম জিওমেট্রিক ডিজাইনের বাড়াবাড়ি হয়েছিল, খিলজি-যুগে আবার ভারসাম্য কিয়ে পেল।

তুগলক যুগে পাবেন দার্ঢ্য—শক্তিশালী স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা। অলঙ্কার এখানে বাহুল্যরূপে বর্জিত। দেয়াল বাক্স—যেন পিরামিডের ঢঙে টারচা করে একে আরও মজবুত করার চেষ্টা হয়েছে, গম্বুজও শক্তির পরিচায়ক। লাল পাথর, কালো স্লেট (তখনো কালো মার্বেল এ-দেশে আসে নি) এবং মর্মরের ধবল এই তিন রঙের খেলা নিয়েই স্থপতি এখানে অলঙ্কারহীন দৃঢ়তার একঘেষে মিমি ভেঙেছেন। গিয়াসউদ্দীন তুগলকের কবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

সৈয়দ-লোদী বংশব্রয়ের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই ছিল সামান্য। তাই এঁদের কলা-প্রচেষ্টা ছোট ইমারতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ওদিকে ইরান-তুরানের সঙ্গে যোগস্বত্র ছিল হয়ে গিয়েছিল বলে সে-দিক থেকে নব নব অনুপ্রেরণাও আসছিল না। ফলে তাদের স্থাপত্যে হিন্দু প্রাধান্ত বেশী এবং ছোট ইমারতে অলঙ্কারের প্রয়োজন বড় ইমারতের চেয়ে বেশী। কম্পজিশনেও এই প্রথম হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হয়ে এল। বস্তুত এই আটকোণ ও লা ইমারত এবং আট দিকের বেরা বারান্দা বৌদ্ধরূপ এবং তার প্রদক্ষিণচক্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হিন্দুরা স্তম্ভ-নির্মাণে চিরকালই দক্ষ, ছত্রিও তাদেরই স্বষ্টি। হিন্দু ছজ্জা (ড্রিপ-স্টোন—এগিয়ে আসা কার্নিসের মত) ছাতের বুটী ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে প্রয়োজন—ইরানে দরকার নেই বললেও চলে—সে-সব এসে এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তুগলক প্রভাব এখানে স্তম্ভ সামান্য—কবল মাত্র টারচা

জন্তে কিছুটা পাওয়া যায়। সৈয়দ-লোদী স্থাপত্য দেখে মাছুষ হতবাক হয় না সত্য, কিন্তু এর এমন একটা কমপেন্ডেন্স বা ঠাস-বুহনি আছে বা অল্প স্থাপত্যে বিরল। অল্প দিয়ে রসস্থিতিতে সৈয়দ-লোদী প্রথম না হলেও প্রধানদের একজন।

মোগল-যুগ আরম্ভ হল হুমায়ূনের কবর দিয়ে। সেখানে ইরান-তুরানের প্রাধান্য। কিন্তু ছবি এবং পদ্মফুলের ডিজাইন এখানে প্রচুর এবং কারুকার্যেও হিন্দু প্রাধান্য বেশী। সিক্রিতে ইরানী ভাব এত কমে গিয়েছে যে, কোনো কোনো ইমারতে কার প্রাধান্য বেশী কিছুতেই স্থির করা যায় না। সেকেন্দ্রার গম্বুজ শেষ করার পূর্বেই আকবর ইহলোক ত্যাগ করেন—তাই বলা শক্ত সম্পূর্ণ সমাধি মনে রসের কোন্ ভাবের উদয় করে দিত। দিওয়ান-ই-খাস ও আম্ যে অলঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে সত্য তো পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এত দিন বলা হত, পার্থান স্থাপত্যে স্থপতি ও স্বর্ণকার একজোটে কাজ করেছেন। দিওয়ান-ই-খাস্ ও আম্ দেখে লোকে বলল, এইবারে এসে জহরীও যোগ দিয়েছেন।

মোগল-কলা এত বিচিত্র ও ভিন্নমুখী যে, তাকে গুটিকয়েক সূত্রে ফেলা প্রায় অসম্ভব। তবে স্থাপত্যের বিকাশ দেখতে হলে সব চেয়ে উত্তম পন্থা হুমায়ূনের কবর ও তাজ দুটি মিলিয়ে দেখা। দুটোব গম্বুজ মিলিয়ে দেখুন, ছত্রিশুলো কার ভালো (এখানে বলা উচিত হুমায়ূনের ছত্রিশুলো নীল টাইলে ঢাকা ছিল; এখন উঠে গিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে—তাই আগে ছিল গম্বুজ মর্মবের সাদা, পুরো ইমারত লাল পাথরের আব ছত্রিশুলোব গম্বুজ নীল, তাজে তিনই মার্বেলের), হুমায়ূনের ভিত্তিতে এক সাব আর্চ (তার ভিত্তব দিয়ে নাচে যাওয়া যায়), তাজে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মাহ, গুলদস্তাজ (মিনাবিকাবও ছোট মিনারিকা যাব শেষ হয় অর্ধকুট পদ্মকোরকে) দুই ইমারতেই এক বকম, নির্মাণকালে হুমায়ূনে ছিল লাল-সাদা-নীলব সামঞ্জস্য, তাজ শুভ্র-ধবল এবং সবচেয়ে বড় পার্থক্য—হুমায়ূনে মিনারিকা নেই, তাজেব চাব কোণে চাবটি। আপনার কোনটি ভালো লাগে? আব এই শৈলীর অধঃপতন দেখতে হলে দেখুন সফদরজঙ্গের কবর—ওয়েলিংডন অ্যারোড্রোমেব কাছে।

স্পষ্ট দেখছি হুমায়ূনে দাঁঢ়া, তাজ মাপুষ।

তার কাবণ, অনেক ভেবে আমি মন স্থির করেছি, হুমায়ূনের সমাধি নির্মাণ করেছেন তাঁর বিদ্বা—স্বামীর জহ। তাই তাতে পৌরুষ সমাধিক। তাজ নির্মাণ করেছেন দিবচকাত্তব স্বামী—গ্রিষাব জহ। তাই সেটিতে লালিত্য বেশী।

বেজে না চরণে চরণে

বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছে নাকি নবীন সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা নিয়ে গিয়ে চাইদের সার্টিফিকেট চান। বেচারীদের বিশ্বাস, চাইবা উত্তম সার্টিফিকেট দিলে তাঁরা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি পেয়ে যাবেন।

চাইদের কেউ-কেউ সার্টিফিকেট দেন, কেউ লেখককে অগ্নি চাইদের কাছে পাঠিয়ে দেন, কেউ বা অস্থূষের ভান করে দেখাই করেন না। এ বাবদে পূজনীয় রাজশেখরবাবু রাজকীয় পদ্মটি বেব কবে আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি সবাইকে অবাতরে সার্টিফিকেট দেন—এমন কি মাঝে-মধ্যে না চাইলও দেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শেষের কটি দিন শান্তিতে কাটাতে চান। সোজা স্বজি ‘দেব না’ বললে তাঁকে আব বাঁচতে হবে না, এবং ‘দেব-দিছি’ ‘দেব-দিছি’ করে টাল-বাহানা দেবার মতো শক্তিও তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ অমিতবীৰ্য পুরুষ-সিংহবৎ ছিলেন, উমেদওয়ারদের ঠেকাবার মতো তাঁর সেক্রেটারিও ছিলেন—তবু তিনিও অকাতরে সার্টিফিকেট দিতেন। প্রাণের প্রতি তাঁর অহেতুক কোনো মায়াও ছিল না—‘মরণ রে তুহঁ মম শ্রাম সমান’ এ গান তিনি রচেনেচেন অল্প বয়সেই—তবু তিনি ‘না-চাহিতে যারে দেওয়া যায়’ ভাবখানা মুখে মেখে পিলপিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পথস্ত তিনি একখানা দিয়েছিলেন—অবশ্য সাহিত্যেব জ্ঞান নয়, চাকরির জ্ঞান। আমি তাঁর ‘কৃত্তী ছাত্র’ এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্রামাপ্রসাদবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্রামাপ্রসাদবাবু বিচক্ষণ লোক, তিনি আমাকে চাকরি দেন নি। অগ্নি চেষ্টা করাব জ্ঞান সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্রামাপ্রসাদবাবু রবিবাবু সার্টিফিকেটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠিব মূল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।

এবং যারা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিতে রাজী হন না, তাঁদের দু-একজনকে আমি চিনি। এবং এ কথাও বিলক্ষণ জানি, তাঁরা যে-সব বইয়ের সার্টিফিকেট দেওয়া দূরে থাক, গাল-গালাজ পর্যন্ত করেছেন তারই অনেকগুলো বাজারে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। রাজশেখরবাবুর ‘দুই সিংহ’ গল্পে আছে কোনো লেখক তাঁর বই কিছুতেই বিক্রি হচ্ছে না দেখে কেনো এক বাবা সাহিত্যিককে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নেয়, বইখানা অভিশয় অল্লীল এবং কদম্ব। ফলে নাকি সে বইয়ের প্রচুর কাটতি হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব শোনা কথা, কিংবা কাল্পনিক। রবিবাবু টাকের ঔষুধের প্রাংশসা

করাতে ওয়ুধের বিক্রি বেড়েছিল কি না তার সঠিক স্টাটিস্টিক্স এখনো দেখি নি।
উন্টোটাও সঠিক জানবার উপায় নেই। এ যেন আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো।
বেতারে আলিপুর বললে, 'সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে'। আপনি অবিশ্বাস করে ছাড়া না
নির্ভয়ে বেরলেন। ফিরলেন ভিজে ঢোল হয়ে। তবেই দেখুন, এমনি লক্ষীছাড়া
দফতর যে, অবিশ্বাস করেও নিষ্ফল নেই, বিশ্বাস তো করা যায়ই না।

*

*

কিন্তু একথানা বই পড়ে আমি এ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ হৃদিস পেয়েছি।

বইখানার নাম 'লিমিট অব্ আর্ট'। চল্লিশ টাকা দাম। টাউস মাল
কপিকল দিয়ে শেলক্ থেকে ওঠাতে নাবাতে হয়।

কবিতার চয়নিকা। গ্রীক-লাতিন থেকে আরম্ভ করে, ফরাসী-জার্মান-ইংরাজী-
স্প্যানিশ-রুশ তাবং ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা সংগ্রহ করে এ-চয়নিকাটি
নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সবিনয় নিবেদন করেছেন, তিনি এ-চয়নিকার
মাধুকরী করার সময় নিজের ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেন নি। তবে কি
তিনি বঙ্গবান্ধবদের রুচির উপর নির্ভর করেছেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন,
বিখ্যাত প্রখ্যাত কবিরা যে-সব অগ্রাণু কবির কবিতার প্রশংসা করেছেন তাই
দিয়ে তিনি এ-'সঞ্চয়িতা' নির্মাণ করেছেন। যেমন মনে করুন, বায়রন বলেছেন,
'পেত্রাকের এ ছত্র কটি কী চমৎকাব, কী অনির্বচনীয়।' চয়নিকাকার সেই
কবিতাটি তুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়রনের প্রশংসিটিও তুলে দিয়েছেন।
ঠিক এইভাবেই, শেকস্পীয়র আছেন গ্যোটার প্রশংসাসহ, কীটস আছেন শেলির
তাবিক্যুক্ত, এবং আরো বিস্তর চেনা-অচেনা কবি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর চেয়ে আর উত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এ-রকম রদ্বি, ওঁচা কবিতার সঙ্কলন
আমি জীবনে কোঁ না ভাষাতে কখনো দেখি নি।

এবং শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সর্বোত্তম বেশ কয়েকটি কবিতা তাতে বাদ
পড়েছে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, একবার এই বঙ্গভূমিতেই এ-ঘটনা ঘটেছিল।
রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতা বাঙালী পাঠকের ভালো লাগে তারই ভোট
নিয়ে একখানি 'চয়নিকা' রচিত হয়েছিল। তাতে এত বেশী ভালো কবিতা
বাদ পড়ে গিয়েছিল, এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখা ঢুকে গিয়েছিল যে এর পর
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে চয়ন করেন সেটিই 'সঞ্চয়িতা' এবং বাজারে সেইটেই চালু।
এস্থলে পাঠক অবশ্য বলবেন, 'রাস্তার লোকের ভোট নিয়ে কি আর উত্তম

কবিতা-সঞ্চয়ন হয়? ওদের কীই বা বুদ্ধি, কীই বা ক্ষতি।' অতএব যে বিদেশী চয়নিকা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেইটেতেই কিরে যাই।

অর্থাৎ ভালো ভালো কবি কর্তৃক নির্মিত সঞ্চয়নও উত্তম হল না কেন?

তার প্রধান কারণ, সাধারণ এবং স্মৃতিসম্পন্ন পাঠক কবিতা পড়ে কিংবা গান শুনে যদি আনন্দ পায় তবেই সে বলে, কবিতা কিংবা গানটি ভালো। অর্থাৎ তার কাছে যে-কোনো বস্তু রসোত্তীর্ণ হলেই হল। কিন্তু কবি যখন অল্প কবির কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর নজর যায় কবিতার গান, ভাষা, ছন্দ, মিল—এক কথায় আঙ্গিকের দিকে। কবিতাটি রচনা করতে গিয়ে কবিতা-কার কি কি মালমশলা নিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাকে কোন্ কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন কি না পাঠক-কবির দৃষ্টি থাকে প্রধানতঃ সেই দিকে। কিংবা মনে করুন, আপনি আমি যখন গান শুনি তখন গানটি মিষ্ট এবং মর্মস্পর্শী হলেই হল। পক্ষান্তরে আকছারই দেখাবেন, বদখদ গলা নিয়ে, বিদকুটে মাঙ্কাতার আমলের একটা সম্পূর্ণ অজানা রাগ পরলে এক ছাড়-চিমসে গাওয়াইয়া। তবলচীও বাজাতে লাগলো এমন এক ভাল যে তার কোথায় সম, কোথায় ফাঁক কিছুই মালুম হচ্ছে না। আপনি বিরক্তিতে উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময় দেখেন হঠাৎ মহক্ষিলের অল্প গাওয়াইয়া শ্রোতার 'আগা, আচা, ক্যাবাং, ক্যাবাং' বলে অচৈতন্য প্রায়। কি হল? ব্যাপারটা কি? না এই ওস্তাদগু ওস্তাদ এক আসন অতি-অতি কোমল এমন এক কঠিনস্ত কঠিন জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে আসা এক পানিপথ নাকি ভয় করেছেন যা পূর্বে নাকি কেউ কখনো করতে পারে নি—না, তানসেন নাকি মাত্র ছ'বার পেরেছিলেন, ওস্তাদ আব্দুল কবীম কুলে একবার! বাস, হয়ে গেল!

অবশ্য সব পাঠক কবি কিংবা শ্রোতা-গাওয়াইয়াই যে শুদ্ধমাত্র আঙ্গিক এবং টেকনিকল স্টিলের দিকে এক-চোখা দৈত্যের মতো তাকিয়ে থাকেন সে কথা বলছি না—তবে ঐ হল গিয়ে নিয়ম, এবং পূর্বোন্নিপিত 'লিমেট্‌ অব্‌ আর্ট' ঐ পর্যায়ের বই।

সমসাময়িক লেখক যখন অল্প লেখকের লেখা পড়েন তখন আরেক মুশকিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা খোলসা করি।

এই মনে করুন, গৌরকিশোর ঘোষ রম্য-রচনা লিখে দেশে নাম করে ফেলেছেন। আমারও বাসনা গেল, ঐ লাইনে যখন ব্যাতি আছে, পরস্যাও থাকতে পারে, তখন আমিই বা বাদ যাই কেন? গৌরকিশোরের লেখায়

অনুসরণে আমিও কয়েকটি রম্য-রচনা লিখে নিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, তাঁর এক নবীন শাকরেন্দ্র জুটলো, তাঁর অনুসরণে এবার একটা ‘স্কল’ ‘ঘরানা’ গড়ে উঠতে চললো। আমার রচনা যে আদর্শেই ‘রম্য’ হয় নি, এমন কি এরে ‘রচনা’ও কওয়া যায় না সেদিকে তাঁর নজরই গেল না। তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, ‘তোকা লেখা, খাসা লেখা, বেড়ে লেখা।’ আমিও খুশী। অবশ্য এ-সার্টিফিকেট আমি এখনো কাজে লাগাই নি। সাহিত্যিকের সার্টিফিকেট-হাল পাঠকের পানি পাবে কি না সে বাবদে আমার মনে এখনো ধোঁকা রয়ে গেছে।

পঞ্চাশের দশরাসী কবি-সম্রাট মল্লিকের নাকি তাঁর তাবৎ কোঁতুকনাটা পড়ে শোনাতেন তাঁর নিরক্ষর বাড়িউলীকে। বাড়িউলী যে-সব রসিকতা শুনে হাসতো, তিনি সে-সব রসিকতার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন, যেগুলো শুনে গম্ভীর-মূর্তি ধারণ করতো সেগুলো তিনি নির্মমভাবে কেটে দিতেন। অথচ আজ তো গুণীমূর্তি সবাই তাঁর নাট্য দেখে আনন্দ লাভ কবে। এই কয়েকদিন মাত্র হল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত তাঁর বাঙালি অনুবাদ কলকাতার বসিক সমাজকে যা হাসালো তা দেখলে স্বয়ং মল্লিকেরই অবাক হতেন।

তবে কি ঐ বাড়িউলী অতিশয় সুরসিকা ছিলেন? এ-পর্যন্ত কেউ তো তা বলেন নি। তবে কি ঠুঁকে না শুনিয়ে সে-যুগের নামকরা সমঝদারকে শোনাতে মল্লিকের কাব্য আরো রসোত্তীর্ণ হত? বলা অসম্ভব।

*

*

যে নল চালিয়েছিলুম, সে তবে এখন এসে খাড়া হল কোথায়, পাকড়ালো কাকে? অর্থাৎ হরে-দরে দাঁড়ালো কি?

আমার বিশ্বাস এ-নল কোথাও দাঁড়াবে না। এ-আলোচনায় কখনকালেও কোনো হাদিস পাওয়া যাবে না।

তবে যদি শোধান, আমাব ব্যক্তিগত বিশ্বাস কি, তবে আমি নবীন লেখককে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো, সার্টিফিকেট কুড়োতে যেয়ো না। ওতে কানাকড়ির লাভ নেই। ঐ যে পাঠক-সম্প্রদায় নামক কিম্ব দূত কিম্ব আকার জীব আছে সে যে কখন কার প্রতি সদয়, কার প্রতি নির্দয়, কখন কাকে আশা-গাছের শাখায় চড়ায়, আর কখন কাকে নির্মমভাবে জিল্ট করে তার হাদিস কেউ কখনো পায় নি।

অবশ্য আপনি যদি ভবিষ্যৎ যুগের পাঠকের জন্ত লেখেন তবে আপনার কোনো ভাবনা নেই। তবে সে-কথাটা পুস্তকের অবতরণিকায় বলে দিলেই সাধু আচরণ হয়। এ বছরের তাজা মাছকে আসছে বছরের শুটকি বলে চালানোটা

জোচ্ছুরির শামিল। পঞ্চাশ বছর পরে যে র মাল মেচোর লিক্যোর হবে সেটা আজ বাজারে ছাড়া ধান্না। তার জন্য আজ যে-লোক সার্টিফিকেট দেয় সেও ধান্নাবাজ।

*

*

হালে আকাশে এক নয়া চিড়িয়ার উদয় হয়েছে।

নিজের সার্টিফিকেট নিজে লিখে, কিংবা/এবং চেলা-চামুণ্ডাদের সামনে নিজের লেখার গুণকীর্তন করতে গিয়ে পয়েন্ট বাংলাে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নিয়ে কিংবা/এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের অগ্ন্যন্ত লেখাতে সে লেখা সঙ্গক্ষে দারুণ-দারুণ রেকর্ডেন্স ঝেড়ে—সব-কিছু প্রকাশকে দিয়ে বিজ্ঞাপনরূপে ছাপিয়ে দেওয়া।

এ সিস্টেমের সঙ্গে ‘আধুনিক বাঙলা কবিতা’র বেশ মিল আছে। বাঙলা ভাষায় লেখা দেখে পড়তে গিয়ে মালুম হল যে কিছুই মালুম হচ্ছে না—এ ভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ কৃৎ তদ্ধিত আপনি কিছুই জানেন না। অর্থাৎ বন্ধু বাঙলা ভাষার মুখোশ পরে অজ্ঞানাজ্ঞন এসে মেরেছে চাকু।

প্রকাশকের মুখোশ পরে এখানে আসে লেখক—হাতে চাকু! পাঠক, সাবধান !!

রবীন্দ্রনাথ কি যেন গেয়েছেন, দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে ভরাবো না ? এ তার উট্টো পিঠ ; যিত্তের বেশে এসেছে বলে তোমারেই যত ভয়।

এ সিস্টেম পাঠক-ব্যাঙ্কারের চালানো জুয়ো-ভূমি মন্টে কার্লোর ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারবে কি না, সেই খবরের প্রত্যাশায় আছি। এযাবৎ তো কোনো সিস্টেম পারে নি।

আর যা করুন, করুন, কিন্তু পাঠকসাধারণকে আহান্মুখ ঠাউরে আপন আহান্মুখির পচা ভিম হাটের মধ্যখানে ফাটাবেন না !!

ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ইভান তুর্গেনেফের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে বহু দেশ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আপন আপন সম্রাট প্রণাম জানিয়েছেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্র পর্যন্ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এঁর, কাল ঠঁর কত লোকের মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী নিত্য নিত্য হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর হিসেব রাখতে যাবে কে ?

যার যে রকম খুশী, এর বেশী কিছু বলা যায় না।

তাই জানি, আমরা যখন গোরস্তানে যাই, তখন খুঁজি আপন প্রিয় ও পরিচিতজনের কবর। যখন কোনোও নতুন লাইব্রেরিতে ঢুকি তখন খুঁজি আপন প্রিয় লেখকের বই। তাই তুর্গেনেফের শতবার্ষিকী না হয়ে ৭৫তম যুভ্যদিনও আমার ও আমার মতো বয়স্কদের মনে দোলা লাগিয়েছে। তরুণরা লাইব্রেরিতে যে-রকম নতুন বইয়ের সন্ধান নেয়, ক্যাসিক্স পড়ে না, ঠিক তেমনি তারা তুর্গেনেফ কিংবা হাইনের শতাব্দীপ্রয়াণও স্মরণ করে না; তারা স্মরণ করে র‍্যাবো কবে হেঁচেছিলেন, ভেরেন কবে কেশেছিলেন।

তা তারা করুক। কিন্তু যখন দেখি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকও সদৃশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন র‍্যাবোর কাছে রবি ঠাকুর শিঙ, মাইকেলের অমিত্রাক্ষর উডেন্ (কাঠরস) এবং সম্পাদক-মণ্ডলীও সেগুলো পরম অদ্বাভরে ছাপাচ্ছেন তখন এঁরা যে তুর্গেনেফকে স্মরণ করবেন না সে তো জানা কথা। শুধু তাই নয়, এখন আপনারা আমার পক্ষে তুর্গেনেফ কিংবা সত্যেন দত্তকে স্মরণ করতে হলে লগুনে রঙিন হওয়াব মতো বীতিমতো সঙ্কট-সঙ্কল—রাষ্ট্রভাষায় থাকে বলে ‘খতরনাক’—সঙ্কোপরি যুগ্ম-শিবের প্রয়োজন।

আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রহুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুশীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল। আজ এঁদের অস্বীকার করতে পারব না—র‍্যাবো-এলিয়ট সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী হন না কেন।

এবং আমার মনের গোপন কোণে একটা অহেতুক ক্ষীণ আশা আছে যে, তুর্গেনেফ-প্রীতিতে আমি একেবারে একা নই। ‘বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের’ মতো ‘বরজলালে’র হাত ধরে আমাকে একাকী সভাস্থল ত্যাগ করতে হবে না। প্রতাপ রায়ের সমকালীন শ্রোতা সে-সভাতে আর কেউ ছিল না। আমার কিন্তু এখনও অনেক মুকুব্বী আছেন। তাঁরা তুর্গেনেফ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ঢের ঢের ভালো লিখতে পারেন, কিন্তু লেখেন না, কারণ তাঁরা জানেন, পাগলাগারদে স্থস্থ লোকের লক্ষণ দেখানো পাগলামি, ভেদ যেখানে রব ছেড়েছে সেখানে কোকিলের পক্ষে মৌনতাই প্রেয়—‘ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিল জলদাগমে’।

তুর্গেনেফের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি থাকতেন বিদেশে—জার্মানী এবং ফ্রান্স—এবং সেখানে বসে বসেই তিনি জানতে পেতেন কী ভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দস্তুত্ক্ষি, তলস্তয় এমন কি কার্ব নেক্রাসফেরও বিরাগভাজন হয়েছেন। ‘বিরাগভাজন’ বললে বোধ করি কমই বলা হল। তুর্গেনেফ শেষের দিকে রীতিমত এঁদের বিধেযভাজন হয়েছিলেন।

বিশেষ আসে হিংসা থেকে। এঁদের সবাই বড় লেখক। জীবিতাবস্থায়ই এঁরা দেশে প্রচুরতম সম্মান পেয়েছিলেন। তবে দূর-দেশবাসী প্রবাসী নিরীহ (‘নিরীহ’ কেন সে কথা পরে হবে) তুর্গেনেক তাঁদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলেন কেন?

এ-তথ্যটি বুঝতে পারলেই জানা যাবে লেখক হিসাবে তুর্গেনেকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্য কোন্‌খানে?

দস্তেফ্‌স্কি ও তলস্তয় জানতেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এঁদের আপন মাহাত্ম্য কোন্‌খানে। দস্তেফ্‌স্কি তাঁর প্রতি চরিত্রের গভীরতম অন্তস্তলে পৌঁছে গিয়ে তার স্বথদুঃখ, তার দুর্বলতা মহত্ব, তার প্রচেষ্টা এবং ভাগ্যে দ্বন্দ্ব’ সমাজ-প্রবাহের খরস্রোতের বিরুদ্ধে তার উজ্জান চলার আপ্রাণ প্রয়াস, কিংবা সে-স্রোতে গাঢ়লে দিয়ে ভেসে যেতে যেতে তাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত—এ সব-কিছু লোহার কলম দিয়ে পাথরের উপর খোদাই করতে পারেন, ভাস্করের মতো দৃঢ়পেশী সবল হস্তে। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর হাতে যেন দৈত্যের হাতে প্রজ্ঞাপতি। চোখে একসূত্র, বৃকে অসীম করুণা। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, একটা বিরাট এঞ্জিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। খেলাব এঞ্জিন যত তেজেই এগিয়ে আহুক না কেন, জানি, ভালো করেই জানি, সামান্য কড়ে আঙুলটি তার সামনে ধরলেই সে থেমে যাবে, কিন্তু দস্তেফ্‌স্কির এঞ্জিন পিঁপড়ের গতিতে এলেও তার সামনে যা পড়বে তার আব উদ্ধার নেই। অরসিকতম পাঠকেরও সাধ্য নেই, তাঁর বর্ণনা পড়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা না শুনে বা বুঝে থাকতে পারে! কিংবা বলব, কুমির যে-রকম ছাগলের বাচ্চাব ঠ্যাং কামড়ে ধবে ডুব দেয় নদীতে, দস্তেফ্‌স্কি সে-রকম পাঠককে নিয়ে ডুব দেন মানব-চরিত্রের অতল সাগরে। এবং আশ্চর্য, সেখানে মনি-মুক্তাব সঙ্গে সঙ্গে যে ক্রন্দ-পঙ্ক দেখি তাব প্রতিও তো ঘৃণা হয় না। মাতাল বাপের উচ্ছৃঙ্খলতায় সরল কুমারী রাত্তার বেড়া হয়ে বাপকে মাতলামোর পয়সা যোগাচ্ছে—কই লোকটাকে তো খুন কবতে ইচ্ছে কবে না। তার অসহায় অবস্থা দেখে শুধু ভগবানকে শোপাতে ইচ্ছে কবে, ‘একে বিবেকহীন পাশ্চাত্যে জন্ম দিলে না কেন? এরও তা হলে কোনো দুঃখ থাকত না, আমরাও অকরণ হৃদয়ে তাকে খুন করতে পারতুম। কিন্তু এ সব বোঝে, এ তো সব-কিছু জানে। তবে এই বক্ষা-ঝড়ের ঘণিঘায়ুর মাঝখানে মানুষকে তুমি প্রজ্ঞাপতির মতো সৃষ্টি করলে কেন?’ কিংবা হয়ত অতখানি চিন্তা করার শক্তিই পাঠকের থাকে না। মোহমান হয়ে যায় পাঠক সেই বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার সামনে—সমস্ত জীবন বয়ে বেড়ায় তার অনপসরণীয় স্মৃতি।

তলস্তয়ের রঙ্গমঞ্চ ভুবন-জোড়া বিরাট। তার পাক্ষপাত্রীদের নাম ভুলে যাই, কিন্তু চেহারা ভুলি নে। তারা রঙ্গমঞ্চে নাচছে যে যার আপন কোণে আপন আপন মণ্ডলী বানিয়ে। প্রত্যেকের আপন নৃত্য সামঞ্জস্য রেখেছে তার মণ্ডলীর সঙ্গে, মণ্ডলী সামঞ্জস্য রেখেছে আর আর মণ্ডলীর সঙ্গে—কখনও বা দুই কিংবা তিনটি মণ্ডলী একে অন্যকে ভেদ করে মিশে এক হয়ে গিয়ে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে—আর সব কটি মণ্ডলীর এ-কোণে ও-কোণে যে-কটি ছন্নছাড়া আপন মনে নাচছে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুলেছে সেই বিরাট ভুবন। বাস্তব জীবনেও আমরা এ-রকম ভুবনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই নে। তলস্তয় কতখানি পেয়েছিলেন কে জানে কিন্তু তাতে কীই বা যায় আসে। তাঁর কল্পনার ভুবন আমাদের বাস্তব ভুবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী প্রত্যক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে প্রাণবন্ত।

তলস্তয় কখনও কবিতা রচনা করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি কবি। তাঁর ভায়ুমতী দণ্ড দিয়ে তিনি যে-রকম আমাদের কল্পনার অতীত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন ঠিক তেমনি আমাদের নিত্যকার চেনা বস্তু—যে বস্তু বহুদর্শনের ফলে তার বৈশিষ্ট্য তার নবীনতা হারিয়ে ফেলেছে—তিনি সামনে তুলে ধরেন সেই চেনা রূপেই, অগচ মনে হয়, ‘কী আশ্চর্য, একে এত দিন ধরে লক্ষ্য করি নি কেন?’ এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও জেনে যাই যে, একে আর কখনও ভুলব না। তাই তাঁর পাক্ষপাত্রী দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। দস্ততেফ্‌দির চাষা কৃভাস ভদ্রকা না খেলেও সে রুশ চাষা; তলস্তয়ের চাষা অস্তহীন স্তম্ভের উপর দিগ্ধে ভেঙে চলেছে বরফের পাথার, সরাইয়ে ঢুকে সে তার চামড়ার ছেঁড়া ওভারকোট স্টোভের পাশে শুকোতে দেয়, আইকনের সামনে বিড় বিড় কবে সে মস্ত পড়ে ডান হাতের তিন আঙুলে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ক্রস্ করে, কিন্তু বার বার ভুলে যাই সে বাঙালী চাষা নয়। অবাক হয়ে ভাবি, বসিরুদ্দি, পাঁচু মোড়ল, নিজ্‌নি নভ্‌গরদের দিকে চলেছে কেন?

মহাভারতের পরেই ওয়ার অ্যাণ্ড পীস্‌।

তুর্গেনেফ দস্ততেফ্‌দির মতো প্রত্যেক চরিত্রের গোপনতম অঙ্ককারে বিদ্যুৎলেখ দিয়ে আলোকিত করতে চান না। তার কারণ বোধ হয় তুর্গেনেফ নথ্‌-শির, আপাদমস্তক ভদ্রলোক। কোনো ভদ্রলোক পরিচিত অপরিচিত কারও গোপন চিঠি পড়ে না—হাতে পড়লেও, কারও হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও। ঠিক তেমনি তার চরিত্রের গোপন দুর্বলতা তার অজানাতে সে জানতে চায় না, প্রকাশ করতে তার মাথা কাটা যায়—সে তো দুশমনের কাজ, গোয়েন্দার ব্যবসা। ভদ্র তুর্গেনেফ তাঁর নায়ক-নায়িকার দিকে তাকান শিশুর মতো সরল

চোখে ; তারা কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যতখানি আত্মবিকাশ করে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁর পক্ষে সেই যথেষ্ট। শার্লক হোমসের মতো আতঙ্গী কাচ দিয়ে তিনি তার জুতোর দাগ পরীক্ষা করেন না, পোয়ারোর মতো তাকে ক্রস-এগজামিনেশনের ঠেলায় কোণ-ঠাসা করে অটুহাস্ত করে ওঠেন না, 'ধরেছি, ধরেছি, তোর গোপন কথা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি, বল !'

অথচ শিশুর কাছে কেউ কোন জিনিস গোপন রাখে না। কবি মাজাই শিশু। তার চোখে ছানি পড়ে নি। প্রতি মুহূর্তে সে এই প্রাচীন ভুবনকে দেখে নবীন রূপে।

রুশদেশে পুশ্কিনের পর যদি কোনো কবি জন্মে থাকেন, তবে তিনি তুর্গেনেফ। তলস্তয় কবি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, আবিষ্কর্তা রূপে, আর তুর্গেনেফ কবি অগ্নি অর্থে। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কুংসিত, কিংবা যার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না এসব-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তিনি অগ্নি কবির মতো অবাস্তবকে বাস্তব করেন না, বাস্তবকে অবাস্তব করেন না। বাস্তব অবাস্তব দুইই তাঁর কবি-মনের স্পর্শ পেয়ে আপন আপন সীমা ছাড়িয়ে তৃতীয় সভায় পরিণত হয়। যত-প্রদীপ শুক কাঠ দুইই তাঁর কবিত্বশিখার পরশে আগুন হয়ে জলে ওঠে। কিংবা বলব, শীতের শিশির যেমন তার শুভ্র পেলব আন্তরগে দিয়ে মধুর করে দেয় সজ-ফোটা ফুলকে, শুকনো পাতার অঙ্গ থেকে ঘুচিয়ে দেয় তাব সর্ব কর্ণশতা। ওপারের ঝাউবন, এপারের কাশ, ঘাস, সর্বোচ্চ শাল বকায়ন থেকে আরম্ভ কবে রাত্ৰায় পাশের নয়ানছুলি—সবাই যেন স্তম্ভ মসলিনের অজ্ঞাতভরণ পরে সৌন্দর্যের গণতন্ত্রে কৌলীক পেয়ে গিয়েছে।

এই কবিত্বপ্রতিভাকেই হিসা করতেন দস্তফেঙ্কি, তলস্তয়, নেক্রাসফ ত্রিমূর্তি। নেক্রাসফ স্বয়ং কবি কিন্তু তিনি জানতেন যে-জিনিসের পরশ পেয়ে শুকনো গাছ গান হয়ে নেচে ওঠে সেইটির পূর্ণ অধিকার আছে একমাত্র তুর্গেনেফের। আজিকের উপর এ-রকম অথও অধিকার ত্রিমূর্তির কারও ছিল না। তাঁদের কোনো বিশেষ রচনা হয়ত তুর্গেনেফের রচনা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের কিন্তু তুর্গেনেফ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রচনাকে তাঁর আজিকের স্পর্শ দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রচনা করে দিতে পারতেন। দস্তফেঙ্কি তলস্তয় যেন লিখেছেন কবিতা। তুর্গেনেফ যে-কোনো মুহূর্তে তার যে-কোনো একটিকে সুর লাগিয়ে গানের রূপ দিয়ে দিতে পারতেন। আর তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি রচনা যেন গান, তার গায়ে আর হাত দেবার উপায় নেই—তা সে গানের মূল্য কবিতার চেয়ে কম হক আর বেশীই হক।

সে-যুগে ভাষা, ছন্দের রাজ্য ছিলেন ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ফ্লেবের। তাঁর শিল্প এবং মানসপুত্র মপাসাঁ তখনও গুরুত্ব মজলিসে আতরদান, গোলাপ-পাশ এগিয়ে দেন। তুর্গেনেফ ফ্লেবেরের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফ্লেবেরকে চিঠি লেখার সময় মপাসাঁ লেখেন ‘গুরুদেব’, তুর্গেনেফকে লেখার সময় লেখেন, ‘গুরু এবং সখা’। ফ্লেবেরের আকস্মিক মৃত্যুতে মপাসাঁ যখন শোকে অভিভূত হয়ে অন্ধের মতো এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছেন তখন তুর্গেনেফ শেষবারের মতো দেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছেন রুশে! মপাসাঁ তাঁকে চিঠি লিখে খুঁজছেন সাদ্ধনা। লিখেছেন, ‘জীবনের সব কটি আনন্দের দিনও তো আমাব এই দুঃখের দিনটার ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না।’

তার তিন বছর পর গত হলেন তুর্গেনেফ।

এবারেও হয়ত তিনি কোনো সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লিখে সাদ্ধনা খুঁজছিলেন। তখনকার দিনের ফ্রান্সের সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তুর্গেনেফ, ফ্লেবের, মপাসাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ভিক্টর হুগো, এদমোঁ দ গ্যুস্ক, এমিল জোলা, আলফ্রেস দাদেঁদের কাউকে হয়ত তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ফ্লেবের গত হলে শোক নিবেদন কবা যায় তুর্গেনেফকে, কিন্তু তুর্গেনেফ গত হলে লেখা যায় আর কাকে? বন্ধিমের মৃত্যু-সংবাদ ববৌজনাথকে জানায়ে হয়ত সাদ্ধনাব বাণী চাওয়া যায়, কিন্তু রবৌজনাথ গত হলে বাঙালী জানাবে কাকে?

মপাসাঁ এর অনেক আগেই ফ্রান্সের বিখ্যাত পত্রিকায় তুর্গেনেফ সম্বন্ধে প্রশংসা লিখেছিলেন। এবারে তিনি যেটি লিখলেন, সেটি বড়ই ককন। মপাসাঁব পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলাতে এ-ছটি থাকার কথা কিন্তু আজ যখন মপাসাঁকেই লোকে স্বীকার করতে চায় না—যদি বা করে তাও তাঁর তথাকথিত অঞ্জাল গল্পের জগৎ—তখন তাঁর প্রবন্ধ পড়তে যাবে কে? তবু বলি আনাতোল ফ্রান্সের রম্য-রচনাকে যদি সত্য ও হৃদয়ের অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় সঙ্গম বলে ধবা হয়, তবে সে-ছটির উৎস খুঁজতে হবে মপাসাঁর রচনায়। তাঁর ছোটগল্পের সর্বত্র-পরিচিত শৈলী: ৩৪ সেগুলো লেখা। ছোট ছোট শব্দ, ছোট ছোট বাক্য আর তার মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দীর্ঘায়তন দীর্ঘকলেবর উদ্ভাম উত্তাল শৈলধারার মতো দ্রুতগামী বাক্য-বিগ্ৰাস। মন্দাক্রান্তার পাঁচটা হৃদয়ের পর দুটো দীর্ঘ এলে যে-রসেব হৃষ্ট হয়।

এর অল্পবাদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারাংশ নিবেদন করি।

“রুশ দেশের মহান ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেফ ফ্রান্সকে আপন দেশরূপে বরণ করেছিলেন। এক মাস অসহ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি গত হয়েছেন।”

“এ-যুগের অত্যাশ্চর্য লেখকদের তিনি অগ্রতম। সঙ্গে সঙ্গে সাধু, সং, অকপট ও বন্ধুবৎসল সমাজের তিনি ছিলেন সর্বাগ্রণী। এ রকম লোকের দেখা ঘেলে না।

“তঁার বিনয় ছিল আত্মাবমাননায় কাছাকাছি; কাগজে তঁার সম্বন্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি তা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। একাধিকবার তঁার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসি সংবলিত রচনা তাঁকে যেন মর্মান্বিত করেছে; কারণ তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে রাজী হতেন না যে, শুদ্ধ সাহিত্য ভিন্ন অগ্র কোনো বিষয় নিয়ে রচনা লেখা হক। সাহিত্য কিংবা কলা-সমালোচনাকে পর্যন্ত তিনি প্রগল্ভ বাক্যবিহ্বাস বলে মনে করতেন। একবার কোনো এক সাহিত্য-সমালোচক তঁার একখানা বই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তঁার জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে তিনি রীতিমত আহত হয়েছিলেন। তার সে বেদনা-বোধে ছিল লেখকের ব্রীড়া—শুদ্ধ বিনয় তার কাছে নতমন্তক হয়।

“আজ গত হয়েছেন এই মহান পুরুষ, তঁার সম্বন্ধে সামান্য কিছু নিবেদন করি।

“প্রথমবার তাঁকে দেখি গুস্তাফ ক্লবেরের পাটিতে।

“দরজা খুলতে ঘরে ঢুকলেন দৈত্য বিশেষ। রূপালী মাথা—রূপকথায় যাকে বলে রজতশির। লম্বা-লম্বা সাদা চুল, রূপালী চোখের পলক আর বিরাট সাদা দাড়ি—সত্যই যেন খাঁটি রূপোর অতি মিহিন তার দিয়ে তৈরী। ঝকঝক চকচক করছে, প্রতিটি রশ্মিকণা যেন তার উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে। আর সেই ধবলিমার মাঝখানে শান্ত স্বন্দর মুখচ্ছবি। নাক চোখ যেন একটু বড় বেশী ঝরালো। সত্যই যেন বরুণদেবের শির—চতুর্দিকে ধবল জলের ঢেউ তুলেছেন—কিংবা আরও ভালো হয়, যদি বলি, অনন্তদেব, বিশ্বপিতার মুখচ্ছবি।

“অতি দীর্ঘ দেহ—বিরাট, কিছ দেহে মেদচিহ্ন নেই। আর সেই বিশালবপু, অতিকায় পুরুষটির চলাফেরা, নড়াচড়া একেবারে শিশুর মতো—বড় ভীক-ভীক ভাব। অতি মিষ্ট মূহু কণ্ঠে কথা বলেন, কেমন যেন মনে হয়, পুরু জিত শব্দের ভার যেন সহিতে পারছে না। কখনও কখনও কথা বলতে বলতে একটু আটকে যান যেন, ঠিক মনের মতো কথাটি ফরাসীতে কি হবে সেটা গোঁজেন আর প্রতিবারেই চমৎকার ঠিক শব্দটি খুঁজে পান। এই সামান্য থমকে যাওয়াটা তার বচনভঙ্গীতে লাবণ্য এনে দিত।

“গল্প বলতে পারতেন অতুলনীয় মধুর ভঙ্গীতে। সামান্ততম ঘটনাকে তিনি সেই ভঙ্গীর পরশ লাগিয়ে রসের স্তরে তুলে নিতে পারতেন। তঁার অসাধারণ

প্রতিভার মূল্য আমরা ভালো করেই জানতুম কিন্তু আসলে তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন অল্প কারণে। তাঁর চরিত্রের শিশুর মতো সরলতা ছিল সম্পূর্ণ অবিখ্যাত; এক দিক দিয়ে এই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন, তাঁর যুগের তাবৎ গুণী-জ্ঞানীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সব কিছুই তাঁর পড়া ছিল, ইয়োরোপের সব ভাষা আপন মাতৃভাষার মতো বলতে পারতেন অথচ অল্প দিক দিয়ে তাঁর আর পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যা কিছু অতিশয় সামান্য সাধারণ তারই সামনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক মানতেন, ভাবতেন, এটা হল কী করে?

“সাহিত্য বিচারের সময় তিনি আমাদের পাঁচজনের মতো সব কিছু বিশেষ গণ্যের ভিতর আবদ্ধ হয়ে বিশেষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতেন না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য তাঁর খুব ভালো করে পড়া ছিল বলে সর্বসাহিত্যেব সমন্বয় করে তারই বিরাট পটভূমিতে তিনি পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রকাশিত একখানা বই তুলনা করতেন। অল্প প্রান্তে প্রকাশিত অল্প ভাষায় লিখিত আরেকখানা বইয়ের সঙ্গে তাই তাঁর সমালোচনা আমাদের কাছে তাব বিশেষ মূল্য পেত।

“তাঁর বয়স হয়েছিল, তাঁর সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল অথচ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ছিল আধুনিকতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। প্রটের পাঁচ আর থিয়েটারী কৌশলে ভর্তি উপন্যাস তিনি দু চোখে দেখতে পারতেন না, তিনি বলতেন, কিছু না, শুদ্ধমাত্র জীবন হবে উপন্যাসেব উপাদান— তাতে প্রটের ছলা কৌশল থাকবে না, থাকবে না অসম্ভব অসম্ভব কীর্তিকাহিনী।

“তাঁর মতে উপন্যাস আটের সর্বাধুনিক রূপ। গোড়ার দিকে রূপকথার ছলা-কলা তাতে ব্যবহার করা হত এবং উপন্যাস এখনও তাব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নি। নানা রকম রোমান্টিক আর আকাশ-কুসুম কল্পনা উপন্যাসকে এতদিন ধর্মভ্রষ্ট করেছে। এখন আস্তে আস্তে মানুষের রসবোধ শুদ্ধ হতে চলেছে। এখন ওসব শস্তা ছলাকলা বর্জন করে উপন্যাসকে করতে হবে সরল, তাকে জীবনের আর্ট রূপে তুলে ধরতে হবে যাতে করে একদিন সে জীবনের ইতিহাস রূপে গণ্য হতে পাবে।

“আজ তাঁর প্রতিভাপ্রসূত কাব্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ করা যাবে না—যদিও জানি তাঁর সৃষ্টি রূপ সাহিত্যের সর্বোচ্চ সৃষ্টির সমপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহাকবি পুশ্কিন, লেরমন্তফ এবং ঔপন্যাসিক গগলের সৃষ্টির পাশাপাশিই তাঁর রচনার স্থান। রূশ দেশ যাদের সৃষ্টি চিরকৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে ইনি তাঁদেরই একজন। ইনি রূশকে দিয়েছেন চিরজীব সম্পদ, অমূল্য নিধি। ইনি

দিয়েছেন এমনই সম্পূর্ণ আট, এমন সব স্রষ্টা যার বিস্মরণ অসম্ভব ; তিনি দিয়েছেন এমন এক গৌরব যে-গৌরবের মূল্য বিচার অসম্ভব, যার আয়ু অসংখ্য এবং রূপ দেশের অস্ত্র সর্বগৌরব সে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। এঁর মতো লোকই দেশের জন্য এমন কিছু করে যান যার কাছে প্রিন্স্, বিসমার্ক তুচ্ছ ; পৃথিবীর সর্বভূমির সর্বমহাজনের কাছে এঁরা নমস্ত হন।”

গাঁজা

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাদের কিছুতেই ‘পদ্মশ্রী’ ‘পদ্মবিভূষণ’ জাতীয় কোনো উপাধিই দিলেন না, এবং শেষ পর্যন্ত শিশির তাহুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্ষেলাররা (অর্থাৎ যারা রকে অস্ত্রও এক লক্ষ গুল মেয়ে লক্ষপতি রক্ষেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাদের ‘গুলমগীর’ উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার ছদ্মবেশ পরে শরৎ নেমেছেন, কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল, রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজ জগবম্প হয়ে তাবৎ ‘ফেলাররাই’ উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালত কারখানা-ওড়িখানাতে খবর পাঠালেন, ‘কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কি করি বলুন তো ?’

মশাদার এরকম সাক্ষর বেদনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। রকে আসতে তাকে বুক ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেকোনো আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত ; অর্থাৎ ছ-চারটি চিংড়ি সদস্তও আছেন। আবার ফলি-কাকার বয়স বাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয় নি। এরা মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার পাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল পাঁচ। অজুন সেনকে বললে, ‘অজুনদা, আমার আপিসকে বপু করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁচেছি কিনা !’

অজুনদা আরো তৈরী মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কি একটা শুনে
সৈ (২য়)—২৬

আঁতকে উঠে বললে, ‘কী বললেন? পৌছয় নি? বলেন কি মশাই? বড় হুশিয়ার্য ফেললেন তো!’

নিশ্চিত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনো ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শাস্ত্রমানে সমাহিত চিন্তে কর্তব্য-কর্মে মন দিলাম।

অজন বুঝিয়ে বলে, ‘আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ঐ আলমগীর নাম। সেই ওজনে আপনি গুলমগীর।’

আমি বললুম, ‘হাসালি রে হাসালি! এ আর নূতন কি শোনালি? প্রথম আমি পরীক্ষানে ছিলাম গুল-ই-বকাওলী, তারপর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মুহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালোভালো। গুলমগীর। বেশ বেশ।’

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন কচিং-কশ্মিন। বললেন, ‘ল্যাটে—ল্যাটে বুঝলেন।’ বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভিত্তি। তারই মহামূল্যবান এক ফোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে, স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেকিয়ে দিয়ে ‘ত’, ‘দ’-কে ‘ট’, ‘ড’ করে কথা বলেন—অল্পই।

তঁার এসব কলকায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বললে, ‘এবারে আপনি আপনার উপাধি-প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরেস গুল ছাড়ুন তো, চাচা।’

মশা বললে, ‘কিংবা গাঁজা।’

আমি বললুম, ‘যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?’

ঘেটু বললে, ‘চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।’ ঘেটুর পাড়ান্ড নাম ঝটু। আমি নাম দিয়েছি ঘেটু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেটু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বাস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, ‘তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি, সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনো সোসিয়ো-পোলিটিকো-ইকনমিক-স্টাটিসটিকস সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ঐ নিয়ে মেতেছে।’

টেটেন নানাটি কেস পড়ছিল। বললে, ‘আপনি কিস্ হুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষে স্টাটিস্টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যা নিত্যা কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?’

‘তবে শোন। নিশ্চিত হয়ে বলি।

পার্টিশেনের বছর খানেক পরের কথা। আমার মেজনা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাক্তার নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনো ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাডিন বাদে নেহরুজী আর আইয়ুব খান সায়েব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ-বুদ্ধি এক্কেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তার দরদ-ভরা তত্ত্বাবাশ কবে মেজনা শুবলে, “তোদের দেশে গাঁজার কি পরিস্থিতি?”

আমি একগাল হেসে বললুম, “স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।”

মেজনা আশ্চর্য হয়ে শুবলে, “সে কি রে। কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে।”

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেয়ে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কি করে জানবো? আমি পাশে বসি, —দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বললে, “শোন।”

পার্টিশেনের ফলে মেলা অচিস্তিত প্রদ্ব, নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়ালো গঞ্জিকা-সমস্তা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম, স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অটচত্ত্ব হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজ্-ই-জাহা-গীরীতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি শস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজা-বাদশাদের রাজসিক জাত্যাভিমান। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না—সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরফ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ রহস্তের খবর দিবে গাঁজা ফর্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বছরের গাঁজা গুদোমে

পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইতিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই—অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।”

আমি শুধলুম, “কেন? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম!”

দাদা বললে, “কী জালা! আমি শ্রীধরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইল্ড প্রডিজি—ওয়াগার চাইল্ড—চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।”

আমি চটে গিয়ে বললুম, “আর তুমি বিয়াল্লিশে!” দাদা আমার চেয়ে দু’ বছরের বড়।

দাদা বললে, “তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।”

রকফেলারদের দিকে তাকিয়ে বললুম, ‘এসব মাইনর বর্ডার ইন্সিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালেকশ্যনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় “আকাশ-বাণী”, “ঢকা-ডিংডমে” পৌছবার পূর্বেই।’

অজনদা শুধালে, ‘ঢকা-ডিংডমটা কি চাচা?’

‘ডিংডম্ মানে জগবল্লভ, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি “টম্‌টম্”, “টম্‌টমিং” শব্দ এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন :

দাদা বললে, “ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রশক্তির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজাব অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তায় ব্যাঘাত হচ্ছে—”

আমি গোশ্শা করে বললুম, “দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মক্কা করো—”

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বললে, “দেখ তাই, তুই কখনো দেখেছিস যে আমি কাউকে নিয়ে—”

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, “থাক থাক। তুমি বলো।” দাদার ঐ গলাটা আমি বড়ই ভরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাক করবার জন্য তৈরী। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বললে, “পূর্বেই বলেছি, পার্টিশেনের কলে বিস্তার অভাবিতপূর্ব সমস্তা দেখা দিল—এটা তারই একটা। পার্টিশেনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে অক্রেসে, বাঙালোরের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যাধানে

এসে দাঁড়ালো এক দুশমন। জিনীভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে—কল্যাণ না কচু—তার সারমর্ম এই : আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশী কবতে পারো, যত খুশী ততো আকিঙ কলিয়ে বিক্রি করতে পারো, গাঁজা চালাতে পারো—কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দীর ভিতর। একস্পোর্ট করতে গেলেই চিস্তির। তখন জিনীভার অমুখিতা চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যান্ড জিনীভার মারকতে তাদের কাছে চাইলে দু' মণ আকিঙ—ওষুধ বানাবার জন্ত। জিনীভা সন্দেহের গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্তে, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্ত ফিনল্যান্ডের অতথানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরি থানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের শোককে আকিঙখোর বানিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনো কোনো দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানে ওলাদের সঙ্গে ঘড় করে ওষুধের অছিলায় বেলী বেলী হাশীশ, ককেইন রপ্তানি করে সে-সব দেশের বহু লোকের সবনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারবো না—নিষাসটি জানিয়েছিল, গাঁজা কার্মের মানোজ্ঞাব। এখন নাকি জিনীভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাটানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আবেক সন্ধ্যা।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভাঙি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা ক্ষেতে তৈরী। তুলে গুদোমজাত করতে হবে। নতুন গুদোম এক ঝটকায় তৈরী করা যায় না—শেষটায় হয়তো জিনীভা কোনো পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোদিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—”

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই—টেটেনদি ছাড়া—এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলো। খাই আর না-ই খাই, একটা ভালো মাল বরবাদ হতে দেপলে কার না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পাক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স পাত্রীকে পমস্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিশিয়ান টেটেন বললে, ‘আপনারা এতে এমন কি নতুন শোক পাচ্ছেন? মাকিনরা যে দু’দিন অন্তর অন্তর অটেল গম লিটারিলি অ্যাণ্ড মেটফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?’ টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম-এ। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বললে, "জুদোমেতে নতুন মাল পোরা হবে। মানেজারকে বললুম, আমি অমুক দিন যাবো, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললুম না। সেই যে—তুই জানিস না কি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানী বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন- হুকুম এল, জাপানী বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে! তাইজাগ না কোথাকার এক হুত্বক্ৰিয়ান একটি মাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর ছ'বছর বাদে, তাজবকী বাৎ, বাজারে সে-সব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায় নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ঐ যদি হয়।

আগেভাগে দিনকণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।"

আমি আঁতকে উঠে বললুম, "কি বললে?"

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বললে, "হ্যাঁ তা তো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়া'ও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বললেন, 'জানিস, সিগারেট মাছুষের সব চেয়ে বড় শত্রু'—সে তখন শাস্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওক পোড়াতে যাচ্ছি'।

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গায়েব বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হৃদমুদ্র হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক গে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মার্শের মধ্য-খানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে মানেজারই মুখাণি করলে। সে-ই তার জনক—একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলোমেলো। গাঁজার ধূঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যেদিকে ধূঁয়ো যায় মাছুষ সেদিক থেকে সরে যায়। আজ দেখি উল্টী বাৎ! জোয়ান-বুড়ো, মেয়েমন্দে—হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়ে-ছেলেও ছিল—ছোট সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাই সাই শব্দ করে সবাই নাজিকুঞ্জী

পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দন-কাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই—
অস্তুত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি
তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস—‘আঃ, আঃ’।
কেউ ঝাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে হুঁহাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ
তুলে নাসারক্ত ফীত করে নিচ্ছে এক-একখানা দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর
‘আঃ—!’ শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে কাবলাকাস্থের মতো মুখ হাঁ করে আশ্রয়
মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ তাওয়া ওলটালো। তখন পড়িমাড় হয়ে সবাই ছুটলো সেদিকে।
আমি, ম্যানেজার, সেরেশ্‌তাদার ততোধিক পড়িমাড় হয়ে ছুটলুম অগ্নিদিকে। হুঁ
একটি চাপরাসী দেখি মনস্থির করতে পারছি না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছে? গাঙ্গা তো
আর কোথাও কলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকায়জ্ঞ
চতুর্দিকে গরীব ছুঁখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজাবে কিনতে গেলে এদের
দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস
ট্টেট্‌ট্‌ট্‌ করে। হয়ত ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম। তাদের কোনো এক ঔপন্যাসিক নাক
সদর রাস্তায় মন্দের পিঁপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে! আমি তার টেলার
বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোথেলো। সেখানে সবাই কবছে মালের
জন্তু ছোটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিবগা-জলদাব জনসমাজ দিকনির্ণয়
যন্ত্রে অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যোঁদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে
উল্টোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি ‘জাগ্রত ভগবানকে’
ডেকেছিলেন তাঁকে ‘জনসমাজ-মাঝে’ ডেকে নেবার জ্ঞে! আমি পবিত্রাহি
চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতাল্লা যেন এত আমাম্মাস, এই ‘জন-
সমাজ’ থেকে আমাদের তফাৎ রাখেন।”

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গন্তীর
রাশভাবী প্রকৃতির লোক, চোখে-মুখে কোনো রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য
দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মুহূর্ত্ত দেখা যায়—যা ঠ হোক,
যা-ই থাক, আমার মতো কাঁজিল-পঞ্চানন নয়। কোটপাতলুন তুর্কী টুপি পরা
সেই লোক খনে এদিক খনে ওদিক ধাওয়া কবছে, টুপিব ফুঁ বা ট্যাসেল
চৈতনের মতো ঝাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্পমান—এ দৃশ্যে কল্পনা মায়ই বাস্তবের
ঝাড়া।

দাদা বললে, “তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম্ তাজ্জিম্ করতে আরম্ভ করেছে। এত ছটোপুটি সব্বেও ঘিলুতে খানিকটে ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুঁতি ফুঁতি লাগছে, কি রকম যেন চিত্তাকাশে উড্ডুক উড্ডুক ভাব। তারপর দেখি, ম্যানেজারটা আমার দিকে কি রকম বেয়াদবের মতো ঝিক্ ঝিক্ করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জীপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জীপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু ভবজ একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। ভবজ আমারই মতো, তার টুপি ফুঁটাটি পর্যন্ত। চুজনাতে তুই জীপে উঠলুম।”

আমি বললুম, ‘দুটা জীপ না কচু!’

দাদা বললে, “বুঝছি, বুঝছি, তোকে আব বুঝিয়ে বলতে হবে না। শাস্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনো ভাইনে ঢাকা, আর কখনো বায়ে মতিহারী। তবে কি ডাইভারটা—? সে তো সর্বক্ষণ আমাবই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্ডা জীপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জীপ। সেও না হয় বুঝলুম। কিন্তু তারপর, মোশয়, সে কী কাণ্ড! চাবখানাই উড়তে আরম্ভ করল।”

আমি শুবালুম, “উড়তে।”

“হ্যাঁ, উড়তে। জীপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো থেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশী।

হাওয়ায় উড়তে উড়তে পুঁমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙলোয় পৌঁছলুম।

ভাগিাস বেশী ধুঁয়ো মগজে যায় নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি ভোর ভাবী। আমার দিকে একদণ্ডে তাকালেন। বাপ্‌স্‌। তারপর অতি শাস্ত কণ্ঠ—কিছু কী কাঠিগু কী দার্দা সে কণ্ঠে—শুধালেন, ‘আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?’ আমি কিছু বলি নি।”

দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, ‘আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকং নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবী টপকান। শমসুল-উলেমার মেয়ে।’

রক শুধালে, ‘ওটার মানে কি চাচা?’

আমি বললুম, ‘পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায়ের অপজিট নাহার।’

রক শুধালে, ‘তারপর?’

আমি বললুম, ‘তদনন্তর কি হল জানি নে। বৌদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপবতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুহুমের মতো ঘোলায়েম শব ডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনীটি অনাহারে মারা গেল।’

মশাদা বললে, ‘বিলকুল গুলু।’

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, ‘সাকল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুলু। অর্থাৎ গুলুইব রাজা গুলুমগীব। তোরা আমাকে আজ ঐ টাইটিলটি দিলে না?’

হরিনাথ দে’র স্মরণে

বহু ভাষা শিখতে পারলে বহু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার মাধ্যমে অনেক সভ্যতা, বিস্তার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়—এ সব কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, বাঙালী ছেলেকে বাধা হয়ে অন্তত তিনটে ভাষা শিখতে হয়—বাঙলা, ইংরিজী এবং সংস্কৃত (কিংবা আরবী অথবা ফার্সী)। হয়ত তাকে হিন্দীও শিখতে হচ্ছে, কিংবা অদূরভবিষ্যতে শিখতে হবে। এ অবস্থায় আমি যদি প্রস্তাব করি, আরো গুটি দুই শিখলে হয় না? তাহলে ছেলেদের হাতে আমার প্রাণ বিপন্ন হবার সন্ধান সস্তাবনা—বাঙলা দেশে না থাকলেও এ খবরটি আমি দিলক্ষণ রাগি। ‘বিশেষতঃ এই পূজোর বাজারে,—মাছুষ যখন বলির পাঠার সন্ধান থাকে।

তাই হটগোল স্মরণ হওয়ার পূর্বেই আমি নিবেদন করছি, এ প্রস্তাবটি শুধু তাদেরই জন্য, যারা বুকে গিয়েছে যে সংস্কৃতে তারা দিগাসাগর হতে পারবে না, ওটাকে নিতান্ত পবীক্ষা পাসের জন্য যেটুকু সম্মান দিতে হয় তাই দেবে, বাঙলা তো মাতৃভাষা, এবং ইংরিজীর চর্চা ততটুকুই করবে যতটুকু পাশের পর চাকরির জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। এই সংজ্ঞা থেকেই স্বচতুর পাঠক বুকে যাবেন যে,

আমি মোটামুটি হার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ছেলেদের কথাই ভাবছি। অর্থাৎ এরা ক্লাসে (সেভেন-এটে) যে রকম পড়ি-মরি হয়ে তিনটে ভাষার পিছনে ছুটতো এখন আর তা করে না। বিশেষতঃ গোটা পাঁচেক ইয়ার্লি আর খান-দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে এরা ভাষা না শিখে কি করে তার পরীক্ষা পাস করতে হয় সে 'বিদ্যায়' বিলক্ষণ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এতখানি বলার পরও যদি কেউ লেমনেডের বোতল গোঁজ়ে তবে আমার দ্বিতীয় নিবেদন, গোটা দুই ভাষা শিখলে চাকরি জোটার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। হল? এখন তবে আশা করতে পারি, পাঠক বোতলটি আমার মাথায় না ফাটিয়ে সেটার ভিতরকার জিনিস বরফের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন।

দয়া করে সেটিও করবেন না; কারণ আমি যে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি সেটা লটারির টিকিট কাটার চেয়ে মাত্র এক চুল ভালো—এই যা। ইংরিজিতে একেই বলে 'চেজিং দি ওয়াইল্ড গীজ্'—কিন্তু চাকরিব বাজারে বাঙালী ছেলের সামনে যখন কোনো 'গীজ্'ই নেই তখন আশা করতে পারি সে ঘবের না গেয়ে বনের হাঁস তাড়া করতে আপত্তি করবে না। বুঝিয়ে বলি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভাষা শেখার কোনো অর্থকরী মূল্য এদেশে ছিল না। স্বরাজ লাভের পর অবস্থাটা বদলেছে। আমরা নানা দেশে আমাদের রাজপ্রতিনিধি, রাজদূত, হাই-কমিশনার, কন্সাল-জেনারেল, কন্সাল, ট্রেড কমিশনার এবং তাঁদের দফতরের জন্ম কাউন্সেলর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সেক্রেটারি, মিলিটারি আতাশে, ট্রেড আতাশে, প্রেস আতাশে, কেরানী, দোভাষী ইত্যাদি পাঠাচ্ছি এবং দিল্লীর পরদেশী দফতর বা ফরেন অফিসেও ভাষা জাননে-ওলা লোকের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া বেতার-কেন্দ্র ফরাসী, ইরানী, ফার্সী, কাবুলী-ফার্সী, আরবী, পশতু, হুহেলী, গুর্খালী, বর্মী, ইন্দোনেশী ও চীনা ভাষায়ও প্রোগ্রাম দেন। আমাদের ফৌজী ইন্সপেক্টরও অনেক ভাষা শেখানো হয়।

এই তিনটির প্রতিষ্ঠানে যে গণ্ডায় গণ্ডায় চাকরি খালি পড়েছে তা নয়, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা উপযুক্ত ভাষাজ্ঞান থাকলে যোগ্য লোককে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান খাতির করবে। আর পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমার এ প্রস্তাব তাদেরই জন্ম, যারা চাকরির বাজারে একটুখানি রিস্ক, রতিভর খুঁকি নিতে রাজী আছে।

আমি যে খবরটি দিলুম সেটি কিছুমাত্র নূতন নয়। কারণ প্রায়ই বেকার

ছেলেরা এসে আমাকে অজুরোধ জানায় তাদের ফ্রেঞ্চ জার্মান শিখিয়ে দিতে। (এখানেই লক্ষ্য করে রাখুন ‘ফ্রেঞ্চ-জার্মানই’ বলে, অত্র কোনো ভাষার নাম তোলে না।) আমার সময়ের অভাব, দ্বিতীয়তঃ আমি বাঙলাটাই ভালো করে জানি নে—কাজেই করাসী-জার্মানের কথাই ওঠে না, তাই তাদের কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়ে বিদেয় দি।

এদের প্রশ্ন করে দেখলুম, এরা জানে না (ক) কোন্ ভাষার চাহিদা বাজাবে কতখানি, (খ) কোন্ ভাষা শক্ত আব কোন্টা নবম, (গ) ভাষা শিখতে হয় কি করে এবং আরো অনেক কিছুই জানে না।

আমি দোষ দিচ্ছি নে। জানবার সুযোগ দিলে তো তাবা জানবে। আব যদি জানতই তবে আজ আমি এ বিষয়ে লিখতে যাবো কেন?

আমাকে এক উত্তম ব্যবসায়ী বলেছিল, ‘জিনিস বেচা সোজা, কেনা শক্ত।’ আমি তো তাজ্জব। বলে কি? তখন বুঝিয়ে বললে, ‘বাজারে ঠিক যে জিনিসের চাহিদা তাই দিয়ে যদি আমি আমার দোকান সাজিয়ে বাণি তবে সন্ধ্যা হ’ত-না-ততই দোকান সাক হয়ে যাবে। তাই বললুম, বেচা সহজ। কিন্তু আড়তদারদের কাছ থেকে যদি বে-আক্কেলেব মতো বে-চাহিদার মাল কিনি তবে সেগুলো দোকানে পাচবে, দোকান উঠে যাওয়ার পরও। তাই বললুম, ‘কেনা শক্ত।’

এস্থলেও সেই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রথম দেখতে হবে, আপনি কি মাল কিনবেন, অর্থাৎ কোন্ ভাষা শিখবেন।

সবাই বলে ‘ফ্রেঞ্চ জার্মান’। এ যেন কথার কথা হয়ে দাড়িয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভূবন-বিখ্যাত ভাষা। এককালে ফ্রেঞ্চ না জেনে কুটনীতি মহলে যাওয়া বিনা পৈতৈয় ব্রাহ্মণভোজে যাওয়ার মতো ছিল। এখনো পৃথিবীর যে কোনো দেশের পাসপোর্টে দেখতে পাবেন দুটি ভাষাতে সব কিছু ছাপা, প্রথমটি তার আপন ভাষা এবং দ্বিতীয়টি ফরাসী। কিন্তু এসব হচ্ছে উনবিংশ শতকের কথা। আপনি যদি সেই শতকের চাহিদা মেটাতে চান, তবে মেটান। আপনি যদি একশ’ বছরের পুরনো বিজ্ঞাপন-মাফিক চাকবির জন্ম দরখাস্ত করতে চান তো করুন।

তাই প্রথম দেখতে হবে :—এখন, এই মুহূর্তে চাহিদা কি এবং চাহিদার গতিটা কোন্ দিকে, অর্থাৎ আপনি ভাষাটি শিখ দু’তিন বছরে যখন বাজারে নামবেন তখন চাহিদাটা কি হবে?

ভাষার প্রাধান্ত তার লোকসংখ্যা থেকে বিচার করা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনা

ভাষা নিন। ইংরিজী, রাশান, চীনা এ তিন ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী লোক এক কথা সত্য, কিন্তু চীনা ভাষায় লোকসংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তারা সবাই মাত্র একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। কাজেই ঐ রাষ্ট্রে আমাদের থাকবে মাত্র একটি এম্বেসি। পক্ষান্তরে জার্মান ভাষার অবস্থা বিবেচনা করুন। জার্মান বলা হয় জার্মান রাষ্ট্রে (উপস্থিত সেটিও আবার দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত), অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে এবং সুইটজারল্যান্ডে। এই তিন দেশে আমাদের তিনটি রাজদূতাবাস আছে। তা ছাড়া জার্মান বলা হয়, উত্তর ইটালির টিরোল, ফ্রান্সের আলসেস-লরেন ও বেলজিয়ামের অয়পেন অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে যদি কখনো রাজনৈতিক গোলমাল আরম্ভ হয় এবং আপনাকে তার রিপোর্ট লিখতে সেখানে যেতে হয় তবে জার্মান ছাড়া এক প ও এগুতে পারবেন না। এবং সর্বশেষ কথা : জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যান্ড বেচে তৈরী মাল, ভারত বিক্রি করে কাঁচা মাল। এসব দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা দ্রুতগতিতে বাড়তেই থাকবে ; বিস্তর কনসুলেট ও ট্রেডকমিশন ক্রমে ক্রমে ওসব জায়গায় আমাদের থলতে হবে।^১ কিন্তু চীন ও ভারত সমগোত্রীয়, দুজনেই বেচে কাঁচা মাল, অতএব 'বৈবাহিক' বৈষয়িক কাজ আমাদের চলে না।

আমরা যে স্বার্থ নিয়ে এ আলোচনা করছি তার দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ভাষার গুরুত্ব বিচার অবান্তর। সোভিয়েট বাশা বিরাট রাষ্ট্র কিন্তু ঐ দেশে আছে এবং বহুকাল ধরে থাকবে আমাদের একটি মাত্র রাজদূতাবাস। রাশা আবার মারাত্মক রকমের কেন্দ্রশ্রাব বাষ্ট্র—মহোদ নাম বদলে তাকে 'সেন্টার' নাম দেবাব প্রস্তাব ঐ কারণেই একবার হয়েছিল—তাই তার উপবাষ্ট্র যথা, তুর্কোমানিস্তান উজবেকিস্তানে যে আমাদের রাজদূত আস্তানা গাড়বেন তার আশ্রয় সস্তাবনা দেখতে পাচ্ছি নে। অবশ্য উত্তম সাহিত্যরস আশ্বাদনের ভগ্ন রাশানের মতো ভাষা পৃথিবীতে বিরল।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আরবরা আজ পৃথিবীতে উঁচু আসনে বসে না। তার প্রধান কারণ, তারা নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক ঐ কারণেই আমাদের দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। উপস্থিত আরব জাতি এই ক'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত :—ইরাক, সিরিয়া (শাম), লেবানন, হাভ্রামু

১ এখানে এম্বেসি, হাই কমিশন, লিগেশন ইত্যাদির পার্থক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে দেওয়া ভালো। এই তিনটিই রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক কাজকর্ম চালায়। এম্বেসি এবং হাই-কমিশন পদমর্যাদায়

ট্রান্সজর্ডন, সউদী আরব, ইয়েমেন, মিশর, সুদান, টুনিসিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, লিবিয়া। তা ছাড়া কুয়েৎ বাহরেইন, ওমান ইত্যাদি। এদের সব কটি স্বাধীন নয়, কিন্তু ভগবানের আলীর্বাদে আমরা যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকান আড়কাটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আড়তদারের কাছ থেকে সোজা পেট্রোল কেনবার দুই নম্বরের 'স্ববাক্স' পাব সেদিন আরবের আনাচে-কানাচেও আমাদের কনসুলেট বসাতে হবে। উপস্থিত, আমার যতদূর জানা, মিশর, সউদী আরব, ইরাকে আমাদের রাজদূতাবাস আছে। এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু রাষ্ট্রশুলাব এসব 'মেল' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে গেলে আমবা পূজোর বাজার পেরিয়ে শ্রামা পূজোয় পৌঁছে যাব। তাই সংক্ষেপে বলি, আমার মনে হয়, আমাদের স্বার্থের জন্য উপস্থিত স্প্যানিশ-ই সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। আপনি বলবেন, ঐটুকু দেশ স্পেন—তার ঐ 'ভাড়া নৌকা' আমাদের কতখানি 'সোনার ধান' ধরবে।

আমি স্পেনের কথা আদর্শেই ভাবছি না। আমি ভাবছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা। সেখানে উজনখানেক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। তাদের ভাষা স্প্যানিশ—হিস্পানী। ওদের গুটিকয়েকে আমাদের রাজদূতরা বেশ কিছুকাল হল ডেরা গেড়ে বসেছেন। আমার বিশ্বাস সব কটাত্ত না হোক, বাকী অনেকগুলো তই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজদূতাবাস বসবে। অতএব আমার সলা যদি নেন তবে স্প্যানিশ শিখুন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অধর্মের জ্ঞান অতিশয় অপ্রচুর। 'তবু বলবো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে এদেরই সঙ্গে আমাদের বাড়বে। সংক্ষেপে তার কারণটা বলি,—আমেরিকা, ইয়োরোপ এবং বাশ। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বলতে গেলে

একই—ব্রিটিশ ক্রাউনের আওতায় থাকলে এম্বেসির নাম হাই-কমিশন—লিগেশন পদমর্যাদায় ছোট। কনসুলেটের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন মতো একাধিক কনসুলেট থাকতে পারে—কিন্তু একাধিক এম্বেসি হয় না,—এবং সে স্থলে কনসুলেট-জেনারেলও থাকে। ট্রেড কমিশন কনসুলেটের চেয়ে জাতে ছোট—অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল পোস্ট-অফিসের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লে তার পদবৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো দেশে আমাদের কনসুলেট না থাকলে, সেখানকার এম্বেসি-হাই-কমিশন-লিগেশন ঐ কাজও করে থাকে। এই সব তাবৎ প্রতিষ্ঠান আমাদের করেন অফিসের তাঁবেতে থাকে।

তাদের সম্পূর্ণ অর্থনীতি যুদ্ধ-প্রস্তুতির চতুর্দিকে এমনি কেন্দ্রীভূত করেছে যে তারা কিনতে চায় যুদ্ধের জগত তাদের যে সব মালের দরকার এবং বেচতে চায় যুদ্ধের জগত যার প্রয়োজন নেই। আর যুদ্ধ যদি লেগে যায় তবে আপনার অর্ডারগুলো তারা শিকিয়ে তুলে রাখবে, আপনার কাঁচা মাল বন্দরে বন্দরে পচবে। দক্ষিণ আমেরিকা এসব আওতার বাইরে। ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েই যাবে—আমাদের তৃতীয় ‘স্বরাজ’ লাভের পর। দশটা রাজদূতাবাস যদি তিনশটা চাকরি দিতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেবে তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার। আর চাকরি ছেড়ে দিয়ে যদি ভাষার জোরে ব্যবসা চালান তবে তো আর কথাই নেই।

এস্থলে আরেকটি তথ্য এবং তথ্যপূর্ণ ইঙ্গিত দি। ভাষা শেখার সময় গোড়ার দিকে সমগোত্রের ভাষা শিখে তাড়াতাড়ি ভাষার সংখ্যা বাড়িয়ে নেবেন। উদাহরণ—স্থলে বলি আপনি বাঙালী, আজ যদি আপনাকে নিছক ভাষার সংখ্যাই দেখাতে হয় তবে আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে অসমীয়া এবং উড়িয়া নিয়ে। এ দুটি ভাষা বাঙলার এত কাছাকাছি যে আপনাকে বেগ পেতে হবে অতি কম। তারপর শিখবেন, হিন্দী, গুজবাটী মারাঠী, গুরুমুখী। ঠিক ঐ একমই পর্তুগীজ ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা স্পেনিশ ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনাব বাঙলা জানা থাকলে অসমীয়া শিখতে কত দিন লাগার কথা? না হয় তারই ডবল বরুন স্পেনিশ শেখা হয়ে গেলে পর্তুগীজ, কিংবা ফরাসিস্ শিখতে। ঠিক সেই বকম জার্মান ফ্রেমিশ এবং ডাচ পড়ে অগ্ন গোত্রে। একদা ব্রাসেল্‌স্ শহরে আমি একখানা ফ্রেমিশ খবরের কাগজ কিনে পড়ে দেখি মোটামুটি বক্তব্যটা ধরে ফেলতে পেরেছি—অলস্‌ল্যান্ড যা জার্মান জানি তাব-ই রূপায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আপনি অসমীয়া শিশুশিক্ষা কখনো পড়েন নি। একখানা অসমীয়া বই নিন। দেখবেন বারো আনা পরিমাণ অনায়াসে বুঝতে পারছেন। কিংবা বেতারে যখন ‘অসমীয়া বাতরি’ শোনে তখন কি তার মোটামুটি অর্থ ধরতে পারেন না?

তাই এই অল্পছোঁদের গোড়াতে ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির যে কথা তুলেছিলাম সেটাতে ফিবে যাই। অর্থাৎ গুরু সাহায্যে যদি বিদ্যায়তনে আপনি স্পেনিশ আরম্ভ করেন তবে মাস দুই যেতে-না-যেতেই বাড়িতে, কারো সাহায্য ছাড়া পর্তুগীজ কিংবা ফরাসী আরম্ভ করে দেবেন। ব্যাকরণখানার দু-দশপাতা ওলটাতে-পালটাতেই দেখবেন একসঙ্গে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন কর্ম নয়। গোড়ার দিকে কিছুটা গুবলেট হয়ে যাবে সন্দ নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে যদি সেটা কাটিয়ে না উঠতে পারেন তবে বুঝবেন ঐদিকে ভগবান আপনার

প্রতি সদয় নন, তখন না হয় লেগে যাবেন মাহুঘ মারার ব্যবসাতে—যাকে অজ্ঞান বলে ডাকারি, কিংবা রেলকলিশনের পরিপাটি ব্যবস্থা করাতে—যাকে অজ্ঞান নাম দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারি। কিন্তু নিবেদন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাত্রিক বড় কঠিন পরীক্ষা। আপনি যদি সেটা পাস করে থাকতে পারেন তবে গোটা তিনেক ভাষা শিখতে পারবেন না কেন ?

গোত্রবিচারে ফিরে যাই।

১। লাতিন গোত্র—স্পেনিশ, ফরাসিস, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান।

২। জার্মান গোত্র—জার্মান, ডাচ, ফ্লেমিশ।

৩। স্বাভিনেভিয়ান গোত্র—নরউইজিয়েন, হুইডিশ।

৪। তুর্কী গোত্র—তুর্কী (৬সমানলি তুর্কী, অর্থাৎ টাকির ভাষা,—তুর্ক-মানিস্থানের ভাষা, জগতাই তুর্কী। প্রথমটা মুস্তফা কামালের মাতৃভাষা, দ্বিতীয়টা বাবু বাদশার)—হাঙ্গেরিয়ান ও ফিনিশ কিন্তু এক হলেও শাখাতে বর্ণ-বৈষম্য প্রচুর।

৫। রাশান গোত্র—রাশান, পলিশ, ল্যাটাভিয়ান, লিতভাক ইত্যাদি।

৬। ইরানী গোত্র—ইরানী ফার্সী ও কাবুলী ফার্সী—পার্থক্য সামান্য।

৭। আরবী গোত্র—আরবী, হীজ্র, ইজিডশ (অধুনা প্যাগেসটাইনে প্রচলিত প্রাচীন হীজ্রের অবাচীন রাষ্ট্রভাষা), আফ্রিক (আবিসিনিয়ান ভাষা)।

৮। চান গোত্র—চান, জাপানী, কোরিয়ান ইত্যাদি।

৯। এছাড়া টিবেটো-বর্মণ গোত্রের বর্মী ইত্যাদি। মালয়, থাই, ইণ্ডোনেশিয়ান ইত্যাদি।

অজানাতে এবং জানাতে ও ছোট এবং বড় কোনো কোনো ভাষা বাদ পড়ে গেল। তাই নিয়ে শোক করবেন না। উপস্থিত এগুলো শিখে নিন। তা হলে অল্পগুলোর খবর আপনার থেকেই জানা হয়ে যাবে।

এর ভিতর সহজ ১ এবং ৬নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ২ এবং ৩নং গোত্রের ভাষা, তার চেয়ে কঠিন ৫ নম্বরের গোত্র, তার চেয়েও কঠিন ৭নং, পারতপক্ষে ৮ নম্বরের পাড়া মাড়াবেন না (অবশ্য জাপানী তেমন শক্ত নয়), ৪ আর ৯ নম্বরের খবর জানি নে, তবে খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

দুই গোত্রের দুটো ভাষা একসঙ্গে শেখা যে খুব কঠিন তা নয়, তবে তার জন্য সংপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠক প্রয়োজন। এই দুইটির বড়ই অভাব—এই দুঃসংবাদটি যতক্ষণ পারি চেপে গিয়েছিলুম; আর পারা গেল না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে

এই স্থসমাচারটিও বিতরণ করছি যে ভারতবর্ষের কোথাও এমন স্থাবাস্থ্য নেই যে তার পাল্লায় পড়ে আপনি হেরে যাবেন। এই যে আমাদের রাজধানী দিল্লী শহর, যেখানকার লোক কেন্দ্রের নোকরি বাবদে হামেহাল তেজ-নজর ওকীবহাল সেখানে যে দু'একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অতিশয় রদী অথচ টাকা লুটছে এস্টের। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, কলকাতায় নাকি গোটাছুত্তিন প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। খোঁজ করলে দেখবেন, খুড়ো-জ্যেষ্ঠার আমল থেকে বাড়িতে দু'চাবখানা মার্লবর পড়ে আছে, কিন্তু ইংরিজী ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা কেউ শেখেন নি। আমিও ভূ-ভারতে এমন প্রাণীর সংস্পর্শে আসি নি যিনি ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে কলকাতাতে বসে কোনো বিদেশী ভাষা শিখেছেন। তবে ইদানীং অবস্থা একটু ভালো হয়েছে।

অধমের শেষ সাবধান বাণী : সব কটা আঙা একই খুড়িতে রাখবেন না—কুল্যে শিনি একই দরগায় উজোড় করে দেবেন না। তার সরল অর্থ বি-এ, এম-এ পাস অবহেলা করে হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বিদেশী ভাষার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না। এসব পড়াশুনো বি-এ, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চালাবেন—আড্ডাটা সিকিটাক কমিয়ে দিয়ে ফুটবল দেখাটা একটু মূলত্বীয় রেখে দিয়ে। একদম ছেড়ে দিতে বলবো কেন, তওবা, তওবা, তাহলে আপনার বাঙালীত্বই যে উপে যাবে। ভাষা শিখে পরীক্ষা দিয়ে যদি সেদিকে নোকরি না জোটে তবে বি-এ, এম-এ পাস করে যা করতেন তাই করবেন। তা হলে অন্তত আমার গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে বলতে পারবেন না, 'তবে রে—, তোর কথায় না—ইত্যাদি।'

অনুকরণ না অনুকরণ?

আগে-ভাগেই বলে রাখছি, এ-লেখা সমালোচনা নয়।

সমালোচনা লেখবার মতো শক্তি—দুটলোকে বলে, শক্তির অভাব—আমার এবং আমার মতো অধিকাংশ লোকের নেই। গল্পছলে নিবেদন করি :—

প্রতি রববারে এক বঁড়শে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মাছ ধরে। বড় মাছের শিকারী, তাই ফাতনা ডোবে কালেকশ্বিনে, আকছার রববারই যায় বিন্-শিকারে। তারই একটু দূরে আরেকটা লোক প্রতি রববারে এসে বসে, এবং তামাম দিনটা কাটায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওর মাছধরা দেখে দেখে। ছু'জনায় আলাপ-পরিচয় নেই। মাস তিনেক পর শিকারী লোকটার 'আলসেমি' দেখে দেখে ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর একটু বিরক্তির স্বরে শুধালে, 'ওহে, ভূমি-

তাঁহলে নিজেই মাছ ধরো না কেন ?’

লোকটা আঁৎকে উঠে বললে, ‘বাপস ! অত দৈর্ঘ্য আমার নেই।’

সমালোচনা লেখার দৈর্ঘ্য আমার নেই !

আর কি-ই বা হবে সমালোচনা লিখে ? কটা স্বস্থ লোক সমালোচনা পড়ে ? কটা বুদ্ধিমান মাছ টোপ গেলে ? আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচক প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোঁকর দেয় অনেককেই—অর্থাৎ রোকা পয়সা ঢেলে মাসিকটা যখন নিতান্তই কিনেছে তখন পয়সার দাম তোলবার জগ্গ একটু-আধটু খোঁচারুঁচি করে। ফলে, চারের রস যত না পেল বড়শির খোঁচাতে তার চেয়ে বেশী জখম হয়ে “হুত্তোর ছাই” বলে তাস-পাশাতে ফিরে যায়।

সমালোচকরা ভাবেন, পাঠকসাধারণ বোকার পাল। ওরা তাঁদের মুখে ঝাল চেখে বই কেনে। তা হলে আর দেখতে হত না। মারোয়াড়ীরা সম্ভার রাবিশ পাণ্ডুলিপি কিনে পয়সা দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিয়ে রাবিশগুলো খুচকারী (অর্থাৎ খুচরোর লাভে, পাইকারীর পরিমাণে) দরে বিক্রি করে ভুঁড়ি বাড়িয়ে নিতো—ফাও হিসেবে দেশে নামও হয়ে যেত, ‘সংসাহিত্য’ তথা ‘সমালোচকদের’ পৃষ্ঠপোষকরূপে।

আমার কথা যদি চট করে বিশ্বাস না করতে পারেন তবে চিন্তা করে দেখুন, আশুবাঁকা নিবেদন করছি, ‘পয়সা দিয়ে সমালোচনা লেখানো যায়, পয়সা দিয়ে কবিতা লেখানো যায় না।’ না হলে আমেরিকায় ভালো কবির অভাব হত না। সমালোচকের অভাব সেখানে নেই এবং বর্ণে গন্ধে তাঁরা অস্বদেশীয় সমালোচকদেরই মতো।

পলিটিশিয়ানরাও ভাবেন প্রোপাগান্ডিস্ট (অর্থাৎ সমালোচক)-দের দিয়ে নিজ পার্টির প্রশংসা কীর্তন কবিয়ে নিয়ে বাজিমাৎ করবেন। কিন্তু ভোটার—ভোটার যা পাঠকও তা—আহাম্মুখ নয়, যদিও সুরল বলে সত্য বুঝতে তার একটু সময় লাগে। না হলে আওয়ামৌরা মুসলিম লীগকে কম্বিনকালেও হটাতে পারতো না।

আমিও মাঝে-মাঝে সমালোচনা পড়ি, কারণ আমিও আর পাঁচজন পাঠকের মতো পয়সা ঢেলেই কাগজ কিনি। তবে আমার পড়ার ধরন স্প্যানিয়ার্ডদের রুটি খাওয়ার মতো। শুনেছি, স্প্যানিয়ার্ডরা বছরের পয়লা দিন গির্জায় উপাসনা সেরে এসে এক টুকরো রুটি চিবোয়—কারণ প্রভু যীশুগুণ্ড তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, ‘আর আমাদের অত্কার রুটি দাও।’ খানিকটে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে, ‘তওবা, তওবা, সেই গেল বছরের রুটিরই মতো যাচ্ছেতাই সোয়াদ।’

তারপর বছরের আর ৩৬৪ দিন সে খায় কোর্মা-কালিয়া কটলেট মমলেট। আমিও সমালোচনার শুকনো রুটি বছরের মধ্যে চিবুই মাত্র একটি দিন এবং প্রতিবারই হৃদয়ঙ্গম হয়, সমালোচনার স্বাদ-গন্ধ সেই গেল বছরের মতো—এক বছরে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে নি।

কথাটা যে ভাবে বর্ণনা করলুম, তাতে পাঠকের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মোটেই তা নয়। অভিজ্ঞতাটা পাঠক-সাধারণ মাত্রেইই নিদারুণ নিজস্ব। অবশ্য সমালোচকদের কথা স্তম্ভ। তাঁরা একে অন্নের সমালোচনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকেন। কেন পড়েন? জ্ঞান সঞ্চয়েব জ্ঞান? রাম রাম! শুধুমাত্র দেখবার জন্মে কে তার মত সাম্য দিয়েছে, কে দেখে নি এবং সেই অছুযায়ী দল পাকানো, খোট বাড়ানো, শক্তি সঞ্চয় করে রুটিটা আঙাটা—থাক।

অবশ্য সমালোচকদের সমালোচনা করার কুবুদ্ধি যদি আমার কখনো হয়—এতক্ষণ যা করলুম সেটা তারই সেতার বাঁধা মাত্র—তা হলে সেটা আপনাদেরই পাতে নিবেদন করবো। তবে ধর্মবুদ্ধি তখনো আপনাদের সাবধান করে দেবে, ও-লেখাটা না পড়তে।

*

*

মূল বক্তব্যে আসি। ইদানীং আমি বাঙলার বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং বাঙলার বাইরে থেকেও কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। এঁরা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করেছেন, ‘কি প্রকারে ভালো লেখক হওয়া যায়?’

প্রথমটায় উল্লসিত হয়েছিলুম। যাক, বাঁচা গেল। বাঙলা দেশ তা হলে স্বীকার করেছে, আমি ভালো লেখক। এবারে তা হলে কলকাতা-দিল্লীতে গিয়ে কিশিং তদ্বির করলেই, দু’চারটে প্রাইজ পেয়ে যাব, লোকসভার সদস্যগিবি, কলচেরল ডেলিগেশনের মেম্বরী এ-সবও বাদ যাবে না। বিদেশ যাবার সুযোগও হয়ে যাবে—বিল্ট দেবার আমার ভারী শখ, অর্থাভাবে এতদিন হয়ে ওঠে নি। ইংরিজীটা জানি নে, এতদিন এই একটা ভয় মনে মনে ছিল। এখন বুলগানিন, চু-এন-লেইয়ের কল্যাণে সেটাও গেছে। এঁরা ইংরিজী না জেনে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হায়, এত সুখ সইবে কেন? আমার গৃহিণী নিরক্ষরা—টিপসই করে লে আদালতে তালাকের দরখাস্ত করেছেন। তালাকটা মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁর কাছে চিঠিগুলো পড়ে নিজের মূল্য বাড়াতে গিয়েছিলুম। তিনি করলেন উন্টো অর্থ। সেটা আরো সরল। ব্যবসাতে যে দৌল

হয়েছে, তারই কাছে আসে লোক সলার সন্ধান ; কেল-করা ছেলে পাস-করার চেয়ে ভালো প্রাইভেট টাটর হয় ।

এর উত্তর আমি দেব কি ? গৃহিণী যে কটা গল্প জানেন সব কটাই আমার সঙ্গে টায়-টায় মিলে যায় । মনে হয় আমার পূজ্যপাদ স্বশুর-শশুড়ী ছেলেবেলা থেকে তাঁকে এই তালিমটুকুই শুধু দিয়েছেন, স্বামীর গোদা পায়ের গোদটি কি প্রকারে বারে বারে দেখিয়ে দিতে হয় । অবশ্য তার জন্ত যে বিশেষ তালিমের প্রয়োজন হয় সেটা অস্বীকার করলেও চলে । ওটা তাদের বিধিগত জহলক্ক অশিক্ষিত পটুত্ব । যে-সব সমালোচকদের কথা পূর্বে নিবেদন করেছি, তাদের বেলাও এই নীতি প্রযোজ্য ।

ব্রাহ্মণীব আশ্রয়াকা আমি মেনে নিয়েছি । তিনি ভালাকের দরখাস্তটি উইথড্র করেছেন—শুন দুঃখিত হবেন ।

*

*

শরবাচাৰ্য দৰ্শনরণাক্ষনে অবতীর্ণ হয়ে বলেছিলেন, ‘সাংখ্যমন্ত্রকে আহ্বান করো । সেই মন্ত্রের অধিপতি । তাকে পরাজিত করলে অগ্ন্যায় সঙ্করী-প্রোক্ষীর সঙ্গে যুদ্ধ কবে অথবা কালক্ষয় কবতে হবে না ।’ আমি শঙ্কর নই । তাই সব চেয়ে সরল প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করব ।

, প্রশ্নটি এই : ‘মপাসার ছোট গল্প অপার আনন্দ দেয়, কিন্তু তাঁর অম্লকরণ-কারীদের গল্প এত বিষাদ কেন ?’ অপিচ, মপাসা ছোট গল্প লেখার যে কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন ‘তার অম্লকরণ না করে গল্প লিখি বা কি প্রকারে ?’

যাঁরা সঙ্গীত আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই জানেন, ওস্তাদ যে-ভাবে গান গান তারই হুবহু অম্লকরণ করতে হয় ঝাড়া দশটি বছর ধরে । ভারতনৃত্য শিখতে গেলে মীনাফীজন্দরম্ পিল্লের নৃত্য অম্লকরণ করতে হত ততোদিক কাল । শ্রাকরার শাগরেদকে কত বছর ধরে একটানা গুরু অম্লকরণ করে যেতে হয়, তার ঠিক ঠিক স্বপ্ন আমার জানা নেই । ভারতবর্ষে এই ছিল রেওয়াজ ।

সাহেবরা এ দেশে এসে বললে, ‘এত বেশী অম্লকরণ করলে নিজস্ব সৃজন-শক্তি (অরিজিনালিটি) চাপা পড়ে যায় । ফলে কোনো কলার আর উন্নতি হয় না ।’ কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । এর মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকনো আছে ।

কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে কি হয়, সেটাও তো নিত্য নিত্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । গুণীজনের উচ্চাঙ্গ সৃষ্টি অধ্যয়ন না করেই, আরম্ভ হয়ে যায় ‘এপিক’ লেখা, দু’কদম চলতে না শিখেই ডান্স ‘কম্পোজ’ করা, আরো কত কী, এবং

সর্বকর্মে নামঞ্জুর হলে সমালোচক হওয়ার পন্থা তো সব সময়ই খোলা আছে। সেই যে পুরনো গল্প—শহর-পাগলা ভাবতো, সে বিধবা মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। পাগলা সেরে গেছে এই রিপোর্ট পাওয়ার পর পাগলা-গারদের বড় ডাক্তার তাকে ভেঙে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে শুধালেন, ‘তা তুমি খালাস হওয়ার পর করবে কি?’ সুস্থ লোকের মতো বললে, ‘মামার বড় ব্যবসা আছে, সেখানে ঢুকে যাবো।’ ‘সেটা যদি না হয়?’ চিন্তা করে বললে, ‘তা হলে আমার বি-এ ডিগ্রী তো রয়েছেই—টাইশনি নেব।’ তারপরে এক গাল হেসে বললে, ‘অত ভাবছেন কেন, ডাক্তার? কিছু না হলে যে কোনো সময়ই তো আবার মহারানীর স্বামী হয়ে যেতে পারবো।’ সমালোচক সব সময়ই হওয়া যায়।

তৃতীয় দল অগ্নি পন্থা নিলে। ওস্তাদদের হুবহু নকল তারা করলে না—তাতে বয়নাকী বিস্তর। আবার বিন্-তালিমের ‘অরিজিনালিটি’ পাঠকসাদারণ পছন্দ করে না। উপায় কি? তাই তারা ওস্তাদদের কতকগুলো বাছাই বাছাই জিনিস অমূল্য করলে এবং শুধু অমূল্যবণই না, বাছাই বাছাই জিনিসগুলোর মাত্রা দিলে বাড়িয়ে।

চার্লি চ্যাপলিন একবার নাম ভাড়িয়ে গোপনবাসের জন্ম গেছেন চলির এক অজানা শহরে। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন ‘সোমবার রাত্রে শহরের কনসার্ট ঘরে চার্লি চ্যাপলিনের নকল করার প্রতিযোগিতা হবে। ভ্যাগাবণ্ড চার্লির বেশভূষা পরিধান করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে টেজের ইস্পাস্‌ উপহার হতে হবে চার্লি ধরনে। সর্বোৎকৃষ্ট অমূল্যবণের পুরস্কার পাঁচশ টাকা।’

চার্লি ভাবলেন, এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না, দেখাই যাক না, প্রতিযোগিতায় ছদ্মনামে কি হয়।

ছাবিশ জন প্রতিযোগীর ভিতর চার্লি হলেন তেরো নম্বর।

তার সয়ল অর্থ, ঐ ছোট শহর, খেড়খেড়ে ডিহি গোপীপুরে বারো জন ওস্তাদ রয়েছেন যারা চার্লিকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন চার্লির পাট কি করে প্লে করতে হয়।

চার্লি শিরে করাঘাত করে বলেছিলেন, ‘হে ভগবান, আমার অভিনয় যদি এই বারো জনের মতো হয় তবে আমি আত্মহত্যা করে মরবো।’

ব্যাপারটা হয়েছে, চার্লি যেখানে নৃশব্দ ব্যঙ্গনা দিয়ে হৃদয়ের গভীর অমূল্যভূতি প্রকাশ করেন এরা সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে মস্তরাত্রে পরিণত করেছেন,

চালি যেখানে চোখের জলের রেশ মাত্র দেখিয়েছেন এঁরা সেখানে হাউমাউ করে আসমান-জমীন ফাটিয়ে আড়াই ঘটি চোখের জল ফেলেছেন, চারুকলার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে চালি যেখানে অথও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশাস্ত শিব সৃষ্টি করেছেন সেখানে তাঁরা প্রত্যেক অঙ্গে ফাইলেরিয়ার গোদ জুড়ে বানিয়ে তুলেছেন এক একটি বিকট মর্কট।

ঘরোয়া উপমা দিতে হলে বলি, ভেজাল সরবের তেলেরই বড় বেশী সোনালী ঝাঁঝ—মারাত্মক তুখোড়।

রবীন্দ্রনাথের ‘দোহল-দোলা’, ‘বাকুল বেণু’, ‘উদাস হিয়াকে’, ‘দোলাতর’, ‘বেণুতর’ করে নিত্য নিত্য কত না নব নব মস্করা হচ্ছে। কিন্তু তবু চালি বেঁচে গেছেন। কারণ আর যা-ই হোক মার্কিন মুন্স্ক পরশু দিনের গড়া নবীন দেশ। ভেজালে এদের অভিজ্ঞতা আর কতটুকু? প্রাচীন চীনের কাহিনী শ্রবণ করুন।

একদা চীন দেশে এক গুণীজ্ঞানী, চরিত্রবলে অতুলনীয় বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হয়। যেমন তাঁর মধুর সরল শিশুর মতো চলাকোরা-জীবনধারা, তেমনি তাঁর অদ্ভুত বচনবিজ্ঞাস। বুদ্ধের কীর্তিকাহিনী তিনি কখনো বলতেন বলদৃষ্ট কণ্ঠে, কখনো সজল করুণ নম্রনে—তথাগতেরই মতন তখন তাঁর সৌম্যবদন দেখে, আর উৎসাহের বচন শুনে বহু শত নরনারী একই দিনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। ক্রমে ক্রমে তাঁর মাতৃভূমির সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি বেজে উঠলো, বুদ্ধের জীবনাদর্শ বহু পাপীতাপীকে ধর্মের মার্গে অগ্রসরণে অগ্রপ্রাণিত করলো।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার পর তাঁর মৃত্যুকণ কাছে এল। তাঁর মন কিন্তু শান্ত, তাঁর চিত্ত নিকম্প প্রদীপ শিখাবৎ। শুধু একটি চিন্তা-বাত্যাঞ্জন কণে তাঁর মুমূর্ষু প্রদীপশিখাকে বিতাড়িত করছে। শিষ্যেরা বুঝতে পেরে সবিনয় জিজ্ঞেস করলে, সেবাতে কোন ক্রটি হচ্ছে কি না।

গুরু বললেন, ‘না। ইহলোক ত্যাগ করতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমার মাত্র একটি ভাবনা। আমার মৃত্যুর পর আমার কাজের ভার কে নেবে?’

শিষ্যেরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর চরিত্রবল কে পেয়েছে, তাঁর বক্তৃতাশক্তি কার আছে যে এ-কঠিন কাজ কাঁধে তুলে নেবে?

গুরু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় অতি অস্বাভাবিক এক নূতন শিষ্য সামনে এসে বললে, ‘আমি এ ভার নিতে পারি।’

গুরুর বদনে প্রশমতার দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠলো। তবু ঈষৎ দ্বিধার কণ্ঠে

শুধালেন, ‘কিন্তু বৎস তোমাকে তো আমি চেনবার অবকাশ পাই নি। তুমি কি সত্যি এ কাজ পারবে? ঐ দেখো, আমার দীর্ঘদিনের শিয়েরা সাহস না পেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা দেখি, তুমি অমিতাভের জীবনের যে কোনো বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতা দাও তো।’

বিস্ময়! বিস্ময়!—সেই শিয় তখন গলা খুলে গাধার মতো, হুবহু গাধার মতো চেঁচিয়ে উঠলো। কিছু না, শুধু গাধার মতো চেঁচালে।

সবাই বাক্যহীন নিম্পন্দ।

ব্যাপার কি?

গুরুর মাত্র একটু সামান্য ক্রটি ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার সময় অল্প বক্তাদের তুলনায় একটু বেশী চিংকার করে কথা বলতেন। ভূঁইফোড় শিগ্ধ ভেবেছে ভালো করে চেঁচাতে পারাতেই উত্তম বক্তৃতার গুঢ় রহস্য। ঐ কর্মটি সে করতে পারলে তাবৎ মুশকিল হবে আসান। তাই সে চ্যাচানোর চ্যাম্পিয়ন রাসভরাজের মতো চেঁচিয়ে উঠেছে।

আমার গুরুদেবের পিতৃতুল্য অগ্রজ সত্যাদ্রষ্টা, প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন,

‘To imitate-এর বাঙলা, অনুকরণ।

To ape-এর বাঙলা, হুঙ্করণ।’

এস্থলে রাসভরাজ।

ফরাসী-বাঙলা

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোনো এক স্থলে খেদ করেছেন, আমরা ইয়োরোপের যে-টুকু চিনলুম সেটা ইংরেজের মারফতে।

তিনি ঠিক কি বলেছিলেন মনে নেই বলে অপরাধ মেনে নিয়ে নিবেদন করি, ইংরেজ বরঞ্চ চেষ্টা করেছে আমরা যেন ইয়োরোপকে না চিনতে পারি।

ইংরেজ যখন এদেশে রাজত্ব করতো তখন দু’টি প্রচারকর্মে মেতে থাকতে সে বড় আনন্দ পেত। তার প্রথম, বিশ্বজনকে জানানো যে, ভারতীয়েরা ড্যাম নিগার, কালা আদমী, তাদের কোনো প্রকারের কল্‌চর্ নেই। দ্বিতীয়, ভারতীয়দের জানানো, ইংরেজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত এবং তাই (আ ফর্তেরিয়রি) ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নেশন তো বটেই। প্রমাণস্বরূপ শেক্সপিয়ারের নাম করলে।

আমরা তখন আমাদের বিজ্ঞাবুদ্ধি দিয়ে যাচাই-পরখ করে দেখলুম, কথাটা ঠিক ; শেক্সপিয়রের মতো কবি পৃথিবীতে কম,—নেই বললেও চলে। ইংরিজিতেই পড়লুম, ফরাসী-জার্মান-ওলন্দাজ-দিনেমার সবাই এ-কথা স্বীকার করেছে। তাই আমরা ইংরেজের বাদবাকি দাবীগুলোও হুড়হুড় করে মেনে নিলুম। বডেল মিথ্যে সাক্ষী—কনফিডেন্স ট্রিক্‌স্টার—এইভাবেই সরল জনকে আপন সব পচা মাল পাচার করে দেয়।

ইংরেজ কিন্তু এ-কথা বলতে ভুলে গেল, উপস্থাসে তার টলস্টয় নেই, গল্পে তার মপাসাঁ নেই, চিত্রকলায় তার রাফায়েল নেই, ভাস্কর্যে তার মাইকেল এঞ্জেলো নেই, দর্শনে কান্ট নেই, নৃত্যে পাভলোভা নেই, ধর্মে লুথার নেই, সঙ্গীতে বেটোকোন নেই।

বিশেষ করে বেটোকোনের কথাই তুললুম।

ইংরেজ জাত স্বর-কানা। তাই সে বেটোকোনের নাম করে না। তাই ইংরেজের বাড়িতে সঙ্গীত-চর্চা নেই। যদি থাকতো তবে এ-দেশের বড় সায়েবদের বাড়িতেও সে-চর্চা আসন পেত। আমরাও ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতুম। ইংরেজ চর্চা করলে এবং আমাদের শেখালে—জ্যাজ্, যেটা তার খুড়তুতো ভাই মার্কিন শিখলে তাদের গোলাম নিগ্রোদের কাছ থেকে।

অতি অবশ্য আমাদেরও দোষ আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা হাজারে হাজারে ফ্রান্স-জার্মানী-ইতালি-রুশে যায় নি বটে, কিন্তু শতে শতে তো গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ক'জন ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাদের সংখ্যা এক হাতের এক আঙুলে গোনা যায় (এবং আশ্চর্য, যে মহাজন আমাদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তিনি কখনো ফ্রান্সে যান নি—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

‘দেশ’ পত্রিকার এ সংখ্যা ফরাসি সাহিত্য নিয়ে। অতএব সেই বিষয়বস্তুর ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করি।

ইংরিজী ভাষা গম্ভীর এবং জটিল কিন্তু তার প্রসাদগুণও আছে। ফরাসী চটুল ও রঙীন। অতিশয় গম্ভীর বিষয় আলোচনা করার সময়ও ফরাসী কেমন যেন একটুখানি তরল থেকে যায়। পক্ষান্তরে রসিকতা করার সময়ও ইংরিজী তার দাঢ্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে না। চার্লস ল্যাম্, এমন কি জেরম্ কে জেরম্ পর্যন্ত যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ধ্রুপদ। উড্‌হাউসে এসে আমরা সর্বপ্রথম চটুলতা পাই।

কিন্তু এহ বাহ। ফরাসী ভাষার সর্বপ্রধান গুণ তার স্বচ্ছতা, তার সরলতা।

ফরাসীরা নিজেই বলেন, ‘যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্লার, ক্লিয়ার) নয় সে জিনিস ফরাসী নয় ।’ আমাদের দেশে আজকাল যে দুর্বোধ্য অবোধ্য পণ্ড বেরয় সে ‘মাল’ প্রথম যখন ফ্রান্সে বেরতে আরম্ভ করল তখন গুণী আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন, ‘যে মধুর ললিত বয়সে মানুষ অবোধ্য জিনিস ভালোবাসে আমার সে বয়স পেরিয়ে গিয়েছে ; আমি আলো ভালোবাসি ।’ তাই আরেক গুণী শেষ কথা বলেছেন, ‘স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা, পুনরপি স্বচ্ছতা ।’

ফরাসী চটুলতা হয়ত অনেকই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু ফরাসী স্বচ্ছতা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে যদি আসতো তবে আর কিছু না হোক, আমাদের মনন সাহিত্যে যে অনেকখানি লোকপ্রিয় হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত দত্ত যদি আরো একটুখানি ফরাসী আওতায় আসতেন তবেই ঠিক বোঝা যেত তাঁর দেবার মতো সত্যিই কিছু ছিল কিনা । এ বিষয়ে বরঞ্চ বলবো, শ্রীযুত অন্নদাশঙ্করের লেখা অনেকখানি ফরাসিস্ ।

শব্দতত্ত্ব এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা ঠিক ঠিক বলতে পারবেন কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার নিবেদন, বাঙলা ভাষার উপর ফরাসী ভাষার (language) প্রায় কোনো প্রভাবই পড়ে নি । বাঙলাতে ক’টি ফরাসী শব্দ ঢুকেছে সে কথা প্রায় পাঁচ আঙুলে গুনেই বলা যায় । অবশ্য এইটেই শেষ যুক্তি নয় ; আমরা বাঙলাতে প্রচুর আরবী এবং ফার্সী শব্দ নিয়েছি বটে কিন্তু ঐ দুই ভাষার প্রভাব আমাদের উপরে প্রায় নেই । কিন্তু অগ্নি কোনো বাবদেও ফরাসী ভাষার প্রভাব বাঙলার উপর আমি বড় একটা পাই নি ।

সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিবিশ্বাস ইনি ফরাসী সাহিত্যের যতখানি চর্চা করেছেন ততখানি চর্চা বাঙলা দেশে তো কেউ করেনই নি, অল্প ইংরেজ জার্মান ইতালিয়ই—অর্থাৎ অফরাসিস্—করেছে । ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, কত বিচিত্র বস্তুই তিনি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে বাঙলায় প্রচার করেছেন । এই যে ইংরিজী এবং ফরাসী পাশাপাশি জাতের ভাষা—গেই ইংরিজীতেই পিয়ের লোতির লেখা ‘ভারত ভ্রমণ’ অনুবাদ করতে গিয়ে ইংরেজ অনুবাদক হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদে মূল ফরাসী যে ঠিক ঠিক ধরা তাই পড়েছে নয়, প্রাচ্য দেশীয় আবহাওয়াও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে ।

এই জ্যোতিরিন্দ্রের বাঙলা ভাষাতেই ফরাসী ভাষার কোনো প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না ।

বরঞ্চ ফরাসী শৈলীর (style) প্রভাব বেশ কিছুটা আছে ।

বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা পাকাপাকি ভাবে বলতে পারবেন, বাঙলার কোন লেখক সর্বপ্রথম ফরাসীর সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্র স্থাপনা করেছিলেন ; আমি শুধু সার্থক সাহিত্যিকদের কয়েকজনের কথাই তুলবো ।

মাইকেলের সার্থক সৃষ্টিমাত্রই গম্ভীর—সংস্কৃত এবং লাতিনের ক্লাসিকাল গুণের সঙ্গে তিনি তাঁর বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন । ওদিকে তিনি আবার অতি উত্তম ফরাসী জানতেন—নূতন ভাষা তিনি যে কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারতেন, সে কথা আজকের দিনের ভাষার ‘ব্যবসায়ী’রা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সে ‘রঙীলা ঘরানা’ তাঁর ভাষার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি । তাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নে তিনি লা ফঁতেনের ধরনে ‘ফাবল্’ (ফেবল্) রচনা করলেন কেন ? লা ফঁতেন তাঁর অনেক গল্প নিয়েছেন ঐশপের গম্ভীর গ্রাঁক থেকে, কিন্তু লিখেছেন অতি চটুল ফরাসী কাহিনী । অথচ তাঁরই অনুকরণে যখন মাইকেল বাঙলাতে ‘ফাবল্’ রচনা করেছেন তখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠ বলছেন,

‘রমাল কহিল উচ্চ স্বর্ণলতিকারে—’

দুই স্বর একেবারে ভিন্ন । অথচ মাইকেলের প্রায় সব ক’টি ‘ফাবলে’র উঃস লা ফঁতেন ।

প্রহসনেও তাই । ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র মূলে মলিয়ের । অথচ শৈলীতে গম্ভীর ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি । যদিও তাঁর আপন ভাষাতে ফরাসী প্রভাব নেই তবু তিনি অল্পবাদের মারফতে যে শৈলী এবং বিষয়-বস্তুর অবতারণা করে গেলেন তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্যের দূর-দূরান্ত কোণে পৌঁছে গিয়েছে এবং আরো বহুদিন ধরে পৌঁছবে ।

তেয়োফিল গতিয়ে, এমন কি বাল্‌জাক্ ও মপাসাঁরা পূর্বে কয়েকটি সার্থক ছোট গল্প লিখেছেন কিন্তু আজ শুধু ফরাসিস না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বীকার করে, মপাসাঁই ছোট-গল্পের আবির্ভাব । তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, দীর্ঘ উপন্যাস না লিখেও পাঠককে কি প্রকারে কাহিনী-রসে আশ্রিত করা যায় (‘কণ্ঠহার’ গল্প নিয়ে সাত-ভলুমী ‘জঁ। ক্রিস্তফ’ লেখা যায়) । মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্ম

১ বরঞ্চ গৌর বসাককে লেখা চিঠিগুলোতে প্রচুর ফরাসী ফ্রিভলিটি পাবেন ।

ডঃতেরফ স্কির মতো ভলুম ভলুম না লিখেও 'হুজুরে' সেই রস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা যায়।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ছোট-গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ যবে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের মারফতে মপাসাঁকে চিনতে শিখলেন তবে থেকেই তাঁর গল্প ঋজু কাঠামো নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে আত্মপ্রকাশ পেল। (অবশ্য প্রথম থেকেই তাঁর গল্পে থাকতো প্রচুর গীতরস এবং পরবর্তী যুগে তিনি অন্য এক মিস্টিক নবরসে ছোট-গল্পকে অপূর্ব এক নবরূপ দান করেন)।

*

*

দান্তে, শেক্সপিয়ার, গ্যোট, কালিদাস কেউই পৃথিবীর সুদূরতম সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবান্বিত করতে পারেন নি মপাসাঁ যতখানি করেছেন। এটম্ বম্ হয়ত পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু বাইসিক্ল ওসেলাইয়ের কল যে রকম গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছে এটম্ বম্ শেক্সপিয়ার সে রকম সাহিত্যে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতে পারেন নি।^২

অথচ আজো যখন কোনো মানুষের জীবনে কোনো এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আসে সে তখন তার প্রকাশ দেবার চেষ্টা করে ছোট-গল্পের মাধ্যমে, অর্থাৎ মপাসাঁর কাঠামো নিয়ে। ইংরেজ, জর্মন, রুশ, বাঙলা এসব অর্বাচীন সাহিত্যের কথা বাদ দিন, অতিশয় প্রাচীন চীন আরবীর মতো ক্লাসিকাল সাহিত্যেও আজকের দিনে মপাসাঁ ছোট-গল্পে আদি গল্পগুরু বাদ্যাকি। সবাই তাঁরই 'রাজেন্দ্র সন্ধমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।'

*

*

বাঙলা সাহিত্যে মপাসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি ফরাসী জানতেন কি না শৈলী-আলোচনায় সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তত্ত্ব শিষ্য রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মপাসাঁর শরণ নিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের কোনো গল্পলেখকই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো মপাসাঁর এত কাছে আসতে পারেন নি। মপাসাঁর মতো প্রভাতের ছিল সমাজের নানা শ্রেণী, নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ে নবীন নবীন গল্প গড়ে তোলার অসীম ক্ষমতা। মপাসাঁর মতো তিনিও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেখানেও দু'জনের আশ্চর্য মিল। ঔপন্যাসিক রূপে মপাসাঁ ফ্রান্সে

২ হেমেন্দ্র বিস্তার শেক্সপিয়ার অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু বাঙলাতে আজ পর্যন্ত কেউ শেক্সপিয়ারের অনুকরণ করেন নি।

বিশেষ কোনো সম্মান পান নি ; বাঙলা দেশে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েরও সেই অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নিবেদন, প্রভাত-পরবর্তী যুগের প্রায় সব বাঙালী গল্প-লেখকই মণাসীর অনুকরণ করেছেন প্রভাতের মাধ্যমে।

*

*

এই সময়ে ‘ভারতা’কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী এক নূতন কথাসাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এ গোষ্ঠী অহরহ অমুপ্রেরণা পেত জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এঁদের ভিতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী ও সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এঁরা প্রধানত ফরাসী সাহিত্য থেকে অমুপ্রেরণা সঞ্চয় করে বাঙলা দেশে এক নূতন ফরাসিস ‘গুলস্তান’ বানাতে আরম্ভ করলেন। এঁদের একটা মন্ত হৃদয়ে ছিল এই যে, এঁরা রবীন্দ্রনাথের গড়া আধুনিকতম বাঙলার সম্পূর্ণ ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে সুযোগ পান নি বলে তাঁর ভাষা ছিল বিত্যাগরী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাবলীল ভাষা ব্যবহার করাতে তখনকার দিনের বাঙালী পাঠকের মর্ম্মহারে দরদী আঘাত হানতে পেরেছিলেন।

সব চেয়ে ‘তাজ্জব ভেঙ্কি বাজি’ দেখালেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাও আবার কাব্যে! এক ভাষার কবিতা যে অগ্র ভাষাতে তার আপন রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে এরকম ভাবে প্রকাশ পেতে পারে এর কল্পনাও বাঙালী পাঠক এর পূর্বে কখনো করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেম বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, এমন কি রবীন্দ্রনাথও বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু এক ‘সদ্যাবশতক’ ছাড়া অগ্র কোনো বই জনপ্রিয় হতে পারে নি। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বলেছেন, অনুবাদ মাত্রই কাম্বীরী শালের উণ্টো দিকের মতো ; মূল নকশার সন্ধান তাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আর-সব সৌন্দর্য উণ্টো পিঠে ওতরায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন, ওতরায়, এবং মাঝে মাঝে উণ্টো দিকটাও মূলের চেয়ে বেশী মূল্য ধরতে জানে।

যাঁরা সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন তাঁরাই আমার কথায় সায় দেবেন। অগ্রতম বিখ্যাত অনুবাদক কাস্তি ঘোষ বহুবীর একথা বলেছেন। তিনি নেই। তাই আজকের দিনের সবে-ধন নীলমণি নরেন্দ্র দেবকে আমি সাক্ষী মানছি।

‘তোয়েফিল গতিয়ে, রঁসার ল্যকঁৎ ছ লিল, ভেরলেন্, বদলের, যুগো (Hugo), শেনিয়ে, মিস্ত্রাল, ভেরেরেন্, ভালমোর, বেরার্জে—কত বলবো?—

কত না জানা-অজানা কবির কত না কবিতা দিয়ে তিনি তাঁর কুস্ত ‘তীর্থ-সলিল’ পূর্ণ করলেন, কত দেশের কত ‘তীর্থরেণু’ বাঙালীর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন।

ঋত্থেদে আছে, হে অগ্নি, তুমি আমাদের পুরোহিত, কারণ তুমি আমাদের সর্ব আহুতি দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। সত্যেন্দ্রনাথ বহু দেশের বহু কবির পুরোহিত।

*

*

কথাসাহিত্যেও ঐ সময়ে প্রচুর কসল কললো। গতিয়ে, যোগো, মেরিমে, দোদে, মপাসী, ছামা, বাল্জাক্ ইত্যাদি বহু লেখকের বহু ছোট-গল্প এবং উপন্যাসও বাঙলায় অনূদিত হল। এ গোষ্ঠীর কাহকলাপ বাঙলা সাহিত্যে কত-খানি স্থায়ী মূল্য ধরে তার বিচার একদিন হবে; উপস্থিত বলতে পারি এঁরা বাঙলা সাহিত্যে যে ফরাসী উদারতার আমন্ত্রণ জানালেন তার ফলে পরবর্তী যুগের অনেক বাঙালী লেখক গোড়ার থেকেই সঙ্গীর্ণতামুক্ত হয়ে সাহিত্যের আরাধনা করতে পেরেছিলেন। হঠাৎ একদিন বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে এঁদের লোকপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে একদিন সম্পূর্ণ লোপ পায়। কিন্তু শরতের মোহ কেটে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেন যে কেউ এঁদের হেমন্তের সফলতা সন্ধান করে না সে এক আশ্চর্যের বস্তু।

*

*

বাঙলায় ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে শুধু প্রমথ চৌধুরী সত্বে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়। ইনিই একমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক যাকে সর্বার্থে ফরাসিস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। একমাত্র এঁরই ভাষাটিতে ‘ঈভনিং ইন্ প্যারিসে’র খুশবাই পাওয়া যায়। এঁর শৈলী ফরাসী শ্লাম্পেনের মতো বৃহদুদিত, ফেনায়িত। এমন কি এঁর বিষয়বস্তুও মাঝে মাঝে ফরাসিভাষার ধূতি পরে মজলিসে এসে বসে। বাঙলা সাহিত্যে বহু পণ্ডিত, বহু দার্শনিক, বহু কলাবিদ এসেছেন, কিন্তু একমাত্র এঁকেই সত্য বিদগ্ধ জন বলা যেতে পারে। এবং সে বৈদগ্ধ্য ফরাসী বৈদগ্ধ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসিসের সঙ্গে বাঙালীর চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়েছিলেন; প্রথমনাথে দুই সাহিত্যে গভীরতম প্রণয়ালিঙ্গন।

এঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ত বাঙলাদেশ একদিন ভুলে যাবে কিন্তু এই বাঙালী ফরাসিস চরিত্রকে বাঙালী কখনো ভুলবে না।

প্রথমনাথের শেষ বয়সে ভারতী গোষ্ঠীর মুমূর্ষু অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ফরাসী পণ্ডিত সিলভা লেভি এদেশে আসেন। তাঁর চতুর্দিকে তখন এক ফরাসী

পণ্ডিতমণ্ডলীর স্রষ্টা হয়। এঁদের প্রধান কণী বোস ৩, প্রবোধ বাগচী, মণি গুপ্ত, শশধর সিংহ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন। এঁদের কেউই প্রচলিতার্থে সাহিত্যে নামেন নি কিন্তু এঁদের মাধ্যমে আমরা এদেশে সর্বপ্রথম ফরাসী পাণ্ডিত্যের সন্ধান পাই। এতদিন আমরা জানতুম, ইয়োরোপীয় ‘প্রাচ্য-বিজ্ঞানদার্শন্য’ বলতে বোঝায় ইংরেজ। এঁরাই প্রথম দেখিয়ে দিলেন, ফরাসিস্ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে রাজত্ব না করেও ভারতীয় শাস্ত্রের চর্চা করেছে প্রচুর ৪। বিশেষ করে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতাদি। প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই বলেছি সাহিত্য ছাড়া অন্য রসে ইংরেজ বঞ্চিত। ফরাসীরা সেখানে যথার্থ গুণী। মণি গুপ্তের অনুবাদে বাঙালী তার সন্ধান পাবে। শাস্তা দেবী এই সময়েই বিশ্বভারতীতে ফরাসী শেখেন।

এই গোষ্ঠীর বাইরে আর ছ’জন পণ্ডিতের নাম করতে হয়। মহম্মদ শহীদুল্লা এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ রায় আর কালিদাস নাগও এই যুগের লোক।

*

*

কিন্তু আমাদের জোড়া কুতুব-মিনার? বন্ধিম এবং রবীন্দ্রনাথ? তা হলে দীর্ঘতব প্রবন্ধ লিখতে হয়। এ যুগের ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, imitation-এর বাঙলা অনুকরণ; aping-এর বাঙলা কি? ‘হলুকরণ’। যারা ফরাসীব ‘হলুকরণ’ করেন তাঁদের উল্লেখ আমি এ প্রবন্ধে করি নি। পদস্থলন সকলেরই হয়। পূর্বোল্লিখিত লেখকদের কেউ কেউ হয়ত অজানাতে মাতাধিকা করেছেন কিন্তু এ-দুটি লোক সঙ্গকে অধম নিঃসংশয়।

বন্ধিম কিঞ্চিৎ ফরাসিস্ জানতেন। কিন্তু তিনি ইংরিজীর মাধ্যমে কঁৎ-কে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। পূর্বসূরীগণের প্রসাদাৎ কঁৎ ফরাসী তর্কালোচনায় যে শুদ্ধবুদ্ধির (rationality-র) চরমে পৌঁছেন, বন্ধিম সেই শাণিত অগ্নি নিয়ে হিন্দুধর্ম বণাঙ্গনে প্রবেশ করেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার সবিস্তর আলোচনা অসম্ভব। তাই এই আক্ষেপ দিয়েই বন্ধিমালোচনা শেষ করি, হায়, তাঁর এই

৩ ইনি ঘোবনেই দেহত্যাগ করেন, কিন্তু এঁর রচনা তখনই বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

৪ পরবর্তী যুগে ভিন্টারিনিংস জর্মন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং তুচ্চি ইতালীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটান। এঁদের সবাই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, বিশ্বভারতীতে।

শুদ্ধবুদ্ধির অমুসরণ আর কেউ করলে না কেন? যে লোক ইন্তেক দয়াসাগরের থেলাক্ষে তলোয়ার খাড়া করেছিল তার অমুকরণ অমুসরণ, এমন কি 'হমুকরণ'ও কেউ করলো না কেন?

রবীন্দ্রনাথের উপর মপার্সার ছায়া পড়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে তিনি ফরাসী কবিতানাট্য এমন কি 'শারাদ'ও পড়েছিলেন। তারই ফলে

Celui qui me lira, dans les
sicle, un soir,
Troublant mes vers—

ইত্যাদি ইংরাজীতে শব্দে শব্দে অনুবাদ :

One who will read me, after centuries, one evening,
turning over my verses—

‘আজি হতে শতবর্ষ পরে’ হয়ে বেরল। কিন্তু প্রথম কয়েক ছত্রের পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলে গিয়েছেন।

ঠিক সেই রকম মেটারলিকের ‘নৌলপাখি’ যে কাঠামোতে^৫ লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’, ‘অরূপ রতন’ সেই কাঠামো নিয়ে, কিন্তু উভয় নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রসনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ মেটারলিককে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছেন। এবং সর্বশেষ নাটকদ্বয় ‘মুক্তধারা’ এবং ‘রক্তকরবী’-র কাঠামোও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব—ভাষা, শৈলী, রসনির্মাণ পদ্ধতি রবীন্দ্রিক তো বটেই।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, অরবিন্দ ঘোষ (ইনি উত্তম ফরাসী জানতেন)—এঁদের মতো প্রতিভাবান লেখকের রচনাতে এঁর প্রভাব, ওঁর ছায়াপাতের অমুসন্ধান করে কোনো লাভ নেই। হীনপ্রাণ লেখক সর্বক্ষণ ভয়ে মরে, ঐ বুদ্ধি লোকে ধরে ফেললে, সে অমূকের কাছ থেকে ধার নিয়েছে; তাই সে মহাজনদের বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ নিজেই এত বড় মহাজন যে, তাঁরা যততরু অনায়াসে বিচরণ করেন। ক্ষুদ্রতম লেখকের বাড়িতেও পাত ফেলতে তাঁদের কণামাত্র ভয় নেই। তাঁদের ঘানিতে যাই ফেল না কেন, স্নেহঘন হয়ে বেরিয়ে আসবে।

এইবারে শেষ প্রশ্ন : ফরাসীর উপর বাড়লা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?

‘লোয়াজো ব্লা’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাড়লায় অনুবাদ করেন

রল। যেরকম বহু বাঙালী লেখককে প্রভাবান্বিত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও বাঙালী গুলী-জ্ঞানীদের সন্ধান রাখতেন। ব্রাহ্ম আন্দোলন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং তাঁদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। বহু ফরাসী ঐ রই মারফতে বাঙলাদেশের অনেক কিছু চিনতে শিখেছে।

পূর্বেই বলেছি, লেভির সঙ্গ পেয়ে বাঙালী গুলী ফরাসী পাণ্ডিত্যের চর্চা করেছিল। লেভি নিজে করলেন উন্টোটা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পেয়ে তাঁরই সাহায্যে করলেন ‘বলাকা’র ফরাসী অনুবাদ। আজ যদি শুনি, পাণিনি কোনো এক চীনা কবির রচনা সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন তা হলে যে-রকম আশ্চর্য হব।

শ্রীমতী আঁদ্রে কার্বেলেজ ফরাসীতে একখানা সঞ্চয়িতা বের করেন। তার নাম ‘ফাই দ্য ল্যাঁদ’—‘লীড্জ্ অব্ ইণ্ডিয়া’। এই চয়নিকায় বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা ছিল প্রধানত। দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানা আমার হাতের কাছে নেই।

এবং নেই, শাস্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক ফের্না বেনওয়ার রচনাবলী। অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় তিনি ‘মুকুধারা’র ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন ‘লা মালিন’ (দি মেলীন) নাম দিয়ে। এর পরবর্তী যুগে বাঙলা সম্বন্ধে আরো বিস্তর লেখা ফরাসীতে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন।

এবং মারাত্মক নেই, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফরাসী প্রেসের অভিমত, অভ্যর্থনা, অকুণ্ঠ প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথ যতবার ফ্রান্সে গিয়েছেন, যখনই তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে, ফ্রান্স তখনই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে স্বীকার করেছে। প্যারিসে স্বীকৃতি পাওয়া সহজ কর্ম নয়। এ-সব প্রেস-কাটিংস্ অনুসন্ধিৎসু পাঠক শাস্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে পাবেন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

অর্থাৎ হাতের কাছে কিছুই নেই—‘ঢাল নেই তলোয়ার নেই’—

তাই আর কেউ বলার পূর্বেই স্বীকার কবে নিই, এ লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

চার্লি চ্যাপলিন

আমার ছেলেবেলায় বায়স্কোপও ছেলেমাছুষ ছিল। হরেক রকম ফিল্ম তখন আসতো; ছোট, বড়, মাঝারি—এখনকার মতো স্টাণ্ডার্ডাইজ্ড নয়। সেনসর বোর্ড-ফোর্ডও তখন শিশু, এখনকার মতো ‘জ্যাঠা’ হয়ে ওঠে নি—‘এটা অঙ্গীল’,

‘ওটা কদম্ব’, ‘সেটা বড় কর্তাদের নিয়ে মস্করা করেছে’ বলে দেশের দেশের রুচি মেরামত করার মতো হরিশ মুখুজ্যে দি সেকেন্ড হয়ে ওঠে নি। কাজেই হরেক রুচির ফিলিম তখন এদেশে অক্রেশে আসতো এবং আমরা সেগুলো গোয়াসে গিলতুম। তার ফলে আমাদের চরিত্র সর্বনাশ হয়েছে, এ কথা কেউ বলে নি। এবং আজ যে সেনসর বোর্ডের এত কড়াকড়ি, তার ফলে এয়ুগের চ্যাংড়া-চিংড়ির ষীতখেট কিংবা রামকেষ্ট হয়ে গিয়েছে এ মস্করাও কেউ করে নি। ভবু শুনেছি সেনসর বোর্ডের বিশ্বাস, বিস্তর ছবি ব্যান করলে শেষটায় ভালো ছবি বেরবে। তাই যদি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা সেনসর বোর্ড লাগাও না কেন? কাকা-মামা-শালাদের চাকরি তো হবেই এবং সুবো-শাম ভদোহদো বই ব্যান করার ফলে একদিন ইয়া দাড়িগোফ সমেত আরেকটি সমুচা রবিঠাকুর বেহেশৎ থেকে টুকুস্ করে ঢস্কে পড়বেন—এই যেরকম হাওড়া ইন্সটিশানের কল থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিট মিন্-ফস্কেপ্-সে বেরিয়ে আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এরা কার রুচি রিফর্ম করতে চায়? আমার? সাবধান! পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় মানে (ওরাই আমাকে মাঝে-মধ্যে বায়স্কোপে নিয়ে যায়), শুনলে ক্ষেপে উঠবে। বোর্ডেরও প্রাণের ভয় আছে। তবে কি টাঙাওলা বিড়িওলাদের? ওঃ! কী দম্ভ! ওদের রুচিতে ভগ্নামি নেই। ঐটে পেলে আমি বর্তে যেতুম।

কিন্তু সে কথা থাক। এই সেনসরিং ব্যাপারটা দেশে-বিদেশে কি প্রকারে সমাধান হয় সে সম্বন্ধে আরেকদিন সবিস্তর আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে ছোট্টা হিটলারদের স্মরণ করিয়ে রাখি বড়া হিটলাররা জর্নানিতে ‘অল কোয়ায়েট’ ফিলিম ব্যান করেছিল।

সেই যুগে হঠাৎ দেখা দিলেন মহাকাবি চার্লি চ্যাপলিন—ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এ রকম একটি ভাস্কর্যহলের-সামনে-দাঁড়িয়ে-নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয় নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাস্কেটবল এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিক্টেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)। ইনি শিশুকর্ম (মডার্ন টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মসিয়ো ভেরু)। ‘অতি বড় বৃদ্ধ’ বলেই ইনি ‘সিদ্ধিতে নিপুণ’ এবং লগ্ন এলে শঙ্করের মতো নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একলা বলেছিলেন, ‘তোমার দিকে চাহিয়া

‘আমাদের বিন্ময়ের অস্ত্র নাই।’ সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপাড়ের হিম্মানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন,

‘সুনীল সাগরের শ্রামল কিনারে

দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।’

চালির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এই দোহাটি মনে পড়ে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদ্বখ্যাত হওয়ার পর টলস্টয় একখানি প্রামাণিক অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। পুস্তকের প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন, ‘হোয়াট ইজ্ আর্ট ?’ অর্থাৎ ‘রস কি ?’ মধুর সঙ্গীত শুনে, উত্তম কাব্য পাঠ করে, দেবীর মূর্তি দেখে আমরা যে আনন্দরসে নিমজ্জিত হই সে বস্তুটি কি ?

তার সংজ্ঞা দেওয়ার পর টলস্টয় বলেন, গুটিকয়েক উদ্যাসককে যে রস আনন্দ দান করে সে রস হীন রস। আচণ্ডাল, (আ-সেনসর বোড ?)^১ জনসাধারণকে যে কাব্য আনন্দ দেয় সেই কাব্যই প্রকৃত কাব্য, উত্তম কাব্য। যথা, মহাভারত। পণ্ডিত-মুখ, বৃদ্ধ-বালক, পাপী-পুণ্যবান সকলেই এ কাব্য শুনে আনন্দ পায়।

অবশ্য সব পাঠক যে একই কাব্যে এএই বস্তুতে আনন্দ পাবে এমনটা নাও হতে পারে। বালক হয়ত কাব্যের কাহিনী বা প্লট শুনে মুগ্ধ, বলদপ্ত্র যুবা হয়ত কণাজুনের যুদ্ধবর্ণনা শুনে বীর রসে লুপ্ত, বৃদ্ধ হয়ত শ্রীকৃষ্ণে অজুনের আত্মসমর্পণ দেখে ভক্তিরসে আত্মত, এবং উদারচারিত্য সবারসে রাসিকজন হয়ত প্রীতি বন্ধার প্রতি মাড়ে প্রকৃত কাব্যরসে নিমজ্জিত।

তা হলে প্রশ্ন, মানুষের ববর ক্রাচকে কি মার্জিত করা যায় না ? হয়ত যায়, কিংবা হয়ত যায় না, কিন্তু চেষ্টা আলবৎ করা যায়। সে চেষ্টা ভরত, দণ্ডিন, মন্মথ, আর্যভট্ট, রবীন্দ্রনাথ, জোচে করেছেন, কিন্তু এঁদের গলা কেটে ফেললেও এঁরা কোনো বোডের মেঘর হতে রাজী হতেন না। মানুষের ক্রটিপরিবর্তন এঁরাই করিয়েছেন—কোনো বোড কখনোই কিছু পারে নি।

বর্তমান যুগে চালি সেই রসই সবজনকে উপহার দিয়েছেন। এ যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাষ্যে, রঙ্গমঞ্চের কুতূপি কেউই চালির বৈচিত্র্য, বিস্তার, গভীরতা, সবজনমর্মস্পর্শক্ষমতা দেখাতে পারেন নি। এ যুগে শার্লক হোমস

১। পাঠক ভাববেন না, আমি কলকাতা বা দিল্লীর বোডের কথা ভাবছি। আমি সর্বাঙ্গের জীবিত ৬ হুত সর্ব বোডের কথা ভাবছি। শ’ যে ক্রম ‘বুইন্ড্ রীডার অব্ প্রেজ’-এর স্বরণে আপন মস্তব্য বিশ্ব-বোডের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন।

সৈ (২য়)—২৮

পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের কোমল হৃদয় স্পর্শকাতরতাকে তিনি তার চরম মূল্য দিতে পারেন নি; ওমর খৈয়ামও প্রকৃত ধর্মভীরুকে বিচলিত করতে পারেন নি।

চার্লিকে বিশ্লেষণ করি কি প্রকারে ?

তার সৃষ্টি, কিংবা তিনি নিজে, এই যে ‘লিটল ম্যান’, সামান্য জন, যেন পাড়ার জগা, টম, ডিক্, হ্যারি ; ‘কেউ-কেটা’ তো নয়ই একেবারে, ‘কেউ-না’ কি করে সকলকে ছাড়িয়ে এক অসাধারণ জন হয়ে সকলের হৃদয়ে এমন একটি আসন গ্রহণ করলো, যে আসন পূর্বে শূন্য ছিল এবং যেখানে আর কেউ কখনো আসতে পারবে না ?

কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি ?

ভ্যাগাবণ্ড চার্লি একটি শুকনো ফুল দেখতে পেয়ে সেটি তুলে নিয়ে তঁকত লাগল। ঝাঁট-দিয়ে-কেলে-দেওয়া ফুল—তার ফুল যৌবন গেছে, সে পথপ্রান্তে অবহেলিত, পদদলিত। সামান্য যেটুকু গন্ধ তখনো তার অঙ্গে সুস্পষ্ট ছিল চার্লি তাই যেন তার ‘সঙ্গদয়’ নিশ্বাস দিয়ে জাগিয়ে তুলে বুক ভরে নিচ্ছে। এ ফুল কি কখনো বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে মৃত্যুর পূর্বমূহুর্তে—রবীন্দ্রনাথের কাঁবি যে রকম আত্মহত্যার পূর্বমূহুর্তে রাজকন্যার বরমালা পেলে—সে তার চরম সম্মান পাবে ?

এমন সময় রাস্তার দুই হোঁড়ারা মোকা পেয়ে পিছন থেকে চার্লির হেঁড়া পাতলুনের ভিতর হাত ঢুকিয়ে শাটে দিল টান। চচ্চড় করে ছিঁড়ে গেল পাতলুনের অনেকখানি—এই তার শেষ পাতলুন, এটাও গেল—আর বোরিয়ে এল হেঁড়া শাটের শেষ টুকরো।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে ভ্যাগাবণ্ড চার্লি হোঁড়াদের দিকে তাকালে। তারা তখন ‘শুভকর্ম’ সমাধান করে ছুটে পালাচ্ছে।

তখন ভ্যাগাবণ্ডের চোখে কী বেদনাতুর করুণ ভাব !

ভিয়েনা, বালিন, প্যারিস-প্রাণে আমি বিস্তর খিয়েটার প্রচুর অপেরা দেখেছি, কাব্যে সাহিত্যে টন মণ করুণ রসের বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু ভ্যাগাবণ্ডের সে করুণ চাউনি এদের সবাইকে কোথায় ফেলে কহাঁ কহাঁ মুহূর্তে চলে যায়।

আর সেই নীরব চাউনিতে বলছে, ‘কেন, ভাই, তোরা আমাকে জালাস ? আমি তো তোদের সমাজের উজীর নাজির হতে চাই নে। কুকুর বেড়ালটাকে পর্যন্ত আমি পথ ছেড়ে দিয়ে কোনো গতিকে দিন গুজরান করছি। আমায় শাস্তিতে ছেড়ে দে না, বাবারা !’ তারপরে যেন দীর্ঘনিশ্বাস—‘হে ভগবান !’

এখানেই কি শেষ ? তা হলে চার্লি দত্তয়েক্স্কির মতো স্বল্প মাত্র করণ রসের রাজা হয়ে থাকতেন।

অন্ধ ফুলওয়ালী মিষ্টি হেসে চার্লিকে একটি তাজা ফুল দিতে যাচ্ছে। তাকে ? চার্লিকে ? অবিখ্যাত !

আইনস্টাইন একবার কোনো শহরের বড় স্টেশনে নেমে দেখেন বিস্তর লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চায়। বিনয়ী আইনস্টাইন শুধু পিছনের দিকে তাকান আর ডাইনে বাঁয়ে সরে যান। নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে কোনো ডাকসাইটে কেউবিড় আসছেন, সবাই এসেছে তাঁকেই বরণ করতে, আইনস্টাইন শুধু আনাড়ির মতো মধ্যখানে বাধার সৃষ্টি করছেন।

কই ? কেউ তো নেই ? রাস্তা একদম ভোঁ ভোঁ—কলকাতার রেশনশপের গুদামের মতো। এরা এসেছে আইনস্টাইনের জগুই।

আমাদের ভ্যাগাবণ্ডিও পিছনে তাকালে। এক্সট্রিমস মীটু। আইনস্টাইন খ্যাতির সবোচ্চ ধাপে, চার্লি নিম্নতম মাপে।

ফুল পেয়ে চার্লির মুখের ভাব ! স্থিত হাত্তে মুখের দুই প্রান্ত দুই কানে ঠেকে গিয়েছে, শুকনো গাল দুটো ফুলে গিয়ে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো চেপে ধরেছে, চোখের কোণ থেকে রগ পর্যন্ত চামড়া কঁচকে গিয়ে কাকের পায়ের নকশা ধরেছে, সে চোখ দুটো কিন্তু বন্ধ—আমার যেন মনে হল ভেজা-ভেজা, ঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমার চোখও তখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।

সবক্ষণ ভয় হচ্ছিল, এইবার না চার্লি ভ্যাকু করে কৈদে ফেলে !

কে বলে সংসারে শুধু অকারণ বেদনা, নিদারুণ লাঞ্ছনা ! পকড়কে লে আও উস্কো। এলিসের রানীর হুকুম, ‘অক্ ফক্ উইন্ হিজ্ হেড্।’

মাগুঘের কলিজায় চার্লি পুকুর খোঁড়েন কি করে ? দুঃখ, সূখ, করুণা, ক্লতজ্ঞতা এসব রস আমাদের কলিজার গভীরতম প্রদেশে চার্লি সঞ্চারিত করেন কোন্ পদ্ধতিতে ?

এক ইরানী কবি বলেছেন, ‘সব জিনিসের হৃদ—অর্থাৎ সীমা জানাটাই প্রকৃত স্রষ্টাকর্তার লক্ষণ।’

অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায়, তাঁর অভিনয়ে চার্লি বাড়াবাড়ি করেন না। কারণ কে না জানে, এক্ষেত্রেমির চূড়ান্তে পৌঁছয় মাগুঘ যখন ভ্যাচব-ভ্যাচর করে সব কিছু বলতে চায়, সামান্ততম জিনিস বাদ দিতে চায় না।

তাই অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন বলেছেন, ‘ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করবে ধ্বনি বলতে তাঁরা ব্যঞ্জনা, ইকিত্ত, সাজেস্টিভনেস অনেক কিছুই বুঝেছেন।

যথা :

কুলটা রমণী পথিককে বলছে, ‘হে পথিক, এই ঘরে রাত্রিকালে আমার বৃদ্ধ স্বশুর-শাশুড়ী শয়ন করেন, ঐ ছোট ঘরে আমি একা থাকি, আমার স্বামী বিদেশে। তুমি এখন যাও।’

ইঙ্গিত স্পষ্ট।

অর্থাৎ চালি যেটুকু অভিনয় করেন, সে তো করেনই; সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই অনেকখানি অভিনয় করে নিই।

হালে চালি স্বথবর দিয়েছেন, তিনি আবার সেই ‘লিটল ম্যান’, সেই ভ্যাগাবণ্ডকে পুনর্জন্ম দেবেন। তাঁর যা বলবার তিনি তারই মারফতে শোনাবেন। শুনে আমরা উল্লসিত হয়েছি। ‘ম’সিয়ো ভেহু’, ‘লাইম-লাইট’ উৎকৃষ্ট অভুলনীয় রসসৃষ্টি কিন্তু আমরা সেই ভ্যাগাবণ্ডকে বড্ড মিস্ করছি।

চালি ভ্যাগাবণ্ডকে বর্জন করেছিলেন কেন?

হয়ত ভেবেছিলেন সব কথা ঐ একই জনের মারফতে বলা চলে না। আমাদের ভ্যাগাবণ্ডের পক্ষে সবাইকে তো বিষ খাইয়ে খাইয়ে—‘বিজনেস ইস্ বিজনেস্’ বলে এলোপাতাড়ি বিধবাহনন করা যায় না—তাই ভেহুর সৃষ্টি।

ঠিক এই কারণেই কোনান ডয়েল শার্লক হোমস্কে মেবে ফেল প্রাক্সব চ্যালেঞ্জার সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাই গল্প কবিতা ধরেছিলেন। এই উদাহরণটাই ভালো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদে পদে দেখলেন তাঁর কবিতায় পদে পদে মিল এসে যাচ্ছে, ছন্দ এসে যাচ্ছে। যাবেন কোথায়? পঞ্চাশ বছরের অভ্যাস। নাচার হয়ে মিলগুলো লাইনের শেষে না এনে মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন—শাক ঢাকা দিয়ে মাংস খাওয়ার মতো।

শেষটায় বললেন, ‘হুতোচ্ছাই! যাই ফিরে ফিরে মিল ছন্দে।’ রবীন্দ্রনাথের গবিতা নিকৃষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তম কবিতা, এই বাঙলা দেশে একমাত্র তিনিই সাথক ‘গবি’, কিন্তু সোজা কথা—তিনি বুঝে গেলেন যে কবিতার মিল ছন্দ বজায় রেখেও তাঁর যা বক্তব্য তা তিনি বলতে পারবেন। ফিরে গেলেন কবিতায়।

চালি যখন ভেহু করছেন, তখন আমরা পদে পদে দেখতে পাচ্ছি তাঁর পিছনে ভ্যাগাবণ্ডকে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাকে লুকোবার জন্তে—রবীন্দ্রনাথ যে রকম মিল লুকোবার চেষ্টা করেছিলেন গবিতায়—কিন্তু আমরা তাকে বার বার

দেখতে পাচ্ছি। বার বার মনে হয়েছে, ‘আহা এ জাহ্নগায় যদি আমাদের ভাগ্যবণ্ডটি থাকতো তবে সে সিচুয়েশনটা কি চমৎকারই না এক্সপ্লয়েট করতে পারতো!’

চালিও সেটা বুঝেছেন। যে ভাগ্যবণ্ডকে এতদিন একটুখানি জিরিয়ে নিলেন, তাকে চালি আবার ঘবের ভিতর থেকে টেনে আমাদের চোখের সামনে তাকে দিয়ে বাউণ্ডলীপনা করাবেন।

সুসংবাদ !!

ফল্গুর ভাষা

থিয়েটারেব কপাল মন্দ, পাঠান-মোগলের আপন দেশে ওটার রেওয়াজ নেই। তাই পাঠান রাজারা এদেশে জমে বসার পর গাইয়ে-বাজিয়েদের ডেকে পাঠালেন, পটুয়াদেবও ডাক পড়লো, নাচিয়েরাও বাদ গেল না আর এয়ারং বানানেওলাদের তো কথাই নেই। সংস্কৃত যদি তখন এ-দেশেব চালু এবং সহজ ভাষা হত তাহলে সংস্কৃত নাটাও যে বাদশাব দরবারে কদর পেত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ হিন্দী কদর পেয়েছিল এবং এ-দেশে বাউলা কদর পাওয়ার ফলে পরাগল খান, ছুটি খানের মহাভারত লেখা হয়েছিল।

সংস্কৃতে লেখা আমাদের নাটা ঠিক মুসলিম আগমনের শুরুতে এদেশে কতখানি চালু ছিল বলা কঠিন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন, সংস্কৃত তখন মৃত ভাষা, ওসব নাটা তখন প্রায় উঠে গিয়েছে। আমি কিন্তু কিঞ্চিৎ ভিন্ন মত পোষণ করি।

পূর্বেই স্বীকার করেছি, পাঠান আমলে সংস্কৃত মৃত ভাষা, কিন্তু সংস্কৃত নাটক তো সম্পূর্ণ সংস্কৃতে লেখা হয়। তুলনা দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করি।

শেক্সপিয়ার জানতেন, তিনি রাজা-রাজড়া এবং শিক্ষিতজনদের জগুই আপন নাটক লিখছেন। কিন্তু অগ্র একটি তত্ত্বও বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁদের সংখ্যা কম, এবং বেশি গ্যালাবি ভরভরাট ক’রে নাটকটাকে জম-জমাট করে তোলে টাঙাওলা-বিড়িওলার দল। কাজেই তাঁর নাটকে ওদেরই মতো চরিত্র ওদেরই ভাষায় কথা কয়, বিশেষ করে ভাড়াটি সব সময়ই রাজা-প্রজা ছুঁদলকেই খুলী করতে জানে।

ঠিক সেই রকম গুপ্ত যুগের কালিদাসও জানতেন যে, তাঁর যুগের ‘টাঙাওলা’

‘বিড়িওলা’ সংস্কৃত বোঝে না, অথচ রাজা-রাজদ্বারা নাটক চান সংস্কৃত। ওদিকে তিনি শেক্সপিয়রের মতো বুঝতেন যে, জনসাধারণকে খুশী না করে কোনো নাটকই বক্স-আপিস ভরতে পারে না। গোলাপফুল খাপছুরং জিনিস। কিন্তু পাতা-কাঁটা ওটাকে খাড়া করে না ধরলে ওটা শুধু শূন্যে শূন্যে ঝুলতে পারে না। তাই তিনি তাঁর নাটকে ব্রাহ্মণ আর রাজা ছাড়া আর-সবাইকে দিয়ে কথা কওয়াতেন তখনকার দিনের চালু ভাষা প্রাকৃত। আর শুধু কি তাই? রাজার সংস্কৃতে শোধানো প্রথের উত্তর দাসী যখন প্রাকৃত দিত তখন কালিদাস তার উত্তরের ভিতর রাজার প্রহরী এমনভাবে জড়িয়ে দিতেন যে সংস্কৃত না-জাননেওলা শ্রোতাও ছুই পক্ষের কথাই পরিষ্কার বুঝে যেত। দাসীর তুলনা দিয়েই যদি জিনিসটা বোঝাতে হয় তবে বলতে হবে, এ-যেন ‘বান্দীকে ঠেঙিয়ে বিবিকে সোজা রাখার’ মতো রাজা এবং প্রজা উভয় দর্শককে সোজা রাখা।

তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাসের নাটক সর্বজনপ্রিয় ছিল।

তার পর প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠিক মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে জনসাধারণ কি কালিদাসের আমলের প্রাকৃত বুঝতো? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো এলেম আমার পেটে নেই। তবে তার একশ’ বছর পেরবার পূর্বেই আমীর খুসরো যে-হিন্দী ব্যবহার করেছেন সে-হিন্দী অনেকটা ঐ প্রাকৃতের মতোই। এবং এখানে আরো একটি কথা আছে। জনসাধারণ ততদিনে কালিদাসের নাটক দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এবং নিরক্ষর দর্শক একটা ফিল্ম তিন বার দেখবার পর যে কতখানি মনে রাখতে পারে সে-কথা শিক্ষিত জন জানেন না। আমার এক চাকর (বস্তুত এই গণতন্ত্রের ইনকিলাবী যুগে ‘মনিব’ বলাই ভালো) পাড়াতে নয়া ছবি এলেই একটানা সাত দিন ধরে সেই ছবি দেখতে যেত। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম, নাগাড়ে সাতদিন ধরে একই ছবি দেখে কি করে? পরে তার গুনগুনানি থেকে বুঝলুম, ছবির চৌদ্দখানা গানই সে রপ্ত করতে চায় এবং করে ফেলেছেও। অনেক হিন্দী গানের বিস্তর কথা না বুঝতে পেরেও! অবশ্য আমার এ-মস্তব্যে ভুল থাকতেও পারে। কারণ আমি এ-জীবনে তিনখানা হিন্দী ছবিও দেখি নি এবং অল্প কোনো পুণ্য করি নি বলে এই পুণ্যের জোরেই স্বর্গে যাবো বলে আশা রাখি। তবে বলা যায় না, সেখানে হয়ত হিন্দী ছবি দেখতে হবে! কারণ এক ইরানী কবি মহাপ্রলয়ের পরে যে শেষ বিচার হবে তারই স্বরণে অনেকটা এই ভয়ই করেন,—

“শেষ-বিচারেতে খুদার সমুখে দাঁড়াবো তো নিশ্চয়,

মানুষের মুখ আবার দেখিব। এইটুকু মোর ভয়।”

“মরা ব্, রুজ-ই কিয়ামৎ গামী কি হস্ত, কৈন্ অস্ত

কি রু-ই মরত্মে আলম্ দু বারা বাহদ দীদ”^১

যদি প্রশ্ন শোধন সে কি করে হয়?—তুমি হিন্দী ফিল্ম বর্জন করার পুণ্যে স্বর্গে গেলে : সেখানে আবার তোমাকে ঐ ‘মাল’ই দেখতে হবে কেন? তবে উত্তরে নিবেদন, কামিনীকাকুনসুরা বর্জন করার ফলে আপনি যখন স্বর্গে যাবেন তখন কি ইক্সলভায় ঐগুলোরই ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন না?

তখন যদি আপনি এক কোণে মুখ গুঁমড়ো করে বসে থাকেন তবে কি সেটা খুব ভালো দেখাবে?

থাক। কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! মূর্খকে চটালে এই তো বিপদ। আবোল-তাবোল বকে।

মোদা কথা এই, পাঠান-মোগল যুগে নাট্যাভিনয় বাজাহুকম্পা পেল না বলে আমরা এখনো তার খেসারতি চালছি। এবং দ্বিতীয় কথা—নাটো, ফিলিমে ভাষা ত্রিনিসটাকে অবহেলা করলে ক্ষতি হয়। এমন কি যদিও বহু গুণী বলে থাকেন ‘সাইলেন্স্ ইজ গোল্ডেন’ তবু সাইলেন্ট ফিলিম চললো না। বাঙলা ফিলিম যখন সে সাইলেন্স্ ভাঙলো তখন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভাষা সে বললে তারই দিকে এ-প্রবন্ধের নল চালনা।

সাতশ’ বছর পরে ইংরেজ আমলে হল ঠিক তাব স্টেটো। কলাজগতে ইংরেজের প্রধান সম্পদ তার থিয়েটার। শেক্সপিয়রের মতো নাট্যকার নাকি পৃথিবীতে নেই। ইংরেজ বললে, ‘চালাও থিয়েটার।’ কিন্তু প্রশ্ন, কে করবে থিয়েটার?

ইতিমধ্যে বাঙালী বিলেত যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানে একাধিক নেশার সঙ্গে সে থিয়েটারের নেশাটাও রপ্ত করে এল।

বাঙলা গাছ এবং পছত পশন দুইই বড় কাঁচা।

আর জনসাধারণের ভাষা? তারও মা-বাপ নেই। একদিকে শেষ-মোগলের ফাদী উত্তর শেষ রেশ, অতীতকে স্মৃতিহুটি-গোবিন্দপুরের ঐতিহ্যহীন স্নায়ু—দুয়ে

১ The only thing which troubles me about the
Resurrection day is this,
That one will have to look once again on the faces of
mankind.

মিলে তার যা চেহারা সেটা কিছুদিন পরে পাওয়া যায় হতোমের নকশায়।
অন্যদিকে বিভাসাগরের অতি ভদ্র অতি মার্জিত ভাষা।

এ-যুগের নাটকের ভাষা তাই শব্দতত্ত্বের স্বর্গভূমি। কিন্তু নাটকে যে স্বচ্ছন্দ ভাষার প্রয়োজন তার বড়ই অভাব। সব নাট্যকারই যেন ঠিক মানানসই ভাষাটির জগ্ন চতুর্দিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।^২

মাইকেলের পৌরাণিক নাট্যে বিভাসাগরী ভাষা; তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে কলকাতার স্বাভাৱ, 'বুড়া শালিকের' বাড়ি রোঁতে গ্রাম্যকলের একাধিক ভাষা; এবং দীনবন্ধু মিত্রের ভাষাতে বিভাসাগরী ও গ্রাম্য দুইই।

নীলদর্পণ সে যুগের বাঙলার বেদনা প্রকাশ করেই যে বিখ্যাত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, বিভাসাগরী ভাষা ও মুসলমান চাষার ভাষা এ-দুয়ের সংমিশ্রণও তার জগ্ন অনেকখানি দায়ী। অবশ্য শুধুমাত্র ভাষার বাহার যদি শুনেই চান তবে 'বুড়া শালিকের' মতো নাটক হয় না। হিন্দু গৃহস্থ, হিন্দু চাকর, মুসলমান চাষা, চাষার বউ, হিন্দু দাসী এদের সকলের আপন আপন ভাষার স্বস্থতম পার্থক্য মাইকেল যে কী কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে কোথাও নেই। নাটক হিসেবে এ-বই উত্তম—সাহিত্য হিসেবে ভাষার বাজারে এ-বই কোহিনুর।

অবাঙালীর জগ্ন পার্শী থিয়েটার করে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি ঠিক জানি নে, কিন্তু বিস্তর বাঙালীও সেখানে যেত ও উর্-গুজরাটীতে মেশানো নাটক বৃকতে যে তাদের বিশেষ অস্ববিধে হত না সে তথ্য কিছু অজানা নয়। 'ছি ছি এতা জঞ্জাল' জাতীয় জনপ্রিয়, বাঙলা-উর্তে মেশানো থিচুড়ি ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভাষা কিছুটা হতোম আর কিছুটা পার্শী থিয়েটারের কল্যাণে।

ইতিমধ্যে ভাষাসম্ভার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায় বঙ্কিমের কল্যাণে। বঙ্কিমের ভাষানির্মাণে কোন্ কোন্ উপাদান আছে সে-কথা আজ ইঙ্গলের ছেলে পর্যন্ত জানে। ডি এল. রায় শ্রেণী এর পূর্ণ সম্ভাবহার করেন।

এইখানে এসে আমাদের সবাইকে—বিশেষ করে রবীন্দ্র-শিগ্গাদের একটু বিপদে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষা যে তাঁর ছোটগল্প উপন্যাসের মাধ্যমে

২. শুনেছি সর্বপ্রথম নাকি এক রাশান এদেশে থিয়েটার করেন। তিনি তখন ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা কতখানি পেয়েছিলেন, তার প্রভাব পববর্তী যুগের বাঙলা থিয়েটারে কতখানি পড়েছিল, এ-সব প্রশ্ন ভাষার বিচারে অবাস্তব।

আমাদের দৈনন্দিন কথা ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে সে-কথা আমরা সবাই জানি, এবং তার প্রভাব যে আমাদের রঙ্গমঞ্চেও পড়েছে সেও প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর নাটকের ভাষা এত বেশী মার্জিত, এত বেশী শৃঙ্খল যে নাট্যশালার আটপোরে কাজ তা দিয়ে চালানো যায় না। তাই বোধহয় তাঁর নাটকের মূল্য সাহিত্য হিসাবে যত না সম্মান পেয়েছে এবং পাবে, নাট্য হিসাবে ততখানি পায়, পাবে কি না সন্দেহ।

*

*

গোড়ার দিকে ফিলিমের কোনো ছুঁচক্সা ছিল না। কারণ সে তখন ভাষণ না করে শোভা বর্নন করতো। ঠিক আমার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তাশীল চিত্রচালককেই মনস্থির করতে হল টকির ভাষা ও উচ্চারণ হবে কি? এ-মুশকিলের একটা অতি সহজ সমাধান আছে। শরৎবাবু ‘নিষ্কৃতি’ করতে হলে তাঁর ডায়ালগের ভাষা দিলেই হল। এর আর ভাবনা কি?

মুশকিল আসান অতি সহজ হয় না। প্রথমত কোনো কোনো বর্ণনা ডায়ালগে প্রকাশ করতে হয়; তখন উপায়? সেটা তৈরি করে দেবে কে? সে-কলম আছে কার? রবীন্দ্রনাথের বারোটি গান নিয়ে যখন দস্তী লেখকেরা মাঝখানে মাঝখানে ‘আপন’ পত্র ছুড়ে দিয়ে কিমপিয়ার (কঁপের) করেন, এবং দুই পাকা গানের মাঝখানে সেই কাঁচা বাঙলা শুনেতে হয় তখন মনে হয় না, থাক্, বাবা, বাড়ি যাই?

কিন্তু সেইটেই প্রধান শিরশীড়া নয়। আসল বেদনা অন্যখানে। বইয়ের লেখা ডায়ালগ আর সিনেমায় উচ্চারিত কথাবার্তা এক জিনিস নয়। বই বন্ধজনের সঙ্গে পড়ে শোনানো যায়—তার পাল্লা অনুর অবদি। নাটো, পদ্য সেটা অত্যধিক ‘সাহিত্যিক’। অবশ্য নিছক ফিলিমের জন্য লেখা রাবিশের কথা এখানে হচ্ছে না।

অন্যদিকে সিনেমার ভাষাতে যদি কোনো সাহিত্যিক মূল্যই না থাকে তবে সে ইস্‌থেটিক পর্যায়ে উঠতে পারবে না। এই হল আমাদের দু-মুখো সাপ, ডিলেমা, প্যারাডক্স—যা খুঁশি দলতে চান বলুন।

প্রথম যখন মাণ্ডু পাথরের বাড়ি তৈরি করতে শিখল তখন পূর্বতর যুগের কাঠের বাড়ির অনুকরণে পাথরের বাড়ি তৈরি করতো; বাঙলা দেশে ইট চালু হওয়াব পর প্রথমটায় সে খড়ের চাল অনুকরণ করেছে; বেতারের বয়স হয়েছে—এখনো সে নাটক করার সময় ‘থিয়েটারের’ (থিয়েটারের নয়) অনুকরণ করে—ফিলিম কেন অনুকরণ করতে যাবে?

ক্রন্দসী

- “আমার নামের মন্ত্রণে

উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শ্রুত

রোমাক্ষিত ; সত্ত্বর পশিল গৃহ মাঝে

পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে

আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাত্ত ভরে,

‘অতিশয় অসময়ে অভাজন’ পরে

অযাচিত অহুগ্রহ’।”

ওঃ ভাষার কী জেলায়। ‘অতিশয় অসময়ে অভাজনে অযাচিত অহুগ্রহ—’

‘অ’-য়ে ‘অ’-য়ে ছয়লাপ। তাও ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশের মুখ।

গল্পটি সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ এটি কণেবর জাতক থেকে নিয়েছেন। আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে রাজ্যপালের মেয়ের আঙুলি হাটিয়েছে। তুমুল কাণ্ড। স্বয়ং আই জি যখন চোর ধরে গবর্নমেন্ট হোসের দিকে যাচ্ছেন তখন মনে করুন মাতাহারি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি কি তখন ‘উতলা’ এবং ‘রোমাক্ষিত’ হবেন না? তাঁর মুখে কি তখন থৈ ফুটবে না, চোখ দুটো পলকা নাচ নাচবে না! অবশ্য সামান্য ‘অ’ দিয়ে কবিত্বের প্রকাশ—রবীন্দ্রনাথ অতি মোলায়েম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুলিশ এর বেশি আর কি কবিত্ব করবে? তবে কিনা রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি লিখেছিলেন সেদিনের তুলনায় আজকের পুলিশ বড্ড বেশী লেখা-পড়া করে আপন সর্বনাশ টেনে আনছে!

আমার অবস্থা হয়েছিল বজ্রসেনের। সে চোর।

আমি তখন বোম্বায়ে। আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্কার। নাম জভেরী—অর্থাৎ জহরীর গুজরাটি সংস্করণ। এক বাঙালী ‘ফিলিম-এস্টেটের’ শাদী। তিনি তাঁর ব্যাঙ্কার জভেরীকে নেমতন্ন করেছেন। জভেরী ব্যাচেলর; আমার সঙ্গে চম্ করে। স্টার সেটি জানতেন। লঙ্কোয়ে প্রতাপালিত বঙ্গরমণী এটিকেট-দুফন্ত হয়, যত না প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। বিবেচনা করি আমারও নিমন্ত্রণ ছিল—কিন্তু কসম খেতে পারবো না।

রোশনাই বাজি বাজনা যা ছিল তা এমন কিছু মারাত্মক খুনিয়া ধরনের নয়। কত্যা কুরূপা হলে এসবের প্রয়োজন। ইংরিজীতে বলে লিলি ফুলকে তুলি দিয়ে রঙ মাখাতে হয় না,—আজকের দিনের ভাষায় লিপিস্টিক-রঞ্জ মাখাতে হয় না। যারা আছেন এবং যারা আসছেন তাঁদের এক এক জনই এক ধামা লিলি—না, দুই ধামা।

দরিদ্র আবুহোসেন ঘুম ভাঙতে দেখে, সে, হৃন্দরীদের হাতে। কুঞ্জে গুঞ্জে গন্ধে অহুমান করলে সে খলীকা হক্কন-অব-রশীদের হারেমের ভিতর। সাক্ষাৎ পরীক্ষান।

আর আমি? অধুনা মৃত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন আমাকে 'বুদ্ধ নিষ্ঠা'র মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হৃন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমিও বুঝি ফিল্ম স্টার—'স্টাটিউ'র ('স্টাটিউ' সাদামাটা সিনেমা বাবদে অজ্ঞজনের শুদ্ধ উচ্চারণ।) ড্রেস না ছেড়েই দাঁওয়াতে এসেছি।

আমি ভাল করেই জানি, আপনারা সব স্টারদেরই চেনেন, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে দেখেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। তত্পরি আরেকটি ছোট কথা আছে। তারকার তুলনা দিয়েই নিবেদন করি। অরক্ষণীয় আকাশের ক্ষুদ্রতম তারকা। কিন্তু তিনি বলিষ্ঠের পাশে বসে যখন সপ্তর্ষির সাতটি তারকার একজন হয়ে দেখা দেন তখন মনে হয় ইনি না থাকলে সপ্তর্ষি সাতটি তারকাই মিথ্যা হতেন।

শাদী মজলিসে তাই ক্ষুদ্রতম তারকাটিও চিত্তহারিণী হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। এলেন, মনে করুন,—নামগুলো একটু উণ্টেপাটে দিচ্ছি—শমশাদ বাহু লায়লা। পরনে সাতিনের পাজামা। পায়ের এক একটি ঘের অন্তত দু'হাত। স্বচ্ছন্দে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের তিনটি পাজামা বা পাঁচটি পাতলুন হতে পারে। শমশাদ বাহুর কোমরটি বঙ্গরমণীর কঁকনের সাইজ। তাই কোমর থেকে পদার মতো ফোল্ডে ফোল্ডে সে পাজামা নেমে আসতে বোঝা গেল না তিনি মাডাম পম্পাডুরের ফ্রক পরেছেন, না ভাওয়ালের জমিদারবাড়ির লুঙ্গী পরেছেন, না ইরানী বেদেনীদের তাম্বু-পানা ঘাঘরা পরেছেন। আসলে নাকি একে লঙ্কোঙ্গি বড়ী মুরী পাজামা বলে। তা সে যে নামই হোক আমার মনে হল আমি যেন খাসিয়া পাহাড়ে মুশমই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে। বিজলির আলো প্রতি ফোল্ড বেয়ে যেন গলা রূপোর মতো ঝরনাধারায় পায়ের কাছে নেমে এসে শততরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে শমশাদ বাহু লায়লা যেন আশ্চর্য হৃৎকুণ্ডে কটিতটি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এর সঙ্গে সে-যুগে লম্বা কুর্তা পরা হত। ইনি পরেছেন কপুলিকা বা চোলী। আমি মাত্র একবার সেদিকে তাকিয়েছিলুম।

মোগল বাদশা মারা গেলে যে ছেলে রাজা হত সে অন্তদের চোখ চোখেরই সুরমা পরার শলা দিয়ে কানা করিয়ে দিত। আমার দুটি চোখই যেন কানা হয়ে গেল। ও রকম কিংখাব আমি দেশ-বিদেশের কোনো জাদুঘরেও দেখি নি।

সোনা রূপোর জরি দিয়ে সে কিংখাবে এমনই কারুকার্য করা হয়েছে যে কিংখাবের একটি টানা-পোড়েনের রেশমী সূতোও দেখা যাচ্ছে না।

ঘাঘরাটি ছিল যেন শীতল ঝরণা ; এ যেন সাক্ষাৎ অগ্নিকুণ্ড।

চোলির হেথাহোথা দু'-একটি মুক্তো গাঁথা। যেন বহি নির্বাণিত করার জন্য ক্ষুদ্র হিমিকার নিষ্ফল প্রয়াস।

হু' কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে বুলবুল-চশ্ম ওড়না।

সেই ছেলেবেলায় দাদীমাকে বুলবুল-চশ্ম শাড়ি পরতে দেখেছি। আর আজ তার-ই ওড়না। অতি ক্ষুদ্র মসলিনের এখানে ওখানে দুটি দুটি করে বুলবুলের চোখের (চশ্ম) মতো ফুটো করে সে দুটি অতি ফাইন মুগা সিল্ক দিয়ে বোতামের ফুটোর মতো কাজ করা হয়। এ রমণীর রুচি আছে। ক্র্যাসিক্‌স্ পড়ে। বুলবুল চশ্ম কালিদাসের যুগের, তার নুলা ইনি জানেন।

আশ্চর্য! এলো গোপা। গান্‌মেটল রঙের কৃষ্ণনীল চুলের খোঁপাটি কাঁধে শুয়ে আছে যেন কৃষ্ণকরবীর স্তবক শুভ্র ফুলদানিতে ঘুমিয়ে আছে।

*

*

হঠাৎ দেখি এক চোখ-ঝলসানো হৃন্দরী, বিধবার থান পরে! ইনি বিয়ের পরবে কেন? আমাদের দেশে ত্রো কড়া বারণ। তখন আবার দেখি তাঁব হাতে ফেনা-ভর্তি শ্যাম্পেনের গেলাস। নাঃ, ইনি সত্য স্টুডিয়ো থেকে শুটিং অধঃমাপ্ত রেখে এসেছেন।

*

*

আরো অনেকেই ছিলেন। বেবাক বর্ণনা দিতে হলে ভাষাম পূজা সংখ্যাটা আমাকেই লিখতে হয়। খচায় পুষাবে না—সম্পাদক জানেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলাল জভেরী এসে আমাকে নিয়ে চললেন সেই তারকা যজ্ঞশালার প্রান্তদেশে অনাদৃত উমিলার অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে অগ্ন প্রান্তে। কি ব্যাপার? জভেরী উত্তেজনার মদ্যিথানে ইংরিজী ভুলে গিয়ে গুজরাটীতে কি যেন 'হু'হু' করলে। কে যেন আমাকে ইন্টারভ্যু দেবে। আমি বেকার। বিধি তবে দক্ষিণ। অগ্ন প্রভাতের সবিতা প্রসন্নোদয় হয়েছেন। আশো ইন্টার হব।

শয়শায় বায়ু লায়লা হুহু হাস্য করলেন। ফিল্ম-স্টারের ধবধবে সাদা দাঁত নয়। গোলাপীর চেয়েও গোলাপী রঙের অতি ক্ষীণ একটি ফিল্ম—ফিল্ম-স্টারের দাঁতের উপর। কি সুন্দর! তাই বৃদ্ধ কালিদাস তাঁর নায়িকার দাঁতের সঙ্গে রাঙা অশোকের তুলনা দিয়েছেন—শুভ্র বন-মল্লিকার সঙ্গে দেন নি। আগেই

বলেছি, ইনি ক্লাসিকল। পানের রস গ্রহণ করতে জানেন। অল্প পান কিন্তু জানেন না। হাতে লেমন-দ্রোয়াশ।

শুধালেন, ‘আপনি দার্শনিক?’

আমি জভেরীকে ধমক দিয়ে বললুম, ‘জভেরী!’

জভেরী ভীত। বললে, ‘আমি কিচ্ছু বলি নি।’

আমি বীবী সাহেবাকে চালাকি করে শুধালুম, ‘আমাকে কি এতই বিজ্ঞ মনে হয়?’

‘বুদু মনে হয়। বিজ্ঞ মনে হয় খ্রিস্টাবকে, ব্যাকারকে, পোকার খেলাড়ীকে।’

বাধা হয়ে বললুম, ‘না। আমি দার্শনিক নই। আমি দর্শনের শত্রু ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করি।’

শমশাদ বাহুর মুখে তৃপ্তির চিহ্ন ফুটলো।

এত দিনে আমার নীরস শাস্ত্রচর্চা ধন্য হল।

বললেন, ‘সে তো আরো ভালো। আমি তাই খুঁজছিলাম। আচ্ছা বলুন তো—’ বলে তিনি যেই একটু থেমেছেন, আমি তাড়াতাড়ি বললুম, ‘বীবী সাহেবা, এই জায়গা কি ধর্ম-চর্চার পক্ষে প্রশস্ত?’

অবহেলার সঙ্গে বললেন, ‘নয় কেন? পাপীরাই তো ধর্মচর্চা করবে। ধার্মিকদের তো এসব হয়ে গিয়েছে। তেলো মাগায় ব্রিলেণ্টাইন? সে-কথা থাক। আমি শুধোতে চাই, কেউ যদি মরে যায় (আমাব মনে হল শমশাদ কেমন যেন একটু শিউরে উঠলেন) তবে আমি মরে গেলে তাঁকে দেখতে পাবো কি?’

আমি শুধালুম, ‘কোন ধর্মমতে?’

‘সে আবার কি?’

‘আমি “তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্র” চর্চা করি।’

‘তার মানে?’

‘এই মানে ধরুন, পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান মেলা ধর্ম আছে। আমি প্রত্যেক ধর্মের জন্ম, যৌবন, বর্তমান অবস্থা,—কে কি বলে তাই পড়ি। যেমন প্রত্যেক দেশের ইতিহাস হয়, তেমনি প্রত্যেক ধর্মের ও ইতিহাস হয়।’

একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, ‘আমি অতশত বুঝি না। আমি কিল্ম কাজ করি, আমি পণ্ডিত নই। আমি জানতে চাই, এত সব ধর্ম পড়ার পর এ-বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত, পার্সোনাল মতটা কি?’

মহা কাঁপরে পড়লুম। বললুম, ‘আমি কখনো ভেবে দেখি নি। মুসলমান ধর্ম বলে—’

বাধা দিয়ে বললেন, ‘থাক। আপনি তাহলে একটি আস্ত চিনির বলদ। ধর্ম বয়ে বেড়াচ্ছেন—কখনো কাজে লাগান নি।’

আমি বললুম, ‘ধর্ম কি মশলা বাটার জিনিস! নামাজের কার্পেট দিয়ে কি মানুষ বিছানা বাঁধে?’

অতি শাস্তকণ্ঠে বললেন, ‘না। কিন্তু নামাজের কার্পেটে মানুষ নামাজ পড়ে; ওটা শিকের তুলে রাখে না।’

আমি বললুম, ‘আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে ফিল্ম-স্টারদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। আপনি নিশ্চয়ই বিস্তর লেখাপড়া করেছেন।’

‘কী আশ্চর্য! এ তো কমন্সেন্সের কথা। এটা না থাকলে প্রডুসার, ডিরেক্টর, এডমায়ারার, লাবারের দল আমাকে কুটিকুটি করে ফেলতো না! ওসব কথা থাক। আপনি আমার কথার উত্তর বেশ চিন্তা করে দিন।’ তারপর জভেরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ওহে জভেরী, ওঁকে একটা শ্যাম্পেন দাও না?’

আমি মাথা নেড়ে বললুম, ‘থাক। আপনার পাল্লায় পড়ে আমার বিশ বছরের নেশা কল্পুর হয়ে গেছে। আড়াই ফোটাতে আর কি হবে, লায়লীবাহু!’

একটু হেসে বললেন ‘আপনার মুখে “লায়লী” বেশ মিষ্টি শোনায়।’

সব্বোনশ! সব্বোনশ!! এ যে ডবল এটাক। পিনসার মুভমেন্ট।

ওড়নাটি ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ারে যে ভাবে চেপে বসলেন তাতে বললুম যে এঁর গায়ে কাবুলী রক্ত আছে। উত্তর না নিয়ে উঠবেন না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটি বন্ধ—বড় শাস্ত প্রশান্ত নিস্তব্ধ ভাব। ঐ বেশ পরা না থাকলে মনে হত তপস্বিনী, কঠোর ব্রতচারিণী সূফী রমণী।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, ‘আমার মনে হয়,—’ থামলুম। কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ পর ফের বললুম, ‘আমার মনে হয়—’

অল্প একটু ‘ঐ’ শুনতে পেলুম।

‘—যে পুণ্যবান লোকের কোনো কামনা আল্লাতাল্লা অপূর্ণ রাখেন না।’

*

*

আমি জানি, চতুর্দিকে তখন হৈ-ছল্লোড়। কিন্তু আমার মনে হল যেন আমি মরুভূমির মাঝখানে হুপুর রাত্রে জেগে উঠেছি। দিবাভাগের আতপতাপে দহ

সব কাকেলার মাছুষ উট গাধা ঘোড়া সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আকাশের নৈশতাকাকেও যেন মরুভূমির নৈশশব্দা হার মানিয়েছে। কোথা থেকে এল এ শাস্তি, এ বিধান? তাকিয়ে দেখি, লায়লার মুখ থেকে।

ততক্ষণে জভেরী শ্রাস্পেন নিয়ে ফিরেছে।

লাহুলা উঠে বললেন, ‘আপনার কথা ঠিক।’

তারপর জভেরীকে রাজেশ্বরীর কণ্ঠে বললেন, ‘তুমি থাকো। আমি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।’

গাড়িতে একটি কথাও হয় নি।

আমি নামবার সময় তাঁকে ‘আদাব আরজ, খুদা হাফিজ’ বললুম। তিনি সযত্নে আমার ডান হাত আপন ছ’হাতে ধরে মুহূ চাপ দিলেন। সে চাপে ছিল বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা। ফিল্ম-স্টারের হাতের চাপ আমি এর আগে, এখন এবং এর পরেও কখনো পাই নি।

মধ্যরাত্রি অবধি খাটে শুয়ে শুধু শাস্তি অল্পভব করেছিলুম।

রাত তিনটেয়, বোম্বইয়, একবার ধড়মড় করে জেগে উঠে ফের শুয়ে পড়েছিলুম।

*

*

সকালে উঠে দেখি, জভেরী ব্যাঙ্কে চলে গিয়েছে।

তারপর দেখি, পূব রাত্রির প্রসন্নতা মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

কী যেন এক অজানা অস্বস্তির ভাব সর্ব দেহমন অসাড় বিকল করে দিয়েছে।

ফোন বাজল। জভেরী চিংকার করে কি বলছে।

‘শোনো, কাল রাত তিনটেয় শমশাদ আগ্নেহত্যা করেছে। দুটো চিঠি রেখে গিয়েছে। একটা পুলিশকে, একটা তোমাকে। তোমার চিঠিটার নকল যোগাড় করেছি। লিখেছে, ‘মাই ডিয়ার এম, তোমার কথাই ঠিক। আমি চললুম। দেখা যখন তাঁর সঙ্গে হবেই তখন আর শেরি করে লাভ কি? আমি জানি আত্মহত্যা পাপ। আমার সব পুণ্যের বদলে এটা মাফ হয়ে যাবে।’

এখন মনে পড়ছে সন্ধ্যার সময় জভেরী বাড়ি এসে আমার হাত থেকে কোঁচ নামিয়েছিল।

এ-জীবনে এই প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলুম। আর এই শেষ ॥

ছুন্দর কা সির্পর চঃমেলি কা তেল

লিঙ্গোদ্যোফোন রেকর্ডের কথা অনেকেই শুনেছেন। এ-রেকর্ডগুলোর সাহায্যে দিলী-বিদেশী যে-কোনো ভাষা অতি চমৎকার রূপে শেখা যায়। রেকর্ডগুলোতে বড় বড় ভাষা এবং উচ্চারণবিদরা গোড়ার দিকে খুব সহজ ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন, ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে শেষের রেকর্ডগুলোতে এমন বেগে বলেছেন যে, সেটা আয়ত্ত করতে পারলে আপনি সে ভাষায় নিজেকে ওকীবহাল বলে পরিচয় দিতে পারবেন। প্রথম একখানি রেকর্ড নিয়ে বার বার সেটা শুনতে হয়। তারপর প্রগ্রহতা ও উত্তরদাতার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে, সামনে পাঠাপুস্তকের দিকে চোখ রেখে উচ্চারণ করে যেতে হয়। পাঠাপুস্তকে আবার ‘অমুশীলন’ও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও করতে হয়। ‘কী’ দেওয়া আছে। তাই দিয়ে ভুলগুলো মেরামত করে নিতে হয়।

বুদ্ধি-ত্বির বিশেষ প্রয়োজন নেই। শুধু গাবার খাটুনি আর সাহসিকতা বা নিষ্ঠা। কংবা বলতে পারেন ‘লেগে থাকা’র প্রয়োজন।

আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর বেশির ভাগ জিনিস শেখার জন্ম আক্কেল-বুদ্ধির প্রয়োজন অতি সামান্য। আসলে প্রয়োজন গাবার খাটুনি। বাড়লায় বা অথ যে-কোনো ভাষাতে শব্দ-ভাণ্ডারের শ্রাব্য কর্তে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন কোথায়? ‘পদ্য’ শব্দের প্রতিশব্দ ‘কমল’, ‘সরোজ’, ‘পঙ্কজ’। শব্দতে হলে কাউকে মাইকেলের মতো মেধাবী হতে হয় না, প্রয়োজন হয় ঐ কর্মে রোজ লেগে থাকার। কারো মুখস্থ হয় এক দিনে, কারো লাগে তিন দিন। তফাৎ এটুকু মাত্র। স্বয়ং মাইকেলই নাক বলোছেন, জিনিসায়ের ৯৯% পার্সাপরেশন, অর্থাৎ মাথার খাম পায়ে ফেলা, আর মাত্র এক পার্সেন্ট ইন্সপিরেশন, অর্থাৎ বিাধদত্ত প্রাতিভা।

শুধু মাত্র মাথার খাম পায়ে ফেলে মাইকেলের মতো কাব্য রচনা করা যায় না। কিন্তু নিছক খাটুনির জোরে যে কোনো ভাষার অন্ততঃ এতখানি আয়ত্ত করা যায় যে, দেশের ৯৯% লোক তাকে ঐ ভাষায় পাণ্ডিত বলে মেনে নেয়।

এবং এই সোনার বাড়লার ৯৯% লোক খাটতে রাজী নয়। রেওয়াজ না করেই সে গাওড়াইয়া হয়ে যায়, নিত্য নবীন নাচ ‘কম্পোজ’ কর্তে থাকে।

কিন্তু সে-কথা থাক। পরানন্দা বা আপন নন্দা—আমিও তো বাঙালী বটি—করে আমি পুজোর বাজারে বসভঙ্গ কর্তে চাই নে। তাই মূল কথা আদ্রষ্ট্য কর।

এই লিঙ্কোয়াকোন রেকর্ড পস্তনের প্রথম যুগে বার্নার্ড শ' চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। অতি হৃদয় উচ্চারণে স্বমধুর ভাষণ। ব্যঙ্গ-কৌতুক, রস-স্বাষ্টি, আর তথ্য-পরিবেশ তো আছেই।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

“...হয়ত তুমি চালাক ছেলে। আমাকে শুধালে, তা হলে কি আমি সব সময় একই ধরনে কথা বলি ?

“আমি সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি কবি নে। কেউই করে না। এই তো এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার গ্রামোফোনওলাদের সামনে কথা বলছি, এদের অনেকেই আমার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি কথা প্রাণপণ বোঝবার চেষ্টা করছে। বাড়িতে আমি আমার জীব সঙ্গে যে রকম বেথেয়ালে কথা কই, এখন যদি তোমাদের সঙ্গে সেরকমধারা কথা কইতে যাই, তা হলে এ রেকর্ডখানা কারো এক কড়ির কাজে লাগবে না ; আর এখন তোমাদের সঙ্গে যে রকম সাবধানে কথা বলছি, সেরকম যদি দ্বীপ সঙ্গে বাড়িতে বলি তা হলে তিনি ভাববেন আমার বন্ধ পাগল হতে আর বেশী বিলম্ব নেই।

“জনসাধারণের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয় বলে আমাকে সাবধান থাকতে হয় যে, বিরাট হলের হাজার হাজার লোকের শেষ সারির প্রোতাও যেন আমার প্রত্যেকটি কথা পরিকার শুনতে পায়। কিন্তু বাড়িতে ব্রেকফাস্টের সময়ে আমাব জী আমার থেকে মাত্র দু'ফুট খানেক দূরে বসে আছেন। তাই বেথেয়ালে এমন ভাবে কথা বলি যে, তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রায়ই বলেন, ‘ও রকম বিভ্রিভ করা না ; আর দেখো, কথা বলার সময় অল্প দিকে ঘাড় ফিরিয়ে না। তুমি যে কি বলছো আমি তার কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।’ এবং তিনিও যে সব সময় সাবধানে কথা বলেন তা-ও নয়। আমাকেও মাঝে মাঝে বলতে হয়, ‘কি বললে ?’^১ আর তিনি সন্দেহ করেন যে, আমি ক্রমেই কালা হয়ে যাচ্ছি, অবশ্য তিনি সেটা আমাকে বলেন না। আমি সস্তর পেরিয়ে গিয়েছি—কথাটা হয়ত সত্য।

“কিন্তু এ-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, রাজরাণীর সঙ্গে কথা বলার মতো আমি যেন আমার জীব সঙ্গে কথা কই এবং তাঁরও বলা উচিত যেন তিনি রাজার

১ এখানে শ' ইচ্ছে করেই ‘আই বেগ ইয়োর পাডন’ কিংবা ‘এক্সকিউজ মি’ বলেন নি। ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাড়িতে জীকে আমরা পোশাকী আদবকায়দা দেখাই নে।

সঙ্গে কথা বলছেন। তাই উচিত; কিন্তু আমরা তা করি নে।

“আমাদের আদব-কায়দা দু’রকমের—একটা পোশাকী, অন্যটা ঘরোয়া। কোনো অপরিচিতের বাড়িতে গিয়ে যদি দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের কথাবার্তা শোনো—অবশ্য আমি আদর্শেই বলতে চাই নে যে এরকম অভদ্র আচরণ তোমার পক্ষে আদর্শ সম্ভব—কিন্তু তুমি, ভাষা শেখার অত্যধিক উৎসাহে ভূমি যদি কয়েক মূহূর্তের তরে এরকম অপকর্ম করে শোনো, পরিবারের লোক বাইরের কেউ না থাকলে আপোসে কি ধরনে কথা বলে এবং পরে যদি ঘরে ঢুকে ওদের কথা শোনো তাহলে তোমার সামনে ওদের কথা বলার ধরন দেখে রীতিমত অশ্রু হয়ে যাবে। এমন কি, আমাদের ঘরোয়া কায়দা-কেতা পোশাকী কায়দার মতো উত্তম হলেও—আসলে আবার ভালো হওয়া উচিত—তাদের মধ্যে সব সময়ই পার্থক্য থাকে এবং সে পার্থক্য অল্প সব কায়দা-কেতার চেয়ে কথাবার্তাতেই বেশী।

“মনে কর ঘড়িটাতে দম দিতে ভুলে গিয়েছি; ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে! কাউকে তা হলে জিজ্ঞাস করতে হয়, ‘কটা বেজেছে?’ অপরিচিত কাউকে জিজ্ঞাস করলে বলবো, ‘কটা বেজেছে, বলতে পারেন?’ সে তখন প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু যদি জীকে ঐ কথাই শুধাই তবে তিনি সর্বসাহুল্যে শুনতে পান ‘কটা বেজে?’ তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাস করলে ওরকম বললে চলবে না। তাই এখন তোমাদের সামনে কথা বলছি জীর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশী সাবধানে! কিন্তু পদ্মাটি, ওকে সেটি বলো না।”

•

•

শ’ কথাগুলি বলেছেন প্রধানত উচ্চারণ সম্বন্ধে। কারণ, তিনি রেকর্ডের মারকতে বিদেশীকে ভালো ইংরিজী উচ্চারণ শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি যে ‘আমরা সর্বত্রই একই উচ্চারণে কথা বলি নে’, ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশী প্রযোজ্য। শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ ইত্যাদি আমরা সকলের সামনে একই ভাবে বাছাই করে প্রয়োগ করি নে।

খন্তর মশায়ের সামনে ঘাড় নিচু করে, হাত-পা দিয়ে বায়ু সমুদ্র মন্থন করা কিছুকণের মত হৃগিত রেখে বলি,

‘আজ্ঞে, রামবাবু বললেন, ঐ ব্যাপার নিয়ে আমি যেন হুশিয়ার না করি।’

পিতাকে বলি, ‘রামবাবু বললে, যাও, ও-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।’

রকের ইয়ারকে বলি, ‘ব্লা রেমোটো কি বললে জানিস? বললে, “যা যা

হৌড়া, মেলা ডে'পোমি কত্তি হবে না, আপন চরকার তেল দে গে যা।”

শ' সর্বোচ্চ উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। সেটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তিনি যে তাঁর স্ত্রীকে সমঝে চলতেন, এমন কি ডরাভেনও, সে-কথা কারো অজানা নেই। আর ডরায় না কে? ‘পঞ্চতন্ত্র’ পড়ে দেখুন—বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অস্ত্র একজনের। লাইব্রেরী থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অস্বাভাবে আছে।

তাই প্রশ্ন উঠবে, উপরের যে রিপোর্টটি পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করছে, সেটি যদি বউয়ের কাছে নিবেদন করি, তবে সেটা কি রূপ নেবে?

সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে, বউ কি শুনতে চান। তিনি যদি শুনতে চান, ‘রামবাবু ঐ কাজেব ভারটা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আপনাকে তাই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তাহলে তো আপনি নিশ্চরোয়া হয়ে গিয়ে তেরিয়া মেরে চড়াকসে বলবেন, “ঈ্যা, ঈ্যা গিন্নী, যা কয়েছো।” আমি যতই বলি, “রামবাবু, আপনাকে কিছুটা চিন্তা করতে হবে না। আমি সব বোঝা কাঁধে নিচ্ছি”, তিনি ততই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, “না ভায়া, ও কাজ আমার—তোমাকে দেখতে হবে না।” কি আর করি? গুঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়ে এলুম।’

আর যদি গিন্নী উটোটা আশা করে থাকেন? অর্থাৎ আপনি যদি মিশনে ফেল মেরে এসে থাকেন? তাহলে? তাহলে ‘ঈশ্বর রক্ষতু’।

গলা সাক করে ইদিক-উদিক তাকিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, “—

আবার বলছি তখন ঈশ্বর রক্ষতু। আমি আর কি বলবো। চরিত্র বছর হল বিয়ে করেছি। এখনো সে ভাষা শিখতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো হল কথাবার্তায়। সাহিত্যে এ জিনিসটি আরো প্রকট।

সেখানে কাকে উদ্দেশ করে লিখছেন সেটাতো আছেই, তার উপরে আছে বিষয়বস্তু।

কালীপ্রসন্নসিংহ যখন মহাভারতের অলুবাদ করেছেন তখন ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা, কারণ বিষয়বস্তু এপিক, গুরুগম্ভীর। ‘হতোয় পাঁচাচর নক্সা’য় তিনি ব্যবহার করেছেন ‘রকে’র ভাষা। কারণ সেখানে বিষয়বস্তু ‘বেলেলাপনা’, অস্ত্রএব চতুল এবং সেই কারণেই ‘মেঘনাদবধে’র ভাষা এক, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র ভাষা অন্য। ‘কৃষ্ণচরিত্রে’র ভাষা এক, ‘কমলাকান্তে’র ভাষা অন্য।

এমন কি ধরুন, বিষয়বস্তুও এক, কিন্তু সেখানে পরিবেশ এবং পাত্র ভিন্ন বলে ভাষাও ভিন্ন হল। ‘পারস্ত্র ভ্রমণে’ রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন ঐ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়, গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে—তাই তার ভাষা এক এবং ‘মরুভূমি-হিংলাজে’র পাত্রপাত্রী অতি সাধারণ জন—এমন কি রিক্‌রাক্—তাই তার ভাষা অন্য; ‘মরুভূমি’ ‘পারস্ত্র’র চেয়ে ভালো না মন্দ সে-কথা উঠছে না। দুটোই রসসৃষ্টি, কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস।

অর্থাৎ বিষয়বস্তু—কন্টেন্ট—তার শৈলী এবং ভাষা—স্টাইল—নির্বাচন করে। সেখানে উন্টোপাণ্টা করলে রসসৃষ্টি হয় না।

‘বকিমের ভাষার অম্বুবর্তন করবে’—ছেলেবেলা থেকেই সে উপদেশ শুনেছি এবং ধবে নিয়েছি সে ভাষা ‘বাক্সিংহ’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’র ভাষা।

ঐ ভাষা দিয়ে পাড়ার কানাই-বলাইয়ের কাহিনী লিখতে গেলে কর্ম ও কন্টেন্টে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তার ফলে বাবে বারে তাল কাটে। শব্দ চাটুজ্জব প্রথম যৌবনের লেখাতে তার নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যায়। প্রৌঢ় বয়সে তিনি তার আপন ভাষা পেয়ে বিষয়বস্তুব সঙ্গে তাল রেখে অদ্ভুত তবলা শোনালেন।

এমন কি ‘গোরা’, ‘ষোঁগাযোগ’, ‘শেষের কবিতা’র ভাষা দিয়ে ‘কচিসংসদ’ লেখা যায় না।

তাঁই রবীন্দ্রনাথ বা বকিমের অম্বুবর্তন (ইমিটেশন) সহজেই হত্বকরণ (এপিং) হয়ে যেতে পারে ॥

আর্ট না অ্যাক্সিডেন্ট

আর্ট বলতে আমরা আজকাল মোটামুটি রস ই বুঝি। তা সে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে যে কোনো কলাব মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক না কেন।

এখন প্রশ্ন আর্ট বা রসের সংজ্ঞা কি? সে জিনিস কি? তাব সঙ্গে দেখা হলে তাকে চিনব কি করে? অগ্ণাত বস থেকে তাকে আলাদা করব কি করে? সুবেস আর্ট কোনটা আব নিরেসই বা কোনটা?

প্রাচীন ভারত, গ্রীস এবং চীন—এই তিন দেশেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে এবং অধুনা পৃথিবীর বিদগ্ধ দেশ মাত্রেই এ নিয়ে কলহ-বিসংবাদের অন্ত নেই। বিশেষ করে যবে থেকে ‘মডার্ন আর্ট’ নামক বস্তুটি এমন সব ‘রস’ পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে যার সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই।

এলোপাডাডি রঙের পৌছকে বলা হল ছবি, অর্থহীন কতকগুলো দুর্বোধ শব্দ একজোট করে বলা হল কবিতা, বেসুরো বেতলা কতকগুলো বিদঘুটে ধনির অসম্বন্ধ করে বলা হল সঙ্গীত। বলছে যখন তখন হতেও পারে, কিন্তু না পেলাম রস, না বুঝলাম অর্থ, না দিয়ে গেল মনে অথ কোনো রসের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত। তাই বোধহয় হালের এক আলংকারিক মডার্ন ভাস্করের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যখন ভাস্কর এক বিরাট কার্টের গুঁড়ি নিয়ে তার উপর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ বাটালি চালানোর পর সেটাকে কাঠের গুঁড়ির আকার দিতে পারেন, এবং নিচে লিখে দেন “কার্টের গুঁড়ি”—তখন সেটা ‘মডার্ন ভাস্কর্য’।

ইতিমধ্যে এই মডার্ন আর্টের বাজারে একটি নতুন জীব ঢুকেছেন এবং সেখানে হলস্থূল বাধিয়ে তুলেছেন—এর নাম অ্যাক্সিডেন্ট, বাঙলায় দুর্ঘটনা, দৈবযোগ, আকস্মিকতা যা খুশী বলতে পারেন।

এঁর আবির্ভাব হয়েছে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশে—যেখানে মানুষ ঠাণ্ডাভাবে ধীরে-সুস্থে কথা কয়, চট করে যা-তা নিয়ে খামখা মেতে ওঠে না।

*

*

সুইডেনের মহাসম্মানিত ললিত কলা আকাদেমির বিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রফেসর, কলারসিক গুণীজ্ঞানীরা অকস্মাৎ কিংকতবাবিমূঢ় হয়ে কণ্ঠমূলের পশ্চাদ্দেশ কণ্ঠন করতে লাগলেন। তাঁদের মহামান্যবর প্রেসিডেন্ট তো খুদাতাঙ্গার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে সোজা সুজি বলেই ফেললেন, ‘কি কবি, মশাইবা, বলুন। কে জানত শেষটায় এরকমখারা হবে? আজকাল নিত্য নিত্য এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে যে, কোন্টা যে এক্সপেরিমেন্ট আর কোন্টা যে অ্যাক্সিডেন্ট কি করে ঠাণ্ডারাই? আমরা ভেবেছি, চিত্রকর ফাল্‌স্ট্রোম্‌ আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং তাই ভেবে ঐ ছবিটাও একজিবিশনের অগ্ন্যাগ্ন ছবির পাশে টাঙিয়ে দিয়েছি—’

ওদিকে আর্টিস্ট ফাল্‌স্ট্রোম্‌ বেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সর্পত্র চৌচাষেটি করে বলতে লাগলেন, ঠাঁক লোকচক্ষে হ'ল করাব মানসে দুটো লোক কুমতলব নিয়ে এই অপকর্মটি করেছে।

অপকর্মটি কি?

ফাল্‌স্ট্রোম্‌ ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসনাইটের টুকরোর মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময়ে সুইডিশ ললিত-কলা আকাদেমি এক বিরাট মহতী একজিবিশনের ব্যবস্থা করেন—‘স্বতঃস্ফূর্ত কলা (স্পন্টানিস্‌মুস বা Spontaneous art) ও

তার সর্বাকৌণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সে চিত্রপ্রদর্শনীতে স্নাইডেন তথা অন্তান্ত দেশের স্পন্টানিস্‌ম্‌স কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন তাতে থাকবে। (ক্যাবিজম,, দাদাইজম্‌ব মতো স্পন্টানিয়েজম-ও এক নবীন কলাসৃষ্টি পদ্ধতি—আমি অবশ্য এখানে সে প্রশ্ন তুলছি নে যে সার্থক কলাসৃষ্টি মাত্রই স্পন্টোনিয়াস বা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে,—বিশেষ পদ্ধতিকে এ নাম দিলে তাকে চেনবার কি যে সুবিধে হয় বোঝা কঠিন।)

এখন হয়েছে কি, আর্টিস্ট কাল্‌স্টোন্‌স্‌ তাঁর অগ্র ছবি যাতে কবে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ বড়বেবড়ের ম্যাসনাইটের টুকরোখানা তাঁর ছবির উপরে বেধে চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। আকাদেমিক বড় কর্তারা ডাবলেন, এটাও মহৎ আর্টিস্টের এক নবীন মহান কলানিদর্শন এবং পরম প্রকৃতিতে সেই ম্যাসনাইটের টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামখ্যাত নামটি লিখে ঝুলিয়ে দিলেন আর্টিস্টের অগ্র ছবির পাশে।

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন আর্ট সমালোচকরা কি যে কববেন ঠিক করতে ন' পেবে চূপ কবে গেলেন আর স্নাইডেনবাসী আপনার আমার মতো সাধারণজন মুখ টিপে হাসলে যে বাবা বাবা পণ্ডিতেরা ঐ 'স্বতঃস্ফূর্ত' বসিকতাটা ধরতে না পেরে ফাঁদে পা ফেলেছেন বলে।

কিন্তু এইখানে ব্যাপারটা ব গোড়াপত্তন মাত্র।

স্নাইডেনের কাগজে কাগজে তখন আলোচনা আরম্ভ হল এই নিয়ে : একখানা উটকো কাঠ জাতীয় জিনিসের উপর এলোপাতাড়ি রঙের ছোপকে যদি পণ্ডিতেরা আর্ট বলে মেনে নিতে পাবেন তবে তাঁদের ঢাক ঢোল পেটানো এই মহাসাধনার 'মহার্ণ আর্টে'র মূল্যটা কি ?

*

*

ওইভিন্দ ফাল্‌স্টোন্‌ স্নাইডেনের নাম কবা তরণ চিত্রকর। তিনি সম্প্রতি এই 'স্বতঃস্ফূর্ত কলা মার্গে' প্রবেশ কবেছেন এবং কলা নিমাণের ক্রমবিকাশে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর চং একাধিকবার আগাপান্তলা বদলিয়েছেন। স্নাইডেন এখন এই 'কনক্রীট', 'স্কুল', বা 'বাস্তব' মার্গের খুবই নামডাক, এঁরা নিজেদের অমুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত অনব্যবহিত ভাবে বড়ের মাঝকতে প্রকাশ করেন—সে প্রকাশে কোনো বস্তু বা কোনো কিছু প্রতিকৃতি থাকে না, কোনো কিছু কপায়িত করে না, ছবি ব নাম পর্যন্ত থাকে না—এবং দর্শক তাই দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, সরাসরি আর্টিস্টের অমুভূতি বুকে গিয়ে তার অর্থ করে নেয়,—কিংবা ঐ আশা করা হয়।

এই হল মোটামুটি তার অর্থ—অর্থীং অর্থহীন জিনিসকে যদি অর্থ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে যে ‘অর্থ’ দাঁড়ায়।

কালস্টোয়াম্ চিত্রপ্রদর্শনীতে দু’খানি ছবি পাঠাতে চেয়েছিলেন, এবং পূর্বেই বলেছি, সে দু’খানি ছবি যাতে করে পোস্টাণিসের চোট না খায় তাই সঙ্গে সেই ম্যাসনাইটের টুকরো দিয়ে সেগুলোকে প্যাক করে তিনি চলে যান গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। এদিকে আকাদেমির বাৎ-সিদ্ধিরা ছবি তিনখানা (আসলে অবশ্য দু’খানা) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বাছাই করে নিলেন দু’খানা,—এবং তার মধ্যে মনোনীত হয়ে গেল তুলি পৌছার সেই ম্যাসনাইটের পট্ট। ক্রিটিকদের কারোরই কাছে ঐ ম্যাসনাইটের ‘অদ্বিত’ তুলিপৌছা রঙ-বেবঙ কবা জিনিসটির স্টাইল বা বিষয়বস্তু অদ্ভুত বা মূল্যহীন ঠেকে নি। তার অর্থ, একদিকে চিত্রকরের ‘শ্রায়ত’ ‘ধর্মসম্মত’ আঁকা ছবি ও অন্যদিকে তাঁর তুলি পৌছার এলোপাথাড়ি রঙের চোপ—এ দুয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

তাই লেগেছে হলস্থল তর্কবিতর্ক, ‘সে আর্ট তবে কি আর্ট যেখানে “ভুল” জিনিস অক্লেশে খাটি আর্ট বলে পাচাব হয়ে যায়?’

এটা ধরা পড়ল কি করে? কালস্টোয়াম্ ছুটি থেকে ফিরে একদিন স্বয়ং গিয়েছেন চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। সেখানে ঐ ‘ম্যাসনাইট ছবি’র কাণ্ড দেখে যখন ভুলটা ধরা পড়ল তখন কোথায় না তিনি বিচক্ষণ জনেব মতো চূপ করে থাকবেন—তিনি উন্টে আরম্ভ করলেন তুলকালাম কাণ্ড!

কলে জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিতমণ্ডলী, তীক্ষ্ণচক্ষু কলাসমালোচকদেব দল, বাহু বাহু আর্টসংগ্রহকারিগণ, সরলচিত্ত সাধারণ দর্শক এবং সবশেষে নিজেই আর তামাম ঐ ‘স্বতঃস্ফূর্ত-কলা-পন্থী’কে বিশ্বজনের সম্মুখে তিনি হস্তাস্পদ করে ছাড়লেন।

এর কয়েক বছর পূর্বে এক বিদগ্ধ বিদূষক চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীর ‘আঁকা’ একখানি ‘ছবি’ ঐ রকম এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়ে শহরের লোককে বোকা বানিয়েছিল—তখনও কেউ ধরতে পারেন নি, ওটা বাদরের মস্তুরা।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ধরনের তামাশা চলবে কতদিন ধরে? এই যে স্পন্টানিস্টের দল, কিংবা অন্য যে-কোনো নামই এদের হোক—এরা আর কতদিন ধরে আপন ব্যবহার দিয়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রকাশ করবেন যে এদের আর্ট কোনো কিছু সৃজন করার দুরূহ শক্তিসাধনার আয়ত্ত নয়, আকস্মিক দৈবপ্রতিপাক বা অ্যাক্সিডেন্ট বা ঘটনাক্রম এদেরই মতো উত্তম দত্তম ছবি আঁকতে পারে, শ্রেষ্ঠ গান গাইতে পারে, সার্থক কবিতা রচনা করতে পারে—এতদিন যা শুধু সরস্বতীর

বরপুঞ্জেরাই বহু সাধনার পর করতে পারতেন ?

এই প্রশ্নটি শুধিয়েছেন এক সরলচিত্ত, দিশেহারা সাধারণ লোক—সুইডেনের কাগজে।

উত্তরে আমরা বলি, কেন হবে না ? এক কোটি বাদরকে যদি এক কোটি পিয়ানোর পাশে বসিয়ে দেওয়া হয়, এবং তারা যদি এক কোটি বংশপরম্পরা ওগুলোর উপর পিড়িং পাড়ায় করে তবে কি একদিন একবারের তরেও একটি মনোমোহন রাগিণী বাজানো হয়ে যাবে না ? সেও তো অ্যাক্সিডেন্ট !

আমার ব্যক্তিগত কোনো টীকা বা টিপ্সনী নেই। মর্ডার কবিতা পড়ে আমি বুঝ না, আমি রস পাই না। সে নিয়ে আমার কোনো খেদ নেই। পৃথিবীতে যে অতশত ভালো জিনিস রয়েছে যার রসাস্বাদন আমি এখনো করে উঠতে পারি নি, ওগুলো আমার না হলেও চলবে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

আমরা যারা বাল্য বয়স থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছি এবং আশ্রমবাসী সকলেই থাকে সেদিনও পর্যন্ত এখানকার সর্বজনপূজ্য আচার্যশ্রেষ্ঠ রূপে পেয়ে সফটের সর্বশ্রেষ্ঠ কাণ্ডারী ও আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী জেনে মনে মনে গভীর পরিতৃপ্তি অনুভব করতাম, আজ তাদের শোক সব চেয়ে বেশী।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে তাঁকে অসংখ্য লোক কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হয়ত তাঁদের অনেকেই আমাদের চেয়ে তাঁকে পূর্ণতররূপে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের এবং সমগ্রভাবে আশ্রমের সভ্যতায় যে আঘাত লেগেছে তার কঠোরতা আজ এই প্রথম আমরা বুঝতে আরম্ভ করলুম। এতদিন আমাদের এমন একজন ছিলেন যিনি বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তারপরেও সেদিন পর্যন্ত তিনি আশ্রমবাসীদের সবাগ্রীগুণে আমাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্রমের দৈনন্দিন সমস্তাতে তাঁকে জড়িত করা হত না, কিন্তু তিনিই ছিলেন গুরুতর সমস্তাতে আমাদের সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক।

এখানকার শিক্ষাভবনের (অর্থাৎ ইন্সুলার) শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন আবিস্ত করেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে তাঁর এই কর্মভার গ্রহণ যে উভয়ের পক্ষেই পরম প্রাধার বিষয়, সে-কথা দুজনেই জানতেন।

শরবর্তীকালে উত্তর বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি অধ্যাপক হলেন ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি উপাচার্যরূপে আশ্রম পরিচালনা করেন। 'উপাচার্য' শব্দ এখানে প্রয়োগ করাতে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। এটি একটি রাষ্ট্রীয় অভিধা—বস্তুত তিনি আচার্যোত্তম ছিলেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রধান আচার্য রূপে পেলে ধন্য হত।

এবং এই তাঁর একমাত্র কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়।

বস্তুত এরকম বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরল। কেউ তাঁকে জ্ঞানের সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত রূপে, কেউ মধ্যযুগীয় সম্ভ্রমের প্রচারক রূপে, কেউ রবীন্দ্রপ্রতিভার সমাক রসজ্ঞ ও টীকাকাররূপে, কেউ চৈনিক-ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারার্থী গবেষকরূপে, কেউ বাউল-ককোরের গুঢ় রহস্যবৃত্ত তত্ত্বজ্ঞানের উন্মোচকরূপে, কেউ শব্দতত্ত্বের অপার বারিদি অতিক্রমণরত সম্ভরণকারীরূপে, কেউ হৃৎ-হৃৎখের বৈদিকার্থে পুরোহিতরূপে, কেউ এই আশ্রমের অমূল্যনামিকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যাহুয়ারী রূপ দিবার জন্ত উপযুক্ত মন্ত্র আহরণে রত ঋষি রূপে—আমরা তাঁকে চিনেছি গুরুরূপে।

বিনয়বশত প্রকৃত গুণীজন তাঁর গুণ আচ্ছাদিত রাখেন, কিন্তু শিষ্যের কাছে তাঁর সর্বগুণ উন্মোচন করে দেন। তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, অলঙ্কারশাস্ত্র তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল এবং ভরতমন্মথসম্বৃত প্রাচীনতম অলঙ্কারিক নৃত্য তিনি অতি সাধারণ, অতিশয় গ্রাম্য গীতিকাতে আরোপণ করে দে যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে-কথা বার বার সপ্রমাণ করতে জানতেন। বৈষ্ণবসন্তান বৈষ্ণবরাজও ছিলেন। রক্তনশাপ্তে তাঁর অমুরাগ ছিল। অভিনয়ে তিনি স্বদক্ষ নট। ভারতের ঐক্যাস্ত্র-সম্বন্ধানের পর্যটকরূপে চৈতন্য ও বিবেকানন্দের পরেই তাঁর নাম করতে হয়।

তাঁর আরো বহু গুণ ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। আজ সেদিন নিশ্চয়ই নয়। এই এখন আমার কানে ভেসে আসছে কিত্তিমোহনের বিহারকিত্তি শালবীথিকায় তাঁর স্মরণে শোকতপ্ত আশ্রমবাসিগণের সপ্রদ্বন্দ্ব 'আগুনের পরশমণি' বৈতালিক গীতি।

*

*

চিত্রে নন্দলাল। সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ। শাস্ত্রে বিধুশেখর। শব্দতত্ত্বে হরিচরণ। শিক্ষকতায় জগদানন্দ। রসে কিত্তিমোহন।

সু:নেছি বিশ্বভারতী এঁদের সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশ করবেন। তার প্রতিভাই পাওয়া যাবে বিশ্বভারতীর নাতিসম্পূর্ণ ইতিহাস। এ কর্মে সংঘাতীভ

শিখের সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি শুধু সেটুকু বলতে পারি যা স্বচক্ষে দেখেছি।

শাস্ত্র এবং রসালোচনার রবীন্দ্রনাথের দুই বাহু ছিলেন বিশ্বদেবর এবং ক্ষিত্তিমোহন।

সকলেই আশা করেছিলেন কাশীব শাস্ত্রী ক্ষিত্তিমোহন সংস্কৃত চর্চায় যশস্বী হবেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে দিলেন বাঙলার জনবৈদগ্ধ্য চর্চায়। আজ আব মধ্যযুগের সম্ভবা যে পৃথিবীর সর্বসমৃদ্ধের সমকক্ষ এ কথা নিয়ে কেউ তর্কাতর্কি করে না, এ দেশের আউল-বাউলরা যে সাধনার গভীরতম অভ্যাসে পৌছে প্রাচীন যুগের মূনি ঋষিদেরই ব্রহ্মানন্দ আত্মদান করেছিলেন সে-কথাও কেউ অস্বীকার কবে না, এমন কি কোনো কোনো অর্বাচীন ঐ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখে এখন সপ্রমাণ কবতে চায় যে, সে ক্ষিত্তিমোহনকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাঁর ‘অসম্পূর্ণ’ জ্ঞান ‘সম্পূর্ণত্ব’ করে দিয়েছে। বিরাটকায় ক্ষিত্তিমোহনের স্বল্পে ঝাঁড়িয়ে বামনও হস্তত একটু বেশী দূর অবাধ দেখতে পায় অস্বীকার কার নে, কিন্তু সে বামন ক্ষিত্তি-অতিক্রমের বিরাট মস্তিষ্ক আব বিরাটতব হৃদয় পাবে কোথায়। তবে আজ এই বিতর্কনুলক প্রস্তাব (অবশ্য আমাব কাছে নয়) উত্থাপন করব না—আজ শোকের দিন।

এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষিত্তিমোহন আউল-বাউল গান নিয়ে আলোচনা করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন সেটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রচর্চা পদ্ধতি। অর্থাৎ উপনিষদ বা গীতাব টীকা লেখাব সময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে রকম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠোদ্ধাব করেন, অগাছ শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, ঐ সব শাস্ত্রের মূল উৎসেব অনুসন্ধান করেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিনি আউল-বাউলের ‘শাস্ত্র’ অধ্যয়ন করে, টীকা লিখে তাদের জীবনদর্শন অধ্যাত্মদর্শন লোকচন্দ্রের সামনে তুলে ধরলেন।

এই কমে লিপ্ত হয়ে ক্ষিত্তিমোহন দেখতে পেলেন, আউল-বাউলের মূল উৎস যে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ভক্তিবাদে রয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে মুসলিম সূফীবাদ। তিনি তারই অনুসন্ধানে সূফীবাদের এমনই গভীরে পৌছলেন যে, বহু সুপণ্ডিত সূফী পর্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, সূফী আবহাওয়াব এত দূরে থেকে এই লোকটি একে আপন প্রাণ-নিশ্বাসে ভরে নিল কি কবে? বামমোহনকে যদি বলা হয় জবরদস্ত মোলবী, একে তাহলে বলতে হয় ‘জবরদস্ত’—বা ‘জবর-দার-সূফী’। পূর্ব বাঙলাব অনাদৃত মুসলিম চারীকে ক্ষিত্তিমোহন ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা কুরান ও

মুসলিমদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আশ্চর্য প্রাণশক্তিবলে সে তার চতুর্দিকের ভিন্ন-সাধনাও আপন করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সাধকের কাছে সে ঋণীও বটে, উত্তমর্গও বটে। এবং সর্বশেষে সপ্রমাণ করলেন, হিন্দু মুসলমান সাধনার মিলন হয়েছে এই ‘চাষাভুষ্য’দের কলাগেই—মৌলভী ভাষা-চাষে যে ভাবনা-সাধনার আদান-প্রদান অতি অল্পই হয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গণসাধনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা গভীরতর হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ক্রিয়া-কর্মের দিকে আকৃষ্ট হলেন। ‘মেয়েলী’ বলে আমরা যে সব পালপার্বণ ব্রত-পূজা অবহেলা করে আসছিলাম সেগুলো একটি একটি করে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখাতে লাগলেন যে, এগুলোব ভিতরও অতি প্রাচীন ঐতিহ্য লুকোনো রয়েছে, এবং অনেকগুলোই চলে যায় আমাদের ধর্মাসুসজ্ঞানের প্রাচীনতম যুগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলেন যে, আমাদের অনেকগুলোই আবার আমাদের প্রতিবেশী ‘অনার্য’দের কাছ থেকে নেওয়া।

সে এক বিপরীত দর্পণ। আমরা যে সব পালপার্বণকে ভেবেছিলাম অতিশয় খানদানী ‘আর্য’, ক্ষতিমোহন প্রমাণ করলেন তার অনেকেই ‘অনার্য’ এবং তথাকথিত ‘অনার্য’ ক্রিয়াকর্মের মূল রয়েছে নৈকশ্য আর্যসাধনার গভীরে।

এর সব-কিছুই প্রেমী গবেষককে নিয়ে যায় ভারতবর্ষের ধর্মাসুপ্রাণিত দর্শন-চর্চায়—কাবণ একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই বহর বাহুরূপ উন্মোচন করে অন্তরের ঐক্য দর্শন করাতে পারে। সেখানে তিনি পেতেন জ্ঞানী দ্বিজেন্দ্রনাথের উপদেশ এবং সহযোগিতা—গুণী রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য যে তিনি অহরহ পেতেন সে জ্ঞান-কথা

১ এই ঋষি সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় নি। এ যুগে এঁর ভগবৎ-উপলক্ষি তুলনাহীন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অষ্টমীয়া দার্শনিক ছিলেন। ক্ষতিমোহনের সঙ্গে এঁর যোগ হওয়াতে উভয়েই প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। নিয়ে ক্ষতিমোহনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ক্ষতিমোহনের পুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে উদ্ধৃত করছি :

“হিরাক্লিটসের প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্মবাদের গোড়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আপনার বিচারে বাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা আমাকে ব্যস্ত করিয়া বলুন, এইটে আমি লিখিতে ইচ্ছা করি।

প্রবর্তিত না বলিয়া প্রকল্পিত বলিলাম এইজন্য যেহেতু হিরাক্লিটসের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারযোগ্য নহে—তাহা একটা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র।

পূর্বেই নিবেদন করেছি। এরই কালে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড, যোগ ও তন্ত্রের রহস্যবাদ ও দর্শনের মূল তথ্য রয়েছে একই নিহন্দ সত্য।

এই সত্যের ভাষ্যমতী-দণ্ড হাতে নিয়ে ক্ষিতিমোহন প্রবেশ করলেন হীনযান, মহাযান এবং তারই ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক যান, নেপাল-তিব্বত-চীনের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মজগতের ভিতর। সেই এক সত্য কখনো বৌদ্ধদর্শনের কৃষ্ণাতিমুখ চিন্তাবারায়, তন্ত্রের বিকৃত কর্মকাণ্ডের পিছনেও সেই সত্য ভ্রম্যচ্ছাদিত, সেই সত্যই চম্পাপদে, সেই সত্যই পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতে, পশ্চিমবঙ্গের আউল-বাউলের গানে কখনো স্বপ্রকাশ, কখনো শাস্ত্রানধিকারীর উৎপাতে লুপ্তায়িত—কখনো সরলতম ভাষায় স্বচ্ছ, কখনো রহস্যাবৃত রূপকে আশ্চর্য কুহেলিকাঘন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এতে আর এমন নূতন কথা কি? আমরা তো চিরকালই স্বীকার করে এসেছি, সর্বধর্মেই সত্য সমাহিত।

সত্যই কি আমরা তা জীবনে স্বীকার করেছি? ধর্মের বাহুরূপে যে বিকট বিকট প্রভেদ অহরহ দেখতে পাচ্ছি, সে কি যুগ যুগ ধরে আমাদের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করে নি? না হলে চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণের কি প্রয়োজন ছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন এঁদের মতো ধর্মসংস্কারক ছিলেন না। এঁদের প্রধান কর্ম ছিল, যুগ যুগ সঞ্চিত আমাদের ঐতিহ্যের ধন যার প্রায় সব-কিছুই আমরা দৈনন্দিন জড় অভ্যাসের ফলে সম্পূর্ণ অবহেলা করে বসে আছি, সাধনাবিহীন মস্ততত্ত্বই সর্বপাপহর বলে বিশ্বাস করে বসে আছি, মুখে ‘সর্বভূতে নারায়ণ’, কর্মে সে ‘নারায়ণ’কে ডোম-চণ্ডালের কলুষভাব ভয়ে সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রেখেছি, স্বর্ণ-পর্ণে, ধর্মে-অধর্মে প্রভেদ কবার শক্তি প্রায়

‘প্রকল্পিত’ অপেক্ষা আরো বেশী সঙ্গতমার্কিক বিশেষণ আমাদের দিতে পারেন তো ভালো হয়।

‘অগ্নিব্রহ্মবাদ’ হয় কি না? এরূপ একটি কথা চলিতে পারে কি না— তাহাতে কি বুঝায়?

‘প্রকল্পিত’ ইহার পরিবর্তে মনোভিমত, প্রস্তাবিত, উপগম্য—এ তিনটির কোনোটি খাটে না। যেহেতু তাহা শুধু মনোভিমত বা প্রস্তাবিত বা উপগম্য নহে। কাণীর পণ্ডিতেরা এরূপ স্থলে কিরূপ তাত্ত্বিক ভাষা ব্যবহার করেন?

এই বিষয়ে উচিতাভুতিত আমাদের লিখিয়া পাঠান।”

হারিয়ে কেলছি—এই নিদারুণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি সেই সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা যে-সত্য আমাদের হাতের কাছেই আছে,—লালন ককীরের ভাষায়—

“হাতেব কাছে—পাইন খবর

খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর—!”

বাক্যে চাইলেই পাওয়া যায়।

কিত্তিমোহনের প্রধান কর্ম ছিল, সমাজের তথাকথিত নিম্নতম সম্প্রদায়েও যে সে সত্য যুগপৎ নুসৃত্ত ও উদ্ভাসিত আছে, তারই দিকে তথাকথিত শিক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে তিনি তাঁর সাধনা আরম্ভ করে নিচের দিকে নেমে এলেন। আউল-বাউলে এবং সেখানে যে সব মণিমুক্তা গেলেন, তাদের প্রাচীনত্বের সন্ধানে উপরের দিকে গেলেন বেদ-উপনিষদে। এই অবিচ্ছিন্ন তিন লোকে তাঁর গমনাগমন গতিধারা ছিল অতিশয় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময়। এটা পণ্ডিতজন-দুর্লভ—ধর্মলোকে বিধিভিত্ত স্পর্শকাতরতা না থাকলে এ জিনিস সম্ভবে না।

কিত্তিমোহন পথ প্রদর্শন করার পর আরো অনেকেই আউল-বাউল নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু তৎসঙ্গেও কিত্তিমোহন একক।

তার কারণ কিত্তিমোহনের এমন একটি গুণ ছিল যা এ যুগে আর কারও ছিল না—আমার অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর কুতূপি আমি এ গুণটি দ্বিতীয় জনে দেখি নি।

কঠিনতম জিনিস সরল ভাষায় মধুর রূপে প্রকাশ করার অলৌকিক ‘খুদা-দাদ’-বিধিভিত্ত ইজ্জতাল-শক্তি।

কিত্তিমোহন লিখেছেন যতখানি, বলেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। কারণ তিনি জানতেন পুস্তক সর্বগামী নয়, লিখিত অক্ষরের শক্তি সীমাবদ্ধ।

বিদ্যালয়ের অজ্ঞাতশত্রু বালক থেকে আরম্ভ করে শুভকেশ বুদ্ধ, অভ্যাগত-রবাহূত সকলকে, সভাস্থলে, বন্ধুসমাগমে, ট্রেনে-জাহাজে, হিমালয়ের চটিতে, নর্মদার পারে পারে, দেশে-বিদেশে তিনি যেখানেই থেকেছেন, যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি এই অভূতপূর্ব বাচনভঙ্গী দ্বারা তাঁর বক্তব্য নিবেদন করে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। শত শত লেখক হাজার হাজার গম্ভীর পুস্তক লিখেও যা করতে সক্ষম হবেন না, কথকসম্রাট কিত্তিমোহন একাই তা করে গেছেন তাঁর খুদা-দাদ এই সওগাতের দৌলতে।

সবিনয় নিবেদন করছি, আচার্য কিত্তিমোহনের বহুমুখী কর্ম এবং চিন্তাধারার সম্যক বিশ্লেষণ আমার সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে। যে-টুকু আছে তাও শোকাচ্ছন্ন।

তবু আশ্রমবাসী, তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরই স্মরণে তাঁর অসংখ্য অহুয়ানী পাঠক ও শ্রোতাদের উদ্দেশে এই কথা কয়টি নিবেদন করি।

আমার অক্ষয়তম রচনাও তাঁর স্নেহানীর্বাদ লাভ করত। পুণ্যলোক থেকে আগত তাঁর সে আশীর্বাদ থেকে আমার এ দান প্রকাশলি অকিঞ্চন গুরুদক্ষিণা বঞ্চিত হবে না—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

॥ শেষ ॥